নীলকণ্ঠ

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ

=প্রথম প্রকাশ=

বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী, ১৩৬৮

প্রকাশনা : সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৬০, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

মুদ্রণ : নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস,
৬, ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
৪২, মহেন্দ্র গোসাঁই লেন, কলিকাতা-৬।

" ব্লক : কলার ষ্টুডিও,
৪২, মহেন্দ্র গোসাঁই লেন, কলিকাতা-৬।

" শিল্পী : শিবনারায়ণ নিয়োগী,
৬, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী লেন, কলিকাতা-২।

বাঁধাই : শ্রীকৃষ্ণ আর্ট প্রেস,
২১বি, সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪।

: প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসাধন সংঘ
৬০, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
মহেশ লাইব্রেরী
সংস্কৃত সাহিত্য পুস্তক ভাণ্ডার

অঞ্জলি

প্রমত্তা বিপুলা পৃথ্বী প্রচণ্ড বিক্ষোভে,
দিগদিগন্তরে সদা সাহারার ত্রিতাপ দহন ;
হিংসা দ্বন্দ্ব দুর্নীতির তীব্র শরাঘাতে
সত্য-শিব-সুন্দরের অবহেলে নিয়ত নিধন।

তারি মাঝে মেঘমন্দ্রে শুনি জয়ধ্বনি
উদ্বেলিত মনপ্রাণ, নব উষা জাগে পূর্বাচলে ;
নিষ্ঠা-সিদ্ধি-করুণায় সঞ্চারিত অমর্ত প্রেরণা—
জটাশীর্ষে শোভে নাগ, পদাম্বুজ ধৌত সিন্ধুজলে।

তোমারি মন্দিরে তবু জঘন্য বেসাতি,
নির্বিচারে বঞ্চনা ও ভণ্ডামির নির্লজ্জ বোধন ;
অঙ্গনে নিশীথে নগ্ন অভিসার ছলে
উন্মুখ বিভোল প্রাণে নাগিনীর নির্দয় দংশন !...
তবে আর কোথা আশা, কিবা পরিণতি ?
বিশ্বে শুধু ধ্বনিবে কি অসহায় আত্মার ক্রন্দন ?...

শান্ত সমাহিত প্রভু, রুদ্রনেত্রে ফিরে চাও আজি—
বিপ্লবের বহ্নিতেজে প্রলয় প্লাবনে
পঙ্গু হোক পাপচক্র, ধ্বংস হোক ক্লিন্ন পঙ্কে ঘৃণ্য রক্তবীজ ;
হৃদি বৃন্দাবনে মুগ্ধ প্রেম-প্রস্রবনে
মহাজীবনের মন্ত্রে অভিষিক্ত কর ধরণীরে ঃ
নীলকণ্ঠ ! তব শুদ্ধ নিত্যলীলা লীলায়িত হোক ত্রিভুবনে।...

তোমারই গঙ্গানন্দ

নিবেদন

বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতার যুগ। ঋষিদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে অপৌরুষেয় বেদ ও ধর্মশাস্ত্র, প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম।

ঋষিদের ধর্মকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করে অনার্য রাক্ষস। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। সনাতন আদর্শে প্রণীত হয় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতগীতা।

ক্রমে দেখা দেয় কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের বৈষম্য, জাতিভেদ ও অবিচার। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে জ্ঞানমার্গ প্রতিষ্ঠিত হয় নূতন মর্যাদায়—'শূন্যতাকরুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে।' বেদানুগ নয় বলিয়া বৌদ্ধধর্ম পরিত্যক্ত হয় হিন্দু সমাজে।

শঙ্করাচার্য বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিতে প্রচার করেন অদ্বৈতবাদ—রোধ করেন হিন্দু সমাজের অধোগতি। কিন্তু 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ইহা বিশেষার্থে মায়াবাদ বলিয়া তিনি অভিহিত হন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধরূপে—'মায়াবাদং সচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে'।

রামানুজাচার্য প্রচার করেন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। এই মতে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—জগৎকারণটী জীবাত্মা ও সূক্ষ্ম জগৎ, চিৎ ও অচিৎ, এতদুভয়-বিশিষ্ট পরমাত্মা। ভক্তিকে ধর্মের প্রধান অঙ্গ হিসাবে প্রচার করেন তিনি। মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদও প্রেরণা দেয় বৈষ্ণবদের।

মুসলিম সংঘর্ষে হিন্দু সমাজে দেখা দেয় ঘোর সংকট। কঠোর শাসন ও বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করেন শাস্ত্রকারগণ। রামানন্দ, কবীর, গুরুনানক ভক্তিবাদের মাধ্যমে প্রচার করেন উদার ঐক্যমত। তবু হিন্দু সমাজে প্রবল হইয়া ওঠে অনৈক্য ও শ্রেণীবিদ্বেষ। উত্তাল সমুদ্রে নাবিকহীন তরীর ন্যায় বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে হিন্দুধর্ম।

সেই চরম দুর্দিনে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তাঁহার অত্যুদার ধর্মভাব প্রচারে হিন্দু সমাজে দেখা দেয় নব জাগরণ। অদ্বৈত প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তিনি গঠন করেন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ। জটিল ধর্মকর্ম ও কঠোর সাধনার স্থলে প্রবর্তন করেন নাম-কীর্তন—কর্মের কঠোরতা ও জ্ঞানের শুষ্কতার পরিবর্তে প্রবাহিত হয় প্রেমভক্তির

বিপুল প্রাণবন্যা। সর্বজনীন সনাতন ধর্মের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় আত্মহারা হন মহাপ্রভু, বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম প্রচারে আসমুদ্র-হিমাচল আলোড়িত করিয়া উৎসর্গ করেন মহিমান্বিত জীবন।

'কিন্তু হিন্দুধর্মের ভিত্তিমূলে কঠোর আঘাত হানিল ঔরঙ্গজীবের সংকীর্ণ নীতি।' প্রতিবাদে শিখ গুরু তেগ বাহাদুর শির দিলেন, তবু সার (ধর্ম) দিলেন না। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে পরিণত করিলেন সামরিক জাতিতে। অখণ্ড হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পে শিবাজী দাঁড়াইলেন উন্নতশিরে। 'মোগল সাম্রাজ্য বিলুপ্তপ্রায় হইলে রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল ইউরোপীয় বণিকগণ।' হিন্দু সমাজেও দেখা দিল নানা গ্লানি, তান্ত্রিক ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের নানা অনাচার। অধর্মের অভ্যুত্থানে সারা দেশ হইল শতধা বিচ্ছিন্ন, মৃতপ্রায়। সেই অধঃপতনের পিচ্ছিল পথেই ইংরেজদের আগমন। 'ইংরাজি শিক্ষা ও প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল বৈদেশিক অপপ্রচার। পতিত লক্ষ লক্ষ নরনারী গ্রহণ করিল খ্রীষ্টানধর্ম—শিক্ষিত মুষ্টিমেয় দেশবাসীও আকৃষ্ট হইল পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে। সেই চরম সংকটে রাজা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলে চৈতন্যোদয় হইল শিক্ষিত সমাজের।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইলেন বিজয়কৃষ্ণ। সারা ভারতে উল্কাবেগে প্রচার করিলেন সর্বাত্মক ব্রাহ্মধর্ম—দুর্জয় সাধনায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্মুখে স্থাপন করিলেন নূতন এক জাগৃতি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রমাদ গণিলেন পাদ্রী সাহেবের দল—বিজয়কৃষ্ণের কম্বুনিনাদে ভারতীয় সনাতন ধর্মের মর্মমূলে আঘাত হানিবার অলীক স্বপ্ন টুটিয়া গেল তাঁহাদের।...পরম বস্তু লাভের উন্মাদ আগ্রহে বিজয়কৃষ্ণ আবার ছুটিলেন বনে-পর্বতে। গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট অলৌকিকভাবে দীক্ষালাভ করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে নতুন আলোক প্রচারে ব্রতী হইলেন।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বারদীর ব্রহ্মচারী, কাঠিয়াবাবা, গম্ভীরনাথজী, ভোলাগিরি মহারাজ প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের প্রভাবে হিন্দু সমাজে জাগে নব উন্মেষ। দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজ গঠনে, সনাতন পন্থীদের ধর্ম-মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠায় এবং স্বামী রামতীর্থের বেদান্ত ধর্ম প্রচারে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হইল সারা ভারতে। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে

ব্রহ্মজ্ঞানের শুষ্ক পথ ছাড়িয়া প্রেমভক্তির চিরমধুর পথে অগ্রসর হইলেন যুগাচার্য বিজয়কৃষ্ণ। মহাপ্রভুর অবশিষ্ট লীলাপুষ্টির প্রয়োজনে গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবে ধন্য হইল দেশবাসী।

এইভাবে বৈদিক যুগ হইতে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে বোঝা যাইবে, ধর্মের গ্লানি ও অধঃপতন দেখা দিলে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ধর্মরক্ষার জন্যই। সেই উদ্দেশ্যে ভগবান বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে দেখা দেয় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণী-সঙ্গম। প্রথমে রামমোহনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সনাতন আদর্শের পথে ভারতকে জানাইলেন উদাত্ত আহ্বান। বিভিন্ন ধর্মপথ পরিক্রমার পর প্রমাণ করিলেন, শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত প্রেমভক্তির মহিমান্বিত পথই ধর্মলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

নবগৌরাঙ্গ রূপে বিজয়কৃষ্ণের এই আবির্ভাব নিছক ভাবের কথা নয়। অদ্বৈত প্রভুর অভিমানক্ষুব্ধ দাবীর ফলে তাঁহারই বংশে দশম পুরুষে গোস্বামী প্রভু রূপে অবতীর্ণ হন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এই প্রসংগ উত্থাপিত হওয়ায় কেহ কেহ মৃদু আপত্তি জানাইয়াছেন, যদিও কোন যুক্তি দেখান নাই। কিন্তু ইহা কল্পনাপ্রসূত প্রচার-কৌশল মাত্র নয়, প্রামাণ্য সত্য। এই সত্য আবিষ্কার করেন গোসাঁইজীর অন্যতম ভক্ত শিষ্য ও নিত্য-সঙ্গী শ্রীধর মহারাজ। ১৩০২ সালে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া যাইবার পথে তিনি এক ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে অতিথি হন এবং সেই ভক্তের আদি-পুরুষ শ্রীল পরমানন্দ দাস * লিখিত একটি করচা পুঁথি পাঠ করিয়া তাহা হইতে একটি অধ্যায় নকল করিয়া আনিয়া সযত্নে রক্ষা করেন। গোস্বামী প্রভুর অধিকাংশ শিষ্যই উহা সেই সময় পাঠ করেন। উহা অবলম্বনে 'শ্রীশ্রীঅদ্বৈত অভিশাপ' নামে একটি পালা-গান রচনা করেন কাশী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের মহান্তজী স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ।...

স্বপ্নযোগে জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশক্রমে অপ্রাকৃত আবির্ভাব হইতে শ্রীক্ষেত্রে লীলা-সংবরণ পর্যন্ত গোস্বামী প্রভুর দিব্য জীবনও ইহার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। শাস্ত্র, সদাচার ও সনাতন আদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করাই তাঁহার লীলামৃত কথার প্রধান

* শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে সীতাঠাকুরাণীর অতি বিশ্বস্ত অনুগত সেবক।

বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রভু মাত্র সাড়ে-তিন জনকে যে মন্ত্র প্রদান করেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের কলিজার ধন সেই মহাশক্তিযুত ইষ্টনাম জাতির কল্যাণে এবার সহস্র সহস্র গৃহীদের মধ্যেও বিলাইয়া দেন গোস্বামী প্রভু। বিশ্বপ্লাবী শ্রীনামপ্রবাহে এইভাবে সার্থক হইল মহাপ্রভুর পুনরাবির্ভাব।···

প্রাচীন যুগ হইতে ক্রম-বিবর্তনের পথে ভারতীয় সনাতন-ধর্মের যে ধারাটী প্রবহমান, সেই প্রাণগঙ্গার অপূর্ব মহিমা আমরা দেখিতে পাই গোস্বামী প্রভুর মধ্যে। ত্রিতাপদগ্ধ যে জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণব্রত গ্রহণ করিয়াই তাঁহার আবির্ভাব, সেই স্বদেশবাসী একজনের হস্তে মহাপ্রসাদ নামে তীব্র বিষের লাড্ডু সজ্ঞানে ভক্ষণ করিয়া তিনি লীলা সংবরণ করিলেন। আর, আপন মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়া গেলেন তাঁহারই প্রাণপ্রতিম মানসপুত্র কুলদানন্দের উপর।

আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে গোসাঁইজী ও ব্রহ্মচারিজীর অনন্ত লীলারহস্য সম্যক উপলব্ধি করা অসম্ভব। ইহা গোষ্পদের জলে মহাকাশের বিপুল মহিমা অনুধাবনের ব্যর্থ-প্রয়াস মাত্র। তবু সদ্‌গুরু অবতারের উদ্দেশে ইহা ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তিনম্র পূজা, সাগ্রহ অর্চনা। সেইদিক দিয়াও ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের সনাতন-ধারা, বিশেষতঃ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য কিছুটা অনুভব করা অপরিহার্য। তবেই অনুমাত্র ধারণা লাভ করা সম্ভব হইবে, নবগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ গোসাঁইজীর শ্রীনাম ও প্রেমধর্ম প্রচার-ব্রত কীভাবে সার্থক হইল ব্রহ্মচারিজীর জীবন-লীলায়।

বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার ব্যাকুল আগ্রহ ছিল ব্রহ্মচারিজীর। আবার সত্যানুসন্ধানের আগ্রহে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করেন সনাতন হিন্দুধর্মের পথে। গোসাঁইজী নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও প্রিয়তম সন্তান কুলদানন্দকে সন্ন্যাস দান করেন নাই; কারণ সন্ন্যাসী শুধু সর্বত্যাগী নন, সংসারত্যাগী। জনকল্যাণের বৃহত্তর তাগিদে তিনি নিজেও ছিলেন ব্রহ্মর্ষি গৃহী-সন্ন্যাসী। সেই তাগিদে এবং নিজের আরব্ধ লীলাপুষ্টির প্রয়োজনে গুরুগতপ্রাণ কুলদানন্দকে দান করেন সন্ন্যাস হতেও কঠোরতর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপনের এবং গুরুর দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি হিসাবে তাঁহাকে স্বহস্তে প্রদান

করেন শাস্ত্রসম্মত নীলকণ্ঠ বেশ। ব্রহ্মচারিজীও তাই সনাতন আদর্শে অবিচল নিষ্ঠার সহিত গুরুপ্রদর্শিত পথে তাঁহার দিব্য জীবনে সাধন করিলেন কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমভক্তির অপূর্ব সমন্বয়—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ও দুশ্চর সাধন মার্গে অমর্ত প্রেরণায় অগ্রসর হইয়া লাভ করিলেন মহাসিদ্ধি। পরে শ্রীগুরুদেবের পূত জীবনাদর্শে স্বয়ং নীলকণ্ঠের ন্যায় আজীবন পান করিলেন আকণ্ঠ হলাহল—আর জগতের হিতার্থে পাপী-তাপীর উদ্ধারকল্পে প্রেমাবতার সদ্‌গুরু রূপে পরিবেশন করিয়া গেলেন মহিমান্বিত প্রেমধর্ম এবং মহাশক্তিযুত নামামৃত।...উজান বহিল দেশের প্রাণযমুনায়—সার্থক হইল তাঁহার নীলকণ্ঠ নাম। নূতনের মাঝে দেখা দিল চিরকালের শাশ্বত মহিমময় রূপটীর অভাবনীয় আত্মপ্রকাশ—সারা জগতে নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি, আর্য ঋষিপন্থার আদর্শ ও ঐতিহ্য।...

তাই ব্রহ্মচারিজীর জীবন-চরিত সত্যই অমূল্য, অনবদ্য। ইহা শুদ্ধ প্রজ্ঞা, অনন্ত ঐশ্বর্য ও অমর প্রেমভক্তির অফুরন্ত উৎস—কঠোর সংগ্রাম, অমোঘ সাধনা এবং ঋষিকল্প সিদ্ধি ও ঋদ্ধির বিচিত্র কথামৃত।

আর, এই মহাগ্রন্থের রচয়িতা তাঁহারই মানসপুত্র ঠাকুর শ্রীমৎ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। ব্রহ্মচারিজী যেমন গোসাঁইজীর সদ্‌গুরু জীবনের নিত্যসঙ্গী, ব্রহ্মচারিজীর নীলকণ্ঠ-লীলার শেষ অধ্যায়ে তেমনি ঠাকুরও ছিলেন তাঁহার লীলা-সহচর। এজন্য ব্রহ্মচারিজীর অপার মহিমা ও লীলা-মাধুর্য সম্পর্কে আছে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞা, ধ্যান ও ধারণা। এছাড়া, নিজ গুরুর নির্দেশে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত-পালন এবং সুকঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভের মহিমায় ঠাকুরের দিব্য জীবন মহিমান্বিত। আধুনিক যুগে নানা গ্লানি, দুর্নীতি ও অবিশ্বাসের প্রবাহের মধ্যে পতিত ও ত্রিতাপক্লিষ্ট নর-নারীর উদ্ধারকল্পে সদ্‌গুরুরূপে তিনিও আজ ভারতীয় সনাতন-ধর্মের ভিত্তিতে গোসাঁইজী ও ব্রহ্মচারীর দিব্য মহিমা ও নামধর্ম প্রচারে নিযুক্ত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?...আপন সাধনা ও মহিমায় শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গত কারণেই গোসাঁইজী ও ব্রহ্মচারিজীর জীবন-বেদ ও লীলা-মাধুর্য উপলব্ধির এবং পরিবেশনের সুযোগ্য অধিকারী।

তবে গোসাঁইজী ও ব্রহ্মচারিজীর ন্যায় ঠাকুরও আত্মগোপনপ্রিয়, সদাসতর্ক আত্মপ্রচারবিমুখ। এজন্য তাঁহার সম্পর্কে ব্রহ্মচারিজীর অনেক লীলাবৈচিত্র্য অপ্রকাশিত রহিয়া গেল এই গ্রন্থে। সঙ্ঘের দাবী ও আবদারের ফলে তাহার অতি সামান্য অংশই পরিবেশিত হইল।

মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্—সেই খাতিরে কোন কোন শিষ্য-শিষ্যার নিকট হইতে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজীর হলাহল পানের অনেক কাহিনীও রহিয়া গেল সাধারণের অগোচর। তাঁহার জীবনের সহিত যাহা অবিচ্ছেদ্য, মাত্র তাহাই পরিবেশিত হইল। তবে গ্রন্থ-রচনা সম্পর্কে তাঁহার ষষ্ঠ খণ্ড ডায়েরী এবং অনেকগুলি স্বপ্ন ও তথ্যের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এই ডায়েরীখানি প্রকাশের জন্য ঠাকুরকে নির্দেশ দেন স্বয়ং ব্রহ্মচারিজী। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে তিনি নিজেই তাঁহার এই সব স্বপ্ন ও তথ্যগুলি ঠাকুরকে লিপিবদ্ধ করাইয়া দেন। পরবর্তীকালে সেগুলি চাহিয়া লইয়াছিলেন পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত চার-পাঁচ বৎসর পুনঃপুনঃ অনুরোধ জানান সত্বেও এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে কেন যে তাঁহারা সেই অমূল্য ডায়েরী ও তথ্যগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন না, তাহা তাঁহারাই জানেন।··· 'নীলকণ্ঠ' পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও বিনাসর্তে ঠাকুরবাড়ী কমিটীকে অর্পণ করিতে ঠাকুর প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা জীবনী প্রকাশ করিতে বা এ বিষয়ে কোনপ্রকার সহযোগিতা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরকাল জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশে এই অবহেলা সত্যই মর্মান্তিক! জন-কল্যাণের তাগিদে আশ্রমের কর্ণধারেরা ব্রহ্মচারিজীর ষষ্ঠ খণ্ড ডায়েরী প্রকাশ করিলে পরবর্তী সংস্করণে 'নীলকণ্ঠ' দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইতে পারিবে পূর্ণতর মাধুর্য-সম্ভারে।

ব্রহ্মচারিজীর দিব্য জীবন-আলেখ্য রূপায়ণের স্বপ্ন ঠাকুরের বহু দিনের। বহুকাল হইতে বিভিন্ন সূত্রে বহু গ্রন্থ এবং নানা স্থান ও ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে অজস্র তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য চলিয়াছে তাঁহার অবিচল সাধনা। সেই সঙ্গে আত্ম-সমাহিত অবস্থায় তাঁহার গভীরতম উপলব্ধির রসায়ণে বহু অসুবিধা সত্বেও মধুর রসতত্ত্ব ও ভাবসম্পদের অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনায় এ মহাগ্রন্থ আজ অনন্যসাধারণ। ঠাকুরের উদার ধ্যানদৃষ্টির স্বচ্ছধারায় ইহার ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত পূত

মন্দাকিনী। তাহারই তটপ্রান্তে গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তির রসসিঞ্চনে স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমকলি।

আমরা সেই মালঞ্চের দীন মালাকর,—ইহা ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা। ঠাকুর বলিয়াছেন, আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ভিন্ন এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। কিন্তু সেই শক্তি ও প্রেরণা দিল কে? পুতুল নাচের আসরে কি কিছুমাত্র কৃতিত্ব আছে তুচ্ছ পুতুলের?··· তবে তাঁহার দ্যুতিমান কায়ার পশ্চাতে আমরা ম্লান ছায়া মাত্র। ফলে, এ গ্রন্থ প্রকাশের স্বপ্ন ও তাহার রূপায়ণের সবটুকু সার্থকতা একমাত্র ঠাকুরের—কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদেরই। বর্ণাশুদ্ধি, মুদ্রাপ্রমাদ ইত্যাদি অসঙ্গতি যেন চাঁদে কলংক—সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাই সকলের নিকট। পরম ভাগবত মণীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী, সাহিত্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ স্মৃতিতীর্থ এবং আচার্য যোগেশ ব্রহ্মচারী তাঁহাদের আশীর্বাণী ও অভিমত দ্বারা এই মহাগ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আর, ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীরাধাগোপাল বসাকের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হইল।

তবু, নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এ গ্রন্থ সাধক, ভক্ত ও ভাবুক পাঠকের নিকট নিঃসন্দেহে অমূল্য সম্পদ। দুর্জয় সংগ্রাম, সাধনা ও সিদ্ধির স্তরে স্তরে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজী উত্তীর্ণ হইয়াছেন ভূলোক হইতে দ্যুলোকে। সেই দিব্যধামে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দেহধারণের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত লীলামাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন দেশের শিক্ষা, শান্তি ও কল্যাণের জন্যে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সেই ক্রমবিবর্তন ও নীলকণ্ঠ-লীলার মধুর দ্যোতনায় ধন্য হইবে দেশবাসী, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা। বহু ভাগ্য ও সুকৃতির ফলে আমরা আজ এই রসোত্তীর্ণ কথামৃতের উত্তরাধিকারী। এ মহাগ্রন্থ পাঠ করিতে বসিলেই দিব্য ভাবে ও প্রেরণায় আমাদের মত অধমদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসে। তাই মনে হয়, এই রসসাগরে অবগাহন করিতে পারা বহু পুণ্যফলেই সম্ভবপর। আর, যে ভাগ্যবান ভক্তপ্রবর নিমজ্জিত হইতে পারিবেন, নিঃসংশয়ে ভবজ্বালা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন তিনি।···

— জয়গুরু —

বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী, ১৩৬৮। কৃপাধন্য—সৌরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(পরমহংস শ্রী ১০৮ অচ্যুতানন্দ সরস্বতী)

আকিঞ্চন

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী মহারাজের জয় হোক্। এ কি ব্যাপার! তাঁহার প্রণীত 'নীলকণ্ঠ' গ্রন্থরত্ন শিরে ধারণ করিয়া এ কি অবস্থা হইল! কম্প-অশ্রু-পুলকে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার মর্ম্মমূল মন্থন করিয়া উত্থিত হইতে চাহিল জ্যোতিরালোকে উদ্ভাসিত কুণ্ডলায়িত একটি ধ্বনি—'খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ অভক্তের নাশ, মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ।' 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ'—কলিপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার এমনই মহিমা, 'জীব ছার কোথা তার পাইবেক সীমা!' শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর যুগোচিত নব আবির্ভাবের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলাম। ভরসা তবে আছে। আমার মত অধম জীবের দিকে তাকাইবার মত তবে একজন এখনও আছেন। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম'—প্রভুর শ্রীমুখের এই আশ্বাস-বাণী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। তাহার শক্তি আজও আকাশে বাতাসে খেলিতেছে এবং যুগোচিতভাবে আমাদের অলক্ষ্য পথে অথচ অব্যর্থগতিতে প্রভুর বিশ্ব পরিপ্লাবী প্রেমলীলা পরিপূর্ত্তির উপযোগী প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতেছে।

কিন্তু আর কত দিন? প্রকৃতপক্ষে নিজে আসিয়া ধরা না দিলে কে তাঁহাকে ধরিবে? চাহিলেই তো তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু দুরবগ্রহ তিনি। বদ্ধ জীব আমরা। হিংসায় জর্জ্জর পৃথ্বী। তাঁহাকে চাহিবার জন্য আগ্রহ আমাদের হইবে কেন? ভরসা এই যে, অনপেক্ষ তিনি; অযাচিত তাঁহার প্রেম। 'নীলকণ্ঠে'র জীবন-সাধনার বীর্য্যমূলে নব গৌরাঙ্গ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণের আত্মমাধুর্য্যের এমন চাতুর্য্যের পরিচয়ই আমরা পাইয়াছি। শ্রীমৎ ব্রহ্মচারিজী কুলদানন্দকে তিনি নিজে হাতে 'নীলকণ্ঠ' সাজাইয়াছেন, সাজাইয়াছেন নিজ প্রয়োজনে। কুলদানন্দের মহাজীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের দুঃশ্চর তপোবল, সংসিদ্ধি লাভের জন্য তাঁহার সতত জাগ্রত সাধনা, নিরন্তর নিরলস তাঁহার সংগ্রাম; এই

সকলের মূলে আমরা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বীর্য্যময় যে রূপটি প্রত্যক্ষ করি তাহাতে সৎগুরু স্বরূপ ভগবান বিজয়কৃষ্ণেরই নিজ বৈভব প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কুলদানন্দ সেখানে নিবেদিতাত্ম; তাঁহার ভিতর দিয়া বিশ্বাত্মদেবতার সর্ব্বজীবোদ্ধারে সর্ব্বাতিশয়ী সংবেদনময় আত্ম ভাবটিই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 'সৎগুরুসঙ্গে' শ্রীমৎ কুলদানন্দের আত্ম-বিশ্লেষণ সাধারণ সাধকের আত্মদোষানুদর্শন নহে। বিশ্ব সাহিত্যে এমন ভাবে আত্ম-বিশ্লেষণের পরিচয় কোথায়ও মিলে না। প্রকৃতপক্ষে অপূর্ব্ব নির্ম্মাণক্ষম প্রতিভা বলিতে আমবা সাহিত্যিক বিকারে যে বস্তু বুঝিয়া থাকি, ব্রহ্মচারিজী সৎগুরুসঙ্গে তাঁহার প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন নাই। সৎগুরুর কারুণ্য-মহিমায় তিনি এ ক্ষেত্রে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমারের সমতুল্য উর্দ্ধরেতার নিস্ক্রিয় এবং নিষ্কল আত্মসত্তায় অধিষ্ঠিত; নিজের সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি তাঁহার নাই। কামসঙ্কল্প-বিবর্জ্জিত পুরুষ তিনি। সৎগুরু চরণে নিত্য সমাশ্রিত তিনি, তিনি গুণাতীত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার আত্ম-বিশ্লেষণের আলোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের আর্ত্তজীবের বেদনাই প্রতিফলিত হইয়াছে এবং এই কৌশলে প্রেমাবতার ঠাকুরটি নাম-প্রেমের চাতুরী মহাকারুণ্যের মহিমায় আমাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ গুণাতীত অবস্থায় অধিরূঢ় না হইলে গুণাভিভূতির রীতি এবং প্রকৃতিকে বদ্ধজীবের পক্ষে বিজ্ঞানময় উপলব্ধির উপযোগী ভাবে উন্মুক্ত করা সম্ভব হইতে পারে না। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ, গুণতত্ত্বের ঊর্দ্ধে অসঙ্গ দ্রষ্টৃরূপে তাঁহার পক্ষেই ইহা সম্ভব। ফলতঃ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ তাঁহার জীবন-সাধনায় বিশ্বজীবের গ্লানি বহন করিয়াছেন, সৎগুরুরই প্রয়োজন সাধনের প্রেরণায়। গুণ-দোষ বিচারের ক্ষেত্র বুদ্ধির ভূমি। শ্রীমৎ কুলদানন্দজী এই স্তরের ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। তিনি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। যিনি সকলের প্রিয়তম, যাঁহার সমাশ্রয় লাভ করিলে যতই কেন অপরাধী হই না, আমরা আমাদেব সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হই, সেই পরম পুরুষের আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব স্বরূপে শ্রীমৎ কুলদানন্দ আমাদের কাছে আবির্ভূত হইয়াছেন।

তাঁহার আত্ম বিশ্লেষণে আমরা তাঁহাকে আমাদের আলম্বন স্বরূপে পাই, সমাত্ম-সম্বন্ধে চেতনায় আমরা তাঁহার দিকে তাকাই—অমনই প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুরীর জালে আমরা জড়াইয়া পড়ি। আজানুলম্বিত দুই ভুজ ঊর্দ্ধে করিয়া তিনি হরি, হরি, বলিয়া আমাদের কাছে ছুটিয়া আসেন। 'নিজ নামামৃতে মত্ত অনুক্ষণ—জয় শচীনন্দন!' তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত এই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া করুণাঘন তাঁহার চরণে আমাদিগকে আত্মানিবেদন করিতে হয়।

এ দেশের মহাজনগণ জীবের চিত্তে ভগবৎ-সম্বন্ধের উদ্দীপনাকে স্বগত এবং পরগত এই দুই দিক হইতে আস্বাদন করিয়াছেন। ভগবান যখন জীবকে স্বীকার করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত-ভাবে উন্মুখ হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার তেমন স্বীকৃতিকে পরগত স্বীকাব করিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে জীবের প্রার্থনায় করুণা পরবশ হইয়া তিনি যখন জীবকে স্বীকার করেন, তাহা স্বগত স্বীকার। সাধকদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নিজে জীবকে স্বীকার করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে জীবের অতি গুরুতর পাপও তাহার ভগবৎ-প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। মহাপ্রভুর প্রেমের লীলায় পারতন্ত্র্যগত অর্থাৎ পরগত স্বীকৃতির পথে জীবকে আপন করিবার জন্য শ্রীভগবানের আকুতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তের ভিতর দিয়া তিনি আত্মরসে জীবকে আকর্ষণ করিয়াছেন, ভক্তই এক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি স্বরূপ। গোসাঁইজীর লীলায় মহাপ্রভুর সেই চাতুরীর খেলাই আমরা দেখিতে পাই, খোলের বোলে গোল ঘটে না! মানুষটি যখন এক, তখন স্বভাবটিও একই হইবে।

শক্তির কাজ শক্তিমানের আনুগত্য। সে ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্ব তাহার কিছুই নাই। শ্রীমৎ কুলদানন্দজীর সাধনে এই তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে আমরা তাঁহার যেটি কৃত্য বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা শক্তিমানের সংবেদনেই স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্মচারিজীর সৎগুরু স্বরূপে প্রকাশ-লীলারই প্রধানতঃ বিস্তার করা হইয়াছে। প্রবর্ত্তক জীবন, সাধক জীবন অতিক্রম করিয়া তাঁহার সিদ্ধ জীবনের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমাদের পরিচয় ঘটে। ফলতঃ ব্রহ্মচারিজীর জীবনে তিন স্তরেই প্রেমভক্তির বিতরণে

গোসাঁইজীর অত্যদ্ভুত ক্রম-পরাক্রমশীল লীলার বিলাসই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার সাধনার বিভিন্ন স্তরে এবং পরিশেষে তাঁহার সিদ্ধ স্বরূপেও সর্ব্বজীবের প্রতি গোসাঁইজীর সংবেদনেরই পরিপূর্ত্তি প্রজ্ঞানময় প্রদ্দীপ্তি লাভ করিয়াছে। এই হিসাবে তিনি স্বরূপধর্ম্মে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাবতার গোসাঁইজীর লীলা-পরিকর রূপে নিত্যসিদ্ধ। ভাগবত বলেন—যিনি ভূতভাবন, সকলের প্রতি তাঁহার আত্মভাবই সিদ্ধ স্বরূপে জগতে ব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের এই ব্যক্তভাব বলিতে সমাত্ম-সম্বন্ধে পতিত, তাপিত জীবের উজ্জীবনে তাঁহার পৌরুষই বুঝায়। প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধরূপে শ্রীমৎ কুলদানন্দের প্রজ্ঞানময় অবদানে গোসাঁইজীর সর্ব্বাত্মভাবের পরিপূর্ত্তি নিত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নিজ লাভের পূর্ণতায় উদ্দীপিত পৌরুষ-সূত্রেই জীব ও ভগবানের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের উদ্দীপন ঘটে। সৎগুরু এক্ষেত্রে মাধ্যমরূপে কাজ করেন। তিনি জীব এবং ভগবান উভয়েরই নিজতত্ত্ব। প্রত্যুত ব্রহ্মচারিজীর আনুগত্য অবলম্বন না করিলে গোসাঁইজীকে বুঝিবার উপায় নাই। ব্রহ্মচারিজীকে নিজ করিয়াই গোসাঁইজীর প্রেমলীলা আমাদের উপলব্ধির পক্ষে পৌরুষধর্মে পূর্ণত্ব লাভ করে। শ্রীমৎ কুলদানন্দজীর সিদ্ধ স্বরূপের নিগূঢ় রহস্য এইখানে নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মচারিজীকে নিমিত্ত স্বরূপে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বজীবের প্রতি সংবেদন উদ্দীপিত করিবার চাতুর্য্যে গোসাঁইজী আত্মমাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছেন। সেই বিস্তারের সূত্রে জীবের অবীর্য্য নিরাকৃত করিয়া অব্যবহিত আত্মভাবেব ঘনিষ্ঠতায় ব্রহ্মচারিজীকে আমরা সিদ্ধ স্বরূপে লাভ করিয়াছি। শক্তি এবং শক্তিমানের এখানে অভেদত্ব। নামী, নাম এবং নামদাতা অদ্বয়, চিন্ময়, অখণ্ডৈক রসের অমৃতময় কলেবরে আমাদের কাছে এখানে প্রকটিত। বাচকের নিজ বীর্য্যের মাধুর্য্যে ডুবিয়া বাচ্য এখানে নীরব। বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত সর্ব্বতোময় ব্যক্ত-ভাবে প্রণবের এখানে প্রভাব। কলিহত আমাদের পাপভারের বেদনা বহন করিয়া ব্রহ্মচারিজী কলিপাবন দেবতার অযাচিত করুণার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, দেবতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিয়া আত্মমহিমায় আমাদের কাছে ব্যক্ত হইলেন। সৎগুরুর সমাশ্রয়তত্ত্বে শিষ্যের সাধনাঙ্গের নিজ ভাবটি বিশ্ববীজে মগ্ন হইল।

বিষয় আসিয়া আশ্রয়কে বরণ করিল। প্রেমের ঠাকুর মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিয়া মানুষকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর লীলা-মাধুর্য্যের এই তো রীতি। নামরূপে নামিয়া আসাতেই নামীর পূর্ণ কামত্ব, তাঁহার বীর্য্য-মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য। ঔদার্য্যবলে নামী তখন হন নামদাতৃ স্বরূপে উদ্দীপ্ত, আত্মমাধুর্য্যে তিনি হন অপাবৃত। নাম দানের আগ্রহে জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেও আমরা নামীকে সিদ্ধ স্বরূপে চিন্ময় বিগ্রহে পাই।

কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার—নামই সৎগুরু। নামদাতা যিনি তিনিই প্রেমদাতা—সদাপরিভবঘ্ন তাঁহার স্বরূপ। সৎগুরু স্বরূপে প্রকটিত শ্রীমৎ কুলদানন্দজীর অদভ্রকরুণ অরুণোজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গের জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র-স্নিগ্ধ বিভূতি আমাদের চিত্তকে উচ্চকিত করে। তাঁহার বরাভয়প্রদ মধুর অধরে উদ্ভাসিত হাসি আমাদিগকে পরিপ্লুত করিয়া অমৃতের সাধনায় আমাদের চেতনা জাগায়। অদোষদর্শী তিনি—পুরুষোত্তম স্বরূপে তাঁহার মাধুর্য্য সর্ব্বজীবের কাছে সমভাবে উন্মুক্ত। 'ঈশ্বর স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ, স্বল্প সেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ'—এমন তাঁহার উদার প্রভাব। শাণিত ছুরিকা হস্তে তাঁহাকে যে আঘাত করিতে উদ্যত, তাঁহাকেও আলিঙ্গনদানে তাঁহার বাহুযুগল সম্প্রসারিত। তিনি যে নীলকণ্ঠ, জীবের অবিদ্যা-জনিত হলাহল পান করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনই যে তাঁহার ব্রত এবং সেই ব্রত-সাধনের উদ্দেশ্যেই সৎগুরুর চরণে তাঁহার জীবন নিবেদিত। স্বতন্ত্র সংজ্ঞা তাঁহার কোথায়? 'সেই স্বামী যে না কভু ছাড়ে নিজ জন' —শ্রীমৎ কুলদানন্দজীর জীবনে সৎগুরুর এই লক্ষণটি আমরা প্রমূর্ত্ত দেখিতে পাই। শিষ্যের নিতান্ত ক্রুর আচরণও তাঁহার চিত্তে বিকার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পরন্তু তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যিনি চাতুর্য্যজাল বিস্তার করেন তাঁহাকে অমৃতের আস্বাদন করাইবার জন্যই তাঁহার উৎকণ্ঠা; সেজন্য তিনি আকুল। বিষের অপেক্ষাও বিষয় যে মারাত্মক, এ সত্য সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারিজীর অনধিগত নহে। তিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ, সুতরাং বিষয়ী শিষ্যের মনোগত অভিপ্রায়ও তাঁহার অবিদিত ছিল না; তবু নির্ব্বিবেক বিষয়ীর হাতেই নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষয়ী

শিষ্যের কূটচক্রে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াও সমস্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন তাঁহারই উপর। সৎগুরু এমনই পতিতপাবন পুরুষ! সর্ব্বাবস্থায় শিষ্যকে নিজের উদার মহিমায় আকর্ষণ করিয়া মহান আদর্শে তাঁহাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অপরাধীর মার্জ্জনা ভগবানের কাছে না থাকিতে পারে, তাহাকে জগৎ বর্জ্জন করিতে পারে; কিন্তু শিষ্যের অপরাধ যেমনই হোক্ সৎগুরু তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারেন না। তিনি যে সর্ব্বাশ্রয় স্বরূপ। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত কালকূট নীলকণ্ঠ যিনি, তিনি ব্যতীত আব কে পান করিবে?

যুগাবতার স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। "নাম ভিন্ন কলি যুগে নাই আর ধর্ম্ম," সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের সমর্থনে এবং সমাচারসূত্রে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীকে স্বহস্তে নীলকণ্ঠ সাজাইয়া তিনি সৎগুরুর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়া যান। ব্রহ্মচারিজী যুগযুগান্তরের আবর্জ্জিত ধর্ম্ম সংস্কারের অন্ধতা এবং অবিদ্যা জনিত হলাহল প্রসন্ন চিত্তে পান করিয়া নাম-প্রেমের সর্ব্বজনীন আদর্শ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই আদর্শেই ভারতের সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ বিধৃত রহিয়াছে এবং ভারতের এই সনাতন ধর্ম্মই মহাবিভীষিকায় পতিত বর্ত্তমান আর্ত্ত জগৎকে রক্ষা করিতে পারে। শ্রীমৎ গঙ্গানন্দজী ধন্য! 'নীলকণ্ঠে'র বদান্যলীলার মাধুর্য্যে তিনি আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের চিত্ত উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। পশুত্বের যেখানে পিপাসা, সেখানে তিনি প্রেমের স্পর্শ জাগাইয়াছেন। অধর্ম্মের প্রভাবে অভিভূত হইয়া আমরা প্রলয়ান্তকর অন্ধকারের গর্ভে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছি, ভয়াবহ পরধর্ম্মের দুরন্ত মেঘমালা আমাদের দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে; তিনি এই সঙ্কটে আমাদের আত্মচৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমৎ কুলদানন্দের তিনি সাক্ষাৎ সম্পর্কে কৃপাপ্রাপ্ত এবং অনুগৃহীত শিষ্য। এ ক্ষমতা তাঁহারই আছে। দণ্ডবৎ তাঁহার চরণে, শতকোটী দণ্ডবৎ। তাঁহার ন্যায় কৃপাপরায়ণ লোকাচার্য্যের পদরজে পতিত তাপিত জীবনকে যেন অভিষিক্ত করিতে পারি, এই আকিঞ্চন।

৭ ডি, রামকৃষ্ণ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা-৩

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র সেন

জটাশঙ্কর

নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

সিদ্ধির পথে

মহাসাধকের দিব্য জীবনে দেখা দেয় মহাসিদ্ধির শুভ সূচনা। প্রথম কৈশোরে নবজাগ্রত চেতনার সন্ধিক্ষণ হইতেই সূত্রপাত এই মহান সাধনার। যাত্রাপথের প্রতি বাঁকে সম্মুখে দাঁড়ায় উত্তুঙ্গ বাধার পর্বত। পদে পদে দগ্ধ করে দুর্দম প্রলোভনের দুঃসহ দাবানল। প্লাবনের বেগে ধাইয়া আসে ক্ষুধিত যৌবনের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। হিংস্রকুটীল নাগিনী বিষাক্ত নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করিয়া দিতে চায় মহত্তর জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ও সাধনা।

এ যেন ভক্ত ধ্রুব-প্রহ্লাদের যাত্রাপথে সুকঠোর পরীক্ষার বিপুল আয়োজন। তবু কালিয়-দমনের ন্যায় নাগের মাথায় নৃত্য করেন কুলদানন্দ। অবহেলে লঙ্ঘন করেন দুর্লঙ্ঘ্য গিরিচূড়া। হৃদয়ের অনির্বাণ হোমাগ্নির কাছে নিষ্প্রভ হয় লেলিহান রিপুবহ্নি। তবু অগ্রগতির স্তরে স্তরে অন্তরে জাগে দৃপ্ত অভিমান। তখনই সকাতরে স্মরণ করেন গুরুদেবের অভয় চরণ। আর, স্নেহে ও শাসনে, কৃপা ও আশীর্বাদে তাঁহাকে ধন্য করেন পরম দয়াল গুরুদেব। এইভাবে, একদিকে অটল ধৈর্য ও নিরলস সংগ্রাম, অন্যদিকে ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা ও অনন্ত গুরুকৃপা—এই দুই ধারার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় কুলদানন্দের সুকঠোর তপশ্চর্যা। ফলে তিনি আজ স্থিতধী, আর তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত মহাসিদ্ধির সিংহদ্বার।

কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম ও সাধনার অমর ইতিবৃত্ত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' এই পর্যন্তই প্রকাশিত। আদ্যন্ত এই দিনলিপি নিজের খুটিনাটি প্রতিটী ত্রুটি ও দুর্বলতায় ভরপুর। সব কিছুই আশ্চর্য নৈতিক সাহসের সহিত একান্ত অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন কুলদানন্দ। সবকিছু বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি জয় করিবার জন্য সত্যই যেন রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন স্বয়ং নীলকণ্ঠ। তেমনি, বিভূতি ও সাফল্যের প্রতি স্তরে সযত্নে গোপন রাখিয়াছেন সমস্ত অভিব্যক্তি। সিদ্ধির বেদীমূলে

উপনীত হইয়া তাই তিনি নিশ্চুপ। তাঁহার নিয়মিত আত্মকথার সুমধুর প্রতিধ্বনি আজ নিস্তব্ধ। ইহার পর মাঝে মাঝে তিনি কিছু কিছু পরিবেশন করেন তাঁহার সাময়িক দিনলিপিতে; কিন্তু সাধারণ্যে তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার দেন নাই। একমাত্র তাঁহার চরণাশ্রিত লেখক ও মহানন্দ নন্দী মহাশয়কে তাহা সংগোপনে রাখিয়া সুবিধামত প্রকাশ করিবার নির্দেশ দান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মহামূল্য দিনলিপিগুলি আজ লেখকের হস্তচ্যুত, তাহার নাগালের একেবারে বাহিরে। ফলে, পূর্ণতার পথে ঠাকুর কুলদানন্দের মহিমান্বিত জীবনের সার্থক পদক্ষেপ আজ বহুলাংশে অপ্রকাশিত।

* * *

১২৯৯ সালের ২০শে শ্রাবণ চারি বৎসরের জন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেন কুলদানন্দ। হরিদ্বারে চণ্ডীদেবীর পাদমূলে নির্জন তপস্যা ও গুরুপূজার মাধ্যমে দেখা দেয় অপার আনন্দ। কলিকাতায় ফিরিয়া গুরুদেবের নিকট লাভ করেন চিরবৈরাগ্যের অধিকার। কুম্ভমেলায় দেখা দেয় প্রচুর প্রেরণা, উজ্জ্বলতর আদর্শ। বহু মহাপুরুষের সান্নিধ্যে লাভ করেন গুরুদেবের অভিনব পরিচয়—দেবতাকুলে বুঝি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। নবদ্বীপে গুরুদেবের মহাভাবে সেই শ্রদ্ধাভক্তি, নিষ্ঠা ও নির্ভরতা পূর্ণ হইল অনুপম মাধুর্যে।

এইভাবে ১৩০০ সালের চৈত্র পর্যন্ত চতুর্বর্ষের ব্রহ্মচর্যের মধ্যে প্রায় দুই বৎসর পূর্ণ হইল। বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইল তাঁহার নিয়মিত দিনলিপি। ১৩০১ সালের নববর্ষ হইতে তাঁহার দিব্যজীবনে সুরু হইল অভিনব অধ্যায়। কিন্তু তাহার অধিকাংশ রহিয়া গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে। কলনাদী স্রোতস্বিনী প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া মিলিত হইল সাগর-সঙ্গমে। সেই অপার রহস্য শুধু বুঝি সেই মহানদী ও মহাসাগর বুকেই লুক্কায়িত।...

॥ এক ॥

শান্তিপুরবাসীর সাদর অভ্যর্থনায় নবদ্বীপ হইতে সশিষ্যে শান্তিপুর গমন করেন গোস্বামী প্রভু। চৌদ্দমাদলের কীর্তনে তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া শান্তিপুর ভক্তসমাজ উপনীত হইলেন অদ্বৈত প্রভুর ভজনস্থল বাব্‌লায়। এই কীর্তন-যাত্রায় যোগদান করিয়া অপার আনন্দলাভ করেন কুলদানন্দ। গভীর নিস্তব্ধ রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের কেহ কেহ এই স্থানে সুমধুর কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিতেন। কুলদানন্দ এই অপ্রাকৃত কীর্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, নিমগ্ন হইলেন গভীর নামানন্দে।

গোস্বামী প্রভুর সহিত শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় আগমন করেন কুলদানন্দ। সুকীয়া ষ্ট্রীটে রাখাল বাবুর বাড়ীতে গুরুদেবের সঙ্গলাভে দিন কাটিতে থাকে বিহ্বল আনন্দে। নিত্য নূতন করিয়া উপলব্ধি করেন গুরুদেবের দিব্য বিভূতি।

এখানে কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন গোস্বামী প্রভুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখি। আসন্ন মৃত্যুর শীতল স্পর্শে গৃহে উঠিল ক্রন্দনের রোল; তবু গোসাঁইজীর দৈনন্দিন পাঠকার্য নিয়মিত চলিল। জননী যোগমায়ার তিরোধান কালেও কুলদানন্দ লক্ষ্য করেন গুরুদেবের এই অবিচল ধৈর্য।···অনেকক্ষণ পরে মৃত কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন গোসাঁইজী। তাঁহার নির্দেশে ধীরে ধীরে সুরু হইল মধুর কীর্তন, তালে তালে আরম্ভ হইল অপ্রাকৃত নৃত্যছন্দ। পরে প্রেমসখির মস্তকে দক্ষিণ চরণ স্থাপন করিয়া মুদিত চক্ষে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন গোসাঁইজী।···

গভীর বিস্ময় ও বেদনায় অভিভূত হইলেন কুলদানন্দ। প্রেমসখির পাণিগ্রহণের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার নিকট প্রস্তাব জানান জননী যোগমায়া দেবী। গেণ্ডারিয়ায় দিদিমা ও যোগজীবনও যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেন। হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় স্বপাক আহার কালে দেখিয়াছেন সেবারতা প্রেমসখির স্নিগ্ধ-শান্ত সুন্দর মূর্তি।

নির্জনে ঘুন সান্নিধ্যে অনুভব করেন তরুণীর গোপন অনুরাগ। নিজেরও অন্তরে দেখা দেয় কামনার আবেগ। তবু বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের প্রেরণায় প্রেমসখিকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অনেক দিন হইতে এমনি নানা ঘটনা-প্রবাহে প্রেমসখির সহিত স্থাপিত হয় একটী মধুর প্রীতির সম্পর্ক।·· ব্রহ্মচারিণী প্রেমসখি তাঁহার চোখে ছিলেন দেবীপ্রতিমা। আজ তাঁহারই অকাল বিসর্জনে বেদনাহত হইলেন তিনি। কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গে প্রত্যক্ষ করিলেন অপূর্ব জ্যোতির্বিকাশ। তাঁহারই পূত চরণস্পর্শে ভাগ্যবতী প্রেমসখি মিলিত হইলেন শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মধুর লীলায়। বুঝিয়া বেদনার মাঝেও অন্তরে তিনি লাভ করিলেন গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ।···

রাখাল বাবুর বাড়ী হইতে শ্যামবাজার কম্বলীটোলার একটী বাড়ীতে গুরুদেবের সহিত কিছুদিন অবস্থান করেন কুলদানন্দ। এখানে মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করেন। উভয়ে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইলে দেখা দেয় এক অব্যক্ত ভাবের তরঙ্গ। তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন কুলদানন্দ। শেষরাত্রে গোস্বামী প্রভুর সহিত ভগবানের গুণগান করিতেন মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদ। কাছে বসিয়া কুলদানন্দের মনে হইত নিতান্ত পাষাণও বুঝি বা গলিয়া যাইবে! কয়েকজন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দুষ্টব্যক্তি গোস্বামী প্রভুকে হলাহল মিশ্রিত সন্দেশ খাওয়াইয়া তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন; কিন্তু মহাত্মা ক্ষেপাচাঁদের যোগক্রিয়ায় সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এজন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন কুলদানন্দ। উভয়ের ভাব বিনিময়ের তিনিই ছিলেন নীরব সাক্ষ্য।

অল্পকাল পরে কম্বলীটোলা হইতে পটলডাঙ্গা সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের এক বাসায় গুরুদেবের সহিত কিছুকাল বাস করেন কুলদানন্দ। তাঁহার মনে হইত ইহা যেন মুনিঋষিদের নৈমিষারণ্য। আশ্রমের পাঠ-পূজা, কীর্তনাদি নিত্যক্রিয়াগুলি যথারীতি সম্পন্ন হইত। হোম,

ভাগবত পাঠ ইত্যাদির পর সকলের সহিত সাধন-ভজন ও নামানন্দে মগ্ন থাকিতেন। রেবতী বাবু, বেনীমাধব বাবু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মাঝে মাঝে নিজেও গান ধরিতেন গোস্বামী প্রভু। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মাধুর্য ও গভীরতা উপলব্ধি করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন কুলদানন্দ। নয়নজলে গোসাঁইজী গাহিতেন; "গৌর তোর লাগি কাঙাল হয়ে আমার এ যন্ত্রণা······" কুলদানন্দের মনে পড়িত সাধন-জীবনের কঠোর পরীক্ষার কথা। অহৈতুকী প্রেমধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিয়া প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতেন।···

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর পার্বতিচরণ রায় মহাশয় এই সময়ে গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভগবান আছেন কিনা তিনি এই প্রশ্ন করিলে গোসাঁইজী বলেন: হ্যাঁ, ভগবান আছেন—তাঁহাকে দেখাও যায়।···মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব জনৈক আত্মীয় আর একদিন আসিয়া প্রশ্ন করেন: আপনি নাকি রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি বিগ্রহ মানেন এবং তাঁদের নিকট প্রণাম করেন? ঈশ্বর সাকার—একথা কি বিশ্বাস করেন? আবেগমধুর কণ্ঠে বলেন গোসাঁইজী: যে মুখে ঈশ্বর নিরাকার বলেছি সেই মুখেই ঈশ্বর সাকার বলছি।···সত্য সত্যই তাঁকে দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, আস্বাদন করা যায়। শুধু তাঁকে দর্শন করেই ক্ষান্ত হইনি—তাঁর দুই হাত দুই পা টিপে টিপে দেখেছি।···

গুরুদেবের এই অপূর্ব বাণী গভীর নিষ্ঠার সহিত অনুধাবন করেন কুলদানন্দ। দীক্ষালাভের অল্পদিন পরে গুরুদেব পুতুল-পূজায় বিশ্বাসী ভাবিয়া তিনিও একদা গভীর বেদনা অনুভব করেন। কিন্তু আজ তিনি সাধন-ভজনের বহু উচ্চস্তরে সমাসীন; গুরুদেবেরও বহু দিব্য ভাব ও বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফলে সর্বান্তঃকরণে আজ বিশ্বাস করেন গুরুদেবের এই বেদবাণী। আজীবন ভগবদ্‌বুদ্ধিতে যিনি অনুপ্রাণিত, গুরুদেবের এই সুস্পষ্ট ঘোষণা আজ যেন নূতন করিয়া জাগাইয়া তোলে তাঁহার প্রবুদ্ধ অন্তর।···বার বার ধ্বনিত হয় মহাসঙ্গীত—তাঁকে দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, আস্বাদন করা যায়।···

১৮ই আশ্বিন, ১৩০১। পাঁচ মাস পরে সতীর্থদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আবার লেখনী ধারণ করেন কুলদানন্দ। এই বিরতির চমৎকার কৈফিয়ৎ প্রদান করেন। বলেন: আপন ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিবার আর বিশেষ কোন তাগিদ বা প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না; বরং সেই সময়টুকু সাধন-ভজনে কাটানোই তাঁহার পক্ষে অভিপ্রেত; তবু বিশেষ বিশেষ ঘটনাপঞ্জী নিতান্ত সংক্ষেপেই লিপিবদ্ধ করিবেন।...কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার পরেই তাঁহার লেখনী আবার বন্ধ হইয়া যায়।

এই সময়ের অস্পষ্ট আভাস হইতে বোঝা যায়—স্নান, তর্পণ, হোম, পূজা, পাঠ সবই পূর্ববৎ চলিতেছিল; কিন্তু নিজেকে তিনি আপনার মাঝে গুটাইয়া লইতে থাকেন। ফলে, নিত্যক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বতই দেখা দেয় শৈথিল্য ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব। বস্তুতঃ ইষ্টনামের মাধ্যমে ইষ্টমূর্তি গুরুদেবের ধ্যানেই তিনি এখন অধিকতর নিমগ্ন, ভগবান গোস্বামী প্রভুর নিত্যলীলার নিত্য সহচর।...তাই বুঝি নিত্যক্রিয়ার গতিপথে তাঁহার ছন্দপতনেও গোসাঁইজী এখন দিব্যি নির্বিকার—বরং যেন উল্লসিত।...কর্ম অনুষ্ঠানে নয়, ধীরে ধীরে অনুগত শিষ্যের বাহ্যিক কর্মত্যাগেই গোসাঁইজীর এখন অধিকতর সমর্থন।

এই প্রসঙ্গে বর্তমানে কুলদানন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হোমের আহুতি দানে আজ তাঁহার নিজস্ব কোন প্রার্থনাই উৎসারিত হয় না—শুধু অন্তরে জাগে গুরুদেবের শান্তি ও আনন্দ স্ফূর্তির আগ্রহ। আর ধ্যানযোগে প্রস্ফুটিত শ্রীগুরুর অনুপম রূপশ্রী। মনে হয় গুরুদেবের সহিত এক অচ্ছেদ্য সুনিবিড় যোগসূত্র সংস্থাপিত। তিনি আর শুধু বিস্ময় ও শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র নন, বড় আদরের ও অনুরাগের ধন। এই দিব্য লীলার সুনিবিড় মাধুর্যরসেই গুরু-শিষ্যের ব্যবধান আজ অনেকাংশেই অপসারিত, উভয়ে যেন পরস্পর অভেদ।...

এই জন্যই আশ্বিনের পর লেখনী বন্ধ করিয়া আবার আত্মগোপন করেন কুলদানন্দ। প্রেমভক্তির অকূল পাথারে একমাত্র গুরুদেবের

সঙ্গেই চলে তাঁহার সূক্ষ্ম যোগাযোগ—রহস্যের গোলক ধাঁধায় গোপন নিঃশব্দ পদসঞ্চার।···

ফাল্গুন মাস, ১৩০১। এই সময়ে আবার সুরু হয় তাঁহার আত্মবিশ্লেষণ। গত পাঁচ মাস দিনলিপি লিখিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি দুঃখ বোধ করেন। তাঁহার মনে হয় নিয়মিত ঐ দিনলিপির মধ্য দিয়াই আপন সত্তা সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। তাহার অভাবে জীবন-নাট্যের কয়েক পাতা বুঝি বা চিরবিলীন হইল মহাশূন্যে। কলিকাতা হইতে এই সময়ে গুরুদেবের সহিত শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন কুলদানন্দ। যাত্রাকালে বাড়ীর মেথরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন গোস্বামী প্রভু। বলেনঃ আশীর্বাদ করুন, যেন রাধারাণীর দর্শন পাই।···তাঁহার এমনি ধারণাতীত আচরণে মেথরটী কাঁদিয়া ফেলিল; আর কুলদানন্দ এবং অন্য সকলে অভিভূত হইয়া গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াও গোসাঁইজী এক মেথরাণীকে বলেনঃ মা, শিশুকালে গর্ভধারিণী বিষ্ঠা পরিষ্কার করতেন। এখন সেই কাজ তুমি কচ্ছ।···বলিয়া গোবিন্দজীর প্রসাদ দিতেই মেথরাণীও কাঁদিয়া আকুল।···

উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে গোসাঁইজী বলিয়াছেনঃ ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সমস্ত নরনারীর পায়ের তলা দিয়া!···এমনি বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া কুলদানন্দ বুঝিলেন, সেই অমৃতবাণী গুরুদেবের জীবন-বীণায় আজ অপূর্ব সুরেই ঝংকৃত। ভক্তিরাজ্যের প্রবেশপথে সাধককে কীভাবে অগ্রসর হইতে হয়, স্বীয় জীবনলীলায় তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিলেন। "তৃণাদপি সুনীচেন···" এই মহাবাক্য শুধু এইরূপে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে—ছোটবড় ভেদে শুধু এইভাবেই মানুষের মাঝে জাগিয়া ওঠেন দুঃখীর ভগবান।···

শ্রীবৃন্দাবনে গুরুদেব ও গুরুভ্রাতাদের সহিত প্রথম কিছুদিন প্রসিদ্ধ লালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করেন কুলদানন্দ। পরে প্রায় ছয় মাস বাস করেন লুইবাজারে তীর্থমুনির কুঞ্জে। এই সময়ে

রামদাস কাঠিয়া বাবা ও সিদ্ধ জগদীশ বাবা প্রায়ই গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেন। গোস্বামী প্রভুর সম্মুখেই মহাত্মা কাঠিয়া বাবা কুলদানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যদের একদিন বলেন ঃ দেখ, যখন বাবা (গোস্বামী প্রভু) এখানে না থাকবেন, তখন তোমরা আমার কাছেই থাকবে। সত্য বলছি, আমি তোমাদের জন্যই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি।···কাঠিয়া বাবার এই সরল ও গভীর স্নেহপূর্ণ বাক্যে মধুর তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেন কুলদানন্দ।

শ্রীমতী রাধারাণীর স্বপ্নাদেশে মহাত্মা ময়ূর মুকুট বাবা এই সময়ে গোস্বামী প্রভুর শরণাপন্ন হন। শক্তি সঞ্চার কালে গোস্বামী প্রভুর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শনলাভে ধন্য হন বাবাজী মহাশয়। পরে এই অপূর্ব দর্শনের কথা জানিয়া চমৎকৃত হন কুলদানন্দ।

এই সময়ে তাঁহার সাধন-ভজন ও সরস নাম চলে অবিরাম অপ্রতিহত গতিতে। সদ্‌গুরুসঙ্গে তিনি অনুভব করেন অপূর্ব ভাববৈচিত্র্য। সাধন পথে নিবিড় রসাস্বাদনে, নানা দিব্য অনুভূতিতে ভরিয়া ওঠে শ্রীধাম বৃন্দাবন বাসের সুমধুর দিনগুলি।

ভাদ্র মাস, ১৩০২। ছয় মাস কাটিল শ্রীবৃন্দাবনে। গুরুদেবের ও গুরু-ভ্রাতাদের সহিত কুলদানন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের পুরাতন বাসায় দিন কাটিল আশ্বিন মাস পর্যন্ত। কার্তিক মাসে ফিরিয়া আসিলেন সাধনার সিদ্ধপীঠ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে।

কুম্ভস্নানে যাত্রার পূর্বে গোসাঁইশূন্য নির্জন আশ্রমে ঢুকিয়া বেদনার্ত হইয়া পড়েন কুলদানন্দ। ভক্তদের অশ্রুসজল নয়নকোণে তিনি প্রত্যক্ষ করেন অব্যক্ত সকরুণ বেদনা,···বনবীথির শুষ্ক পত্রমর্মরে শুনিতে পান মূক ধরিত্রীর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস। বহুদিন পরে গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসেন পাড়াপড়শী নরনারী।··· বক্ষে জাগে দুরু দুরু স্পন্দন—চক্ষে ফোটে আনন্দাশ্রু, শুষ্ক মলিন মুখে হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তি। সানন্দে ছুটিয়া আসে কাক-শালিক, বিড়াল-কুকুর।···সাধন কুটীরে আম্রবৃক্ষের পল্লবে পল্লবে শিহরণ জাগে,··· মৃদু হাওয়ার দোলায় তাহারা জানায় সাদর অভ্যর্থনা।···

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া যায় কুলদানন্দের। গুরুদেবের চরণপাতে গেণ্ডারিয়ায় আজ প্রবাহিত আনন্দ-প্লাবন।... মনে পড়ে মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন। বিরহিণী শ্রীমতীর তখন ঠিক এমনই আনন্দোচ্ছ্বাস।...

"শতেক বরষ পরে বধূয়া মিলাল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।..."

বিয়োগবিধুরা গেণ্ডারিয়া আজ তেমনিভাবেই বুকে তুলিয়া লইল তাহার হারানিধি।...সেই আনন্দের বাণ নৃত্যছন্দে প্রবাহিত হইল কুলদানন্দের হৃদয়-যমুনার কূলে কূলে।...

সাধন-ভজন ও গুরুসেবায় দিন কাটিতে লাগিল। বাহিরের সমস্ত বিষয় হইতে তিনি নিজের মন গুটাইয়া লইয়া দিবারাত্র মগ্ন রহিলেন ভজনানন্দে।

মাঘ মাসে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ধূলট-উৎসব। পাঠ, গান, নৃত্য, ভোজন, প্রসাদ বিতরণ—সব কিছুর মধ্য দিয়া আশ্রমে যেন বসিয়া গেল আনন্দের বাজার। সপ্তাহকাল দিবারাত্র চলিল এই মহোৎসব ও মহাকীর্তন। 'জয় শচীনন্দন' বলিয়া শিষ্যগণসহ উদ্দাম নৃত্যে মত্ত হইলেন গোস্বামী প্রভু। ধূলটের শেষদিনে বিরাট নগর সংকীর্তন পরিক্রমা করিল সমস্ত ঢাকা সহর—পুরোভাগে রহিলেন গোস্বামী প্রভু। তাঁহার উদ্দাম নৃত্যে, গম্ভীর হরিধ্বনিতে ও অদ্ভুত শক্তিপ্রকাশে ধর্মের এক মহাস্রোত বহিয়া গেল। পথিপার্শ্বে কর্মকার, কুম্ভকার, মুচি, চামার সকলেই উন্মত্ত হইয়া যোগ দিল এই মহাসংকীর্তনে। বহু লোক রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অর্ধঘণ্টায় দ্রুতবেগে প্রায় ৩।৪ মাইল পথ পরিক্রমা করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন সকলে।

এই অভূতপূর্ব ধর্ম-প্লাবনে গুরুদেবের এক অভিনব মহিমময় রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন কুলদানন্দ। নূতন করিয়া অনুভব করিলেন তাঁহার অনন্ত শক্তির অফুরন্ত উৎস। সেই অপূর্ব আনন্দে তিনি নিজেও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।...

এই অবিস্মরণীয় মহোৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ দুইদিন পর্যন্ত হতচেতন হইয়া পড়েন। এমনকি আশ্রমের বৃক্ষরাজি হইতেও মধু বর্ষিত হয়। সেই মধু আস্বাদন করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন অনেকে।

উৎসব শেষে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন গোস্বামী প্রভু। চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল—গেণ্ডারিয়াবাসীর চোখে মুখে আবার নামিল গভীর বেদনার ছায়া। যেন গোকুলচন্দ্র বৃন্দাবন আঁধার করিয়া চলিলেন। তাঁহাদের একমাত্র আশা, গোস্বামী প্রভু আবার ফিরিবেন তাঁহার প্রধান লীলাক্ষেত্র গেণ্ডারিয়া আশ্রমে। কিন্তু কেহই জানিতে পারিলেন না, গেণ্ডারিয়া হইতে ইহাই গোস্বামী প্রভুর শেষযাত্রা।...

গুরুদেবের সহিত কলিকাতায় আসিলেন কুলদানন্দ। চৈত্র মাস পর্যন্ত বাস করিলেন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। ১৩০৩ সালের নববর্ষে ৪৫ নং হ্যারিসন রোডের বাসায় আসিলেন তাঁহারা। গুরুদেবের সহিত এখানে এক বৎসর অবস্থান করেন কুলদানন্দ।

গোস্বামী প্রভুর স্বাস্থ্য ক্রমাগত অবনতির দিকে যাইতেছিল। সেজন্য সর্বদা তাঁহার নিকট থাকিয়া সাধ্যমত গুরুসেবা করিতেন কুলদানন্দ। এই সেবা লইয়া শিষ্যগণের মধ্যে দেখা দিল অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কুলদানন্দের প্রতিও অনেকে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। দুই-এক জনের আচরণে রীতিমত অশান্তির সৃষ্টি হইল। বাধ্য হইয়া বিষয়টির দিকে গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন কুলদানন্দ।

গোসাঁইজী: নিরুদ্বেগে ও নিঃস্বার্থভাবে কর্ম ক'রে যাওয়াতেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। গুরুসেবা এমন কি ভগবৎ সেবার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। বাইরের কোন কিছুতে আসক্ত হওয়াই বন্ধন। প্রকৃত সেবা ভক্তিতে।...

কথাগুলি গভীর রেখাপাত করিল কুলদানন্দের অন্তরে। কিন্তু গুরুসেবার অধিকার লইয়া অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে মনকষাকষি ও ক্রমে বিরোধ দেখা দিল। কুলদানন্দও বাধ্য হইয়া একদিন অসতর্ক মুহূর্তে বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। গোস্বামী প্রভু নির্জনে

প্রিয় শিষ্য কুলদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন: ব্রহ্মচারি! একটি বিষয়ে আজ আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করব। বল, মঞ্জুর করবে ?···

দুঃখে ও লজ্জায় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন কুলদানন্দ। বলিলেন: ঠাকুর! আমার যা কিছু সবই তো আপনার। আপনাকে অদেয় কী আছে? আর, আমার নিজের বলতে তো কিছুই নেই; যা ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন।···

: তোমার কাছে এই অনুরোধ—আজ থেকে তুমি আর কখনো' কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না, সর্ব অবস্থায় সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হবে, যে যতই ক্ষতি বা নির্যাতন করুক, কখনো' প্রতিবাদ করবে না: অটল ধৈর্যের সঙ্গে তুমি ক্ষমা করবে ও ভুলে যাবে।···তোমার কাছে এই অনুগ্রহ আজ ভিক্ষা চাই।

দীক্ষাকাল হইতে গুরুদেবের বহু নির্দেশ, উপদেশ ও সস্নেহ শাসন শুনিয়া আসিতেছেন কুলদানন্দ। কিন্তু প্রার্থনার সুরে গুরুদেবের সস্নেহ দাবী ও অমোঘ আদেশ শুনিলেন আজ এই প্রথম। তাঁহার সর্বাঙ্গীন ক্রমোন্নতির জন্য শ্রীগুরু মহারাজ তাঁহারই অনুগ্রহের দ্বারে ভিখারী।···সত্যই কী মধুর লীলা! ভাবিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন: আপনি কৃপা করে গ্রহণ না করলে আমি কি কিছু দিতে পারি ?

: তাহলে, আমি যা চাইলাম সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে তা দিলে। এখন খুশী মনে যেতে পার।

এইভাবে চির অনুগত শিষ্যকে আজ অপূর্ব শিক্ষা দিলেন গোস্বামী প্রভু। কুলদানন্দের ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার ফল হইল সুদূরপ্রসারী।

পরে আবার নানাভাবে দেখা দিল কঠোর পরীক্ষা। শম, দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য কুলদানন্দের বিরুদ্ধে অন্যান্য শিষ্যদের লাগাইয়া দিতেন গোসাঁইজী। সর্বাবস্থায় কুলদানন্দ চিত্তের সাম্যভাব বজায় রাখিতে পারিতেন কিনা পরীক্ষা করিতেন। ফলে,

গুরুসঙ্গে থাকিবার সময় সতীর্থদের দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইতেন কুলদানন্দ। অনেক সময় এই উৎপীড়ন তাঁহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিত। তবু গুরু-আদেশে তিনি ছিলেন ধীর-স্থির, সর্বংসহ।

তাঁহার মনে বিরক্তি ও উত্তেজনা দেখা দিলে অমনি গীতার শ্লোক পাঠ করিয়া সাবধান করিয়া দিতেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দও নিজেকে সংযত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। গোসাঁইজী এই সময়ে হইলেন যেন শিশুর মত অসহায়। সামান্য কারণে কুলদানন্দের উপর বিরক্ত হইতেন, বিনা কারণেও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। এইভাবে চলিত শিষ্যের ধৈর্যের পরীক্ষা। আবার কখনও বা সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া সস্নেহ মধুর বচনে তাঁহাকে ধন্য করিতেন।

এইরূপ শিক্ষা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের প্রতিটি সুখ-সুবিধার দিকেও রহিল তাঁহার সদা সতর্ক দৃষ্টি। আন্তরিক গুরুসেবার মধ্যে নিজেকে নিত্য ডুবাইয়া দিলেন।

শ্রাবণ মাস, ১৩০৩। কুলদানন্দের ব্রহ্মচর্য ব্রতের ষষ্ঠ বর্ষ পূর্ণ হইল। নিত্যক্রিয়া ও সাধনভজনের সহিত আন্তরিক গুরুসেবায় দিন কাটিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় পৌনে চারিটার সময় হোম করিতেন কুলদানন্দ। আর গোসাঁইজী পাঠ করিতেন হোমের মন্ত্র। রাত্রি সাড়ে চারিটায় গুরুদেবের সহিত উষা-কীর্তনে যোগদান করিতেন। পরে গুরুভ্রাতাদের কণ্ঠে ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। পাঠ, সাধন-ভজন, স্বপাক আহার—সবই চলিত নিয়ম মত। সান্ধ্য বৈঠকে গুরুদেবের সহিত নামকীর্তনে যোগদান করিতেন। পরে সাড়ে-নয়টায় বিশ্রাম করিতেন কিছুক্ষণ। রাত্রি বারোটায় ঘুম হইতে উঠিয়া গুরুদেবকে মুখ ধুইবার গরম জল দিতেন এবং ঔষধ খাওয়াইতেন। পরে সমস্ত রাত্রি তিনি গুরুদেবের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন।

এই সময়ে কলিকাতায় কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার ফল যে কত ভয়াবহ, তাহা নিতান্ত পরিতাপের সহিত প্রত্যক্ষ করেন কুলদানন্দ।

মনোরমা দেবীর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হইলেন সকলে। গোসাঁইজী বলিলেন : জীবনের ব্রত শেষ করে মা আমার চিরশান্তিময় মাতৃলোকে চলে গেছেন। জীবনে তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলেন নি, কারো সঙ্গে বিবাদ করেন নি, কারো প্রাণে আঘাত দেন নি। গুরুদেবের এই প্রশস্তি বাক্য সর্বদা স্মরণ ও পালন করিতেন কুলদানন্দ। রাত্রে গুরুদেবের জটা হইতে ছারপোকা বাছিয়া দিতেন। এই সময়ে মাঝে মাঝে অনুভব করিতেন গুরুদেব যেন মরদেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।···গুরুদেবের নিকট হইতে আভাসে বুঝিতে পারেন, ভগবদিচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই কোনরকমে এই রুগ্ন দেহ টানিয়া লইয়া চলেন গোসাঁইজী।

কুলদানন্দের জীবনে ধীরে ধীরে আবার দেখা দেয় নানা সংকট। গুরুসেবায় সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মনে হয় কোনরকমে নিষ্প্রাণ ভাবে গুরুসেবা করিতেছেন। তাঁহার এই মানসিক পরিবর্তন অবিলম্বে ধরা পড়িল গোসাঁইজীর কাছে। তিনি বলিলেন : ব্রহ্মচারি! যদি সেবা করতে চাও, নিষ্ঠা ও আনন্দের সঙ্গে কর—নইলে সেবা থেকে বিরত থাকা উচিত। দিতে হ'লে প্রাণ ঢেলে আনন্দের সঙ্গে দিতে হয়। নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে না দিলে তা দান ব'লে গণ্য হয় না।···

গুরুদেবের এই কথাগুলি কুলদানন্দের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। আত্মবিশ্লেষণের ফলে বুঝিতে পারিলেন, বহুদিনের সংযম সত্বেও নিজের প্রবৃত্তি আজো সম্পূর্ণ দমিত হয় নাই। রিপুর তাড়নায় তিনি আজো বিভ্রান্ত। আগ্রহ ও প্রবল চেষ্টা সত্বেও তাই যথোচিতরূপে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এতদিনের সংযম ও ব্রহ্মচর্য তবে কি

নিষ্ফল হইবে? অষ্টপ্রকার মৈথুন হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে না পারিলে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপনের সার্থকতা কোথায়?

আত্মবিচারের ফলে আরো বুঝিলেন, সংযম প্রচেষ্টার নেপথ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আজো প্রবল। মনে পড়িল, সাধন-জীবনের প্রারম্ভে গুরুদেব সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিলেই সর্বনাশ!...এই ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াও নিশ্চিত ও নিঃশংক হইতে পারেন নাই। কামরিপু আজো বাহিরের দৃশ্য, শব্দ ও ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়ের মধ্য দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চায়।

মনের সমস্ত যন্ত্রণা গুরুদেবের নিকট একদিন উদ্‌ঘাটন করিলেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী বুঝাইয়া বলিলেনঃ ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনের পর এই জন্যই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলেছি।...হতাশ হবার কিছু নেই। প্রত্যেক সাধককেই সাধন পথে অসীম ধৈর্য ও আপ্রাণ চেষ্টার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। প্রসবের পূর্বে গর্ভিনী দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু প্রসবের পর সেই যন্ত্রণা ভুলে মাতৃত্বের আনন্দ অনুভব করেন। সিদ্ধির পথে সাধককেও ঠিক সেইভাবে অগ্রসর হতে হবে।...

এই আশ্বাস-বাণীতে মনের ক্ষোভ ও নৈরাশ্য দূর হইল কুলদানন্দের। আজ এই উপদেশ লাভে নূতন আশা ও আনন্দ অনুভব করিলেন।

আবাল্য ধর্মানুরাগের সহিত এইভাবে কুলদানন্দের সাধন-জীবনে দেখা দেয় কঠোর সাধনা ও অনন্ত গুরুকৃপার অপূর্ব সমন্বয়। তিনি ধীরে ধীরে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

॥ দুই ॥

মাঘ মাস, ১৩০৪। হ্যারিসন রোডের বাসা। কুলদানন্দের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদাকান্তও এই সময় গুরুসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু গোসাঁইজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতে থাকে। বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে লইয়া পশ্চিমে যাইবার কথা চলে।

আহারান্তে গোসাঁইজী একদিন বসিয়া আছেন তেতলার বারান্দায়। পুরীধাম হইতে জগন্নাথদেবের চিত্রপট, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়। তাঁহার মধ্যে জগন্নাথদেবের প্রকাশ দেখিয়া অশ্রুসিক্ত হইলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দের চক্ষেও বহিল অশ্রুধারা। কিছুদিন পরে তাঁহার আরো দুইজন গুরুভ্রাতা পুরী হইতে আসিলেন। পুরীধামের বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন মানসে গোসাঁইজী অধীর হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ফাল্গুন মাসের শেষে পুরী যাত্রার দিন স্থির হইলে নিশ্চিন্ত হইলেন কুলদানন্দ।

কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করা তখন বড় দুরূহ। রেলওয়ে ছিল না—পদব্রজে যাওয়াও গোসাঁইজীর পক্ষে অসম্ভব। তিনি বাতরোগে অতিশয় কাতর। অগত্যা অল্প খরচায় জাহাজ ভাড়া করিবার চেষ্টা চলিল। চারিদিক হইতে টাকা আসিতে লাগিল। নানা স্থান হইতে বহু লোকও গোসাঁইজীকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। কটক পর্য্যন্ত যাইবার জন্য ছোট একখানি জাহাজ সাত শত টাকায় ভাড়া করা হইল।

পুরী যাত্রার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন কুলদানন্দ এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতারা। পথের জন্য চাউল, ডাইল, মিষ্ট, ফলমূল ইত্যাদি সবই কিনিয়া লওয়া হইল। পুরী যাইবার উদ্দেশ্যে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিলেন গোসাঁইজী।

২৪শে ফাল্গুন। বেলা প্রায় দুইটা। সশিষ্যে পুরীধাম রওনা হইলেন গোস্বামী প্রভু। ঠাকুর ঘরের তুলসী গাছটা সঙ্গে লওয়া হইল। জননী স্বর্ণময়ী দেবী বলিয়াছিলেনঃ পুরী গেলে বিজয় আর ফিরবে না।…বঙ্গজননীর অঞ্চলনিধি চিরদিনের জন্য দুঃখিনী মায়ের অঞ্চল ছাড়িয়া রওনা হইলেন সেই শ্রীক্ষেত্রে। সকলের চোখেই আজ বিদায়ের অশ্রুবন্যা।…

জাহাজের সহিত দুইখানি বজরা সংযোগ করা হইয়াছে। গুরুদেব ও গুরুভ্রাতাদের লইয়া একখানিতে উঠিলেন কুলদানন্দ। অন্যখানিতে উঠিলেন দিদিমা, শান্তিদিদি এবং অন্যান্য মহিলারা।

বিদায়কালে করযোড়ে বলিলেন গোস্বামী প্রভু: আশীর্বাদ করুন, আমার যেন শ্রীক্ষেত্রপ্রাপ্তি হয়।…পলকে চারিদিকে উঠিল আকুল ক্রন্দনধ্বনি! কুলদানন্দ গুরুদেবের সঙ্গে চলিলেও সেই মর্মদাহ হৃদয় দিয়া অনুভব করিলেন। গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন: আমরা কী করব?

গোসাঁইজী বলিলেন: 'ঘরে করো নাম-সংকীর্তন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবন।'…

সকলে পুনরায় শ্রবণ করিলেন নব-গৌরাঙ্গের এই অভিনব অমৃতবাণী।… অনুগত শিষ্যদের প্রতি, প্রিয় দেশবাসীর প্রতি ইহাই গোস্বামী প্রভুর প্রধান উপদেশ।…

পরদিন বেলা বারোটায় গেঁয়োখালিতে জাহাজ নোঙর করিল। গুরুদেবকে লইয়া খালপারে ডাল বাংলোয় গিয়া উঠিলেন কুলদানন্দ।

আজ দোল পূর্ণিমা। মহিলারা আবীর আনিয়াছিলেন—কুলদানন্দ, সারদাকান্ত, সরলনাথ, সকলেই ভক্তিভরে আবীর দিলেন গুরুদেবের শ্রীচরণে। সংগীত ও আহারান্তে আবার জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

শ্রীক্ষেত্রের মহিমা, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার করুণার কথা বলিতে লাগিলেন গোস্বামী প্রভু। সদ্‌গুরুসঙ্গে তাঁহার বচনামৃত শ্রবণে বিভোর হইয়া পড়িলেন কুলদানন্দ। মহাপ্রভু আঠারো বৎসর বাস করেন পুরীধামে, ভক্তবৃন্দ সহ সংকীর্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই লীলাক্ষেত্রে প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে যে চিরবিসর্জন দিতে চলিয়াছেন তাহা তখন কেহ জানিতে পারেন নাই। সপার্ষদ মহাপ্রভুর ন্যায় গোস্বামী প্রভুকে লইয়া মহানন্দে তাঁহারা চলিয়াছেন গোবিন্দ দর্শনে। হুগলী নদীর স্নিগ্ধ হাওয়ায়, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীতে তাঁহাদের দেহমন জুড়াইয়া গেল।

পাঠ, পূজা কীর্তনাদি নিত্যক্রিয়া চলিতে লাগিল যথারীতি। রন্ধনাদি কার্যের জন্যে পথিমধ্যে প্রত্যহ জাহাজ নোঙর করা হইত। অমনি সেখানেও যেন আনন্দের হাট বসিয়া যাইত।

পঞ্চম দিবসে জাহাজ পৌছিল কটক সহরে। রন্ধনাদির পর বজরায় বসিয়া সেবা করিলেন গোসাঁইজী। কাছে বসিয়া তাঁহার প্রসাদ পাইলেন সারদাকান্ত ও কুলদানন্দ।

পরদিন প্রাতে গুরুদেবকে অশ্বযানে এবং মহিলাদের গোযানে লইয়া সকলের সহিত পদব্রজে রওনা হইলেন কুলদানন্দ। বারং স্টেশনে গিয়া সকলে ট্রেনে উঠিলেন। সশিষ্য গোস্বামী প্রভুকে লইয়া ট্রেন যেন ছুটিয়া চলিল নবোদ্যমে। গোস্বামী প্রভু সমাধিস্থ, কুলদানন্দ ভাবমগ্ন। সকলের মনেপ্রাণে গভীর ভক্তি, অপার আনন্দ।

অপরাহ্নে সকলে উপস্থিত হইলেন পুণ্যতীর্থে। পুণ্যভূমি পুরীধামে পদার্পণ করিতেই নিমেষে তিরোহিত হইল গোস্বামী প্রভুর বাতব্যাধির সমস্ত যন্ত্রণা। তাঁহার প্রদীপ্ত শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুসিক্ত হইলেন কুলদানন্দ। ভাব-বিহ্বল গুরুদেবকে পুরোভাগে লইয়া নামকীর্তন যোগে অগ্রসর হইলেন সকলে। মেয়েরা চলিলেন ঘোড়ার গাড়ীতে। শ্রীমন্দিরের ধ্বজা চোখে পড়িতেই গোসাঁইজীর সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন কুলদানন্দ। জানিতে পারেন, গুরুদেবের দিকে সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করেন এক অপূর্ব দেবীমূর্তি।...গোসাঁইজীর সহিত সকলে নাম সংকীর্তন ও নৃত্য সহযোগে মহাভাবে বিভোর হইয়া অগ্রসর হইলেন। দর্শকমণ্ডলীর মনে হইল, চারিশত বৎসর পরে আবার বুঝি পুরীধামে প্রবেশ করিয়াছেন স্বয়ং মহাপ্রভু, ভক্তগণসহ নাম মদিরায় মাতোয়ারা হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন শ্রীমন্দিরের দিকে।...

প্রথমে সকলে গিয়া উঠিলেন নীলমণি বর্মণের দোতলা বাড়ীতে। মহাপ্রসাদ গ্রহণের পর রাত্র দশটায় গোস্বামী প্রভুর সহিত সকলে উপস্থিত হইলেন শ্রীমন্দিরে। বিগ্রহ দর্শন করিবামাত্র ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া পড়িলেন গোস্বামী প্রভু। ৺জগন্নাথদেবের দিকে

চাহিয়া পরমাত্মীয়ের মত অস্ফুটে কত মধুর আলাপ করিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত হইল অবিরল অশ্রুধারায়।···

কুলদানন্দেরও চক্ষু অশ্রুসজল হইল। মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিলেন মহাসিদ্ধির উচ্চ স্তরে সুগভীর প্রেম ও ভক্তিসুধা সত্যই কী অনির্বচনীয়।···স্থিরনেত্রে গোস্বামী প্রভু চাহিয়া ছিলেন বিগ্রহের দিকে ; আর অপলকে কুলদানন্দ চাহিয়া রহিলেন প্রাণপ্রতিম শ্রীগুরুদেবের দিকে। স্পন্দিত প্রাণে ঝংকৃত হইল—গুরুদেবই তো স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ।···মনে হইল, সত্যই লীলাময়ের কী অপূর্ব লীলা।···

তীর্থগুরু ও পাণ্ডাদের প্রণামী ও দর্শনী দেওয়া হইল। বাসায় ফিরিয়া কুলদানন্দ ও বিধুবাবু গুরুদেবের সেবা করিলেন সারারাত্রি।

গুরুদেবের সহিত আরম্ভ হইল শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা। প্রথমে তাঁহারা দর্শন করিলেন মহাপ্রভুর 'গম্ভীরা'। আঠারো বৎসর নিয়ত এখানে অবস্থান করেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ইহার পর সমুদ্রস্নানে গেলেন সকলে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ,···শুধু নীলাভ অপার জলরাশি। চাহিয়া চাহিয়া কুলদানন্দের মনেপ্রাণে উথলিয়া ওঠে অপূর্ব আনন্দ। গুরুদেবের নির্দেশে স্বর্গদ্বারে সমুদ্রস্নান করেন সকলে।

পরে দর্শন করিলেন টোটা গোপিনাথের বিগ্রহ। এই বিগ্রহ পূজা করিতেন মহাপ্রভুর পারিষদ গদাধর পণ্ডিত। কথিত আছে, অন্তর্ধান কালে মহাপ্রভু বিলীন হইয়া যান এই বিগ্রহে।···অতঃপর তাঁহারা দর্শন করিলেন হরিদাস ঠাকুরের সমাধি। পরম ভক্তের এই সমাধি রচনা করেন মহাপ্রভু স্বয়ং।···পরে সকলে গেলেন চটক পর্বতে। এই বালির পাহাড় দর্শন করিয়া গোবর্ধন-ভ্রম হয় ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর। জ্যোৎস্না রাত্রে যমুনা ভ্রমে তিনি ঝাঁপ দিয়া পড়েন সমুদ্রবক্ষে। সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় কোনার্কের দিকে ভাসিয়া গেলে জেলেরা তাঁহাকে উদ্ধার করে।' কুলদানন্দ জানিতে পারেন, এই চটক পর্বত দর্শনকালে গোসাঁইজীর নিকট প্রকাশিত হন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর।

সমুদ্রতীর ধরিয়া আসিবার সময় গোস্বামী প্রভু বলেন : তোমরা খুব সতর্ক হয়ে সমুদ্রে স্নান করো। আমার চোখে পড়ল তোমাদের দু-এক জনকে সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।···

এ কথার তাৎপর্য সেদিন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না কুলদানন্দ।

বিমলাদেবীর মন্দির দর্শনকালে জানিতে পারিলেন, পুরীধাম প্রবেশের দিনে তিনিই গুরুদেবের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। এই বিমলাদেবী শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

শ্রীমন্দিরের দিক হইতে নিকটে আসিলেন একটী উলঙ্গ সাধু। গোসাঁইজীকে প্রণাম করিয়া উভয় হস্তে আরতি করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন মধুর সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের মর্মকথা : হে রাম! তোমাকে বহুদিন পরে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।···শুনিয়া গভীর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন কুলদানন্দ।

অতঃপর তাঁহারা দর্শন করেন সিদ্ধ-বকুল মঠ। রৌদ্রে-বৃষ্টিতে এখানে বসিয়া সাধন করিতেন হরিদাস ঠাকুর। একদিন মহাপ্রভু দাঁতন করিতে করিতে ভক্তকে দেখিতে আসেন। ভীষণ খরতাপে ভক্তের কষ্ট দেখিয়া তিনি রোপন করেন দাঁতনখানি—তাহা হইতেই অচিরে উৎপন্ন হইল এই বকুল বৃক্ষ। তাহারই ছায়ায় বসিয়া হরিদাস ঠাকুর মহানন্দে সাধন-ভজন করিতে থাকেন। রথের চাকা প্রস্তুত করিবার জন্য রাজা এই বৃক্ষ কাটিতে চাহিলে সকাতরে মহাপ্রভুকে মনোব্যথা নিবেদন করেন হরিদাস ঠাকুর। রাজার লোকেরা পরদিন আসিয়া সবিস্ময়ে দেখে, বিনা ঝড়েই বৃক্ষটী ধরাশায়ী এবং আগাগোড়াই অন্তঃসারশূন্য।···সেই শায়িত বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ করেন হরিদাস ঠাকুর। বল্কল-সর্বস্ব এই অপ্রাকৃত বৃক্ষটী আজো ভক্ত তথা বৈজ্ঞানিকদের পরম বিস্ময়।···গোসাঁইজী বলেন : ঐ সিদ্ধ-বকুল বৃক্ষটি হরিদাস ঠাকুরের তপঃ প্রভাবে ও মহিমায় একটি বীজ আকারে পরিণত হয়েছে।···কুলদানন্দ পরে একদিন গিয়া দেখেন বৃক্ষটী সত্যই বাঁকিয়া প্রণব আকার হইয়াছে। বৃক্ষগাত্রেও যেন অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি প্রকাশিত।···

ইহার পর দর্শন করিলেন চক্রতীর্থ, চক্র নারায়ণ বিগ্রহ, গুণ্ডিচাবাড়ী ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। গুণ্ডিচাবাড়ী ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের যজ্ঞবেদী—এখানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া মহারাজ ৺জগন্নাথদেবের কৃপালাভ করেন। জগন্নাথদেব রথে চড়িয়া আসিয়া ছয়-সাত দিন এখানে বিশ্রাম করেন। সরোবরে স্নান ও তর্পণ অন্তে সকলে ঘাটের উপরেই নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব দর্শন করিলেন। জগন্নাথ বল্লভ মঠ দর্শন করিতে গেলে সমস্ত বাগান ঘুরিয়া দেখাইলেন মহাত্মা ভূতানন্দ স্বামী। মহাপ্রভু সাতদিন একাসনে সমাধিস্থ ছিলেন এখানে—সাঙ্গ-পাঙ্গো লইয়া তিনি এখানে আসিয়া মহোৎসব করিতেন। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বের এইসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন ভূতানন্দ স্বামী।

পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই সকল তীর্থ দর্শন করিয়া কুলদানন্দ অনুভব করেন নূতন আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। প্রতি অণু-পরমাণুতে জড়িত মহাপ্রভুর পদরেণু।···আজো তিনি যেন ধ্যানমগ্ন, ভক্তবৃন্দ লইয়া মহোৎসবে মত্ত।···মন্দির বিগ্রহাদি সবই যেন জীবন্ত, জাগ্রত।···সর্বত্রই গুরুদেবের নিকট সুন্দর সুন্দর গল্প ও উপদেশামৃত শ্রবণ করেন তাঁহারা। সর্বদা ছায়ার ন্যায় গুরুদেবের অনুগামী হইয়া এইভাবে শ্রীক্ষেত্রে এই তীর্থ পরিক্রমা করা কুলদানন্দের জীবনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অতঃপর মার্কণ্ডেশ্বর ও লোকনাথ মহাদেব দর্শন করেন। শিব চতুর্দশীতে লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হয় এই লোকনাথ মন্দিরে। পথের ধারে মহাবীরের প্রকাণ্ড বিগ্রহ দর্শন করিয়া ভাবাবেশে বলেন গোস্বামী প্রভু : সেবকের জয় চিরকালই। জগন্নাথদেব আজ কত যত্ন করে মহাবীরের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন, কত সমাদরে সাজিয়ে দিচ্ছেন। ভক্তদের প্রভু এরূপ কতই আদর করে থাকেন।···এই কথায় অপার আনন্দলাভ করেন কুলদানন্দ। অসুস্থ দেহ লইয়াও গুরুদেবের এই তীর্থ পরিক্রমায় তিনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী—অহোরাত্র নীরব সেবক। হয়ত আদর্শ সন্তানের প্রতি ইহা গোস্বামী প্রভুর প্রচ্ছন্ন অথচ অক্ষয় আশীর্বাদ।···

বৈশাখ, ১৩০৫। অক্ষয় তৃতীয়া। নরেন্দ্র সরোবরে সকলে দর্শন করেন ৺জগন্নাথদেবের চন্দন-যাত্রা মহোৎসব। গ্রীষ্মকালে নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি করিতে বাহির হন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব। এই সময় মদন-গোপালের বিগ্রহ অতীব দর্শনীয়। ইহা দর্শন করিয়া এবং মধুর সাত্বিক ভাবপূর্ণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী বলেন, এই সময়ে বিগ্রহে যথার্থই ভগবান আবির্ভূত হন।...

একদিন নরেন্দ্র সরোবরের দক্ষিণ পারে বসিয়া গোস্বামী প্রভু বলেন ঃ তোমরা ওপারে ঐ গাছের মাঝখানে কিছু দেখছ ?... একটী সুন্দর মন্দির দেখা যাচ্ছে। যেন সোনার মত ঝক ঝক কচ্ছে।...

গুরুদেবের কথাটী বিশেষ লক্ষ্য করিলেন কুলদানন্দ। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত ইংগিতটী তখন বুঝিতে পারিলেন না। গুরুদেবের নিত্যসঙ্গে পরমানন্দে বুঝি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, শ্রীগুরুর লীলা সংবরণ হইবার কথা শ্রীক্ষেত্রেই।...

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং আষাঢ় মাসে রথযাত্রা মহোৎসব দর্শন করেন। স্নানবেদীতে জগন্নাথদেবের স্নানের সময়ে দেবতারা নাকি উপস্থিত হন এবং পূজারীদের সহিত জগন্নাথ দেবকে স্নান করান। স্নানবেদীর পার্শ্বে গুরুদেবের সহিত সকলে পূর্ব হইতেই বসিয়াছিলেন। কিন্তু দর্শনের জন্য সেবকদের টাকার দাবীতে বিরক্ত হইয়া গোসাঁইজী বলেন ঃ চল—ঠাকুর কৃপা করলে অন্যত্রও দর্শন হবে।...সশিষ্যে গোসাঁইজী চলিয়া আসিলেন নাট মন্দিরে। পরে সেবকেরা ক্ষমা ভিক্ষা করিলে সকলে স্নানযাত্রা দর্শন করেন। রথযাত্রার দিন দ্বিতীয়া তিথিতেই জগন্নাথদেবকে রথে তুলিবার প্রথা ; নতুবা রথে 'বামন' দর্শনে সপ্তমুক্তির ফললাভ হয় না। কিন্তু গোসাঁইজীর ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্বেও সেবকেরা দ্বিতীয়ার মধ্যে জগন্নাথদেবকে রথে উঠাইল না—ফলে ক্ষুণ্ণ হইলেন গোসাঁইজী। তাঁহার সহিত কুলদানন্দ এবং অন্য সকলে আশ্রমের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রথ টানিবার সময় জগন্নাথদেব দর্শন করেন।...

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। কুলদানন্দ, সারদাকান্ত, বিধুভূষণ প্রভৃতি প্রতি দিনের ন্যায় গুরুদেবকে স্নান করাইতেছিলেন। অতর্কিতে একটী তরঙ্গাঘাতে গোসাঁইজীর হাটুর সন্ধি খসিয়া যায়। পরক্ষণে আর একটী তরঙ্গ আসিয়া হাটুর সন্ধিস্থলে লাগিলে পুনরায় তাহা যথাস্থানে লাগিয়া যায়। কুলদানন্দ ও অন্য সকলে ইহা শুনিয়া সবিশেষ বিস্মিত হন। কিছুদিন পরে একদিন কীর্তনের মধ্যে সহসা উপস্থিত হইলেন একজন দিব্যকান্তি পুরুষ। গোস্বামী প্রভুকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিলেন এবং কিছুক্ষণ তাঁহার আঘাতপ্রাপ্ত শ্রীচরণখানি টিপিয়া দিয়া অদৃশ্য হইলেন। কুলদানন্দের প্রশ্নে গোসাঁইজী জানান, ইনি সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ।···শাস্ত্রে আছে, যাঁহারা ভগবৎ-ভক্ত, ব্রহ্মাদি দেবতারাও তাঁহাদের সেবায় তৎপর থাকেন।···ঘটনাটি গভীর রেখাপাত করে কুলদানন্দের মনে। দেবতারাও শ্রীগুরুদেবের সেবা করায় গভীর আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন।

কুলদানন্দ ছিলেন গোস্বামী প্রভুর একনিষ্ঠ সহচর। পুরীধাম পরিক্রমার সময় প্রতিপদেই ছায়ার ন্যায় তিনি ছিলেন গুরুদেবের অনুগামী। প্রতিক্ষণে গুরুদেবের উপর ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি। নামকীর্তন ও নানা অনুষ্ঠানের মাঝেও তিনি ছিলেন সদাগম্ভীর, নীরব কর্মী। হোম, পূজা, পাঠ, সাধন-ভজন ইত্যাদির সহিত সময়মত গুরুদেবকে ঔষধ খাওয়ান, সারারাত্রি জাগিয়া গুরুদেবের পরিচর্যা করা—ইহা ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম। তিনি সানন্দে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন আন্তরিক গুরুনিষ্ঠা ও গুরুসেবায়।

প্রতি গৃহে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা গুরুদেবেরই নির্দেশ। পুরীধামে আসিয়াও আশ্রমে সারাদিন যাহাতে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান, পাঠ-পূজাদি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল কুলদানন্দের। প্রভুপাদ যোগজীবন ও শান্তিসুধা ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়। সন্ধ্যার

দেবযজ্ঞ (উপাসনা), ঋষিযজ্ঞ (সদগ্রন্থ পাঠ), পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধতর্পণাদি) প্রাণীযজ্ঞ (প্রাণী ও বৃক্ষদের আহার ও জলদান) ও মনুষ্যযজ্ঞ (মনুষ্যকে কিছু কিছু দান) ইহাই পঞ্চযজ্ঞ।

পর কীর্তন ও হরিলুট হইত। এইসব দেখিয়া পুরীবাসী আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

ঝুলন-পূর্ণিমায় গুরুদেবের জন্মোৎসব, জন্মাষ্টমীতে নন্দোৎসব এবং ভাদ্রমাসে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব দিবস—এই প্রধান অনুষ্ঠানগুলি সকলের সহিত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন কুলদানন্দ।

২৫শে ভাদ্র, সোমবার—পঞ্চমী তিথি। অন্যদিনের ন্যায় সমুদ্র স্নান করিতে যান কুলদানন্দ। সঙ্গে ছিলেন গুরুভ্রাতা স্বামী দেবপ্রসাদ। কয়েক মাস পূর্বে বিশেষ সাবধানে সমুদ্রস্নান করিতে বলেন গোস্বামী প্রভু; কিন্তু সেকথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এইদিন স্নানের সময় ভরা ভাদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গ সহসা উভয়কেই ভাসাইয়া লইয়া যায় বহু দূরে। তীরে ফিরিয়া আসিবার জন্য তাঁহাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ভীষণ বিপদের সংবাদ তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়া গেল গোস্বামী প্রভুর কাছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন: সেকি! ব্রহ্মচারীকে দিয়ে এখনও যে অনেক কাজ করাবার আছে!···ততক্ষণে ধীবরেরা উভয়কে উদ্ধার করিবার জন্য সাগরজলে নামিয়াছিল। কিন্তু শেষ চেষ্টা করিতে করিতে 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিয়া দেবপ্রসাদ নিমজ্জিত হইলেন অতল তলে।···আর কুলদানন্দ হতাশ হৃদয়ে নিজেকে ছাড়িয়া দিলেন উন্মত্ত তরঙ্গ-বিক্ষোভের মাঝে। আশ্চর্য যে, ধীবরদের বিনা সাহায্যেই তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল সাগর কূলে।···

কুলদানন্দ পরে জানিয়া হতবাক হন যে, একমাত্র গুরুদেবের কথাতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া যান স্বয়ং বরুণদেব।···গভীর ভক্তিভরে তিনি আপন মনে বলেন: জয় গুরুদেব—তোমারই জয়!··· স্বামী দেবপ্রসাদের মৃতদেহ পরে ধীবরেরা তুলিয়া আনে এবং গভীর দুঃখ ও শ্রদ্ধার সহিত তাহা সমাধিস্থ করা হয়।

একদিন গুরুভ্রাতা পান্নালাল-ঘোষ মহাশয় স্বপ্নযোগে দেখিলেন— শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ

মলিন, দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত।···স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া গোস্বামী প্রভু বলিলেন: মহাপ্রভূ যে শক্তি মাত্র সাড়ে তিনজনকে দিয়েছিলেন, এবার তিনি তোমাদের তাই দিয়েছেন। কিন্তু এই দেবদুর্লভ জিনিসের কেউই তেমন মর্যাদা দিতে পাচ্ছে না। এইজন্যেই তাঁকে ঐভাবে দেখেছ।···

শুনিয়া খুব অনুতাপ ভোগ করিলেন কুলদানন্দ। মনে হইল: সাধু সন্ন্যাসীদের কলিজার ধন এই সাধন বহু সৌভাগ্য বলেই গুরুদেবের নিকট থেকে লাভ করেছি। তেমনি সত্যই আমরা বড় হতভাগ্য, তাই সেই অমূল্য ধনের মর্যাদা আজো রক্ষা করতে পারলাম না। তাই তো মহাপ্রভু ও গুরুদেবের এত আপশোষ।···কিন্তু গুরুদেব তো সহায় আছেন।···তাঁর অনন্ত কৃপাবলেও একদিন কি এই অপূর্ব শক্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারব না?···তবে বরুণদেবকে ব'লে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন কেন? তাঁর অবশিষ্ট লীলাপুষ্টির প্রয়োজনে এই অযোগ্য দেহের প্রয়োজন আছে বলেই তো!··· ভাবিয়া মনে মনে শ্রীগুরুর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন কুলদানন্দ।···

গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্র শাস্ত্রে অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাসী। একদিন কুলদানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত তিনি সমুদ্রস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া কুলদানন্দকে বলিলেন: চল ভাই, জগন্নাথদেব দর্শন করে আসি।···গুরুদেবের ততক্ষণে চা খাইবার সময় হইয়াছিল; সেই সময়ে প্রতি দিনের ন্যায় কাছে বসিয়া বাতাস করিবার জন্য কুলদানন্দ তখন খুবই ব্যস্ত। তিনি বলিলেন: ওসব কিছুর দরকার নেই। আমাদের যিনি লক্ষ্য, তাঁর চতুর্দিকে কত জগন্নাথ-বলদেব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু, গৌর-নিতাই ঘুর্চ্ছেন!···

শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন সতীশচন্দ্র। গুরুদেবের সেবা করিবার জন্য কুলদানন্দ আশ্রমে ফিরিলেন। আর তখনকার মত নীরবে সতীশচন্দ্র গেলেন শ্রীমন্দিরে। বাসায় ফিরিয়া গুরুদেবের সেবা অন্তে বলিলেন: ঠাকুর! কৃষ্ণ কি ভগবান নন?

গোসাঁইজী ঃ একথা বলছ কেন ? আমি কি কখনও তা বলেছি ?

ঃ ব্রহ্মচারী বলল আপনি নাকি তাই বলেছেন ?

কুলদানন্দকে ধমক দিয়া গোসাঁইজী বলিলেন ঃ কি ব্রহ্মচারী—রাধাকৃষ্ণ ভগবান নন এমন কথা তোমাকে বলেছি নাকি ?

সংযত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন কুলদানন্দ ঃ আমি ওসব কিছু বলিনি। আমি বলেছি—আমাদের যিনি লক্ষ্য তাঁর চারিদিকে কত জগন্নাথ-বলদেব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ঘুর্চ্ছেন।…গেণ্ডারিয়ায় সেবা করতে করতে ভাবাবেশে আপনি ঐরকম কথা বলেছিলেন—এখনও আমার ডায়েরী থেকে দেখাতে পারি।

ঃ তুমিই বল আমাদের লক্ষ্য কী ?

ঃ সদ্‌গুরুই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর তাঁর আদেশ পালনই আমাদের প্রধান কর্তব্য। সদ্‌গুরুর চতুর্দিকে দেবদেবী, মুনি-ঋষি, এমনকি স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত না ঘুরে নিস্তার পান নি।…

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গোসাঁইজী বলিলেন ঃ আমার ভাবাবেশের অনেক কথা তোমার ডায়েরীতে লিখে রেখেছ। ঐসব পুড়িয়ে ফেলো। কোন্ সময়ে কিভাবে আমি কি বলি, তা লোকে বুঝতে না পেরে শেষে নানারকম গোলমাল করবে।…

গুরুদেবের কথায় মনে বড় আঘাত পাইলেন কুলদানন্দ। সারাদিন বড় অশান্তিতে কাটিল। রাত দুইটায় গুরুদেবের কাছে একা বসিয়া আছেন। এই অবসরে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন গোসাঁইজী। বলিলেন ঃ যেমন লিখছ লিখে যাও। তোমাকে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়।…

অশান্তির তীব্র বহ্নিতে পরম শান্তি ও সান্ত্বনার বারি সিঞ্চন করিলেন গোস্বামী প্রভু।…আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন কুলদানন্দ। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অভিনয় হইয়া গেল, তাহার নীরব সাক্ষ্য রহিলেন শুধু তাঁহারাই।…কুলদানন্দ বুঝিলেন তাঁহার গুরুনিষ্ঠা সতীশচন্দ্রের নিকট প্রকাশ করা উচিত হয় নাই।…এমনি নিখাদ সত্য ও সুস্পষ্ট মনোভাব সাধারণ্যে প্রকাশিত হউক,

ইহা গুরুদেবের অভিপ্রেত নয়। কারণ ভুল বুঝিয়া অনেকে হয়ত দেব-দেবীর অমর্যাদা করিয়া বসিতে পারে। তাই সকলের সমক্ষে শাসন করিলেন গুরুদেব, কিন্তু গোপনে জানাইলেন সস্নেহ আশীর্বাদ।...

কুলদানন্দের গুরুনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি কত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এই ঘটনা তাহার চমৎকার নিদর্শন।...সদ্‌গুরুই তাঁহার নিকট সর্ব দেবদেবী, স্বয়ং শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি।...এজন্য পৃথকভাবে কোন দেবদেবীর দর্শন বা সেবা করিবার কোন ইচ্ছা বা প্রেরণা অনুভব করিতেন না তিনি।...এজন্যই গোপনে তাঁহাকে এমনিভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন গোস্বামী প্রভু।...

অহোরাত্র গুরুসেবাই ছিল কুলদানন্দের প্রধান নিত্যকর্ম। গুরুদেবের কিছুমাত্র কষ্ট বা অসুবিধা দেখিলে অস্থির হইয়া উঠিতেন।

মাঘমাসে গোসাঁইজীর শরীর দুর্বল ইহয়া পড়িল। একদিন জ্বরও দেখা দিল। আর বাহির না হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন একাগ্রমনে। সকালে অল্প মহাপ্রসাদী মুড়কি প্রসাদ পাইলেন। কিন্তু রাত্রে প্রায় কিছুই সেবা করিলেন না। দৈহিক অসুস্থতায় ও অস্থিরতায় একমনে ধ্যানেও বসিতে পারিলেন না।...

গুরুদেবের কষ্ট হৃদয় দিয়া অনুভব করেন কুলদানন্দ। সাধ্যমত সারা রাত গুরুদেবের সেবাযত্ন করেন। কী করিয়া গুরুদেবকে একটু স্বস্তি, একটুখানি শান্তি দিবেন, তাহার জন্য ব্যাকুলতার অন্ত নাই তাঁহার।

কিন্তু গুরুদেব যে রাত্রে অনাহারী আছেন সেজন্য সকালে উঠিয়াই তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিলেন: ঠাকুর জ্বরের মুখে আর মুড়কি খেতে পারেন না। আপনারা অন্য জিনিষ আনান না কেন? অন্যের হলে তো কত আসত।...

এমনি আরো কিছু বলিলেন কুলদানন্দ। তাহাতে কন্যা শান্তিসুধার মনে আঘাত লাগিল। পিতাকে তিনি জানাইলেন, তাঁহাকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছেন ব্রহ্মচারী।...

একদিকে স্নেহপুত্তলী অভিমানিনী কন্যা, অন্যদিকে গুরুগতপ্রাণ চিরানুগত ভক্ত সেবক। কন্যাকে দিতে হইবে সান্ত্বনা, আর শিষ্যকে করিতে হইবে সস্নেহ শাসন। গোসাঁইজী গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন: স্ত্রীলোকের মর্যাদা দিতে যে পারে না—সে তো মানুষই নয়, তার আবার ব্রহ্মচর্য কী? আজ অবধি ব্রহ্মচারী না বলে ওকে কুলদা বলে ডাকব। সে যেন আমার ঘরে না আসে। এত বছর ব্রহ্মচর্যে কী হল? সবই তো মিছে দেখছি।···

অদূরে থাকিয়া কথাগুলি শুনিতেই চমকিয়া উঠিলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন, ঠাকুরের নির্দেশে সর্বংসহ হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি তো নিজের বা অন্য কারো জন্য কিছু বলেন নাই; গুরুদেবের কষ্ট দেখিলে তাঁহার যে বুক ফাটিয়া যায়, বিশেষতঃ তিনি যে অসুস্থ। বাধ্য হইয়া কথা বলিয়াছেন একমাত্র তাঁহারই জন্য।···তবু এই তাহার পরিণতি?···

শান্তিসুধা শান্ত হইলেন, কিন্তু কুলদানন্দের চিত্তে দেখা দিল দারুণ বিক্ষোভ। বার বার কানে বাজিতে লাগিল গুরুদেবের কথাগুলি। গোসাঁইজী শৌচে গেলে তাঁহার ঘরে গিয়া সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তবু অন্তঃস্থল হইতে গুমরিয়া উঠিল সকরুণ ক্রন্দন।···

ঠিক সেই সময় আসিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: আমি নিজেই ওষুধ তৈরি করব। তোমরা অন্যরকম করে ফেলবে।···

কথাটী যেন বিষ ঢালিয়া দিল কুলদানন্দের কাণে! সামান্য একটু ঔষধ, তাহাও গুরুদেবকে নিজেই তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে? তবে আর কী প্রয়োজন নিজ অস্তিত্বের?···

সারা অন্তর পলকে উদ্বেল হইয়া উঠিল। মুখে কিছুই বলিবার আর শক্তি রহিল না। তবু নীরবে গুরুদেবের সম্মুখে গেলেন—নতমুখে অপরাধীর ভংগিতে নয়, উন্নত মস্তকে গুরুনিষ্ঠার অখণ্ড দাবীতে।···

পলকে সেই দাবী দয়াল ঠাকুরের হৃদয় স্পর্শ করিল। ভাসিয়া গেল সমস্ত শাসন। পরম স্নেহভরে সুস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন: কে?— ব্রহ্মচারী, তুমি!···আচ্ছা—ওষুধ তৈরি করো।···

দমকা হাওয়ায় উত্তাল হইয়া উঠিল অন্তরের তরঙ্গ-বিক্ষোভ। গভীর আবেগে কম্পিতকণ্ঠে গুরুদেবের কথারই সুর ধরিয়া বলিলেন: আর ব্রহ্মচারী নয়—'কুলদা' বলবেন।···

নিমেষে দেখা দিল অভাবনীয় পরিবেশ—সেই অব্যক্ত ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হইল অনন্ত করুণাময় গোস্বামী প্রভুর স্নেহার্দ্র হৃদয়ে। বালকের ন্যায় তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মানসপুত্রের প্রেম-যমুনায় উত্থিত হইল প্রবল আলোড়ন।···আর দুইটী অন্তরে রহিয়া রহিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল সেই একই নিরুদ্ধ স্বর্গীয় আবেগ!···

নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন গোসাঁইজী: আমার বুক জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল।···তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি! তুমি এসেছ দেখে বড় আনন্দ হ'ল।···

নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না কুলদানন্দ। সর্বান্তঃকরণে লুটাইয়া পড়িলেন জীবন-প্রভুর শ্রীচরণতলে, চোখের জলে ধৌত করিলেন চরণকমল। বলিলেন: আমার আর কোন দুঃখ নেই। আশীর্বাদ করুন—আপনি যখন যে অবস্থায় রাখেন, সবই যেন আপনার আশীর্বাদ বলেই মেনে নিতে পারি।···

অসীম স্নেহে কুলদানন্দের গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকেন গোস্বামী প্রভু।···মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে কুলদানন্দ বলেন: আমার দুই একটী কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, দয়া করে যদি শোনেন···

শিশুর মত আদর করিয়া বলিলেন অন্তর্যামী গোসাঁইজী: কিছুই আর বলতে হবে না, আমি সব জানি।···ও কিছুই নয়—আমার সঙ্গে কী যে সম্বন্ধ পরে টের পাবে।···একটু থামিয়া বলিলেন: দিন বার-তের তোমাকে 'কুলদা' বলেই ডাকব—কেমন?··

অশ্রুজলের মাঝেও চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্ন হাসি। কুলদানন্দ বলিলেন ঃ আপনার যা খুশি—আমার তাতে কোন কষ্টই হবে না।···

এইভাবে সেদিন সকলের অলক্ষ্যে ভগবান গোস্বামী প্রভু ও ভক্ত কুলদানন্দের মধ্যে অভিনীত হইল স্বর্গীয় অনুপম দৃশ্য।···

॥ তিন ॥

পুরীধাম অবস্থান কালে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্যের জন্য সকলের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন গোস্বামী প্রভু। প্রথমতঃ, মর্কটদের উৎপীড়নে মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃপক্ষ বন্দুকের সাহায্যে নির্মমভাবে সুরু করেন বানর-নিধন যজ্ঞ। ইহাতে মর্মাহত হন গোসাঁইজী, কুলদানন্দ এবং আরও অনেকে। আশ্চর্যের বিষয় বানর-কুল তাঁহাদের সহানুভূতি বুঝিতে পারিয়া বিপদ বুঝিলেই দলে দলে আশ্রমে আশ্রয় লইত। আকারে ইংগিতে এবং অনেক সময়ে তাঁহাদের শ্রীপদ ধারণ করিয়া জ্ঞাপন করিত বিপদের কথা। গোস্বামী প্রভুর নেতৃত্বে বানর বধের বিরুদ্ধে সুরু হইল তীব্র আন্দোলন। কুলদানন্দ, সতীশচন্দ্র প্রভৃতি যোগ দিলেন এই আন্দোলনে। অবশেষে সহৃদয় ছোটলাট উডবার্ণ সাহেব বানর বধ রহিত করিলে নিশ্চিন্ত হইলেন সকলে। দ্বিতীয়তঃ সশিষ্য গোসাঁইজীর আন্দোলনে মন্দির সংলগ্ন পায়খানা ভঙ্গ করেন মিউনিসিপালিটী কর্তৃপক্ষ। এছাড়া দান-যজ্ঞের মধ্য দিয়াও গোস্বামী প্রভু তিন মাসে ব্যয় করেন বহু সহস্র টাকা। শত শত সাধু ব্রাহ্মণ ও কাঙালীকে অন্ন-বস্ত্রাদি মহাসমারোহে দান করা হয়। কুলদানন্দ, সারদাকান্ত, বিধূভূষণ, সরলনাথ প্রভৃতি ছিলেন এই দানযজ্ঞের প্রধান হোতা।···

গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক শক্তি ও অভূতপূর্ব কার্যকলাপ দর্শন করিয়া জনসাধারণ তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তিতে কয়েকজন ধর্মাভিমানী হিংসাপরায়ণ ব্যক্তির

ক্রোধ ও বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে। নানাপ্রকারে তাহারা গোস্বামী প্রভুকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

পুরীতে আগমন করা অবধি ৺জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই সেবা করিতেন না গোস্বামী প্রভু। মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতে থাকেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন: যেমন নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান একই তত্ত্ব, তেমনি জগন্নাথদেব ও মহাপ্রসাদ একই তত্ত্ব; এঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। জগন্নাথদেব দর্শনে যে ফল, মহাপ্রসাদ সেবনেও সেই ফল।...এইজন্য মহাপ্রসাদ বলিয়া কেহ কোন কিছু দিলে তাহা কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না গোস্বামী প্রভু। এই গভীর নিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করিল ঈর্ষান্বিত দুবৃত্তগণ।

২২শে বৈশাখ, ১৩০৬। কুক্ষণে অগ্রসর হইল এক দুর্বৃত্ত পাণ্ডা। ভক্তির ভাণ করিয়া গোসাঁইজীকে প্রণাম করিল। কিন্তু মহাপ্রসাদ নামে প্রদান করিল তীব্র বিষমিশ্রিত লাড্ডু।... তখন তাহার দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলেন অন্তর্যামী গোসাঁইজী। দুর্ভাগ্যবশতঃ আর কেহই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। মহাপ্রসাদের যথোচিত মর্যাদা রক্ষার জন্য সেই সুতীব্র হলাহল মিশ্রিত লাড্ডু অম্লানবদনে অবিচলিত চিত্তে ভক্ষণ করিলেন গোস্বামীপ্রভু। ফলে ক্ষণকাল মধ্যেই অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্বয়ং নীলকণ্ঠ মহাদেবের কৃপায় একটু পরেই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে তাঁহার নিত্যক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি চলিতে লাগিল।

কিন্তু শরীর অকস্মাৎ ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়িল। হিংসা-পরায়ণ লোকদের গতিবিধিতে কেমন যেন সন্দেহ হইল যোগজীবন গোস্বামীর। গোসাঁইজীকে আকস্মিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে ঘটনাবলী প্রকাশ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিলেন। ক্রমে কুলদানন্দ ও কয়েকজনের নিকট মনের সন্দেহ ব্যক্ত করিলেন যোগজীবন। তাঁহাদের অত্যধিক আগ্রহে অবশেষে গোসাঁইজী

আসল ঘটনা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—প্রায় পঁচিশ জন এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ; জগন্নাথদেব তাহাদের দেখাইয়াও দিয়াছেন।···
মারাত্মক সংবাদটী তখন সরকারী দপ্তরে পৌছিয়া গেল। যোগজীবন, ভক্তবৃন্দ এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও দুর্বৃত্তদের নাম জানিতে চাহিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের নাম প্রকাশ করিলেন না গোসাঁইজী। শুধু বলিলেন : ধর্মের প্রতিষ্ঠা এক বিষম ব্যাপার।···এই প্রতিষ্ঠার ঘাটে অনেক সাধকও তাঁহাদের অর্জিত সাধন-সম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে নিরয়গামী হন। তোমরা শান্ত হও। ওদের ক্ষমা কর—ওরা বড়ই কৃপাপাত্র।···

অপার বিস্ময়ে, গভীর ভক্তিতে অভিভূত হইলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবের দিকে বারবার চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, সত্যই কী অপূর্ব ক্ষমাসুন্দর দিব্যমূর্তি।···

সক্রেটিস ও যীশুখ্রীষ্টের আত্মদান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু উভয়ে মৃত্যুবরণ করেন অনেকটা বাধ্য হইয়াই। আর, গোস্বামী প্রভুর বিষপান ছিল সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাধীন। তবু নির্বিকারে শুধু বিষপান করেন নাই—সেই সুতীব্র হলাহল তিনি হজম করেন অলৌকিক শক্তিবলে। দ্বিতীয়তঃ, সক্রেটিস ও যীশুখ্রীষ্টের ক্ষেত্রে জনমত ও রাজশক্তি ছিল প্রতিকূলে, আততায়ীদের শাস্তি-বিধান ছিল তাঁহাদের আয়ত্বের বাহিরে। আর গোসাঁইজীর ক্ষেত্রে সরকার ও জনসাধারণ অনুকূলে থাকায় দুর্বৃত্তদের শাস্তি দেওয়া যাইত খুব সহজেই। নিজে কিছু না করিলেও অন্ততঃ তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে পারিতেন। অথচ কোন ক্ষেত্রে কিছুমাত্র সুযোগ গ্রহণ করেন নাই গোস্বামী প্রভু—পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও দুর্বৃত্তদের তিনি ক্ষমা করেন সুগভীর প্রেম ও অহিংসার প্রেরণায়। এমনকি, শিষ্যদের নির্দেশ দান করেন—যদি কোন প্রকারে দুর্বৃত্তদের নাম প্রকাশিত হয়, তবুও কেহ যেন ঘুণাক্ষরেও তাহাদের শাস্তি বিধানের চেষ্টা না করে।···সুতরাং গোস্বামী প্রভুর শক্তি ও সংযম, প্রেম ও অহিংসা, ক্ষমা ও উদারতা নিঃসংশয়ে

অনন্যসাধারণ,...জগতের ইতিহাসে সর্বদিক দিয়াই অদ্বিতীয়।... ভাবিয়া অপরিসীম ভক্তিতে, গর্বে ও আনন্দে কুলদানন্দের সারা অন্তর ভরপুর হইয়া উঠিল।...

পক্ষকালের মধ্যে যেন নির্জীব হইয়া পড়িলেন গোসাঁইজী। শরীরের অবস্থা খুবই খাবাপ হইয়া পড়িল।

নরেন্দ্র সরোবরের তীরে ছিলেন অদ্বৈত বংশের এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী। গোসাঁইজীর আদেশে প্রতিদিন তাঁহাকে মহাপ্রসাদ পাঠান হইত। ধুতি, চাদর, ঘটী, ঘর মেরামতের টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইত। একদিন নরেন্দ্রের গোসাঁই আম পাঠাইয়া দিলেন। উহা লইতে নিষেধ করিলেন গোসাঁইজী। এই ব্যাপারে কেহ আসিলেও সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া দিলেন।

ইহাতে রুষ্ট হইলেন নরেন্দ্রের গোসাঁই। বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন: বিষ খাওয়ালে কি মানুষ বাঁচে?...তবে গোসাঁইজী তো অবতার; তাঁকে কি কেউ বিষ খাইয়ে মারতে পারে?...

একথা শুনিয়া আশ্রমের লোকদেরই দোষারোপ করিলেন গোসাঁইজী। কিন্তু নরেন্দ্রের গোসাঁইয়ের কৃতঘ্নতায় খুব দুঃখিত হইলেন কুলদানন্দ। বুঝিলেন, মনুষ্য চরিত্র সত্যই দুর্বোধ্য বটে।... গুরুভ্রাতা সরলনাথকে লইয়া নরেন্দ্রের গোসাঁইয়ের নিকট গেলেন তিনি। বলিলেন: ঠাকুরের আপনি জ্ঞাতি খুড়া, অসুখে কোথায় সহানুভূতি দেখাবেন—উল্টে যারা বিষ দিয়েছে তাদের সমর্থন কচ্ছেন?...বেশ, ঠাকুরের সঙ্গে আর আপনার সাক্ষাৎ হবে না। আপনার জন্যে মহাপ্রসাদও কাল থেকে আর আসবে না।...

অনেকের সন্দেহ হয় দুষ্ট বাবাজীদের সহিত গোপন যোগাযোগ আছে নরেন্দ্রের গোসাঁইয়ের। গুরুদেবের আদেশে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইল না; তবু এই গোসাঁইয়ের আচরণের বিরুদ্ধে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ না জানাইয়া

পারিলেন না কুলদানন্দ। সাধারণ দুর্বৃত্তদের অপেক্ষা সাধুবেশী এইসব দুষ্ট ব্যক্তিরাই সমাজ ও দেশের প্রধান শত্রু।···

গোসাঁইজীর শরীর ক্রমাগত অবনতির দিকে চলিয়াছে। শরীর এত দুর্বল যে অন্যকে ভর করিয়াও শৌচে যাইতে কষ্ট হয়। কথা বলিতেও ক্লেশ বোধ করেন—অনেক সময়ে নীরবে আত্মসমাহিত থাকেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সারদাকান্তকে বলিলেন: আজ অবধি হরির লুট, জগন্নাথদেবের পূজা-অর্চনা—এসব তুমিই কর।

: আমি তো পূজা-অর্চনা জানিনে—তবে ইষ্টনামে পূজা করতে পারি।

: সেই তো শ্রেষ্ঠ পূজা।

গোসাঁইজী দুর্বলতায় হাঁপাইতে থাকেন। আহারেও অরুচি হওয়ায় নামমাত্র আহার করেন। কুলদানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের দুশ্চিন্তাও বাড়িয়া চলিয়াছে। কুলদানন্দ মনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছেন গুরুদেবের ঐকান্তিক সেবা ও পরিচর্যায়। সতীর্থ সরলনাথকে লইয়া দিবারাত্র চলিয়াছে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম। আর কোন চিন্তা, কোন কাজ নাই—একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান গুরুদেবের স্বস্তি ও শান্তি।···বাল্যাবধি গোসাঁইজী যোগাসনে বসিয়া যাবজ্জীবন নিস্পন্দ শিখাবৎ ধ্যানস্থ। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি শয্যা গ্রহণ করেন নাই। সেই মহাযোগেশ্বর নিজের দেবদেহ আজ আর সোজা রাখিতে পারিতেছেন না।·· ইহা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন কুলদানন্দ এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতারা। অগত্যা তাঁহারা গুরুদেবের জন্য কতকগুলি বালিশের ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রে তিন ঘণ্টা ধরিয়া গুরুদেবের চরণে তেলজল মালিশ করিলেন তাঁহারা। খুশী হইয়া বলিলেন গোসাঁইজী: তোমরা আজ আমায় বাঁচালে—বিষে ভেতরটা প'চে গেছে।···নিদারুণ ক্লেশের মধ্য দিয়াও গুরুদেবের ক্ষণিক স্বস্তিতে তৃপ্তি অনুভব করিলেন কুলদানন্দ।

আজকাল সর্বদাই শ্বেত ও নীলবর্ণ মিশ্রিত বিষাক্ত পাকা কফ নির্গত হইতেছে। যে সব নেকড়ায় গোসাঁইজী কফ ফেলেন, তাঁহার আদেশে সেগুলি পোড়াইয়া ফেলিতেছেন কুলদানন্দ।

পরদিন রাত্রি দশটায় নবাগত একটি গুরুভ্রাতা গোসাঁইজীকে বাতাস করিতে থাকেন। একটু পরে তিনি উঠিয়া যাইবেন—হঠাৎ অর্ধ-বাহ্যাবস্থায় আপত্তি জানাইলেন গোসাঁইজী। কুলদানন্দকে বলিলেন: তোমরা যাকে তাকে বাতাস দিতে দাও কেন? একেবারে উচ্চ অধিকার! যাও ব্রহ্মচারি, ওকে বলে এস—যেন কালই দেশে চলে যায়।···

গোসাঁইজীর এই নির্দেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেবাও এক প্রকার মহৎ সাধনা। বহুদিনের নিষ্ঠা, ভক্তি ও একাগ্র সাধনার মধ্য দিয়াই তবে ধীরে ধীরে লাভ করা যায় গুরুসেবার উচ্চ অধিকার। একদিকে অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তি, অন্যদিকে কঠোর সংযম ও ঐকান্তিক সাধনা—এই বিচিত্র মানদণ্ডে সমতা ও সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে কুলদানন্দ লাভ করেন অহোরাত্র গুরুদেবের ঘন সান্নিধ্য—তাঁহার সেবার অখণ্ড অধিকার।···ইহা লইয়া গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিদের মাঝে কত কথা, কত ঈর্ষার ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তবু গুরুদেবের কৃপা ও আশীর্বাদে তাঁহার নিত্য সঙ্গলাভের ও নিত্য সেবা করিবার অধিকার অর্জন করেন কুলদানন্দ। ইহা হইতে কেহ কখনও তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ একনিষ্ঠ গুরুসেবাই প্রকৃত গুরুপূজা।···

বেদানার রস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন গোসাঁইজী। প্রভুপাদ যোগজীবন কলিকাতা হইতে এক বোতল বেদানার রস আনাইয়া দিলেন। তাহা তেমন ভাল হইল না। কলিকাতার উইলসন হোটেল হইতে আনিলে পাওয়া যায় খাঁটি জিনিষ। কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন কি গোসাঁইজী? যোগজীবন ও আর সকলে ধরিয়া বসিলেন কুলদানন্দকেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া বলিলেন কুলদানন্দ: খাঁটি বেদানার রস উইলসন হোটেল থেকে আনিয়ে দেব? তাতে আপনার উপকার হতে পারে।···

শুনিয়াই ধমক দিয়া উঠিলেন গোসাঁইজী : তোমার তো ভয়ানক রাজসিক ভাব দেখছি! উইলসন হোটেলের বেদানার রস আমাকে খাওয়াতে চাও?···

আহত হইয়াও দমিয়া গেলেন না কুলদানন্দ। গুরুদেবের বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিসত্তার প্রশ্ন অবান্তর। সহজভাবে বলিলেন : কেন, উইলসন হোটেলের জিনিষ তো আগে আপনাকে খেতে দেখেছি?···

: তাই ব'লে কি এখনও খেতে হবে? বারো বছর নিয়ত সঙ্গে থেকেও বুঝলে না, কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? আগে তো কত কী করেছি—চিরকালই কি এক ভাব?·· আমি অপরের নিকট শাস্ত্র ও সদাচারের মহিমা প্রচার কচ্ছি, আর নিজে সদাচার বহির্ভূত কাজ করব? এ কখনই হতে পারে না।···

আদর্শ প্রচারে সদ্‌গুরুর ব্যক্তিগত দায়িত্ব কতখানি তাহা মনেপ্রাণে বুঝিলেন কুলদানন্দ। ইহাও বুঝিলেন ইহার উপর আর কথা চলিবে না।

কিন্তু গোসাঁইজীর শরীর ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ফলে যোগজীবন এবং আরো অনেকে তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোসাঁইজী বলিলেন : তোরা এত ভাবিস কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব তিনবার ক'য়ে আমার খবর নিচ্ছেন। আমার ভয় কি? অন্য স্থানে গেলেই কি ত্রাণ পাব? আর, এখানে ধরে আছড়ালেও তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছু হবার যো নেই। অন্যদিকে তোমরা তাকাও কেন?···তাঁর ইচ্ছা হলে মুহূর্ত মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।···আমি পুনঃ পুনঃ বলছি—আর কারো উপর নির্ভর করো না।···

কুলদানন্দের মনে হইল, শত দুঃখ-বিপদেও এই বিশ্বাস ও নির্ভরতাই প্রকৃত ভক্তি।···

রাত্রি প্রথম প্রহর। গোসাঁইজী ধ্যানমগ্ন। কিছুকাল অস্পষ্ট কী যেন বলিলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন : ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্মঃ, ওঁ রামঃ·।···

পরদিন গুরুদেবের নিকট ইহার তাৎপর্য জানিতে পারেন কুলদানন্দ। পূর্বদিন পায়খানার সহিত দুইবার রক্তপাত হওয়ায় গোসাঁইজী বুঝিলেন, বিষ রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। অমনি তাঁহাকে হীরা-মাণিক্য খচিত পালঙ্কে তুলিয়া দেবতারা লইয়া গেলেন গঙ্গাতীরে, পালঙ্ক শুদ্ধ তাঁহাকে গঙ্গায় নামাইয়া অন্তর্জলী করিলেন। তখনই তিনি বলিয়া উঠেন: ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্মঃ, ওঁ রামঃ।··· গোসাঁইজী বলিলেন, গঙ্গার হাওয়ায় তাঁহার শরীর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।···

গুরুদেবের এই নিদারুণ বাক্যে বিচলিত হইয়া পড়িলেন সকলে। কুলদানন্দের মনে হইল, তাঁহার অস্তিত্বের ভিত্তিমূল পর্যন্ত থর থর কাঁপিয়া উঠিল।···

অমনি তাঁহাদের শান্ত করিলেন দয়াল গুরুদেব। কয়েক দিন যাবৎ তিনি গাঁধালের ঝোল খাইতেছেন। উহাতে রক্তশুদ্ধি ও বিষের জ্বালা দূর করে, শরীর ঠাণ্ডা হয়। তিনি বলিলেন: আজ নিবেদন করলে জগন্নাথদেব এসে প্রায় সবটুকুই খেয়ে ফেললেন! এইভাবে তিনি আশ্বস্ত ও দয়া না করলে কি আর বাঁচি!···

কুলদানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যদের গোসাঁইজী আরো বলিলেন: দেখ, সামনে বর্ষাকাল। তখন আকাশে সর্বদা মেঘ, পথঘাটে কাদা, পোক-জোঁক, নদী-নালার জল অপরিষ্কার—প্রকৃতি যেন নিরানন্দের ছায়ায় ঢাকা! তখন মনে হয় না এইদিন কেটে যাবে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে বর্ষার পরই শরৎকাল। তখন আকাশ স্বচ্ছ, রাস্তাঘাট খটখটে—আবার মেদিনী হাসতে থাকে।···তেমনি এখন তোমাদের প্রারব্ধক্ষয়ের সময়। এখন নানা রোগ-শোক, যন্ত্রণা-অপমান, পরস্পরে অবিশ্বাস খুব আসবে। অনেকে বিশ্বাস হারিয়ে সাধন ত্যাগ করবে। এই ভয়ানক অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ধৈর্য ধরে গুরুদত্ত নাম করা।···তাহলে শিগগির কর্ম ক্ষয় হয়ে শান্তি আসবে। আর ধৈর্য হারিয়ে বিপথে গেলে ঘোর

বিপাকে পড়তে হবে। বর্ষার পর যেমন শরৎকাল আসে, তেমনি তোমাদেরও এই অবস্থার পরে চিরশান্তি দেখা দেবে।...

কুলদানন্দ এবং অন্য সকলে কতকটা শান্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, মহাযাত্রার পূর্বে ইহা গুরুদেবের মহামূল্য উপদেশ।...

গোস্বামী প্রভুর শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বেশী কথা বলা বন্ধ করিয়া তিনি প্রায়ই ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে শ্রীবৃন্দাবনলীলা বিষয়ক গান শুনিতে চাহিতেন; তখন রেবতী মোহন ও প্রিয়নাথ সুমধুর গান করিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেন। কুলদানন্দ ও সরলনাথ সারা দুনিয়া ভুলিয়া নিমগ্ন রহিলেন গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষায়।...আর অন্তরে চলিল অবিরাম নাম সাধন।...কোন ভক্ত তাঁহার সেবাপ্রার্থী হইলে গোস্বামী প্রভু বলেন: যাঁরা ভক্তির সঙ্গে শ্বাসে প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম সাধন করেন, তাঁরাই আমার যথার্থ সেবা করেন। অন্য সেবায় আমার প্রয়োজন নেই—তাতে আমার তেমন প্রীতিও জন্মে না।...গুরুদেবের এই বেদবাক্য, এই মহামূল্য উপদেশ কখনও ভোলেন না কুলদানন্দ। দিবানিশি গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষার সঙ্গে সঙ্গে তাই চলে নাম সাধন। জানেন, তবেই তাহাতে অন্তর্যামী গুরুদেবের তৃপ্তি ও স্বস্তি।...

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। গোস্বামী প্রভুর মহাপ্রয়াণের পূর্ব দিন। তাঁহার ইচ্ছায় নরেন্দ্র সরোবরের পাব হইতে একটি তুলসীগাছ আনা হইল। তিনি বলিলেন: নরেন্দ্রের তুলসী গাছ নরেন্দ্রেই যাবে।... মালী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া প্রণাম করিলে বলিলেন: তুমি আমার চিরদিনের মালী—আমাকে চিরকাল ফুল দেবে।...সোয়ার আসিলে বলিলেন: তুমি আমার চিরদিনের সোয়ার—আমাকে চিরদিন মহাপ্রসাদ দেবে।...

গুরুদেবের এ সমস্ত কথার সঠিক তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না কুলদানন্দ। তবু কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁহার অন্তঃস্থল

দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল।···গভীর বিষাদে সারা মনপ্রাণ মুহ্যমান। গুরুদেবের দেহ নিতান্তই অবসন্ন। কোথায় তাঁহার শ্রীমুখের সেই অনুপম হাসি ও কথা? কোথায় সেই অপার স্বর্গীয় আনন্দ? ·· আর কি তাহার সন্ধান মিলিবে না?···ভাবিতেই কুলদানন্দের সারা অন্তর দুলিয়া উঠিল।···অশ্রুসিক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেনঃ জয় গুরুদেব! তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক।···

রাত্রি নয়টা। অবিচ্ছেদে চলিয়াছে গুরুসেবা। এক বৎসর তিন মাস এই অপূর্ব, ঐকান্তিক সেবাই কুলদানন্দের মহান সাধনা। আজ কয়েক দিন একেবারে বিশ্রাম নাই। একটু আগে সেবা করিতে করিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। শৌচে যাইবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিলেন গোস্বামী প্রভু।

চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন কুলদানন্দ। অপরাধী দৃষ্টিতে গুরুদেবের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ পদসেবা করিতে আরম্ভ করিলেন।···অমনি করুণা-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। পরম স্নেহের ধনকে গণ্ডস্পর্শ করিয়া আদর করিলেন গোসাঁইজী। পরক্ষণে অসীম স্নেহভরে কুলদানন্দকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেনঃ এইভাবে নিজেকে বিলিয়ে সেবা কচ্ছ—এ ব্যর্থ হবে না জেনো, জীবন সার্থক হবে। গুরুশক্তি অলক্ষ্যে এইভাবে তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। জীবন মধুময় হয়ে যাবে। শতসহস্র নরনারী তখন তোমাকে সেবা করবার জন্য ব্যাকুল হবে।···

সুগভীর আবেগে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন কুলদানন্দ। আর, তাঁহার মস্তকে পৃষ্ঠে কৃপাহস্তের অমিয় পরশ বুলাইয়া দিতে লাগিলেন গোস্বামী প্রভু।···ধীরে ধীরে বলিলেনঃ আমার এমন কতকগুলি কাজ আছে, যা এই দেহ থাকতে হতে পারে না। সময়ে ঐ কাজ আরম্ভ হবে।···নিজ সমস্ত সত্তা যেন উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন গোসাঁইজী উপযুক্ত আধারে। শ্রীগুরু মহারাজের শ্রীহস্তে নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের আজ দেবদুর্লভ অভিষেক!

অনির্বচনীয় দিব্য আনন্দে উঠিয়া বসিয়া গুরুসেবায় নিমগ্ন হইলেন কুলদানন্দ।…

অপরাহ্নে সতীর্থ অশ্বিনী বাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু কলহে প্রবৃত্ত হইলে মর্মাহত হন গোসাঁইজী। এখন কুলদানন্দের নিকট হইতে বিস্তারিত জানিয়া লইলেন। শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন: দেখ, জগন্নাথদেব সবাইকে জানাতে বললেন, রাগ বড় চণ্ডাল। কারো কাম-ক্রোধাদির উদ্রেক হলে তখনই সে স্থান ত্যাগ করবে।…আর, তিনি আমাকে তোমাদের হ'য়ে ক্ষমা চাইতে বললেন।…পরক্ষণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন: তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।…তাঁহার নির্দেশে উভয়ে সাশ্রুনেত্রে পরস্পরকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিলেন। শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি ইহাই ভগবান বিজয়কৃষ্ণের শেষ উপদেশ।…

একটু পরে কুলদানন্দকে বলেন: তোমাদের ভার আমি জগন্নাথদেবের উপর দিলাম। তিনিও তা গ্রহণ করলেন।…তোমরা সকলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে--তবে কিছু সময়-সাপেক্ষ। এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাই শান্তি পাবেন।…

রাত্রে কুলদানন্দ ও সবলনাথ বহুক্ষণ তেল-জল মালিশ করিলেন শ্রীগুরুচরণে। খুশীভাবে মস্তক স্পর্শ করিয়া গোসাঁইজী বলিলেন: আমি নিশ্চয় বলছি, সমস্ত শীতল হয়ে যাবে।…

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬। কুলদানন্দের জীবনে একটী সবিশেষ স্মরণীয় দিন।…

অনেকক্ষণ শৌচে বসিয়া বড়ই অবসন্ন হইলেন গোসাঁইজী। আসনে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন, সমাধিস্থ হইলেন একটু পরেই। কুলদানন্দ ও সরলনাথ ছায়ার ন্যায় কাছে ছিলেন; ক্রমশঃ অন্য সকলেও আসিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেও সমাধি ভঙ্গ না হওয়ায় চিন্তিত হইলেন সকলে। ধীরে ধীরে কীর্তন করিয়া ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের চোখে মুখে ঘোর বিষাদের ম্লান ছায়া। বেলা দুই প্রহরে বহু চেষ্টার পর অল্প একটু

জ্ঞান হইল গোসাঁইজীর। তিনটার সময় অর্ধেক পরিমাণ ঔষধ অনেক কষ্টে তবে খাওয়াইতে পারিলেন কুলদানন্দ। আসন্ন নিদারুণ বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার চক্ষে ফুটিল অশ্রুবিন্দু।

রাত্রি প্রায় আটটায় দিব্য জ্ঞান হইল গোস্বামী প্রভুর। কুলদানন্দের নিকট তিনি ঔষধ চাহিয়া খাইলেন। জগদ্বন্ধু বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ আজ আমার কাছে থেকো।...

তৎপরে কুলদানন্দ ও সরলনাথের সাহায্যে গেলেন শৌচাগারে। ফিরিয়া আর আসনে গেলেন না গোসাঁইজী—গিয়া বসিলেন আসনের নিকটে টবে রোপিত নিত্য পূজার তুলসী বৃক্ষমূলে। তাঁহাকে আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন কুলদানন্দ—সেকথা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না গোসাঁইজী। ইতিপূর্বে শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে একদা তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যেদিন আসন ছাড়ব, সেদিন আমি আর থাকব না।...কথাটা তখন কাহারও মনে হইল না; বরং সমস্ত দিন পরে তাঁহার স্বাভাবিক কথাবার্তায় শিষ্যদের মনে নব আশার সঞ্চার হইল। কুলদানন্দের নিকট ডাবের জল, মহাপ্রসাদের আমানি জল ও ঘোল চাহিয়া খাইলেন গোসাঁইজী।

জগদ্বন্ধু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এখন কেমন আছেন?

ঃ ভাল আছি। মাথাটা ধরে আছে।

ঃ আপনার চা খাবার অভ্যেস! সমস্ত দিন তো খাননি—একটু চা খাবেন?

ঃ তবে একটু পাতলা করে আনুন।

স্বহস্তে দুইবার চা পান করিলেন গোসাঁইজী। ক্ষণকাল পরে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া নতমস্তকে কাঁহাকে যেন প্রণাম করিলেন। তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই জীবন-দেবতার পদপ্রান্তে ইহাই তাঁহার শেষ প্রণতি।...পরমুহূর্তে উপবিষ্ট অবস্থাতেই সহসা দেবচক্ষু হইয়া আসিলেন। সচকিত বিহ্বলতায় সকলের অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল।...হৃদয়-বীণার সমস্ত তন্ত্রীগুলি বুঝি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল চক্ষের পলকে।...মস্তকে নামিল আকাশের বজ্র—চক্ষে ছুটিল

অশ্রুপ্লাবন।···সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটে নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন ভগবান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু।···

ভারতীয় ধর্ম-বিপ্লবের মূর্ত বিগ্রহ অন্তর্হিত।···এতদিনে অস্তমিত প্রেম-ধর্মের সমুজ্জ্বল গৌরব-রবি।···আঁধার নামিল দিগদিগন্তে, সারা ত্রিভুবনে।

কুলদানন্দের চোখেও জমাট, নিকষ কালো আঁধার!···প্রাণপ্রতিম শ্রীগুরুদেব এখনও যেন সমাধিস্থ।···আর কি তিনি 'ব্রহ্মচারি' বলিয়া তেমনি সাদরে ডাকিবেন না? তবে মনপ্রাণ ঢালিয়া আর কাহার সেবা করিবেন? ঠাকুর বিহনে জীবন যে বৃথা,···আজন্ম সাধনা যে নিষ্ফল! কই দয়াল গুরুদেব?···কোথায় প্রাণের প্রাণ, জীবনের আলো?···অগতির গতি কোথায় তুমি হৃদয়-দেবতা?···

শুষ্ক পত্রে মর্মরিত মর্মান্তিক হাহাকার,···শূন্য আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত সকরুণ ক্রন্দন।···শুধু ভক্তবৃন্দ নয়, দলে দলে সমাগত নর-নারী, সারা পুরীধাম যেন বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত।···এমনকি, বানরগণ গোস্বামী প্রভুর আসন-ঘরে, বারান্দায় বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান। যথারীতি আহার্য বস্তু দিলেও পশু-পক্ষী পর্যন্ত একটী কণাও স্পর্শ করিল না।···এ যেন মহাপ্রভুর তিরোধানে ভক্তবৃন্দ, স্থাবর-জঙ্গমাদির মর্মব্যথার সকরুণ অভিব্যক্তি!···

সেই নিদারুণ শোকাবেগের মাঝেও ধীরে ধীরে আত্ম-সচেতন হইলেন কুলদানন্দ। শ্রীগুরুদেব তো জন্ম-মৃত্যুর অতীত,···সর্বভূতে বিরাজিত।···যেমন ছিলেন, তিনি তো তেমনই আছেন সূক্ষ্মদেহে, ধ্যান ও ধারণায়।···নিরন্ধ্র কালো মেঘেও ঐ তো বিচ্ছুরিত তাঁহার স্বর্গীয় দ্যুতি।···অন্তরেও ঐ তো পূর্ণরূপে বিদ্যমান ভক্তের ভগবান।··· পরক্ষণে মর্মমূলে ধ্বনিত হয় ঠাকুরের কথামৃত: আমার এমন কতকগুলি কাজ আছে, যা এই স্থূলদেহ থাকতে হতে পারে না।···তবে তো এখন হইতেই সেই কার্যের শুভ সূচনা।···সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ হয়: কুলদাকে দিয়ে এখনও যে আমার অনেক কাজ করাবার আছে।···

সেইদিন হইতেই তো শুরু তাঁহার নব-জন্ম।···আর, তিনি তো শ্রীগুরু-চরণে আত্ম-সমর্পিত।···সুতরাং কে বলে গুরুদেব নাই?···তিনি তেমনই আছেন,···আজীবন রহিবেন অন্তরে-বাহিরে—প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে মধুর নাম-সাধনায়,···প্রতি পদক্ষেপে তাঁহারই নির্দেশিত চলার পথে।···

পরক্ষণে চমকিয়া ওঠেন কুলদানন্দ। সম্মুখে ঘোর কৃষ্ণ জ্যোতির্মণ্ডল—আর তাহারই মধ্যে দিব্য বিভায় প্রকাশিত স্বয়ং গুরুদেব!··· অপার আনন্দে, বিপুল প্রেরণায় তিনি প্রণাম করেন শ্রীগুরুচরণে! মনে পড়ে নব গৌরাঙ্গরূপেই এবার গোস্বামী প্রভুর শুভ আবির্ভাব!··· তাঁহার প্রধান লক্ষ্য—সদ্‌গুরুর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া জ্বালাময় এ সংসারে প্রেমধর্ম সংস্থাপন করা।···তাই তো ঘরে ঘরে বিলাইয়া দিয়াছেন সুমধুর ইষ্টনাম,···প্রচার করিয়াছেন ৺নাম-ব্রহ্মের পূজা ও আরতি, শাস্ত্র ও সদাচারের মহিমা।···কলিহত জীবের পরম কল্যাণ সাধনায় সূক্ষ্মদেহে আজ হইতে শুরু ভগবান গুরুদেবের সেই মহাকার্য।···

গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন—কোন মহাপুরুষের তিরোভাবে শোক ও মোহ দেখা দেয় না, দেখা দেয় নিদারুণ বিচ্ছেদ-বেদনা। তবুও কুলদানন্দের ধারণা ছিল গুরুদেবের তিরোধানের শোক সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। গোসাঁই-শূন্য পৃথিবী তাঁহার নিকট দুঃসহ নরক! তাই গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গে বিষ রাখিয়াছিলেন।···

কিন্তু সেই চরম দুঃসময়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেও অল্পক্ষণে অনুপ্রাণিত হইলেন অদৃশ্য শক্তি ও ইঙ্গিতে। শ্রীগুরুর অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করিবার তাগিদে বিষপান করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। পাছে অন্য কেহ অনর্থ ঘটায় এই আশঙ্কায় বিষের কৌটা নিক্ষেপ করিলেন পুষ্করিণীর জলে।

শ্রীগুরুর স্নেহচ্ছায়াতলে থাকিয়া দীর্ঘকাল তিনি লাভ করিয়াছেন অপূর্ব শিক্ষা ও আদর্শ। সেই অক্ষয়, অমূল্য সম্পদ পাথেয় করিয়া তাঁহার বৈরাগ্যদীপ্ত দিব্য জীবনে শুরু হইল আর এক নূতন মহিমান্বিত

অধ্যায় ।···গুরু-নির্দেশিত ব্রত উদ্‌যাপনের শুভ সংকল্প লইয়া মনেপ্রাণে আত্ম-নিবেদন করিলেন ঃ জয় গুরুদেব ! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।···

গোস্বামী প্রভুর মহাপ্রয়াণের পরদিন। তাঁহার দেব-দেহ সংকারের আয়োজন চলিয়াছে। কুলদানন্দ ও যোগজীবন প্রভুর মনে পড়িল, গোসাঁইজী তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অতএব সৎকারের আয়োজন বন্ধ হইল। আর, আশ্চর্যভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্রয় করা হইল নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর-পূর্ব তীরস্থ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটী।

তখন মহাসমারোহে কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন সকলে। মুগ্ধ বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবাক হইয়া কুলদানন্দ দেখেন, সেই কীর্তনের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন স্বয়ং গুরুদেব !···সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্ধে— সর্বদিকেই প্রতিভাত তাঁহার দিব্য, অপরূপ মূর্তি।···দেহত্যাগের পূর্বে তিনি বলেন, এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া যাইবেন যাহাতে কাহারও অন্তরে শোক স্পর্শ না করে। সেই কথা মনে পড়িল কুলদানন্দের। গুরুদেব নাই—একথা আর মনেই হইল না।···অন্য সকলেও বিস্মৃত হইলেন দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা। প্রভুপাদ যোগজীবন এবং সকলের সহিত কুলদানন্দ গোসাঁইজীর ভাগবতী তনু সুসজ্জিত করিয়া সমাধিস্থ করিলেন যথাস্থানে। সকলের অন্তরে প্রবাহিত হইল এক অপূর্ব আনন্দধারা।···

নরেন্দ্র সরোবরের অপর পারে দাঁড়াইয়া একদিন ভাবাবেশে বলেন গোসাঁইজী ঃ ওপারে স্বর্ণচূড়া-বিশিষ্ট একটী মন্দির দেখা যাচ্ছে।···বাস্তবে রূপায়িত হয় তাঁহার সেই ভবিষ্যৎবাণী। গুরুনিষ্ঠ সারদাকান্ত ও নগেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের সবিশেষ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সমাধিক্ষেত্রে নির্মিত হয় এক অপূর্ব মন্দির। রম্য কানন-শোভিত এই মন্দির "জটিয়াবাবার সমাধি-মঠ" নামে সুপরিচিত। দর্শক মাত্রেই উপলব্ধি করেন গোস্বামী প্রভুর নিত্যলীলা। ত্রিতাপক্লিষ্ট ধর্মার্থীদের কৃপা করিয়া চিরশান্তি লাভের পথ প্রদর্শন করিতেছেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণ। ভক্তবৃন্দের নিকট ইহা পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

॥ চার ॥

কুলদানন্দের দীক্ষালাভের পর সুদীর্ঘ বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের পর নয় বৎসর অতীতপ্রায়।

এই দীর্ঘকাল তাঁহার বহুবাঞ্ছিত সদ্‌গুরুসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে শেষ ছয় বৎসর নিরলস সংগ্রাম ও সাধনার সহিত অতিবাহিত তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকের জীবন। ঐকান্তিক গুরুসেবার মাঝেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়া অভিভূত আনন্দে অনুভব করিয়াছেন সদ্‌গুরুর অপূর্ব কৃপা ও লীলাবৈচিত্র্য।

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ ও ভক্ত কুলদানন্দের মাঝে এইভাবে স্থাপিত হয় একটা সুনিবিড় আত্মিক সম্পর্ক।···সেই অপ্রাকৃত মাধুর্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা অন্য সকলের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। বিজয়কৃষ্ণের বিরাট সত্তার পাদমূলে নিজেকে উজাড় করিয়া সঁপিয়া দিয়াছেন কুলদানন্দ। তেমনি চির-অনুগত, গুরুগত-প্রাণ কুলদানন্দের বিপুল সত্তার মাঝেও সানন্দে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন গোস্বামী প্রভু।···বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন একজন অসুস্থ মহাপুরুষের নিত্য সেবক। কিন্তু গোপন অন্তর্লোকে অসীম স্নেহ ও প্রেমে, অনন্ত ভক্তি ও বিশ্বাসে দুইটী বিরাট হৃদয়ে দেখা দেয় মধুর মিলন।···সকলের অগোচরে কুলদানন্দের জীবন-নদী প্রবাহিত হয় উদ্দাম বেগে, অপার আনন্দে বিলীন হইয়া যায় চিরবাঞ্ছিত সাগর-সঙ্গমে।···

কুলদানন্দের সাধনপূত সারা অন্তর তাই আজ বিজয়কৃষ্ণের শক্তিসঞ্জাত দিব্য অনুভূতিতে ভরপুর। সাগর মাঝে বিলীন মহানদীর বক্ষে আজ আর নাই কোন বিক্ষোভ। চক্ষের সম্মুখেই তিলে তিলে মর্তলীলা সংবরণ করিলেন ভগবান শ্রীগুরুদেব। আর, তিনি অটল ধৈর্যের সহিত বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিলেন সমস্ত আঘাত। কলিজার ধন

হারাইয়া বাহিরে হইলেন সর্বহারা ফকির ; কিন্তু নিভৃত অন্তরে হৃদয়-দেবতাকে একান্ত আপনার রূপে বরণ করায় তিনি আজ রাজ-রাজেশ্বর।···ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে ইষ্টদেব প্রতিষ্ঠিত বিপুল মহিমায়—সেই হৃৎপদ্মে বিজয়কৃষ্ণের আজ নিত্য অধিষ্ঠান।···কুলদানন্দ প্রতিনিয়ত দর্শন করেন শ্রীগুরুর দিব্য মূর্তি,···শ্রবণ করেন তাঁহার অমিয়বাণী,···আঘ্রাণ করেন তাঁহার ঘন-সান্নিধ্যের পদ্মগন্ধ,···আস্বাদন করেন মহাপ্রসাদের রসামৃত,···আর স্পর্শ করেন দেবদুর্লভ চরণপদ্ম !···ধ্যানে, জ্ঞানে, নিদ্রায়, জাগরণে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে দেহ-মন-প্রাণ, তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব এখন শুধু শ্রীগুরু মহিমায় আনন্দময়।···

ইহাই নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের জীবনে লোকোত্তর সাধনা ও গুরুসেবার সুদুর্লভ পুরস্কার। উত্তরকালে মহাসিদ্ধি লাভের পথে ইহাই তাহার বিচিত্র সার্থক প্রস্তুতি।···

গুরুদেবের দেহান্তে কোথায় কীভাবে সাধন-ভজন করিবেন একদা জিজ্ঞাসা করেন কুলদানন্দ। গোসাঁইজী বলেন—কোন তীর্থে বা নির্জন পর্বতে, যেখানে মন চায়।···কিন্তু কোন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া যান নাই।

সাধন গ্রহণের পর হইতে গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত একপদও কখনও অগ্রসর হন নাই। আজো তাঁহার জীবন-প্রবাহ কীভাবে কোন্ পথে ধাবিত হইবে, সেজন্য নির্ভর করিয়া রহিলেন অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত গুরুনির্দেশের উপর। নিত্যক্রিয়া, পাঠ-পূজা, সাধন-ভজন সবকিছু সমর্পণ করিলেন শ্রীগুরুর উদ্দেশে।

প্রথমে পুরীধাম হইতে গমন করেন কাশীধামে। কিন্তু দেহ অসুস্থ হইয়া পড়িল। সাধন-ভজনেও মন বসিল না, চিত্তে জাগিল না প্রকৃত আনন্দ। অকারণ চঞ্চলতায় নানাদিকে ঘুরিতে থাকেন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। অবশেষে গেলেন কনখলে বড়দাদার কাছে। হরকান্ত তখন হরিদ্বার সিভিল লাইনের সহকারী সার্জেন। এখানে কিছুদিন সাধন-ভজন করিয়া আনন্দলাভ করেন কুলদানন্দ।

এই সেই হরিদ্বার। সাধন-জীবনে এখানেই তাঁহার প্রথম সার্থক পদক্ষেপ। চণ্ডীমায়ের পাদমূলে বিরহ-দহনে হৃদয়ে জাগে মিলন সঙ্গীত। নিভৃতে সঙ্গোপনে অন্তরের মণিকোঠায় বড় সাধের প্রথম গুরুবরণ।···তারপর বিরহে মিলনে কতদিন কত না মুহূর্ত অশ্রুধারায় অভিষিক্ত,···প্রেমরসে সঞ্জীবিত।···ভাবিতে ভাবিতে আঁখিকোণে টলটল করে অশ্রুবিন্দু,···মনের গহনে ডুবিয়া যান কোন্ অতল তলে।···

একদিন স্বপ্ন দেখিলেন: পুরীধামের সমাধি-মন্দির হইতে যেন হাত ইসারায় গোসাঁইজী ডাকিতেছেন—কুলদা, এখানে এস।···স্বপ্নটী বিশেষ রেখাপাত করিল না তাঁহার অন্তরে। মনে হইল: সত্যই যদি পুরী যাত্রা করাই গুরুদেবের নির্দেশ, তবে তিনি দেখা দিয়া প্রত্যক্ষ আদেশ না করা পর্যন্ত স্বপ্ন সত্য বলিয়া মানিবেন না।

এইভাবে গত হইল আরো কিছুদিন। পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন: গোসাঁইজী যেন নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিয়া সিক্তদেহে উঠিতেছেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমার কাপড়খানা এনে দেও।···স্বপ্ন-যোগে ইহাও পুরী যাইবার ইঙ্গিত; তবু দ্বিধাবোধ করিলেন কুলদানন্দ।

একদিন আনমনে এইসব কথা ভাবিতেছেন। সহসা একজন অলক্ষ্যে চপেটাঘাত করিল তাঁহার বাম গণ্ডে—সর্বাঙ্গে প্রহার করিয়া ধরাশায়ী কবিল।···এইভাবে কে প্রহার করিল, কেন করিল—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। লোকটীকেও দেখিলেন না—নিরুপায়ে পড়িয়া রহিলেন ভূমিতলে। সেই অবস্থায় বাম পায়ে আবার কামড়াইয়া দিল ভীষণ পাহাড়ী বিছা। সুতীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।···

সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন হরকান্ত। নানাপ্রকার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিনদিন অবিরাম চেষ্টার পর গুরুকৃপায় সুস্থ হইলেন কুলদানন্দ।

ভাবিতে লাগিলেন—কেন এমন হইল?···মনে পড়িল স্বপ্ন দুইটীর কথা। বুঝিলেন গুরু-আদেশ অমান্য করিবার জন্যই আজ এই কঠোর দণ্ড।···

বড় দাদাকে সব জানাইলেন। তিনিও পুরী যাইবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া আছে হরিদ্বারের চণ্ডীপাহাড়। তাঁহার সাধন-জীবনে প্রথম সার্থকতা লাভের পুণ্য পীঠস্থান। তবু, পুনরায় রওনা হইলেন পুরীধাম।

বরদাকান্তজী তখন গয়ার উকিল। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য পথে গয়াধামে নামিয়া তাঁহার বাসায় গেলেন কুলদানন্দ।

ইচ্ছা ছিল তুইদিন বিশ্রামের পর পুরীধামে যাত্রা করিবেন। এমন সময় দেখিলেন আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বপ্ন ঃ গয়ার নিকটবর্তী কোন পাহাড়ে নির্দিষ্ট একটি স্থান দেখাইয়া দিয়া যেন গোসাঁইজী বলিলেন—এখানে বসে সাধন-ভজন কর।···স্বপ্নে এই স্থানটীর দৃশ্য পরিষ্কার দেখিলেন। পূর্বে আর কখনও গয়াধাম দর্শন করেন নাই ; তবু স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন কোন আশ্রম সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন।···

স্বপ্নের কথা বলিলেন বরদাকান্তজীকে। বাল্যজীবনের প্রধান প্রতিবন্ধক আজ সিদ্ধির পথে পরম সহায়। ক্ষীণতোয়া নিঝ'রিণী বাধার মধ্য দিয়াই ছুটিয়া চলে স্রোতস্বিনী রূপে।···প্রাণের ভাইকে লইয়া সাগ্রহে পাহাড়ে গেলেন বরদাকান্তজী।

স্বপ্নদৃষ্ট স্থানটী আবিষ্কার করিয়া বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না কুলদানন্দের। পুরী যাওয়া বন্ধ হইল—এবার স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত গুরুনির্দেশ গ্রহণ করিলেন গভীর শ্রদ্ধায়। স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন স্থানটী অবিকল সেইরূপ।

আকাশগঙ্গা পাহাড়। এইস্থানে দীক্ষালাভ করিয়া এগার দিন সমাধিস্থ ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। সেই পুণ্যক্ষেত্রেই শ্রীগুরুর আদর্শে শিষ্যের জীবনে আজ সিদ্ধিলাভের সার্থক পুনরাবৃত্তি।···

এখানে সাধন-ভজন করিতে খুব উৎসাহ দিলেন বরদাকান্তজী। প্রথমে তাঁহার বাসায় থাকিয়া কুলদানন্দ দিবাভাগে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সাধন-ভজন আরম্ভ করেন। গোস্বামী প্রভুর তিরোধানের

পর দারুণ বিরহতাপে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান সাঙ্গ হইল—এই পুণ্যধামে তিনি ব্রতী হইলেন কঠোর সাধনায়।

অদূরে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিম্নে কপিলধারায় নামানন্দে নিমগ্ন ছিলেন মহাত্মা গম্ভীরনাথজী। তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল বরদাকান্তের। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের পরিচয় পাইয়া গম্ভীরনাথজী সানন্দে সাধুবাদ জানাইলেন। বলিলেন: সাধনের পক্ষে এস্থান বড়ই অনুকূল—এখানে সাধন করলে সত্যি যথেষ্ট উপকার পাবে।··· শুনিয়া খুবই অনুপ্রাণিত হইলেন কুলদানন্দ।

তাঁহাকে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেন গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্, স্বনামধন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা, স্বর্গত প্রকাশ চন্দ্র রায় মহাশয়। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তখন হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের বড়ই উপদ্রব। সেখানে কুলদানন্দের জন্য রঘুবর দাস বাবাজীর পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটিরের উপর দোতলা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন রায় মহাশয়।

কুটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে মেজদাদার বাসা হইতে কুলদানন্দ চলিয়া আসিলেন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে। শুভ মুহূর্তে গুরুদেবের সিদ্ধপীঠে স্থাপন করিলেন তপস্যার আসন,···প্রবৃত্ত হইলেন অবিরাম নিরলস সাধন-ভজনে।···মনে হইল স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত গুরুনির্দেশ ভাবী সিদ্ধিলাভের নিশ্চিত সোপান। প্রতিপদে কৃপাসিন্ধু গুরুদেবের কৃপাবর্ষণের কথা স্মরণ করিয়া নিমগ্ন হইলেন অনাবিল আনন্দে। উপলব্ধি করিলেন গুরুদেব আছেন তাঁহার কাছে কাছে,···তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই।···

আকাশগঙ্গায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একটানা সাধনা চলিল কুলদানন্দের।

পাহাড় হইতে একবারও নামিতেন না সপ্তাহের প্রথম ছয়দিন। শেষে একদিন মাত্র যাইতেন মেজদাদার বাসায়। মেজদাদা ও উপস্থিত গুরুভ্রাতাদের সহিত দিনটী কাটিয়া যাইত গুরুদেবের নানা মধুর প্রসঙ্গে। সপ্তাহের চাল, ডাল, আটা, লবণ সব কিছু পরম সমাদরে গোছাইয়া

দিতেন মেজ বৌঠাকুরাণী। সেই স্নেহের দান সানন্দে গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন সাধন-কুটিরে।

একদিন রাত্র এগারোটায় বরদাকান্তের এক পুত্র আক্রান্ত হইল কলেরা রোগে। নিদারুণ উদ্বেগে তাহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন সকলে। কুলদানন্দকে খবর দেওয়ার কথা কাহারও মনেই ছিল না। অনেক চেষ্টার পর শেষরাত্রে কিছুটা সুস্থ বোধ করিয়া রোগী ঘুমাইয়া পড়িল।

পাশে বসিয়াছিলেন বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা লাবণ্য দেবী। খোলা জানালা দিয়া দেখিলেন অন্ধকারে দ্রুতপদে আসিতেছেন কুলদানন্দ। ত্রস্তপদে তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন।

ব্যগ্রকণ্ঠে শুধাইলেন কুলদানন্দ ঃ খোকা কেমন আছে?

ঃ এখন একটু ভাল। কিন্তু···আপনাকে তো খবর দেওয়া হয়নি, কাকাবাবু—আপনি খোকার অসুখ জানলেন কী করে?

ঃ বারে—আমি জানব না? সারারাত যে ওর জন্যে যুদ্ধ করলাম।···

লাবণ্য হতচকিত। কুলদানন্দ ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। দারুণ শীতেও তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত···ক্ষত-বিক্ষত।···সকলের আগ্রহে তিনি বলিলেন নিজের যুদ্ধের কথা ঃ রাত্রে আসনে বসে আছি হঠাৎ দেখি কে একজন খোকাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।···ছুটে গিয়ে পথে রুখে দাঁড়ালাম। সুরু হল তুজনের ধস্তাধস্তি—প্রায় সারারাত্রি সেই যুদ্ধ চলল। প্রথমে ইষ্টনামের সাহায্য নিই নি—শেষে গুরুদেবকে স্মরণ করে দ্বিগুণ জোরে তাকে চেপে ধরলাম। পরে দেখি সেই তুর্বৃত্তও নেই, খোকাও নেই। বুঝলাম গুরুদেবের কৃপায় আর নামের মাহাত্ম্যে খোকা বেঁচে গেল।···

এই অলৌকিক ঘটনায় সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বস্তুত, কুলদানন্দের দিব্য বিভূতির ইহাই প্রথম প্রকাশ।···

তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পাহাড়ে ফিরিতে দেওয়া হইল না। ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন সাধন-কুটিরে।

অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামে কুলদানন্দ ছিলেন বজ্রকঠোর। এই বাহ্যিক কঠোরতা লইয়া অনেকে নানা সমালোচনা করিতেন। অন্তরঙ্গভাবে মিশিলে তাঁহারাও বুঝিতেন, তাঁহার অন্তর ছিল সত্যই কুসুম-কোমল। দুষ্কৃতকারীও অকপটে অপরাধ স্বীকার করিলে তাঁহার অন্তরে জাগিত গভীর মমতা ও সহানুভূতি। নানাভাবে কৃপা প্রকাশে তাহাদের চরিত্র আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিতেন।

আকাশগঙ্গার নির্জন শাপদসঙ্কুল পরিবেশে সাধনকালে দেখা দেয় নানা উপদ্রব। তাঁহার সোদরপ্রতিম বন্ধু ও সতীর্থ শ্রীমৎ কিরণচাঁদ দরবেশজী এই সাধন-ভজন সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি লিখিয়াছেন: তিনি (কুলদানন্দ) যখন গয়ার পাহাড়ে সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে সেখানকার বদমায়েস গুণ্ডাদের দ্বারা নানাভাবে উত্যক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অসাধারণ ধৈর্য, সহানুভূতি ও যোগৈশ্বর্য প্রদর্শনে গুণ্ডাদলটীকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

কুলদানন্দের তখন নিরালম্ব ভাব—সমস্ত ভার একমাত্র ভগবান গুরুদেবের উপর ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত। নামানন্দে, কঠোর সাধনায় অহোরাত্র নিমগ্ন।

দস্যুরা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে উপস্থিত হইত সেই নির্জন, দুর্গম পাহাড়ে। দেখিত একজন সাধু সেখানে সর্বদাই সমাসীন। পাছে তিনি পুলিশে খবর দেন এই আশংকায় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল তাহারা। নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া কুলদানন্দকে বিতাড়িত কবিবার চেষ্টা করিল। সব ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিল। একদা রাত্রে জনৈক দস্যু লাঠিহস্তে পার্শ্ববর্তী বেলগাছ তলায় লুকাইয়া রহিল সুযোগের প্রতীক্ষায়। সহসা পার্বত্য বৃশ্চিক-দংশনের তীব্র জ্বালায় তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। দস্যুর উদ্দেশ্য বুঝিলেও তাহার দুঃখ যন্ত্রণায় বিগলিত হইল কুলদানন্দের হৃদয়। ঔষধ দিয়া দুর্বৃত্তকে তিনি সুস্থ করিলেন।

দস্যুদের চৈতন্য হইল না। একদিন কয়েকজন কুলদানন্দের কুটির পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া রহিল। সহসা দেখিল তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে ভীষণকায় এক চিতাবাঘ। নিরুপায়ে তাহারা কুলদানন্দের কাছেই প্রাণরক্ষার সকাতর প্রার্থনা জানাইল। বিনা দ্বিধায় কুলদানন্দও নিজ কুটির মধ্যে তাহাদের আশ্রয় দিলেন।

তবুও শান্ত হইল না স্বার্থান্ধ দস্যুগণ। আর একজন একদা নিশীথে তরবারি হস্তে কুটিরদ্বারে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিল। শেষরাত্রে শৌচে যাইবার জন্য বাহিরে আসিলেন কুলদানন্দ। সুযোগ বুঝিয়া দস্যুটী বৃক্ষ হইতে নামিতে উদ্যত হইল। অমনি প্রকাণ্ড এক অজগর বৃক্ষের শাখার সহিত বেড়িয়া ধরিল তাহার সর্বাঙ্গ। দস্যুটা আর্তনাদ করিয়া উঠিলে সেই বৃক্ষতলে আসিয়া ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কুলদানন্দ। আর, দস্যুকে বন্ধনমুক্ত করিয়া অজগর অদৃশ্য হইল। দস্যুসর্দার ভাবিল দুর্বলতা বশতই সঙ্গীদের এই ব্যর্থতা। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে এবার সদলবলে কুটিরদ্বারে উপস্থিত হইল সে নিজেই। রূঢ়কণ্ঠে কুলদানন্দকে দরজা খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। নির্ভয়ে দুয়ার খুলিলেন কুলদানন্দ। দস্যুসর্দার লংকট সিং নানা ভয় দেখাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে সেস্থান পরিত্যাগ করিবার নির্দেশ দিল।

নির্ভীক অবিচল কণ্ঠে কুলদানন্দ বলিলেন: ভগবানের আদেশে আমি এখানে ভজনে ডুবে আছি। আমার দ্বারা কারো কোন অনিষ্ট হবার ভয় নেই। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও—আমাকেও আমার কাজ করতে দাও। মনে রেখ আমি নিরস্ত্র নই,···আমাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য।···

ঝুলি হইতে একটী থার্মোমিটার বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিলেন কুলদানন্দ। দস্যুরা সভয়ে দেখিল একটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো ক্রমশ অগ্রসর হইয়া চোখমুখ ঝলসাইয়া দিতেছে।···মনে হইল এখনই বুঝি তাহাদের পোড়াইয়া মারিবে। নিরুপায়ে কুলদানন্দের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল দস্যুসর্দার।

সেইদিন হইতে আর কখনও উপদ্রব করে নাই তাহারা। বরং কুলদানন্দের সেবা করিবার চেষ্টা করিত সর্বপ্রকারে।

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের তেজোময় জ্যোতি ও দীপ্ত প্রভাবে অভিভূত হন শিবদাস নামে এক বলিষ্ঠ সাধু। স্বয়ং শঙ্কর অবতার জ্ঞানে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন—গুণ্ডা, হিংস্র জন্তু প্রভৃতির উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্তে সাধনা করিতে সাহায্য করেন। গুরুদেব কর্তৃক প্রেরিত মনে করিয়া শিবদাসকে স্নেহযত্ন করিতেন কুলদানন্দ, শিবদাসের সাধন-জীবনের উন্নতি বিধানে সাহায্য করেন।

কুলদানন্দ তখন কী ভাবে সাধন-ভজনে দিন কাটাইতেন তাঁহার স্বহস্তলিখিত নিম্নের কর্মতালিকা হইতে জানা যাইবে ঃ

রাত্রি ১টা হইতে ২টা—নাম ধ্যানাদি।
২টা ,, ৪টা—ন্যাস্, প্রাণায়াম, কুম্ভকাদি।
৪টা ,, ৫টা—হোম, আরতি, গান আদি।
৫টা ,, ৬টা—শৌচ, স্নান, সন্ধ্যাদি।
৬টা ,, ৭টা—অনিমেষ সাধন।
৭টা ,, ৮টা—চা-পান ও নাম সাধন।
৮টা ,, ৯॥টা—গায়ত্রী জপ ও আহুতি পূজা।
৯॥টা ,, ১১টা—পাঠ (চরিতামৃত, চণ্ডী ইত্যাদি)
১১টা ,, ১২টা—স্নান, সন্ধ্যা ইত্যাদি।
১২টা ,, ১টা—হোম ও নাম ইত্যাদি।
১টা ,, ২টা—বিশ্রাম, ডায়েরী পাঠ ও নকল।
২টা ,, ৩টা—নাম ও আহুতি দান।
৩টা ,, ৩॥টা—প্রাণায়াম ইত্যাদি।
৩॥টা ,, ৪টা—অনিমেষ সাধন, নাম।
৪টা ,, ৫॥টা—ভ্রমণ, সাধুসঙ্গ বা বিশ্রাম।
৫॥টা ,, ৬॥/৭টা—স্নান, সন্ধ্যা, আরতি।
৭টা ,, ৮টা—আহারের চেষ্টা, হোম।
৮টা ,, ৯টা—বিশ্রাম ও জপ ইত্যাদি।
৯টা ,, ১টা—নিদ্রা।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর প্রত্যহ চলিত একটানা কুড়ি ঘণ্টা এই নিত্যক্রিয়া ও সাধন-ভজন। এই তালিকা মহাসাধকের সুমহান সাধনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—যে কোন সাধক ও কর্মবীরের নিকট উজ্জ্বল আদর্শ। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে এই নিয়মানুবর্তিতা সত্যই অভাবনীয়···

সাধনকালে নানা অলৌকিক দৃশ্যাদি দর্শন করিতেন, নানা তত্ত্বের উপলব্ধি হইত। অনেক ক্ষমতাশালী সাধুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মাঝে মাঝে গম্ভীরনাথজীর নিকট গিয়া বসিতেন। তাঁহার সঙ্গে একটী কথাও হইত না, পাশাপাশি উভয়ে নিমগ্ন থাকিতেন মধুর নামানন্দে। তাঁহার উপর সর্বদা পরম স্নেহময় দৃষ্টি ছিল গম্ভীরনাথজীর!

আকাশগঙ্গা পাহাড়-শীর্ষে নির্জনে ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী সূক্ষ্মদেহে আসিয়া গোস্বামী প্রভুকে দীক্ষাদান করেন। সেকথা নিয়ত স্মরণ করিয়া অনুপ্রাণিত হইতেন কুলদানন্দ। এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিটি প্রস্তরে যেন দর্শন করিতেন গুরুদেবের শ্রীচরণ-চিহ্ন, আকাশে বাতাসে অনুভব করিতেন তাঁহার সূক্ষ্ম অস্তিত্ব।···এই পরম পবিত্র স্থানটী চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার আন্তরিক ইচ্ছা জাগে তাঁহার প্রাণে। ফলে গোসাঁইজীর দীক্ষাস্থানে বরদাকান্তজী একখানি প্রস্তরে খোদাই করিয়া লিখিয়া রাখেন: ওঁ—এইস্থানে মানস সরোবরের ব্রহ্মানন্দ পরমহংস শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজিকে দীক্ষা প্রদান করেন। জয়গুরু ওঁ। ১২৯০।···সেইস্থানে আজো প্রস্তরখানি স্থাপিত আছে। পরে কুলদানন্দের গুরুভ্রাতা মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রভৃতির উদ্যোগে ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর নির্মিত হয় একটি ক্ষুদ্র মন্দির। পরবর্তী কালে নানাভাবে স্থানটির সংস্কার সাধন করেন কাশী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা মহান্ত শ্রীশ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ মহারাজ। সুন্দর মন্দির ও নাটমন্দির প্রভৃতি নির্মিত হয় এবং ঐ স্থানে প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় বহু গোসাঁইগণের উপস্থিতিতে মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

অনেক প্রিয় গুরুভ্রাতারা মাঝে মাঝে পাহাড়ে তাঁহার নিকট গিয়া থাকিতেন। প্রাতঃকৃত্যের পর তাঁহাদের রান্না করিয়া খাওয়াইতেন কুলদানন্দ। স্বহস্তে রান্না করিয়া অপরকে পরিতোষ পূর্বক খাওয়ানো তাঁহার একটী বিশেষত্ব।

তাঁহার গুরুভ্রাতা হেমেন্দ্র গুহরায় মহাশয় লেখেন: ব্রহ্মচারী নিজে অতি সংক্ষেপে মাত্র ভাতে-সিদ্ধ ভাত বা ধুনিতে সেঁকিয়া দুই-তিনটী টিক্কর খান; কিন্তু আমরা কখনও গেলে পরিপাটী করিয়া নানা ব্যঞ্জনসহ আমাদের খাদ্য পরিবেশন করেন। সমস্ত বস্তুই তাঁহার হাতের কাছে কুলুঙ্গিতে গোছান থাকে, আসন হইতে উঠিতে হয় না। অবিরাম নাম-সাধনে মগ্ন থাকেন। সাক্ষাৎ মহাদেবের মত রূপ, যেন সর্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি ফুটিয়া পড়িতেছে। তাঁহার গাত্র হইতে এমন মনমাতান পদ্মগন্ধ বাহির হইত যে আমরা সেই সুগন্ধে নামের নেশায় মাতিয়া উঠিতাম। কুটিরের সমস্ত আবহাওয়া যেন নামে ভরপুর মনে হইত। তাঁহার সাধন প্রভাবে আমরা অভিভূত হইয়া নামানন্দে বুঁদ হইয়া থাকিতাম। তাঁহার মধুর ভাব, সুমধুর আলাপ-আলোচনা, তাঁহার প্রেমপ্রীতি আমাদিগকে ভগবৎভাবে অনুপ্রাণিত রাখিত। তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে যেন বুকটা ফাটিয়া যাইত, মনে হইত যেন যুগযুগান্তরের জন্ম-জন্মান্তরের এক বিশিষ্ট বন্ধু ও আপন জনকে ছাড়িয়া যাইতেছি।...

বোলপুরের উকিল তাঁহার সতীর্থ হরিদাস বসু মহাশয় তাঁহার "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা" পুস্তকে লিখিয়াছেন: শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় এই পাহাড়ে একাকী থাকিতেন। তাঁহার অযাচক বৃত্তি। প্রত্যহ ঝরণার জলে দুই-তিনবার স্নান করিতেন। দিবারাত্র সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিতেন। অপরাহ্নে বরদাবাবুর বাসা হইতে কিছু খাবার আসিত, তিনি তাহাই একবার মাত্র আহার করিতেন। তাঁহার শরীরের জ্যোতি, সাধনের অনুরাগ ও তীব্রতা এবং তন্মধ্যে গুরুশক্তির প্রভাব দেখিয়া আমি পরম পুলকিত হইতাম। তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধনে অনুরাগ দেখিয়া আমি তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ দিতাম।...

কুলদানন্দজীর কঠোর সাধন-ভজনের প্রধান প্রত্যক্ষদর্শী পরমহংস স্বামী কৈশবানন্দ সরস্বতী মহারাজ লিখিয়াছেন : ব্রহ্মচারীর তখনকার কঠোর তপস্যা, অবিরাম নাম সাধন, ভগবৎ নির্ভরতা দেখিয়া আমরা অনুপ্রাণিত হইতাম। সেই সময় তাঁহার তেজোদীপ্ত অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। জীবনে তাঁহাকে কখনও কোন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই কখনও পরনিন্দা পরচর্চ্চার প্রশ্রয় দিতেন না ; বরং সকলের গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিন্দাকারীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। বিপথগামী গুরুভ্রাতাদের পরম সহৃদয়তা সহকারে শ্রীগুরুর সঙ্গলাভের সুযোগ করিয়া দিতেন যাহাতে তাঁহারা শ্রীগুরুর পুণ্য প্রভাবে সুপথে আসেন। আমার নিজের জীবন তাহার সাক্ষ্য। তাঁহার মত ভ্রাতৃভক্তি এ যুগে বিরল। উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সহোদর-দিগকে সাতবার পরিক্রমা করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদের সেবা করা তাঁহার সহজাত গুণ ছিল। তাঁহার মত উদার প্রাণ, সদানন্দময়, পরম দরদী, ভ্রাতৃ-বৎসল বন্ধু পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম।···

কুলদানন্দের প্রতি পুনরায় ভিক্ষা করিবার প্রত্যাদেশ হইল। বরদাকান্তজীর বাসা হইতে আহার্য-দ্রব্যাদি লওয়া বন্ধ হইল, আবার ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভজন স্থান হইতে গয়া সহর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। সাধনকালের শেষদিকে ভিক্ষার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া সহরে যাইতে অনেক সময় লাগিত। অনেক দিন ভিক্ষায় যাইবার সময় হইয়া উঠিত না। অথচ দৈনিক ভিক্ষা ভিন্নই বা উপায় কী ?

একদিন কুলদানন্দ দেখিলেন একটি ডুমুর গাছে অনেক ডুমুর ফলিয়াছে। ডুমুর পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়া সহসা যেন এক ধাক্কায় নীচে পড়িয়া গেলেন। রীতিমত আঘাত পাইলেন, কিন্তু শিক্ষা পাইলেন আরো বেশী। বুঝিলেন আহারের জন্য নিজস্ব কোন চেষ্টা আর চলিবে না।···

নিতান্ত অন্তরঙ্গ বারোজন বন্ধুর নিকট মাসিক মাত্র চারি আনা হিসাবে ভিক্ষা পাইবার আবেদন জানাইলেন। ভাবিলেন এইভাবে মাসে তিন টাকা সংগ্রহ হইলেই চলিয়া যাইবে, প্রত্যহ আসন ত্যাগ করিয়া অত দূরে আর ভিক্ষায় যাইতে হইবে না। বন্ধুদের সকলেই বেশ ধনী—কেহ বা লক্ষপতি, এমন কি জমিদার। অথচ মাসিক মাত্র চারি আনা ভিক্ষা পাওয়া দূরে থাক, কাহারও নিকট হইতে চিঠির জবাব পর্যন্ত আসিল না।

কুলদানন্দের মনে পড়িল গুরুদেবের কথা। তাঁহার ছিল সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি—কাহারও নিকট কোন কিছু চাওয়া বা সঞ্চয় করা তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ। মাতৃস্তনে আছে শিশুর খাদ্য, তাই তো শিশুর চিত্ত ভাবনাহীন। তেমনি নর-নারায়ণের অন্তরে আছে সাধু-সন্ন্যাসীর সেবার যোগ্য উপাদান। সাধক ভাবেন ভগবানকে, তাই ভগবানও ভাবেন তাঁহাদের কথা। এই অটল বিশ্বাসে যুক্তযোগী পরম নিশ্চিন্তে সর্বদা নিমগ্ন অসীমের ধ্যানে। গোস্বামী প্রভুর সেই অপূর্ব আত্ম-সমর্পণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কুলদানন্দ। আজ ধারণা হইল নিজের সাধন-জীবনেও সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ গুরুদেবের অভিপ্রেত। তাঁহার ভিক্ষা করা বন্ধ হইল—আহারের জন্য একমাত্র গুরু-গোবিন্দের উপর নির্ভর করিয়া মগ্ন রহিলেন তাঁহারই ধ্যানে।···

আকাশবৃত্তি অবলম্বনের পরদিনই জনৈক গোয়ালা এক সের দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত। তাহার নিকট হইতে কুলদানন্দ গ্রহণ করিলেন মাত্র এক পোয়া দুগ্ধ। পরদিন অনেক জিনিষপত্র লইয়া হাজির হইল এক মাড়োয়ারী। তাহার নিকট হইতেও প্রয়োজন মত যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে প্রত্যহ নানা খাদ্যসামগ্রী আসিতে লাগিল—সমস্তই কুলদানন্দের সেবায় লাগাইবার জন্য সকলের কী গভীর কাকুতি।·· অগত্যা নিজের জন্য যৎসামান্য রাখিয়া বাকি সবই দান করিতে লাগিলেন। মনে হইল ঠাকুরের কী বিচিত্র মহিমা—'যোগক্ষেমং বহাম্যহং'। ··একদা চোখের জলে নিবেদন করিলেন: ঠাকুর, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা অবধি একটা দিনও উপবাসী থাকতে দিলে না? ··

সাধনমার্গে অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যানমগ্ন থাকিবার পথে অনেক অন্তরায়। আহার, নিদ্রা, গ্লানি ও অবসাদ সেই অন্তরায়ের হেতু। এইসব সাময়িক বাধা-বিচ্যুতি অতিক্রম করিয়া ভগবৎ-ধ্যানে নিমজ্জিত হইবার প্রচেষ্টাই যুঞ্জনযোগীর অবস্থা। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভগবৎলাভের প্রেরণায় সাময়িক বাধা-বিচ্যুতি সাধকের নিকট অসহ্য। যুক্তযোগীর ন্যায় অহোরাত্র প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে অনন্ত প্রেমময়ের সুমধুর সঙ্গসুধা সম্ভোগ করিতে তাঁহারা উন্মুখ।···শ্রীগুরুদেবের অবিরাম সান্নিধ্যে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ এতদিন উপলব্ধি করিয়াছেন যুঞ্জনযোগীর সমস্ত অবস্থা। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ উদগ্র হইয়া উঠিল—দেখা দিল যুক্তযোগীর দিব্য-মধুর প্রেরণা। প্রতিনিয়ত সেই বর্ণনাতীত অবস্থা সম্ভোগ করিবার জন্য তিনি নিমজ্জিত হইলেন ঐকান্তিক সাধনায়।···

সাধন-জীবনে কুলদানন্দ প্রথম সার্থকতা লাভ করেন চণ্ডী পাহাড়ে। এবার আকাশগঙ্গায় অগ্রসর হইলেন মহাসিদ্ধির পথে। সেই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভের পথে গুরুদত্ত নাম-সাধনই তাঁহার প্রধান পাথেয়। পাঠ-পূজা, সন্ধা-আরতি, হোম-আহুতি, ন্যাস-প্রাণায়াম, কুম্ভক ও অনিমেষ সাধন—আর সবই এখন তাঁহার নিকট নাম-সাধনার আনুষঙ্গিক অঙ্গ। অন্য কোথাও যাওয়া দূরে থাক, নিতান্ত প্রয়োজনেও আসন ত্যাগ করিতেই সারা অন্তর বিমুখ।···দিবানিশি মধুর নামের নেশায় তিনি বিভোর।···মনপ্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, গহন অন্তর্লোকের অবচেতন সত্তা নিবিড় নামানন্দে নিবিষ্ট, আত্ম-সমাহিত।···পাতাল-গঙ্গার পুণ্য সলিলে সম্পন্ন হয় তাঁহার স্নান ও আচমন। কত মহাপুরুষের নিঃশ্বাসপূত আকাশগঙ্গার আকাশে বাতাসে তরঙ্গিত তাঁহার প্রাণায়াম ও কুম্ভক।·· ঐশী প্রেরণায় উন্মাদ কত মহাঋষির লীলাক্ষেত্র এই মহাতীর্থেই স্থাপিত তাঁহার তপস্যার আসন।···গুরুদেব ভগবান বিজয়কৃষ্ণের পুণ্যপ্রভাবে, আর্যঋষিদের ভগবৎ প্রেরণায় উদ্বেলিত হইয়া ওঠে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সাধন-সমুদ্র।···

সাধন-ভজনের দিক দিয়া দেবভূমি হিমালয়ের পরই আকাশগঙ্গা পাহাড়ের স্থানপ্রভাব সত্যই অনস্বীকার্য। গাম্ভীর্যে, নির্জনতায় ও

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এই পুণ্যধাম সাধনের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। ঊর্ধ্বে সুনীল অনন্ত আকাশ, চতুর্দিকে সুসজ্জিত পর্বতমালা, নিম্নে পাতাল-গঙ্গার সুমধুর সঙ্গীত, বৃক্ষপল্লবে মলয় হাওয়ার মর্মরধ্বনি। এই স্থানের প্রশান্ত গাম্ভীর্যে স্বতই মনপ্রাণ উদাস হইয়া আসে—নয়ন হয় নিমীলিত, চিত্ত হয় শান্ত-সমাহিত।···হিন্দুদের প্রধান তীর্থ ও তপোভূমি এই গয়াধাম—গয়াসুরের মস্তকোপরি বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান একটী প্রধান পারলৌকিক ক্রিয়া। ভগবান বিজয়কৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করেন গয়াধামে। এই পুণ্যক্ষেত্র হইতেই প্রথম প্রবাহিত হয় কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির সুরধুনী।···

সর্বদিক দিয়া এই পুণ্যধামের মাহাত্ম্য সাধক কুলদানন্দের সিদ্ধি-লাভের পথে ছিল সমধিক কার্যকরী। এমনি অনুকূল পরিবেশে প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া চলিল তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা।

সাধনপথে ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্তিলাভের পর ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে অমৃত লাভ হয় বটে; কিন্তু পরমামৃত লাভের অবস্থা তাহা হইতেও উন্নততর ও পূর্ণতর—তাহাই মানবাত্মার চরম সার্থকতা। হৃদয়-সমুদ্র হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ রূপ অমৃত উত্থিত হইলেও মন্থনকার্য চলিবে অব্যাহত গতিতে। অন্তর ও সর্বেন্দ্রিয় হইবে ব্রহ্মভাবে ভাবিত—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সর্বাবস্থায় সমস্ত হৃদয় হইবে অমৃতময়।··· সাধারণতঃ যোগ, জ্ঞান ও প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া মহাপুরুষেরা লাভ করেন মহাসিদ্ধি; কিন্তু প্রধানত শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত ইষ্টনাম সাধনের মাধ্যমেই অমৃতের পুত্র নীলকণ্ঠ কুলদানন্দ অগ্রসর হইলেন সেই পরমামৃত লাভের পথে।···

যোগিরাজ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর অমর সাধনা ও মহাসিদ্ধি সাধারণের ধারণাতীত। তবু সে সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভের জন্য সাধনা সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপরিহার্য।

প্রথমে স্মরণীয় গোস্বামী প্রভুর উপদেশ: ···এক-একটি প্রণালী ধ'রে চলতে হবে। প্রথমে 'এই দেহই আমি' এই জ্ঞান ভেদ করে

শরীরতত্ত্ব জানবার জন্য প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা ইত্যাদি করতে হয়। যিনি তা না করেন তিনি দেহ ও আত্মা যে কী পদার্থ তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করতে পারেন না। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব জানলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়—তখন 'আর সব কিছুই নয়, ব্রহ্মই সব' এই বোধ হয়। পরে আমি এবং ব্রহ্ম এক কি ভিন্ন তা জানবার জন্য যোগ অভ্যাস করা দরকার। এ যোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নয়, আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন। যথার্থ যোগসাধন হ'লে ভগবান কী রূপে জগতে বিরাজ করেন তা প্রত্যক্ষ হয়। তখন ইহলোক পরলোক এক হ'য়ে যায়। পুরাকালে ঋষিরা এই ক্রম অনুসারে সাধনের অবস্থা লাভ করেছেন।···

শাস্ত্র অনুসারে সাধনার এই ক্রম সাতটী স্তরে বিভক্ত: শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী ও তুর্যাগা। সদসৎ বিচারের ফলে এই ধারণা জন্মে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বস্তুই অনিত্য। শমদমাদি অভ্যাসের ফলে চিত্ত অনেক পরিমাণে শুদ্ধ হয়--নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায় সংসার হইতে মুক্তিলাভ জীবনের চরম লক্ষ্য। সকল দুঃখের অবসানে পরানন্দ সম্ভোগের ব্যাকুল আগ্রহে জাগে মোক্ষলাভের আকুতি—তখন লাভ হয় জ্ঞানের প্রথম ভূমি 'শুভেচ্ছা'। তাহা লইয়া গুরুর শরণাপন্ন হন জ্ঞানভিক্ষু সাধক, গুরুনির্দেশে যম, নিয়ম ও বহিরঙ্গ সাধনায় শুদ্ধ হয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। তিনি অভ্যাস করেন সদাচার, উপাসনা, গুরুসেবা, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্ম জ্ঞাননিষ্ঠা—ইহা জ্ঞান সাধনার দ্বিতীয় সোপান 'বিচারণা'। নিঃসংশয় চিত্তে অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য, রাগ-দ্বেষ ও অশুভ সংস্কার দূর হয়; দেখা দেয় অতীন্দ্রিয় বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভের যোগ্যতা—ইহা তৃতীয় স্তর 'তনুমানসা'। পরে

---

* (১) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—ইহা 'অষ্টাঙ্গ যোগ'। (২) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, কৃপা, অকপটতা, ক্ষমা, ধৈর্য, মিতাহার ও শৌচাচার—এই দশটী 'যম'। (৩) তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, পাপকার্যে লজ্জাবোধ, মতি, জপ ও হোম—এই দশটী 'নিয়ম'। (৪) আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই তিনটি 'বহিরঙ্গ সাধন'। (৫) ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটী 'অন্তরঙ্গ সাধন'।

সমাধি অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুতে ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ হয়; অনুভূত হয় জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম ও আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় সত্য বস্তু—ইহা চতুর্থ স্তর 'সত্তাপত্তি'। এই অবস্থায় যোগী সংসার বন্ধন ও জন্মমৃত্যুর অতীত; কিন্তু ধ্যানাবস্থায় যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় ব্যুত্থান অবস্থায় তাহা হইতে বঞ্চিত হন। পূর্ণ ঐশ্চর্য ও পরানন্দ লাভের জন্য সমাধি পরিণত হইবে স্বভাবে, সেজন্য চাই নিয়ত অন্তরঙ্গ সাধনা। বহুদিন তীব্র অভ্যাসযোগের ফলে সাধক পর্যায়ক্রমে উপনীত হন পঞ্চম হইতে সপ্তম স্তরে। তখন জ্ঞান ও আনন্দের চরম সীমায় বীর্য ও ঐশ্বর্য পরিণত হয় অনুপম মাধুর্যে, সমাধি-জাগ্রত সর্বাবস্থায় অন্তর-বাহির সদাই চিদানন্দময়। সর্বত্র সমদর্শী সিদ্ধ যোগীর ধ্যান-দৃষ্টিতে সারা বিশ্ব তখন একমাত্র সচ্চিদানন্দের পূর্ণ বিকাশ।···

যুক্তযোগীর সাধন-জীবনে তখনও আসে না চরম সার্থকতা। সেজন্য চাই জ্ঞান ও যোগ-এর সহিত ভক্তি ও প্রেমের পূর্ণতম সমন্বয়।

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি জ্ঞানযোগের চরম অবস্থা। যোগ-এর অবস্থায় জীবাত্মাতে লাভ হয় সাক্ষাৎ পরমাত্মার দর্শন। পরে ভক্তি-রাজ্যে ভক্ত অদ্বয়-নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ-সাকার লীলা সম্ভোগ করিবার অধিকারী। 'রসো বৈ সঃ'—শ্রীপুরুষোত্তম রসের স্বরূপ। এই রস-সাগরে নিমজ্জিত হওয়াই মানবাত্মার চরম সার্থকতা—আর অহৈতুকী ভক্তিই ইহার সাধন। সেই পরাভক্তি বহু সাধন সত্ত্বেও সুদুর্লভ—বেদে ইহার কোন সাধন প্রণালী দেখা যায় না। ঋষিগণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিকট এই অপার্থিব বস্তু লাভের প্রার্থনা জানান। দ্বাপর যুগের জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে বলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহারা গোকুলে অবতীর্ণ হন গোপীরূপে—লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণের নিকট লাভ করেন প্রেমভক্তি। 'মধুর'ভাবে গোপীকান্তের ভজনা করায় সফল হইল তাঁহাদের মানবজন্ম।···

একমাত্র সদ্‌গুরুর প্রসাদে ভক্তহৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় এই দুর্লভ ভক্তিলতাবীজ। ভক্তিমার্গে অগ্রগামী ভক্ত প্রবেশ করেন প্রেমরাজ্যে, সম্ভোগ করেন লীলারসামৃত। এইজন্য ব্রহ্মানন্দ হইতে নামানন্দ মধুরতর, আর প্রেমানন্দ মধুরতম।···পরাভক্তি ও অপার প্রেমানন্দ লাভেই ভক্তের সাধন-জীবনে সূচিত হয় মহাসিদ্ধি,···মানব-জীবনের পরম চরিতার্থতা। পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভে যোগী শুধু তখনই বিশ্বপাবনী অখণ্ড প্রেমরসে ভরপুর। তাঁহার ভক্তিনম্র পরম উদার দৃষ্টিতে সারা ত্রিভুবন তখন অনন্ত প্রেমসিন্ধুর অফুরন্ত উৎস —মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।··

এই প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন: "যোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার, হঠযোগ ও রাজযোগ। হঠযোগী সিদ্ধ হইলে অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভ করেন—তন্মধ্যে অষ্টসিদ্ধি প্রধান। এইরূপ যোগী বিবিধ অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। এই যোগে শরীর সুস্থ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও, প্রকৃত ধর্ম লাভ হয় না। তোমাদের যে সাধন উহা রাজযোগ। ইহার একমাত্র গুরু স্বয়ং ভগবান। ইহাতে অবিশ্রান্ত গুরুদত্ত নাম জপ করিতে হয়। মনের মধ্যে একটু অহঙ্কার বা অভিমান উপস্থিত হইলে আর রক্ষা নাই; সকলের পদানত ও অদোষদর্শী হইয়া নাম করিতে হইবে। নাম করিতে করিতে সমস্ত দেহ নামময় হইয়া যাইবে, ভাগবতী তনু লাভ হইবে। পঞ্চমপুরুষার্থ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তাহা এই সাধনেই লাভ হইবে। ভক্তেরা যোগৈশ্বর্য্য চান না, তথাপি সর্বপ্রকার যোগৈশ্বর্য্য সর্বপ্রকার সিদ্ধি তাঁহাদের লাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের নিকট সামান্য প্রার্থনাও করিতে নাই, কেবল বলিতে হয়, ভগবান তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভের লেশমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই, ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তিই একমাত্র কাম্য।

এই সাধনে মুক্তির ঊর্দ্ধের অবস্থা লাভ হয়, মুক্তি ত নিম্নশ্রেণীর কামনা! কত শত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভগবানের একবিন্দু কৃপালাভের

জন্য লালায়িত, আর সেই কৃপা আপনারা ষোল আনা লাভ করিয়াছেন, মুক্তি লইয়া আপনাদের কি হইবে ?

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রার্থনা :—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবত্যস্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

মহাপ্রভু ও গোস্বামী প্রভু উভয়ের দিব্য জীবনে ইহাই মহাসিদ্ধি লাভের প্রকৃষ্ট মানদণ্ড। আর, সারা পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রেমধর্ম পুনঃ সংস্থাপন করাই তাঁহাদের আবির্ভাবের প্রধান তাৎপর্য।···তাঁহাদের বরপুত্র যোগিরাজ কুলদানন্দ সেই মূল-মন্ত্রের প্রধান ধারক ও বাহক। তাই জ্ঞান ও যোগ, ভক্তি ও প্রেমের পূর্ণতম সমন্বয়ে তাঁহার হৃদিযমুনায় প্রস্ফুটিত হইল মহাসিদ্ধির শতদল। সেই হৃদ্‌পদ্মে আসন পাতিলেন গুরুরূপী ভগবানের উদ্দেশে—ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়া প্রেমের অশ্রুধারায় সম্পাদন করিলেন তাঁহার অমৃতময় অভিষেক। পূর্ণতম মহিমায় আপনাকে বিলাইয়া দিলেন গুরু-গোবিন্দের ধ্যান ও আরাধনায়। শ্রীগুরু যে একাধারে মাতা-পিতা, বন্ধু ও ভ্রাতা,—তিনি যে প্রাণের প্রাণ, জীবনের পরম কাম্য, চিরআরাধ্য প্রেমপ্রতিমা।···

ছাত্রজীবনে নিরামিষ আহার, যৌবনে ব্রাহ্ম সমাজে তরুণীদের সংস্রবত্যাগ—তখন হইতেই কুলদানন্দের বিপুল সংগ্রামের সূত্রপাত। দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণেই তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার শুভ সূচনা। আবাল্য বৈরাগ্য ও আস্তিক্য বুদ্ধি গুরুশক্তিতে সঞ্জীবিত হইল, প্রাণবন্ত হইল গুরুকৃপায়। চণ্ডীপাহাড়ে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল সাধনার ভিত্তিমূল। কলিকাতায় শালগ্রামে গুরুপূজায়, কুম্ভমেলায় অপার গুরুভক্তিতে, শ্রীক্ষেত্রে নিরন্তর গুরুসেবায় এবং গুরুদেবের তিরোধানে প্রেমের অম্লান মাধুর্যে সাধনার অপূর্ব ক্রমপর্যায় সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। অবশেষে আকাশগঙ্গায় শ্রীগুরুর সিদ্ধিলাভের বেদীমূলে সেই অমর নাম সাধনার আজ চরম পরিণতি।···নিতান্ত শৈশবে তুচ্ছ একটি কেঁচোর

যন্ত্রণায় তিনি অধীর হইয়া পড়েন। এতদিনে বিশ্ব-জগতের অনন্ত দুঃখের অমানিশায় স্বয়ং যেন নীলকণ্ঠ আজ নির্জন মহাশ্মশানে ধ্যানমগ্ন। আকণ্ঠ হলাহল পান করিয়া সর্বভূতে অজস্র প্রেমামৃত পরিবেশনের জন্যই এই ব্যাপক প্রস্তুতি। তাই নিরন্তর পূর্ণানন্দে সমাহিত রহিলেন সিদ্ধকাম মহাভক্ত।

এই অতীন্দ্রিয় অবস্থা সম্পর্কে মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর প্রশস্তিবাণী উল্লেখযোগ্য। গয়াধাম ত্যাগ করিবার সময় বরদাকান্তজী কুলদানন্দের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিবার প্রার্থনা করিলে পরম বিস্ময়ভরে ও সানন্দে গম্ভীরনাথজী বলেন: আরে উন্‌কো ক্যা দেখ্‌না হ্যায়! হাম বিশ বরষ যোগ সাধনা করকে যো লাভ কিয়া, ও তো গোসাঁইজীকা কৃপাসে নাম সাধনাসে সব কুছ প্রাপ্ত হুয়া।...বড়া ভাগ্যবান হ্যায়।...

সত্যই ধন্য এই অজপা সাধন। স্বীয় সাধন-জীবনে মহাপ্রভু ও গোস্বামী প্রভুর মধুর উপদেশ সর্বান্তঃকরণে প্রতিপালন করিয়া কুলদানন্দ দেখাইলেন, সিদ্ধিলাভের পথে নাম-সাধনই সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়।...ইহাও বুঝিলেন: তিনি যে সাধনায় সিদ্ধকাম হইলেন তাহা একান্তভাবে গুরুমুখী। দীর্ঘ সাধন-জীবনে প্রতি দিনের, প্রতিটি মুহূর্তের অনুভূতির ফলে আজ উপলব্ধি করিলেন—প্রেমভক্তির অমৃতময় পথে হৃদয়ের রাজা গুরুদেবই যথাসর্বস্ব।...'ভগবান সর্ব্বেষামপি গুরু'—ভগবান গুরুদেহ ধারণ করিয়া শিষ্যদের উপর শতধারে বর্ষণ করেন অজস্র কৃপাধারা।...

অগ্নিতাপে সুবর্ণ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে। সুকঠোর সাধনায় সিদ্ধকাম কুলদানন্দের সুঠাম-সুন্দর দেহখানিও তেমনি আজ অপূর্ব দ্যুতিমান, অপরূপ তেজোদীপ্ত। ফুল্ল কুসুমের মধুর সুরভি তরঙ্গিত হয় মলয় হিল্লোলে। কুলদানন্দজীর অসাধারণ তপপ্রভাবও বিস্তারিত হইল চতুর্দিকে। তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও মাধুর্যের আকর্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল নানাশ্রেণীর নরনারী।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন:

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

—যে যোগী বিশ্বের সকল প্রাণীর সুখদুঃখ নিজের বলিয়া অনুভব করিয়া সকলকে নিজের সহিত সমান দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম যোগী, ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।...

একই বিশ্বপ্রাণের বিচিত্র স্পন্দন বিভিন্ন জীবের প্রাণে সুখ-দুঃখাদি রূপে স্পন্দিত। জীবজগতে কোটী প্রাণের নানা অনুভূতি একই প্রাণসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গি মাত্র। যোগিশ্রেষ্ঠ কুলদানন্দ সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে সমদর্শী—সেই বিশ্বপ্রাণের সহিত প্রতিষ্ঠিত তাঁহার প্রাণের অখণ্ড ঐক্য। তিনি আজ ব্যক্তিগত সুখদুঃখ রহিত, সর্ব কামনা ও বাসনার অতীত। নিজের জন্য কোন কিছু লাভ বা ত্যাগ করিতে আর উৎসুক নন—কিন্তু বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বদাই তিনি সমুৎসুক। জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা সবকিছু সেই বিশ্বপ্রাণের বহিঃপ্রকাশ—তাই আজ দুনিয়ার দুঃখে তিনি দুঃখী, দুনিয়ার সুখে তিনি সুখী। তিনি সর্বভূত হিতে রত, সর্বজনীন প্রেমে আত্মহারা।...

কেবলমাত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে সর্বত্র সমদর্শী হন নাই—মনে করেন নাই, জীবজগতের পারমার্থিক ঐক্য দর্শন করিয়া ব্যবহার-বর্জিত ও সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করাই সাধক-জীবনের চরম সার্থকতা। ব্যবহারিক ভাবেও তিনি হইয়া ওঠেন সমদর্শী, বিশ্বপ্রেমের মাধুর্যে অনুভব করেন বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন। শত্রু-মিত্র, দূর-নিকট, আপন-পর সমস্ত ভেদাভেদ বিদূরিত হয় তাঁহার ধ্যানমৌন উদার দৃষ্টিতে। অনন্ত জ্ঞানে ও শক্তিতে, অতুল ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে, অসীম প্রেমে ও আনন্দে তিনি আজ সম্যকসিদ্ধ মহাপুরুষ।

সিদ্ধকাম মহাপুরুষগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বৈরাগ্য-প্রধান ও প্রেম-প্রধান। বৈরাগ্য-প্রধান যোগীশ্রেষ্ঠ নিয়ত সমাধিস্থ অবস্থায় ব্রহ্মানন্দ উপভোগে নিরত—কালক্রমে প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে দেহমুক্ত হইয়া লাভ করেন ব্রহ্মনির্বাণ। কিন্তু জীবজগতের ত্রিতাপ জ্বালায় ও অনন্ত দুঃখে প্রেমপ্রধান সিদ্ধ যোগীর অন্তর অসীম করুণায় বিগলিত। পরব্রহ্মে বিলীন হইবার পরিবর্তে বিশ্বপ্রেমেই তাঁহাদের ব্যক্তিসত্তা সঞ্জীবিত। এইজন্য সর্ব স্বার্থ ও সর্ব কর্ম হইতে মুক্ত হইয়াও তাঁহারা

কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন জগতের হিতের জন্য। জনসমাজকে প্রেম ও কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।

সিদ্ধযোগী কুলদানন্দজীর দিব্য জীবন অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায় তিনি উভয় শ্রেণীভুক্ত। বাল্যাবধি তাঁহার অন্তরে দেখা দিয়াছে প্রেম ও বৈরাগ্যের অপূর্ব সমন্বয়। ত্যাগ ও বৈরাগ্যে তিনি চির উদাসী—তেমনি প্রেম ও করুণায় সদাজাগ্রত। একই জীবন-নদীর দুই কূলে দুইটী ধারা প্রবাহিত। তিনি বৈরাগ্যে মহীয়ান, প্রেমে বরীয়ান। স্বয়ং নীলকণ্ঠের মত একাধারে তিনি সর্বত্যাগী বৈরাগী, আবার শিবরূপী বিশ্বপ্রেমিক।···

এইজন্য মহাসিদ্ধি লাভের পর পর্বতগুহায় সমাধিস্থ থাকিতে পারেন নাই কুলদানন্দ। তিনি অবতীর্ণ হইলেন সমাধি ও সংসারের মাঝে—সিদ্ধিলাভের পঞ্চম ও চতুর্থ স্তরে। আবার নির্জনে সপ্তম স্তরে সমাধিস্থ হইয়া সম্ভোগ করিতেন পরমানন্দ।···

ভাল কিছু লাভ করিলে প্রেমিক তাহা আপন জনের মাঝে বিলাইয়া দিতে ব্যাকুল। ব্যথিতের বেদনায় তিনি পরহিতে তৎপর। এইজন্য সিদ্ধকাম সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসেন জনসমাজে, তাপক্লিষ্ট নরনারীর অন্তরে বর্ষণ করেন পরমা শান্তি ও সান্ত্বনা, সুধী সমাজে পরিবেশন করেন সাধনালব্ধ সত্য ও প্রজ্ঞা। ভগবান বুদ্ধদেব ফিরিয়া আসেন গুরুত্যাগী ভক্তদের মাঝে—প্রচার করেন প্রেম ও অহিংসার বাণী। আচার্য রামানুজ নিজের অমঙ্গল তুচ্ছ করিয়া বিশ্বকল্যাণে গুরুদত্ত গোপন মন্ত্র ঘোষণা করেন উচ্চকণ্ঠে। মায়ের কৃপালাভ করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে উন্মুখ হইয়া পড়েন শ্রীরামকৃষ্ণ। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে পরমহংসজীর কৃপালাভ ও মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া গোস্বামী প্রভুও পরম কল্যাণের তাগিদেই ফিরিয়া আসেন সমাজ ও সংসারে।···

যোগিরাজ কুলদানন্দের জীবনেও দেখা দিল তাহারই পুনরাবৃত্তি। গোস্বামী প্রভু সত্যপ্রচারে ব্রতী হন. ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর আদেশে। কুলদানন্দের কল্যাণধর্ম প্রচারের পশ্চাতেও ছিল গোস্বামী প্রভুর

নির্দেশ। মহাপ্রভু তথা গোস্বামী প্রভুর অজপা-সাধন, প্রেমধর্ম ও সদ্‌গুরুর সেবা-পূজা প্রচারের জন্যই কুলদানন্দের এই মহাসিদ্ধি লাভ, এই ব্যাপক প্রস্তুতি।···গোস্বামী প্রভু নিজের আরব্ধ কর্মটুকু উপযুক্ত আধারের মাধ্যমে অপূর্ব কৌশলে সুসম্পন্ন করাইবার জন্যই সমুদ্রবক্ষে নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার হইতে উদ্ধার করেন মানসপুত্র কুলদানন্দকে ; আর আজ এইভাবে তাঁহাকে মহাসিদ্ধি লাভের মাধ্যমে যথোচিতভাবে প্রস্তুত করিয়া লইয়া নিয়োজিত করিলেন জনকল্যাণ ব্রতে।···

সদ্‌গুরু জীবন

বিংশ শতকের প্রারম্ভ। ভারতে বিরাট পরিবর্তনের যুগ। উনবিংশ শতকের শেষে সংস্কার যুগের পরিসমাপ্তি। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব ক্ষেত্রেই অপূর্ব বিপ্লবের শুভ সূচনা।

নৈতিক শক্তিই এই বিপ্লবের প্রাণ। যুগযুগান্তে অধ্যাত্ম সম্পদের সাহায্যেই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে সেই তেজ ও বীর্য, সেই শক্তি ও সম্পদ। ভারত বিস্মৃত হয় আর্যঋষির ধ্যান, ধারণা ও তপস্যার আদর্শ।

দেশ ও জাতির সম্মুখে সেই আদর্শ নূতন করিয়া স্থাপন করেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণ। জাতীয় জাগরণকে দান করেন নূতন গতি, বিচিত্র ছন্দ। প্রাচ্য অধ্যাত্ম জ্ঞান তাঁহার সাধনা ও মহাসিদ্ধির মধ্য দিয়া লাভ করে অভিনব ব্যঞ্জনা। রহস্যপূর্ণ মানবপ্রেম অভিব্যক্ত হয় তাঁহার অপার ভক্তি ও মাধুর্য বিকাশে। যুগ-প্রয়োজনে তিনি প্রচার করেন শাস্ত্র ও সদাচার, সত্য ও অহিংসা, ধৈর্য ও ব্রহ্মচর্য। জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করেন: ভারতের সাধনা গুরুমুখী; সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন এই সাধনার মর্মমূলে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।...

এই নির্দেশ অনুসারে বিজয়কৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ যুগনায়ক। তাঁহারা দেশ ও জাতিকে সঞ্জীবিত করেন নবশক্তি ও প্রেরণায়। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম জ্যোতিপুঞ্জের সুযোগ্য প্রতিভূ রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন তাঁহারই মানসপুত্র নীলকণ্ঠ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। সুকঠোর সাধনায় মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া প্রচার করিলেন গোস্বামী প্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও শক্তি-সমন্বিত শ্রীনাম। গুরুবাদের অপার মহিমা, সদ্‌গুরু-লীলার অনুপম মাধুর্য বিকশিত হইল তাঁহার নামসিদ্ধ, বৈরাগ্যদীপ্ত দিব্য জীবনে। সদ্‌গুরুর লীলা ও মহিমা প্রচারে ভগবান বিজয়কৃষ্ণের সুযোগ্য প্রতিনিধি রূপে তিনি

ছিলেন আত্মপ্রচারের ঘোর বিরোধী। বাস্তবক্ষেত্রে সকল গ্লানি ও অপবাদ বরণ করিয়া লইয়াছেন অম্লান বদনে।···বিরাট শক্তি ও বিপুল যোগৈশ্বর্য সযতনে গোপন করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারীর মাঝে উন্মুক্ত করিয়াছেন আপনার অতুল প্রেম ও মাধুর্যের অমৃতকুম্ভ।···ইহাই নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সদ্‌গুরু জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।···

॥ এক ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩০৯। পুরীধামে গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব। আকাশগঙ্গা পাহাড় হইতে প্রতি বৎসর এই উৎসবে যোগদান করিতেন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। পথে কলিকাতা ও চন্দননগরে বিশ্রাম করিতেন কয়েক দিন। এবারও এই উৎসব উপলক্ষে তিনি গমন করেন পুরীধামে।

এই সময়ে মাসাধিক কাল জনসমাজে কাটিত। এবার অনেকে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইলেন তাঁহার গৌরবর্ণ চারু অঙ্গের দেববিভূতিতে। সকলেই আকৃষ্ট হইলেন তাঁহার অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবে। এ যেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ—সিদ্ধকাম যুক্তযোগীর গরিমামণ্ডিত অপূর্ব জ্যোতি।

পুরী সমাধি-মন্দিরে এই সময়ে মিলিত হইতেন অনেক সতীর্থ। তাঁহারা আলোচনা করিতেন সদ্‌গুরু মহিমা, শুনিতেন পরস্পরের সাধন-ভজনের অভিজ্ঞতার কথা। অনেক তীর্থযাত্রীও যোগদান করিতেন এই উৎসবে। তাঁহারা মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেন জটাজুটধারী ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের বৈরাগ্যদীপ্তি। গভীর শ্রদ্ধায় তাঁহাদের অনেকেই দু-দণ্ড বসিতেন তাঁহার চরণতলে। নিবেদন করিতেন মনের ব্যথা, সংসারের নানা দুঃখের কথা : প্রত্যাশা করিতেন বিপদে ধৈর্য, শোকে সান্ত্বনা। কুলদানন্দের অন্তরও বিগলিত হইত করুণা ও সমবেদনায়। তাঁহার সুমিষ্ট বচনে, মধুর উপদেশে তাঁহাদের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যাইত। তাহারা হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেন সংসারত্যাগী সাধারণ সন্ন্যাসী ইনি নন।

সহোদর ভ্রাতৃত্রয় ও গুরুভ্রাতৃগণসহ শ্রীমৎ কুলদানন্দজী

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এবার ছিলেন তুইটী বর্ষিয়সী বিধবা মহিলা। তাঁহারা গোস্বামী প্রভুর জনৈকা শিষ্যার সহিত আশ্রম দর্শন করিতে আসেন। মহিলাদের অন্তরে ছিল বিষম জ্বালা, তাহারই তাড়নায় তাঁহারা আসেন তীর্থ-ভ্রমণে। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীকে দর্শন করিবা মাত্র তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। অন্তরে জাগিল নব আশা—মন বলিল তাঁহাদের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইতে পারিবেন এই মহাপুরুষ। কুলদানন্দজীর শ্রীচরণে তাঁহারা নিবেদন করিলেন অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

মহিলাদের একজন ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী পুটিরাম মোদকের সহধর্মিণী—আর একজন পুটিরামের শ্যালক-পত্নী। পুটিরাম ছিলেন নিঃসন্তান; পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র জিতেন্দ্রনাথকে পুত্র স্নেহে লালন পালন করেন তাঁহার সহধর্মিণী। তাঁহার ব্যবসায় ও অর্থসম্পদের ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি হইয়া ওঠেন তুর্বিনীত, উচ্ছৃঙ্খল। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ঋণগ্রস্থ হওয়ায় সুন্দর ব্যবসায় একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। প্রতিকারের আর কোন উপায় ছিল না—তাই মনের তুঃখে আর দৈবানুগ্রহ লাভের আশায় মহিলারা আসেন তীর্থভ্রমণে। নরেন্দ্র সরোবর তীরে আশাতীতভাবে দর্শন মিলিল দিব্যকান্তি ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের। নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহারা নিবেদন করিলেন সমস্ত মনোবেদনা। কুলদানন্দজীও স্বভাবসুলভ স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত সান্ত্বনা প্রদান করিলেন মহিলাদের।

ক্ষুব্ধ, অসহায় কণ্ঠে পুটিরামের সহধর্মিণী জানাইলেন সকাতর আবেদন: আমাদের বাড়ী একবার পায়ের ধূলো দেবেন?

আন্তরিক প্রত্যাশা অন্তর স্পর্শ করিল কুলদানন্দজীর। স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তিনি বলিলেন: কথা তো দিতে পারি নে—তবে···

: না—দয়া করে একবার শ্রীচরণ দর্শন দিতেই হবে।

: আচ্ছা—গুরুদেবের যদি ইচ্ছা হয় যাব।

আশ্বস্ত হইলেন মহিলারা। কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বিদায় হইলেন।

পুরীধাম হইতে আকাশগঙ্গা যাইবার পথে কুলদানন্দজী আসিলেন কলিকাতায়। সেখানে অবস্থান করিলেন কয়েক দিন।

একদা অপরাহ্ণে রওনা হইলেন মহিলা দুইটীর বাড়ীতে। নির্দিষ্ট দোকানের সম্মুখে গিয়া তাঁহাদের ঠিকানা দেখিতেছিলেন। এমন সময় দোকান হইতে বাহিরে আসিলেন জিতেন্দ্রনাথ।

পুরীধাম হইতে ফিরিয়া জননী বলেন: জিতেন, একজন সাধু আমাদের দোকানে আসতে পারেন। একটু লক্ষ্য রাখিস। দেখিস যেন ফিরিয়ে দিসনে—তিনি এলেই খবর দিস, বাবা।

ব্রহ্মচারীজির তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া মনে হইল ইনিই বোধ হয় সেই সাধুপুরুষ। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন: কাদের বাড়ী খুঁজছেন?

ঠিকানাটী তাঁহার হাতে দিলেন ব্রহ্মচারীজি।

: এ তো আমাদেরই বাড়ী—আসুন।

সসম্ভ্রমে ব্রহ্মচারীজিকে দোকানে বসাইয়া ভিতরে সংবাদ দিলেন। অমনি সাগ্রহে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহার জননী ও পিসিমা। তাঁহারা ভক্তি সহকারে প্রণত হইলেন ব্রহ্মচারীজির শ্রীচরণতলে। তাঁহাকে সাদরে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইয়া লইয়া গেলেন বাড়ীর ভিতর। বসিবার আসন দিয়া কিছু খাবার গ্রহণ করিবার সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন।

: এখন তো খাওয়ার সময় নয়। আমি এই পথে গঙ্গাস্নানে যাই। স্নানের পর একদিন এসে চা খেয়ে যাব।

সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন কুলদানন্দজী।

জিতেন্দ্রনাথের জননী ও পিসিমা রহিলেন সাগ্রহ প্রতীক্ষায়। দুই-তিন দিন পরে উপস্থিত হইলেন ব্রহ্মচারীজি। আনন্দের সীমা রহিল না মহিলাদের—তাঁহারা চা ও কিছু মিষ্টি আনিয়া দিলেন। নীরবে কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। অনিন্দ্যসুন্দর সাধুপুরুষের দিকে নিবদ্ধ তাঁহার অপলক দৃষ্টি।

তাঁহাকে দেখাইয়া পিসিমা বলিলেন: এই সেই ছেলে—এরই কথা আপনাকে বলেছিলাম।

চা-পান করিতে করিতে যুবককে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন কুলদানন্দজী। মুখে কিছুই বলিলেন না—চা-পান করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে কেমন যেন হতচকিত হইয়া গেলেন জিতেন্দ্রনাথ। অন্তর দিয়া অনুভব করিলেন একটা অব্যক্ত অথচ প্রবল আকর্ষণ।···সাধুপুরুষের চোখে মুখে গভীর স্নেহ ও দরদের আভাস। অচেনা হইলেও তিনি যেন চির আপনার।···সহসা তাঁহার চরণদুটী জড়াইয়া ধরিয়া জিতেন্দ্রনাথ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন: সাধুজি, আমায় ভাল করে দিতে পারেন?···

সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মস্তকে কুলদানন্দজী বুলাইয়া দিলেন অভয় হস্তের মধুর স্পর্শ। কোমল কণ্ঠে বলিলেন: কেন— তুমি তো বেশ ভালই আছ।···

পলকে শতধারে মধু বর্ষিত হইল যেন।···জিতেন্দ্রনাথ এতদিন শুনিয়াছেন নিজের অজস্র নিন্দা ও অখ্যাতি। নিজেও আপনাকে অপদার্থ বলিয়া ভাবিয়াছেন—অথচ পাপের পল্বল পঙ্ক হইতে উদ্ধার-লাভের পথ খুঁজিয়া পান নাই। আজ এ কী অদ্‌ভূত কথা সাধুজীর মুখে!···কুসুম কোমল করপল্লবে এ কী অপূর্ব অমৃত স্পর্শ।···ছল ছল চক্ষে তিনি বলিলেন: না—ভুলিয়ে গেলে চলবে না। আমায় ভাল করতেই হবে—নইলে আপনার পা দুটী ছাড়ব না।···

চরিত্রহীন হইলেও স্পর্শমণির পুণ্যস্পর্শে মুমুক্ষু জীবাত্মার কী মধুর শরণাগতি!···তাঁহার দিকে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া কুলদানন্দজী বলিলেন: বেশ—প্রত্যেক দিন মায়ের পায়ের ধূলো নিও। আর, খুব ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করো—পরে তুলসীতলায় জল দিয়ে প্রণাম করো। তাহলেই তোমার ভাল হবে।···

উচ্ছৃঙ্খল যুবক পাপের পথে অধোগামী হওয়ায় ঋণজালে জড়িত। সাময়িক বিবেক দংশনে সে আজ অধীর। তবু অন্তর্দৃষ্টির বলে কুলদানন্দজী বুঝিলেন, সমস্ত কু-অভ্যাস একদিনে ত্যাগ করিতে

বলিলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তাই আপাততঃ শুধু উল্লিখিত সহজ নির্দেশ দান করিলেন।

জিতেন্দ্রনাথও চমৎকৃত হইলেন। মনে হইল সাধুজীর চক্ষে সত্যই যেন তিনি অধঃপতিত নন, আর দশজনের মতই সাধারণ। তাই তাঁহার জন্য কু-অভ্যাস বর্জনের কঠোর আদেশ দেওয়া দূরে থাক, কোন নিষেধ পর্যন্ত দেন নাই—শুধু তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিলেন সহজ নিষ্ঠার সিংহদ্বার।···ভাবিয়া গভীর শ্রদ্ধায় চাহিয়া রহিলেন সাধুজীর ভুবনমোহন রূপের দিকে।···

তাঁহার জননী ও পিশিমাও চাহিয়া ছিলেন অবাক বিস্ময়ে। এত সহজে দুর্জয় ছেলের এমনি অভাবনীয় ভাবান্তরে তাঁহারাও কৃতার্থ হইলেন। বুঝিলেন সবই মহাপুরুষের কৃপা।···

তাঁহার চরণপ্রান্তে সভক্তি প্রণাম করিলেন সকলে।

কুলদানন্দজীও সানন্দে বিদায় লইলেন। অমৃত পরিবেশনের পথে ইহাই তাঁহার প্রথম সার্থক পদক্ষেপ।···

আরো কয়েকদিন কলিকাতায় কাটিল। গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার পথে প্রত্যহ জিতেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইতেন। পতিতপাবনী সুরধূনীর স্নিগ্ধ স্পর্শে যুবকের দেহমন শীতল ও পাপমুক্ত হইতে লাগিল—পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজির সঙ্গলাভে ও মধুর উপদেশে ধীরে ধীরে দূর হইতে লাগিল তারুণ্যের আবিলতা। স্বল্পকালের মধ্যেই রস-পিপাসু তরুণ অন্তর সঞ্জীবিত হইল অভিনব আনন্দরসের আস্বাদনে। ভাবিতে লাগিল : জীবনে এমন দরদী, এমন প্রাণের বন্ধু তো আর কোথাও দেখি নি!···

এইভাবে যুবকের অন্তরে ভাবী উন্নতির বীজ বপন করিয়া কুলদানন্দজী রওনা হইলেন গয়াধাম।

শ্রাবণ মাস, ১৩০৯। আকাশগঙ্গায় ধ্যান ও সমাধির বিমল আনন্দে দিন কাটিয়া যায় ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের।

মেঘের কোলে ঘন মেঘের কোলাকুলি—গগনে গগনে বর্ষণের বিপুল আয়োজন। বিদ্যুৎদীপ্তির নৃত্যচপল ছলনা আজ আর নাই—আকাশে বাতাসে নাই বর্ষণের বাহ্য আড়ম্বর।...দাদুরির তানে দিগন্ত মুখরিত,...শ্রাবণ-ধারায় তাপদগ্ধ ধরণীর বুকে আনন্দ-প্লাবন।...

নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের মনপ্রাণ উদাস হইয়া ওঠে সেই বর্ষাসঙ্গীতে। ধ্যানমৌন আকাশগঙ্গার মাঝে তিনিও নিত্য নিয়ত আত্ম-সমাহিত। তবু বর্ষণসিক্ত পাহাড়শীর্ষে মাঝে মাঝে চাহিয়া থাকেন অপলকে—মনে হয় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘলোকে সুধাবর্ষণের কী গভীর আকুলতা! তাঁহারও অন্তস্থলে অণুরণিত সেই আকুল আবেগ।...ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে লক্ষ-কোটী জিতেন্দ্রনাথের সকরুণ মুখচ্ছবি। দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত কোটী কণ্ঠের আকুল আবেদনঃ সাধুজি, আমায় ভাল ক'রে দিতে পারেন?...

অজ্ঞাতে তাঁহার চক্ষুদুটী অশ্রুসজল হইয়া আসে। নিজের শত দুঃখতাপে তিনি পর্বতের ন্যায় চির অটল। অথচ অপরের ত্রিতাপ-জ্বালার কথা ভাবিতেই পলকে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে সমস্ত অন্তর। প্রাণ দিয়া তিনি অনুভব করেন মূক ধরিত্রীর বুকফাটা সকরুণ আর্তনাদ। মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হন বুদ্ধদেব, ভগবান শ্রীগুরুদেব। এই পুণ্যধামে সিদ্ধিলাভের পর তাঁহারা পরহিতব্রতে অবতীর্ণ হন জনসমাজে। মনে পড়ে গুরুদেবের নির্দেশ—অন্তর্লোকে ভাসিয়া ওঠে তাঁহার প্রসন্ন, অপরূপ রূপশ্রী।...কামধেনুর মত পুণ্য পীযূষধারা পরিবেশনের ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া ওঠেন ধ্যানমগ্ন নীলকণ্ঠ।...

একদিন সহসা উপস্থিত হইলেন ঝুনঝুনুর এক আগরওয়ালা—জয়পুরের মাড়োয়ারী তীর্থযাত্রী। তিনি সাগ্রহে সাধুদের ভাণ্ডারা দিতে চাহিলেন। কুলদানন্দজী অনুমতি দিলে সানন্দে বহু সাধুকে পরিতৃপ্তি সহকারে সেবা ও আপ্যায়িত করিলেন আগরওয়ালা।

কুলদানন্দের মনে পড়িল ঠিক বারো বৎসর পূর্বে এই ২২শে শ্রাবণ তারিখের কথা। এইদিন গুরুদেবের নিকট তিনি লাভ করেন দুর্লভ ব্রহ্মচর্য ব্রত। ছয় বৎসর পূর্বে গুরুজীর নির্দেশে তাঁহার ব্রত আনুষ্ঠানিক

ভাবে শেষ হয় বটে ; তবু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রতের নির্ধারিত কাল পূর্ণ হইল এতদিনে। সুদুর্গম সাধনার পথে গুরুকৃপায় আজ সার্থক তাঁহার জয়যাত্রা ! তাই কি দয়াময় শ্রীগুরুদেব আজ এইভাবে ভাণ্ডারার মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন করাইয়া লইলেন অধম সন্তানের সিদ্ধি উৎসব ?···ভাবিয়া শ্রীগুরুর অনন্ত কৃপা ও অপরিসীম স্নেহে কুলদানন্দের চোখে দেখা দিল পরাভক্তি ও আনন্দের ধারা। বুঝিলেন, অতঃপর সদ্‌গুরুর মহিমা প্রচারে তাঁহাকে ব্রতী হইতে হইবে,···অগ্রসর হইতে হইবে প্রেমধর্ম প্রচারের পথে !···

কুসঙ্গে দুর্নীতির পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। বিবেকের বৃশ্চিক দংশন, বিধবা জননীর নিরুপায় অশ্রুধারা, ঋণজালে আসন্ন সর্বনাশ—সমস্ত ভয়-ভাবনা নিমেষে ডুবিয়া গিয়াছে সেই উদ্দাম স্রোতে। মনে হইয়াছে ধর্ম-কর্ম, জীবন-যৌবন, সারা দুনিয়া ডুবিয়া গেলেও ক্ষতি নাই—অবিরাম ঐ উপভোগের মধ্যেই আছে দুনিয়ার যত তৃপ্তি, যত আরাম।···

এমন সময় তাঁহার জীবন-বেলায় অবতীর্ণ হইলেন ত্রাণকর্তা নীলকণ্ঠ কুলদানন্দ। তাঁহার সাধন-ঐশ্বর্যের প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে জিতেন্দ্রনাথের চোখমুখ ঝলসাইয়া গেল,···গোপন মনের গহন আঁধারে বিকীর্ণ হইল স্বর্গীয় দ্যুতি।···সেই আলোকে জিতেন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন। সাধুজীর সঙ্গলাভে এবং তাঁহার নির্দেশমত চলিবার ফলে অনুভব করিলেন ঃ পাপের পঙ্কিল স্রোতের বাহিরেই আছে মহাজনদের অনুসৃত মহত্তর পথ—সে পথে কামনার বহ্নিশিখা নাই, অবসাদ বা অনুশোচনা নাই ;···আছে প্রকৃত সার্থকতার মধুর তৃপ্তি, অপূর্ব আনন্দ।···

প্রথম দর্শনেই কুলদানন্দজীর অসামান্য প্রভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। তাঁহার লৌহদৃঢ় হৃদয় ক্রমশ অনুভব করিতে লাগিল চুম্বকের দুর্বার আকর্ষণ।···কু-অভ্যাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার অক্টোপাশে তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল—কয়েকদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন যেন মন্ত্রবলেই আজ শিথিল সেই সর্বনাশা বন্ধন।···নিত্য গঙ্গাস্নান-কালে, জননীর চরণে ও তুলসীতলে প্রণামকালে চোখে ভাসে ঐ অজানা

সাধুজীর অনুপম দিব্য কান্তি। কত অলঙ্কারে, বেশবাসে সুসজ্জিতা, নগরীর সেরা রূপসীর রূপসুধা পান করিয়াছেন রাতের পর রাত,··· তাহাদের বাঁকা হাসিতে, বিলোল কটাক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন স্বয়ং রতির ছলাকলা—নৃত্যছন্দে অঙ্গে অঙ্গে উপভোগ করিয়াছেন যেন উর্বশীর লীলাবিলাস।···কিন্তু সামান্য পীত বসন পরিহিত, জটাজুটধারী সাধুজীর সর্বাঙ্গে কী অপরূপ লাবণ্য,···স্নিগ্ধ-শান্ত দৃষ্টিতে কী গভীর স্নেহ ও করুণা,···মৃদু মধুর বচনে কী অসীম দরদ। ···জিতেন্দ্রনাথের মনে হয়, সত্যই জীবনে আর কখনও দেখেন নাই এমন মনোহর রূপজ্যোতি, আর কখনও লাভ করেন নাই এমন প্রাণঢালা ভালবাসা ; একাধারে রূপে ও গুণে, গাম্ভীর্যে ও মাধুর্যে সত্যই যেন স্বয়ং মহাদেব।···দিবানিশি তাঁহার চিন্তায়, তাঁহারই দুর্বার আকর্ষণে মনপ্রাণ ব্যাকুল। গভীর শ্রদ্ধায় তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন সাধুজীর নির্দেশিত পথে। তন্বী বনিতার হাতছানি আজ তাঁহার নিকট বিস্বাদ,···প্রমত্ত যৌবনের উত্তেজনা নিছক বিড়ম্বনা।···চিত্তের সমস্ত দৈন্য ও পাপ অকপটে প্রকাশ করিয়া সাধুজীর অভয় চরণে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।···

কুলদানন্দজীও বুঝিলেন গুরুকৃপায় যে পরম বস্তু লাভ করিয়াছেন, এবার গুরুনির্দেশে তাহা বিলাইয়া দিতে হইবে জগতের হিতার্থে। তবেই তো দেখা দিবে ব্রত ও সংগ্রাম, সাধনা ও সিদ্ধির পরম সার্থকতা। জীবন পারাবারে যে সুধার স্বাদ পাইয়াছেন, জিতেন্দ্রনাথকে তাহাই দান করিবার সংকল্প করিলেন। সেই লক্ষ্যপথে যুবককে দিয়াছেন প্রাথমিক শিক্ষা ও নির্দেশ। আরো কিছুদিনের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনে আপাতত শুধু সেই ব্যবস্থা বহাল রাখিলেন।

কুলদানন্দজীর সাধনশক্তির প্রদীপ্ত প্রভাবে দূরে থাকিয়াও উন্মুক্ত হইল জিতেন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি। তরুণ রবির অরুণ কিরণচ্ছটায় বিগলিত হইল গহন মনের জমাট তুষারমৌলি। মনে প্রাণে পালন করিতে লাগিলেন ব্রহ্মচারীজির আদেশ।. তাঁহার তপপ্রভাবে ধীরে ধীরে বিদূরিত হইল যুবকের সমস্ত মনোবিকার। কয়েক মাস পরে অন্তরে

জাগিল সাধুজীর কৃপালাভের গভীর ব্যাকুলতা। পিণ্ডদানের নামে জননীকে সঙ্গে লইয়া সহসা একদিন তিনি রওনা হইলেন গয়াধাম।

গয়াধামে তাঁহারা উঠিলেন বরদাকান্তজীর বাসায়। তখন ঠাকুর বরদাকান্ত সপরিবারে ঢাকা গিয়াছেন। তবু বাসার দারোয়ান ঝি-চাকর সকলেই অভ্যর্থনা ও আদরযত্ন করিল।

ঝি-এর নিকট জিতেন্দ্রনাথ শুনিলেন, তাঁহাদের আসিবার কথা পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন কুলদানন্দজী। তাঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন; এমন কি বিশ্রামান্তে তাঁহাদের আকাশগঙ্গা পাহাড়ে পৌঁছাইয়া দিবার কথাও বলিয়া গিয়াছেন।···

এখানে আসিবার কথা পত্রে জানান দূরে থাক একদিন পূর্বে নিজেরাই জানিতেন না। অথচ তাহা পূর্বেই জানিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ব্রহ্মচারীজি। শুনিয়া জিতেন্দ্রনাথের অন্তরে জাগিল পরম বিস্ময়, প্রগাঢ় ভক্তি।

আহার ও বিশ্রামান্তে তাঁহারা যাত্রা করিলেন আকাশগঙ্গায়। আশ্রম-কুটিরে পৌঁছাইয়া প্রণত হইলেন ব্রহ্মচারীজির চরণতলে।

ব্রহ্মচারীজি সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন: হঠাৎ খবর না দিয়ে চলে এলে যে?

ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন জিতেন্দ্রনাথ: তবু আপনি তো সব জানেন দেখছি—আগে থাকতে আমাদের জন্যে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন।···

নীরবে ঈষৎ হাসিলেন কুলদানন্দজী।···

ধনীর দুলাল জিতেন্দ্রনাথের আশ্রমবাস জীবনে এই প্রথম। বাল্যাবধি জীবন কাটিয়াছে সুসজ্জিতা, কোলাহল-মুখরা মহানগরীতে। ক্ষুধিত যৌবনে প্রাচুর্যে ও বিলাসে হৃদয়ের কূলে কূলে জাগিয়াছে ফেনিল উচ্ছ্বাস। কামনার দেউলে কামিনীর প্রগলভতায়, স্বচ্ছন্দ

আরাম ও বিহারে মর্তে যেন নামিয়া আসিয়াছে সাধের স্বর্গ। তবু বিরাম ছিল না বিভোল নেশার, অন্ত ছিল না অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার।…

কিন্তু এখানে দিন কাটে নূতন আনন্দে, নব নব অনুভূতিতে। আকাশগঙ্গার প্রশান্ত গাম্ভীর্যে ও অপরূপ সৌন্দর্যে লজ্জায় যেন মুখ ঢাকিয়াছে রূপজীবিনী মহানগরী। ধ্যানমৌন ব্রহ্মচারীজির ভুবন-ভুলানো রূপজ্যোতিতে, তাঁহার মধুর সঙ্গলাভে ও স্নেহযত্নে কোন্ অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে লাস্যময়ী লীলাসঙ্গিনী।…সত্যই আজ যেন নবজন্ম জিতেন্দ্রনাথের। নিজের পরিবর্তনে নিজেরই বিস্ময় জাগে সব চাইতে বেশী।…

সেই সঙ্গে জাগিল দীক্ষালাভের ব্যাকুলতা। একদিন দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া বলিলেন: শুনেছি দীক্ষা না হলে গয়ায় পিণ্ডদান করবার অধিকার হয় না। তা,…আমাকে দয়া করে দীক্ষা দেবেন, মহারাজ?…

এতদিনে ধ্বনিত হইল রাহুমুক্ত মুমুক্ষু হৃদয়ের আকুল কাকুতি। তাহাতে আনন্দ অনুভব করিলেন কুলদানন্দজী। কিন্তু দীক্ষালাভের প্রয়োজন মূলত পিণ্ডদানের জন্য নয়—তাহা বুঝিবার জন্য চাই আরও প্রস্তুতি, আরো ব্যাকুলতা।…

সস্নেহে বলিলেন: আচ্ছা—হবে। কিছুদিন এখানে থাক—বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন কর।

আশ্বাসে, নব আশায় উচ্ছ্বসিত হইলেন জিতেন্দ্রনাথ। কবে দয়াল সাধু মহারাজের কৃপা হইবে? কবে আসিবে ইষ্টনাম লাভের শুভদিন?…

দিন কাটে ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। দর্শন করেন শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম—ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান আকাশগঙ্গায়। ফুলের হাসিতে, পাখীর কলগানে, পাহাড়-শীর্ষে কণকরশ্মি প্রভায় সত্যই কী বিমল আনন্দ। ধীরে ধীরে জিতেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন কেন লোকালয় ছাড়িয়া এখানে আছেন সাধুজী। কিন্তু সব চাইতে ভাল লাগে সাধুজীর দর্শন। কাছে গেলে তাঁহার জ্যোতিপূর্ণ আঁখি দুটীর দিকে ঠিক চাহিতে পারেন না। আড়াল হইতে লুকাইয়া দর্শন করেন সেই অপরূপ রূপমাধুরী!…মদনমোহনের দিব্য বিভায় দূর হইতে শ্রীরাধার ভীরু অথচ ব্যাকুল দর্শন যেন।…

২৯শে পৌষ, ১৩০৯। পূর্বাচলে হাসিয়া উঠেন দেব দিনকর। এতদিনে দেখা দেয় সেই পরম মুহূর্ত—শুধু জিতেন্দ্রনাথের রাহুগ্রস্ত জীবনে নয়, নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের দিব্য জীবনেও।...

গুরুদেব ভগবান বিজয়কৃষ্ণের আদেশে এই মাহেন্দ্রলগ্নে জিতেন্দ্র নাথকে সর্বপ্রথম প্রদান করিলেন ইষ্টনাম ও প্রণামমন্ত্র।...গুরু-নির্দেশিত পথে এইবার তাঁহার সার্থক পদক্ষেপ। আজ হইতে সদ্‌গুরুর ভূমিকায় তাঁহার আত্মপ্রকাশ—সদ্‌গুরুর লীলা ও মহিমা প্রচারের শুভ সূচনা।...

কিছুদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া জিতেন্দ্রনাথ, তাঁহার মাতা ও পিসিমাতাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষাদান করেন ব্রহ্মচারীজি। দীক্ষালাভের পর জিতেন্দ্রনাথের জীবনে দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন। তাঁহাদের ব্যবসায়েরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহার জীবন সদ্‌গুরু কুলদানন্দজীর অনন্ত কৃপালাভের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন।...

তাঁহার মাতা সাশ্রুনেত্রে একদিন ব্রহ্মচারীজিকে বলেন: বাবা, কত জন্মের পুণ্যফলে পুরীতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেয়েছিলাম। নইলে আমাদের আজ কী গতি হ'ত?...

মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মচারীজি বলেন: সবই গুরুদেবের কৃপা।...

জিতেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ভগবান বিজয়কৃষ্ণ ও জননী যোগমায়া ঠাকুরাণীর পট স্থাপন করেন ব্রহ্মচারীজি। তাঁহাদের পূজা পদ্ধতিও শিখাইয়া দেন।

গোসাঁইজীর লীলা সংবরণের কয়েক দিন পূর্বে প্রভুপাদ যোগজীবন বলেন: বাবা, বড় ইচ্ছা ছিল আপনাকে ঘরে ঘরে নিয়ে গিয়ে শ্রীনামের মূর্ত বিগ্রহ রূপে সবাইকে দেখাই।...করুণার অবতার গোস্বামী প্রভু উত্তর দেন: সদ্‌গুরুর সেবা-পূজা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করাই আমার এবার আগমনের কারণ।...

বিশেষ করিয়া মানসপুত্র ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়া লইতে চান গোসাঁইজী। সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য কুলদানন্দজীও সদ্‌গুরুর সেবা-পূজা প্রচলন করেন তাঁহার প্রথম মন্ত্রশিষ্য জিতেন্দ্রনাথের গৃহে। পরবর্তী কালে বহু

আশ্রমে এবং শিষ্যদের ঘরে ঘরেও তিনি প্রচলন করেন সদ্‌গুরুর এই সেবা ও পূজা।···

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩১০। পুরীধামে বিজয়কৃষ্ণের তিরোভাব উৎসব। সেই উপলক্ষে আকাশগঙ্গা হইতে রওনা হইলেন কুলদানন্দজী।

পথে নামিলেন চন্দননগরে। গুরুভগ্নি নিরুপমা দেবীর সকাতর অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দর্শনলাভে অপার আনন্দলাভ করিলেন নিরুপমা দেবী। গুরুদেবের কৃপা সম্পর্কিত আলোচনায় আদর্শ গুরুভ্রাতাকে পাইয়া পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

গৃহস্থ বাড়ীতে থাকিবার নানা অসুবিধা। গুরুভগ্নির বাড়ীর নিকটে একটী বেলগাছ তলায় আসন স্থাপন করিলেন কুলদানন্দজী। ধুনী জ্বালাইয়া নিমগ্ন হইলেন নিরবচ্ছিন্ন নামজপে।

সম্মুখেই সদর বড় রাস্তা। সেই পথে একটী শবদেহ লইয়া যাইতে-ছিল কয়েকজন হিন্দুস্থানী—পশ্চাতে আলুথালু বেশে যাইতেছিল শোকাকুলা সদ্যবিধবা। ব্রহ্মচারীজির অপূর্ব জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে চাহিতেই থমকিয়া দাঁড়াইল রমণী। যাঁহাকে স্মরণ করিয়া অবিরত মাথা কুটিতেছে, ঐ তো স্বয়ং সেই শিব শম্ভু!···ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ব্রহ্মচারীজির পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল বিধবা রমণী।

মূর্চ্ছিতার চোখে-মুখে সস্নেহে কমণ্ডলুর জল সিঞ্চন করিলেন ব্রহ্ম-চারীজি। জ্ঞান ফিরিতেই হতভাগিনী তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। দরদের সহিত তাহাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিবার চেষ্টা করিলেন ব্রহ্মচারীজি। বুঝাইয়া বলিলেন, তাহার মৃত স্বামীকে বাঁচান তাঁহার সাধ্যাতীত। রমণী তবু নাছোড়বান্দা—অখণ্ড বিশ্বাসে মর্মভেদী আর্তনাদ করিয়া বারবার তাহার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

শোকবিহ্বলার মর্মান্তিক অবস্থায় নীলকণ্ঠের চক্ষে ফুটিল করুণার অশ্রুবিন্দু! তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বলিলেন: সত্যি মা,

আমার কোন শক্তি নেই, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে সবই হ'তে পারে।···
এই ধুনীর বিভূতি নিয়ে গিয়ে ভগবানের নামে শবদেহে ছড়িয়ে দেও—দেখ, তোমার সতীত্ব ও ভক্তি-বিশ্বাসেই যদি কোন কাজ হয়।···তবে একথা কাউকে বলো না যেন—তাহ'লে তোমার স্বামী বাঁচলেও আবার কিন্তু মারা যেতে পারে।···

বিধবার ভাঙ্গা বুকে সঞ্চারিত নব আশা—ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সে ছুটিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। শব দেহের নিকট গিয়া ছড়াইয়া দিল ধুনীর বিভূতি—নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীজির দিব্য মূর্তি স্মরণ করিয়া অস্ফুটে বলিয়া উঠিল : জয় শিব শম্ভু!···

মৃত দেহে ধীরে ধীরে সত্যই স্পন্দিত হইল নব জীবন।···শোকাকুলা আশাতীত আনন্দে স্বামীর মস্তক কোলে করিয়া বসিল। সীমাহীন বিস্ময়ে সকলে ফিরিয়া চলিল সাধু মহারাজের নিকট।

তাহা বুঝিয়া পূর্বেই আসন তুলিয়া গুরুভগ্নির বাসায় উপস্থিত হইলেন কুলদানন্দজী। বিদায় লইয়া সেই রাত্রেই ছুটিলেন ষ্টেশানের দিকে।···

বিজয়কৃষ্ণের অমোঘ উপদেশ : প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা।···তাই নিজের ঐশ্বর্য কোনপ্রকারে প্রকাশ করা দূরে থাক, সর্বদা সর্বপ্রযত্নে এইভাবে তাহা গোপন রাখিতেন ব্রহ্মচারীজি। কিন্তু মহাসিদ্ধি লাভের পর সত্যই যে তিনি কত অসীম শক্তি ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন, এই কাহিনী তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অতঃপর পুরীধামে গমন করিয়া গোসাঁইজীর তিরোভাব উৎসবে যোগদান করেন কুলদানন্দজী। গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও সাধন সম্পর্কিত আলোচনায় সময় কাটিয়া যায়। ভজনানন্দে শ্রীগুরুদেবের পরোক্ষ কৃপালাভের অনুভূতিতে সকলেই উৎফুল্ল হইয়া ওঠেন। সকলের মধ্যে রহিয়াও আপনভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন ব্রহ্মচারীজি। তিনি ছিলেন সকল গুরুভ্রাতা-ভগ্নির আন্তরিক প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধার পাত্র।

পুরীধাম হইতে ফিরিবার পথে উলুবেড়িয়ায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোহিণী-কান্তের বাসায় কয়েক দিন অবস্থান করেন ব্রহ্মচারীজি। রোহিণীকান্ত তখন পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর। তাঁহার বাসায় স্থানীয় মুনসেফ ভগবতী চরণ কুণ্ডু মহাশয় ব্রহ্মচারীজির দর্শনলাভ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। ব্রহ্মচারীজির সহিত আলাপের ফলে ভগবতী বাবুর অন্তরে জাগে গভীর ভক্তি—এক প্রবল আকর্ষণে তখনই দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন তিনি। তাঁহাকে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যাইবার নির্দেশ দিয়া গয়া রওনা হইলেন ব্রহ্মচারীজি।

আকাশগঙ্গায় গুণ্ডা-বদমায়েসরা আবার সুরু করিল নানা উৎপাত। সংবাদ পাইয়া গুণ্ডাদমনের জন্য গয়ার পুলিশের সাহায্য লইবার সংকল্প করেন রোহিণীকান্ত। তিনি গয়া রওনা হইলেন পূজার ছুটিতে। তাঁহার চেষ্টায় অবিলম্বে গুণ্ডাদল বিতাড়িত হইল।

রোহিণীকান্তের সহিত গয়াধামে উপস্থিত হন ভগবতী বাবু। তাঁহাকে খুব আদর যত্ন করিয়া আশ্রম-কুটিরে রাখিলেন ব্রহ্মচারীজি। ভগবতী বাবুকে স্বহস্তে রান্না করিয়া খাওয়াইতেন। কয়েক দিন পরে পাহাড়ে বসিয়াই দীক্ষা দান করেন তাঁহাকে। সদ্‌গুরুর কৃপালাভে ধন্য হইল ভগবতী বাবুর জীবন। পরে তিনি সাব-জজ পদে উন্নীত হইয়া রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। সুযোগ পাইলেই তিনি গুরুদেবের দর্শনলাভ করিতেন, তাঁহার মধুর সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইতেন। অবসর গ্রহণের পর বাঁশবেড়িয়ায় তাঁহার পল্লীনিবাসে সাধন-ভজন ও শাস্ত্রচর্চায় তাঁহার ধর্মজীবন অতিবাহিত হয়।

আকাশগঙ্গায় নির্জন পরিবেশে নিরন্তর সমাহিত হইয়া থাকেন কুলদানন্দজী।

বন-উপবনের নিরালা নিভৃতে বন আলো করিয়া ফুটিয়া ওঠে সুন্দর বনফুল। দিকে দিকে বিলাইয়া দেয় তাহার মধুর সুরভি। সেই গন্ধে আকুল হইয়া ছুটিয়া আসে মত্ত মধুপের দল। প্রাণ ভরিয়া মধু পান করিয়া ধন্য হয় তাহারা।

তখনকার দিনে সেই নির্জন শাপদ-সংকুল গিরিদেশেও দলে দলে যাতায়াত শুরু করে ভক্তিনম্র দর্শকবৃন্দ। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীজির শ্রীচরণে নিবেদন করে আশা-আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা। ধর্মশাস্ত্রের, গীতা ও পুরাণের নানা জটিল সমস্যা উত্থাপন করিয়া প্রার্থনা করে সহজ সমাধান।

গয়া পাহাড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহির্জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া থাকা কুলদানন্দজীর পক্ষে আর সম্ভব হইয়া উঠিল না। গুরুদেব ভগবান বিজয়কৃষ্ণের আদেশে নীলকণ্ঠ সাড়া দিলেন গণদেবতার আহ্বানে —নামিয়া আসিলেন জনকল্যাণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। ঘুচাইতে লাগিলেন জনগণমনের সর্ব সংশয় ও বিভ্রান্তি, ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর অন্তরে বর্ষণ করিতে লাগিলেন প্রেম ও ভক্তি, শান্তি ও সান্ত্বনার পূত পীযূষধারা। নীলকণ্ঠ বেশধারী বুঝি স্বয়ং নীলকণ্ঠের জটা হইতে নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল পতিতপাবনী প্রেমগঙ্গা।...

কুলদানন্দজীর অসামান্য প্রভাবে ও প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন রঘুবরদাস বাবাজীর শক্তিশালী শিষ্য সরযূদাস। রঘুবরদাস বাবাজীর ভজনস্থানে নির্মিত হইয়াছিল কুলদানন্দজীর সাধন-কুটির। সেই অছিলায় তাঁহাকে সেস্থান হইতে অপসারিত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন সরযূদাস। ব্রহ্মচারীজি বুঝিলেন সবই ভগবান গুরুদেবের অপূর্ব লীলা। তবু সমস্ত উৎপাতের মাঝেও অটল ধৈর্যের সহিত গুরুদেবের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

অচিরে দেখা দিল আর এক নূতন উৎপাত। গয়া সহরে চোর-ডাকাতের খুব উপদ্রব দেখা দিয়াছিল। তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পাহাড়ে লুকাইয়া রাখে এমনি সন্দেহ জাগিল পুলিশের মনে। পাহাড়ে পাহাড়ে আরম্ভ হইল পুলিশের অনুসন্ধান। শোনা গেল, আকাশগঙ্গায় হানা দিয়া পুলিশ কুলদানন্দজীর সাধন-কুটিরেও সন্ধান করিবে। তবু নিরুদ্বেগে ধ্যানমগ্ন রহিলেন কুলদানন্দজী।

একদিন মহাত্মা গম্ভীরনাথজী ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন: গোসাঁইজী হাম্‌কো বোলা—আপ জল্‌দি চলা যাইয়ে কাশী, হুঁয়া আপ্‌কে লিয়ে বিলকুল সব ঠিক হো চুকা হ্যায়।...

শ্রীগুরুদেবের প্রত্যক্ষ আদেশের অপেক্ষায় উদ্বেগবোধ করিলেন কুলদানন্দজী। কত সাধু-মহাত্মার সাধনপূত ধ্যানগম্ভীর আকাশগঙ্গা—বিশেষতঃ স্বয়ং গুরুদেবের ও তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির লীলাক্ষেত্র। ঐ সুনীল, নির্মল আকাশ পরম স্নেহে চুম্বন করে বহু আরাধনার এই পুণ্যভূমি। জীবন ভরিয়া এই আকাশগঙ্গার পরম স্নেহময় বক্ষে থাকিয়াই কি উদ্‌যাপন করা যায় না গুরুদেবের প্রেমধর্ম ও শ্রীনাম প্রচার-ব্রত?

ভগবান বিজয়কৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ। অবশেষে তাঁহারই আদেশে কুলদানন্দজীকে ত্যাগ করিতে হইল এই আনন্দধাম। চণ্ডী-পাহাড় হইতে একদিন বিদায় লইয়াছিলেন চোখের জলে—আজও এখানকার তীর্থনীরে মিশিয়া রহিল তাঁহার অশ্রুধারা। পশ্চাতে রহিল গুরু-শিষ্যের তপস্যার স্মৃতি-বিজড়িত ধ্যানমৌন আকাশগঙ্গা—বর্ষশেষে কুলদানন্দজী উপনীত হইলেন ৺বিশ্বনাথের লীলাক্ষেত্র কাশীধামে।

॥ দুই ॥

শিবধাম বারাণসী। জাহ্নবী এখানে অর্ধ-চন্দ্রাকারে প্রবাহিতা। তীরে অসংখ্য মন্দির ও স্নানঘাট। সর্বত্র পুণ্যার্থী জনতা—মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্ন সাধু-সন্ন্যাসী। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ও মহাদেবী অন্নপূর্ণা এই পুণ্যধামের জাগ্রত দেবতা। গয়ার বোধিদ্রুম তলে সিদ্ধিলাভের পর গৌতম বুদ্ধ প্রথমে এখানেই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন।

কাশীধাম কুলদানন্দজীর বড় প্রিয় তীর্থ। গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন এই মহাতীর্থের কত মহিমার কথা। প্রবল আকর্ষণে, গভীর শ্রদ্ধাভরে অনেকবার তিনি এখানে আসিয়াছেন। সেই পুণ্যধামে অবস্থান করিবার আদেশ লাভ করিয়া তিনি আজ আনন্দিত।

কিন্তু কোথায় থাকিবেন, কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিবেন—কিছু স্থিরতা নাই। স্থানাভাব বশত প্রথমে খুব অসুবিধার সম্মুখীন

হইলেন। অনাবৃত আকাশের নীচে, কখনও বা বৃক্ষতলে আসন করিয়া কাটিয়া গেল কয়েক রাত্রি। পরে নারদ ঘাটের নিকট অপরিচ্ছন্ন নর্দমার পার্শ্বে সংগৃহীত হইল অতি সংকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর একটী ঘর। সেই ঘরেই সর্বদা আসনে নামজপে নিমগ্ন রহিলেন। তাঁহার অযাচক বৃত্তি—উপযাচক হইয়া কেহ কিছু ভিক্ষা দিলে গ্রহণ করিতেন। কোনদিন কিছু না জুটিলেও ভ্রূক্ষেপ নাই—অবিরাম একাগ্রমনে তিনি ধ্যানমগ্ন।

শীঘ্র অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অথচ একটু তৃষ্ণার জল দিবারও কেহ নাই। ভীষণ অসুবিধার মাঝেও তিনি ধীর স্থির—শুধু স্মরণ করিতে লাগিলেন শ্রীগুরুদেবকে। কিন্তু সেই সংকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর ঘরে আর মন টিকিল না। যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেইদিকে চলিবেন—ভাবিয়া পথে বাহির হইবার উপক্রম করিলেন।

সহসা উপস্থিত হইলেন মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর শিষ্য কালীনাথজী। খুব কম ভাড়ায় ২১৬ নং সোনারপুরায় একটী বাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। গুরুকৃপায় এই ভাল বাড়ীর সন্ধান পাইয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন কুলদানন্দজী। সর্বদা তাঁহার সর্বপ্রকার সাহায্যে কালীনাথজীও নিযুক্ত রহিলেন। নিয়মিত সাধন-ভজনের ফলে কিছু-দিনে দেহ ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। মনেপ্রাণে প্রবাহিত হইল প্রাণগঙ্গার আনন্দ প্রবাহ।

পুনরায় দেখা দিল নূতন এক উৎপাত। বাড়ীর মালিক বাড়ীটি বিক্রয় করিবার মনস্থ করিলেন। প্রত্যহ দলে-দলে নানা খরিদ্দার সময়ে অসময়ে আসিয়া বাড়ী দেখিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে সাধন-ভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

বাড়ীটি পছন্দসই ছিল কুলদানন্দজীর। কোন উপায়ে ক্রয় করিতে পারিলে এই পুণ্যধামে সাধন-ভজনে জীবন কাটান যায় নিরুদ্বেগে। কিন্তু তিনি নিতান্ত নিঃসম্বল—বাড়ীর দাম আটশত টাকা, তাঁহার নিকট আটটী পয়সাও নাই। শেষে কী ভাবিয়া কলিকাতায় জিতেন্দ্রনাথকে পত্রযোগে সমস্ত কথা জানাইলেন।

সবেমাত্র ব্যবসায় গুছাইয়া লইয়াছেন জিতেন্দ্রনাথ। ঋণ শোধের পর তাঁহার হাতে তখন সঞ্চিত ঠিক আটশত টাকা। শ্রীগুরুর পত্র পাঠ মাত্র মনে হইল তিনি তো পূর্ব হইতে সবই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।···প্রফুল্লচিত্তে কাশীধাম যাত্রা করিলেন—শ্রীগুরু চরণে প্রণামী দিলেন জীবনের প্রথম অর্থসঞ্চয়।···

জমার অঙ্কে শূন্য বসিল—সবই গেল খরচের খাতায়। কিন্তু ধর্মজীবনের জমাখরচে লাভের অঙ্কই বৃদ্ধি পাইল।···যিনি দাতা, তিনিই গ্রহীতা—অর্থের বিনিময়ে পরমার্থ দাতাও তিনি।···

কুলদানন্দজীর ইচ্ছানুসারে জিতেন্দ্রনাথের নামে বাড়ীটি ক্রয় করা হইল। পুনরায় তাহা দানপত্র যোগে শ্রীগুরু চরণেই উৎসর্গ করিলেন জিতেন্দ্রনাথ। পরে আরো কিছু অর্থব্যয়ে বাড়ীটি সাধন-ভজনের উপযোগী করিয়া লওয়া হইল। সোনারপুরার এই বাড়ীতে সর্বপ্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া এতদিনে নিশ্চিন্তে সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইলেন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী।

বিলকুল সব ঠিক হো চুকা—গম্ভীরনাথজীর এই বাক্য এইভাবে সত্যে পরিণত হইল। কুলদানন্দজী জানিলেন চিরদিনের মত আজো ইহা গুরুকৃপার পরিণতি। গুরুদেবের উদ্দেশে বার বার প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিলেন: ঠাকুর, এমনি করেই বুঝি তুমি আমার যোগক্ষেম বহন কচ্ছ।···

সোনারপুরা আশ্রমে অবস্থান কালে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শৌচ ও গঙ্গাস্নান করিতেন কুলদানন্দজী। ধুনি জ্বালিয়া আসন গ্রহণ করিতেন এবং হোমাদি নিত্যক্রিয়া অন্তে ধ্যানস্থ হইতেন। তাঁহার আঁখিযুগল হইতে বিগলিত হইত অবিরল অশ্রুধারা। আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় পূজা-পাঠ সমাপন করিতেন—বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আসন ত্যাগ করিতেন না। দরজার কবাটের সহিত দড়ি বাঁধা থাকিত; কেহ সাক্ষাৎ কবিতে আসিলে আসনে বসিয়াই সেই দড়ি টানিয়া দরজা খুলিয়া দিতেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ হাতের কাছে আলমারীতে

গোছান থাকিত, যখন যেটী দরকার বাহির করিয়া লইতেন। পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাবোধ তাঁহার প্রকৃতিগত বিশেষ গুণ—ইহা সচরাচর সাধুদের মধ্যে দেখা যায় না। অপরাহ্নে ধুনির আগুনে রান্না করিয়া যৎসামান্য আহার করিতেন। শয্যায় শয়ন দূরে থাক বিশ্রাম গ্রহণ পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া আসনে সমাধিস্থ থাকিতেন দিবারাত্র। তাঁহার কঠোর তপস্যা প্রভাবে স্থানটী মহিমামণ্ডিত হয়। সমস্ত আশ্রমটী সুরভিত হইয়া ওঠে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পদ্মগন্ধে। ঢুলু-ঢুলু নেত্রে তিনি অর্ধবাহ্য অবস্থায় মাধুর্যভাবে সর্বদা আত্মসমাহিত থাকিতেন।

গোস্বামী প্রভু প্রবর্তিত সাধন-প্রণালী প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানসম্মত। সাধক প্রাণময় ও চৈতন্যময় নামের দ্রষ্টা মাত্র। এ যেন চন্দ্রমার আলোকে চন্দ্রদর্শন—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। শ্রীনামেই সাধকের প্রীতি ও ভক্তি, প্রেম ও মুক্তি।···শ্রীনামই সর্বসার, সর্বাধার, সর্বরূপ স্বয়ং পরমেশ্বর। এই সাধনে নাম ও নামী অভেদ। বাহিরের কোন কিছুর মানদণ্ডে এই নামের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা নিরূপণ অসম্ভব। শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিরাম নাম-সাধনার ফলেই শ্রীনামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি-সাপেক্ষ। এই সারতত্ত্ব বহুবার প্রচার করিয়া গিয়াছেন গোস্বামী প্রভু।

আকাশগঙ্গা ত্যাগের বৎসরকাল পূর্ব হইতে সব চাওয়া ও পাওয়ার অবসান হয় কুলদানন্দজীর বৈরাগ্যদীপ্ত সিদ্ধ জীবনে। তখন হইতে তিনি ভরপুর ছিলেন অখণ্ড নামানন্দে। পুণ্যধাম বারাণসীর এই নির্জন আশ্রমে অনুকূল পরিবেশে পূর্ব অনুভূত সত্য-শিব-সুন্দরের মধুর ভাবধারা যথোচিতরূপে উপলব্ধি করিতে থাকেন। নাম-সমাধি অবলম্বনে প্রতি-দিন অতিবাহিত হইতে থাকে পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমভক্তি আস্বাদনের অসীম আনন্দে।···

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩১১। পুরীধামে গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব। কাশীধাম হইতে এই উৎসবে যোগদান করিলেন কুলদানন্দজী।

তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রোহিণীকান্ত তখন হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেক্টর। আর, সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্যামপুরের সাব-রেজিষ্ট্রার। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় সন্তোষনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রথম দর্শনলাভ করেন হ্যারিসন রোডের বাসায়। কীর্তনে গোসাঁইজীর অপূর্ব-ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তখন হইতে গোস্বামী প্রভুকে মনে মনে তিনি গুরুরূপে বরণ করেন। তাঁহার একখানি ফটো গোপনে রাখিয়া সেখানে সম্পন্ন করিতেন নিত্য সেবা-পূজা, ধ্যান-ধারণা।

একদিন একটি চুরির তদন্ত উপলক্ষে রোহিণীকান্ত অতিথি হিসাবে উপস্থিত হইলেন সন্তোষনাথের বাসায়। সেখানে গোস্বামী প্রভুর ফটো দেখিয়া সব বুঝিতে ও জানিতে পারিলেন। তাঁহার নিকট ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর সম্যক পরিচয় পাইলেন সন্তোষনাথ বাবু। তিনি দীক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

আষাঢ় মাসে পুরীধাম হইতে উলুবেড়িয়ায় ভগবতী বাবুর বাসায় আগমন করেন কুলদানন্দজী। সেখান হইতে আসিলেন শ্যামপুরে রোহিণীকান্তের বাসায়। ব্রহ্মচারীজির অপরূপ রূপ-মাধুরীতে মুগ্ধ হইল শ্যামপুরবাসী।

সেইদিন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা কার্য উপলক্ষে বাহিরে গেলে মহিলারা কুলদানন্দজীকে দর্শন করিতে যাইবার উদ্যোগ করেন। সন্তোষনাথ তাঁহার স্ত্রীকে বাধা দিলেন। ব্রহ্মচারী সুপুরুষ যুবক—তাঁহার কন্দর্প-কান্তি রূপ-লাবণ্য। তাঁহার নিকট পুরুষসঙ্গীহীন মহিলাদের এভাবে যাওয়া সমীচীন মনে হইল না সন্তোষ বাবুর। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সন্ধ্যায় গেলেন ব্রহ্মচারীজির নিকট। ব্রহ্মচারীজিও অন্তর্যামীরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ দান করিলেন।

সর্বপ্রকার পরীক্ষার পর লজ্জিত ও ভক্তিনত হইলেন সন্তোষবাবু। বুঝিলেন ব্রহ্মচারীজি প্রকৃত উর্ধ্বরেতা, কামজিত মহাপুরুষ। তখন বাড়ীর মহিলাদের নিঃসংশয়ে ব্রহ্মচারীজির সঙ্গলাভ করিবার অনুমতি দিলেন।

অতঃপর, কুলদানন্দজীর নিকট সস্ত্রীক সন্তোষনাথ বাবু দীক্ষা গ্রহণ করেন।

৩০শে আষাঢ়, ১৩১১। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর সদ্‌গুরু জীবনে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এইদিন শ্যামপুরে একসঙ্গে বহু নর-নারীকে তিনি মহাশক্তিযুত নামমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। গোস্বামী প্রভুর নির্দেশে প্রকাশ্যে সর্ব-তাপহারী সদ্‌গুরুরূপে এই তাঁহার প্রথম ও পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ।

দীক্ষাদানকালে অনেকে নানা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। নানা জ্যোতি দর্শন করিয়া কেহ অভিভূত হইয়া পড়েন, নানা দেবদেবীর দর্শনলাভে স্তবস্তুতি করিতে থাকেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন, অট্টহাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়েন—কেহবা অশ্রু-কম্প-পুলকে অধীর হইয়া ওঠেন। দীক্ষা অন্তে অভাবনীয় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল দিকে দিকে।···

এইদিনে দীক্ষার্থীদের মধ্যে শরৎচন্দ্র বালিয়াল, হেমচন্দ্র বটব্যাল, কেদারনাথ বটব্যাল, ডাঃ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সতীর্থের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

শ্যামপুর হইতে কাশীধামে প্রত্যাবর্তন করেন কুলদানন্দজী। আশ্রমে পূর্ববৎ নিরবচ্ছিন্ন নামানন্দে সমাহিত অবস্থায় তাঁহার দিন কাটিয়া যায়।

এই সময়ে মাঝে মাঝে শিষ্যবর্গের সহিত তাঁহার চিঠিপত্রের আদান প্রদান আরম্ভ হয়। এই চিঠিগুলি তাঁহার তৎকালীন চিন্তা ও মনোভাবের চমৎকার দর্পণ।

কেদার বাবুর একখানি চিঠির উত্তরে তিনি লেখেন :

"শ্রদ্ধাভাজনেষু—

···আমার প্রতি আপনাদের অতিরিক্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা-ভালবাসা দেখিয়া যথার্থই আমি লজ্জিত আছি। সন্তোষ বাবুকে বলিবেন—একাকী কোথাও আমি কখনও ছিলাম না, ঠাকুরের সঙ্গেই ছিলাম।···গুরুভ্রাতা বা অনুগত লোক আমার সাহায্যার্থে রাখা প্রয়োজন হইলে ঠাকুর সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। আমি বেশ আনন্দে আছি। আমার জন্যে ব্যস্ত হইবেন না। ইতি আং ব্রহ্মচারী।"

সিদ্ধকাম মহাযোগী হইলেও তুচ্ছ বিষয়ে ব্রহ্মচারীজি আজও গুরুদেবের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। তেমনি নিরহঙ্কার বলিয়া অনুগত শিষ্যের প্রতিও তিনি কত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শিষ্যের শ্রদ্ধাভক্তিতে কতখানি

এই প্রসঙ্গে সন্তোষবাবুকে লিখিত আর একখানি পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধন-জীবনে কামজিৎ হইয়াও লোভ ও অহঙ্কার সম্পূর্ণভাবে জয় করিবার জন্য তাঁহার অদম্য সাধনা স্মরণীয়। আজ এই পত্রখানি তাঁহার পরিপূর্ণ নির্লোভ ও সুবিনীত মনোভাবের সুন্দর নিদর্শন, সদ্‌গুরু কুলদানন্দজীর বিচিত্র প্রতিচ্ছবি।

জয়গুরু

প্রীতিভাজনেষু— ২রা অক্টোবর, ১৯১৭।

২১৬, সোনারপুরা, কাশীধাম।

... * * *

আপনাদের অবস্থা আমি জ্ঞাত আছি। বিষয় অনটনের অবস্থায়ও প্রাণপণ করিয়া আমার সুবিধার নিমিত্ত যেভাবে এতগুলি টাকা দিলেন, তাহাতে যথার্থই আমি খুব লজ্জিত আছি। আমার প্রতি আপনাদের তেমন আত্মীয়তা-বোধ থাকিলে ভবিষ্যতে অগ্রপশ্চাৎ বিচারশূন্য হইয়া এক কপর্দ্দকও আর না দেন, আমার এই প্রার্থনা স্মরণ রাখিবেন।··· আশ্রিত বা ভালবাসার পাত্রের রক্ত চুষিতে যেন না হয়, এ বিষয়ে আমার হিতার্থী হইয়া আপনারা আমায় রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? আপনারা ক্লেশ করিয়া কিছু পাঠাইলে আমাকে অপরাধ-গ্রস্ত হইতে হইবে।···সকলে আমার ভালবাসা জানিবেন। ইতি

সর্বদা তাঁহার কাম্য ছিল শিষ্যদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। আবাল্য সহজাত মনোভাবের ন্যায় আজো সর্বকর্ম তিনি সমর্পণ করিতেন ভগবানের উদ্দেশে। সন্তোষবাবুকে আর একখানি চিঠিতে লেখেন: "প্রতিদিন আমি আপনাদের সকলকে স্মরণ করি। আমি একাকী

আছি বলিয়া চিন্তা করিবেন না। ভগবান ব্যবস্থা করিবেন। যাহা কিছু অসুবিধা আছে তাহারও বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।…”

শ্যামপুরে ঠাকুর কুলদানন্দের সদ্‌গুরুলীলায় সন্তোষনাথের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সহজাত ধর্মভাব, অকৃত্রিম সরলতা ও সর্বদা মধুর হাসির জন্য তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র। দীক্ষার পর নানাবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রচুর শিক্ষা দান করেন কুলদানন্দজী। পরিশেষে সন্তোষনাথ ব্রহ্মচারীজির একান্ত অনুগত হইয়া ওঠেন। ভাগ্যদেবীর হস্তেও বার বার তিনি নির্মম আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্রই পর পর অকাল মৃত্যু বরণ করে। ইহাতে তাঁহার কিছুটা চিত্তবিকার দেখা দেয়। কিন্তু এই চরম দুঃখ বিপদের মাঝে সদ্‌গুরু কুলদানন্দজী ছিলেন একমাত্র সহায়, পরম অবলম্বন। তাঁহার হৃদয়বেত্তাও যেমন সুকোমল, তেমনই সুগভীর।

সন্তোষবাবুর প্রথম পুত্র বিয়োগের পর কুলদানন্দ লেখেন: “গৌরী (সন্তোষবাবুর স্ত্রী) এই ক্লেশে কী প্রকারে স্থির হইবে? শোকের আবেগে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে উহাকে কখনও বাধা দিও না। উহার ক্লেশ আমার বুঝিবার সাধ্য কি? প্রমীলা (ক্ষেত্রনাথ বাবুর স্ত্রী) উহার অবস্থা বুঝিবে। প্রমীলার নিকট অনেক সময়ে থাকিতে দিও। শোকের শান্তির জন্য কোনপ্রকার বুঝ না দিয়া বরং কেহ উহার সঙ্গে বসিয়া কাঁদিতে পারিলে উহার কতক শান্তি হয়।”

সন্তোষবাবুর আর একটী পুত্র বিয়োগের পর ধৈর্যধারণ করিবার জন্য চিঠি দেন কুলদানন্দজী। কিন্তু উপর্যুপরি শোকে অধীর হইয়া পড়েন সন্তোষবাবু। তাঁহার মস্তিষ্কের কিছুটা বিকৃতিও দেখা দেয়। চাকরী ছাড়িয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া গুরুদেবকে তিনি কয়েকখানি চিঠি দেন। কিন্তু শিষ্যের এই চঞ্চলতার প্রশ্রয় দেন নাই কুলদানন্দজী। প্রারব্ধ ভোগের জন্য তাঁহাকে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া চাকরী করিবার সস্নেহ নির্দেশ দান করেন। তিনি লেখেন! “আবার নাকি তোমার সেই গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে।…আমি বড়ই কাতরপ্রাণে

তোমার দয়া ভিক্ষা করিতেছি। সাধনভজন বরং সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে, তথাপি লোকাচার ছাড়িবে না। প্রাণায়ামাদি এক মাস বন্ধ রাখ। আসনে বসিয়া ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া, সন্ধ্যা-পাঠ-হোম মাত্র করিবে। নাম দিনে রাত্রে অর্দ্ধঘণ্টার বেশী নয়। দশজনে তোমার যে চাল ও ব্যবহার পছন্দ করে, তাহাই করিবে।···চাকরী করিতে তোমার অতিশয় অপ্রবৃত্তি। তোমার যে দারুণ কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু কী করিবে? কর্ম্ম একটু আছে—না করিলে চলিবে কেন?"···

এইভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া চাকরী ছাড়িতে নিষেধ করেন ব্রহ্মচারীজি। কারণ বিপর্যস্ত পরিবারটীর কল্যাণ চিন্তায় তখন তিনি সবিশেষ উদ্বিগ্ন। সন্তোষবাবু তবুও তাঁহার জিদ ছাড়িতে পারেন না। তখন বাধ্য হইয়া কঠোর শাসনের সুরে কুলদানন্দজী লিখিলেন:

"নিজেদের জীবনের কল্যাণ কিসে হয় নিজেরাই বুঝিয়া আপন আপন রুচি ও বুদ্ধি অনুসারে যখন ধর্মজীবন গঠন করিতে চলিয়াছ, তখন আমার নিকট আসাই ঠিক হয় নাই। ঠাকুরের প্রথম উপদেশই এই যে, শরীর মন সুস্থ রাখিয়া কর্তব্য কার্য যথামত বজায় রাখিয়া যথাসম্ভব সাধন পথে চলিতে হইবে। ঠাকুরের আদেশ পালনই কর্তব্য —তাহাই ধর্ম্ম। উহা ব্যতীত ধর্ম্ম বলিয়া অন্য কিছু আছে বলিয়া জানি না। ভাবুকতা ধর্ম্ম নয়, উহা ধর্ম্মজীবন লাভের অন্তরায়। মহাপুরুষরা বলেন, অতিরিক্ত ভগবৎ ভজনাতেও নাকি তামস ভাব জন্মে। তুমি আজকাল কিভাবে চলিতেছ, কি করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখিও। আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অবশ্য নিত্যক্রিয়া, সন্ধ্যা, পাঠ ও হোম ব্যতীত আর কিছু করিও না। প্রাণায়াম কুম্ভক একেবারে ছাড়িয়া দাও। দুই একবার মাত্র নাম করিবে। দৃষ্টিসাধনও ত্যাগ কর। হাসি, গল্প, আমোদ নিয়া কিছুকাল কাটাও। সময় খুবই খারাপ পড়িয়াছে। এ সময়ে সরকারী চাকুরী যাহা করিতেছ সহজ নয়। তোমার ঐ চাকরী আমার ভরসা। উহা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন? কর্ম ছাড়িয়া সাধন-ভজনে তোমার বেশী কল্যাণ হইবে না। আত্মার যথার্থ কল্যাণের

জন্য ঐ চাকরী নিয়া থাকাই তোমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সকল দিক রাখিয়া না চলিলে ভবিষ্যতে বিষম অনর্থ ঘটিবে। তাহা শুধু তোমার নয়, আমারও।”

চিঠি দুইখানি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কতখানি স্নেহ, দরদ ও আন্তরিকতার সহিত সন্তোষনাথকে ধৈর্যচ্যুতির পথ হইবে স্বাভাবিক পথে তিনি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপন স্বার্থে যিনি চির অন্ধ, তিনিই লিখিতেছেন: তোমার ঐ চাকুরী আমার ভরসা।···নিজের খ্যাতি-অখ্যাতি, মান-অপমান তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ, নিছক মিথ্যা পরিহাস। অথচ অনুগত শিষ্যের প্রাণে মমতা ও সহানুভূতি জাগ্রত করিবার জন্য তিনিই বার বার সন্তোষনাথের পাগলামির জন্য নিজের অখ্যাতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শোকসন্তপ্ত, ধৈর্যচ্যুত সন্তোষনাথের জিদ ও পাগলামি তবুও ঘুচিতে চায় না। তাই যুগপৎ রূঢ় ও মধুর বাক্য ব্যবহার করিয়া তিনি আবার লিখিলেন:

“স্নেহের সন্তোষ, আজ পর্যন্ত তোমার চমক ছুটিল না। একি! সরকারী চাকুরীটি না থাকিলে পরিবার ভাত অভাবে মারা পড়িবে। তোমারও সাধন-ভজন একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। জুয়াচুরি, বদমায়েসি সকলই তোমার দ্বারা যাহা অসম্ভব মনে কর সম্ভব হইবে।

আমি শ্যামপুরে যাইব ভাবিয়াছিলাম। তোমার এই অস্বাভাবিক অবস্থা থাকিতে যাইতে সাহস করি না। তুমি নিয়মমত আফিসের কার্য্য করিয়া দশজনের মত হইয়া চলিলে আমি শ্যামপুরে যাইব।

দেশে বিদেশে আমার দুর্নাম তোমার দ্বারা রচিত হইল।···করজোড়ে তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই যে, আবার নিয়ম মতন আফিসের কার্য্য কর। দশজনের সঙ্গে হাসি, গল্প, আনন্দ করিয়া দিন কাটাও। আমার এই প্রার্থনা তুমি অগ্রাহ্য করিলে তোমার সাধন-ভজন সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে জানিও। আমি দিনরাত তোমার দুরবস্থার চিন্তায় বিষম যন্ত্রণা পাইতেছি। সময় সময় মনে হয় ধর্ম্মরূপে কোন প্রেত তোমায় চালাইতেছে।

হাত-পা ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়। সাধারণ লোকের মতন চল। তাহলে আমিও খুব শীঘ্র শ্যামপুরে যাইব।

আশীর্ব্বাদক শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।"

এইভাবে প্রিয়শিষ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে উন্মুখ ছিলেন সদ্‌গুরু কুলদানন্দ। সাধারণতঃ গুরু নামদাতা। কিন্তু কুলদানন্দ ছিলেন শিষ্যের পরিত্রাতা—তাহার চরম দুঃসময়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু।...প্রকৃত শিক্ষা ও সান্ত্বনা দিয়া শিষ্যকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য তিনি আবার জানাইয়াছেন নিজের দুঃখ ও দুর্নামের কথা, আবার বলিয়াছেন কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইবার কথা। প্রতি নিঃশ্বাসে নাম-সাধন তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অথচ, সেই সাধন ছাড়িয়া শিষ্যকে তিনি নির্দেশ দিয়াছেন হাসি গল্পের নিতান্ত সহজ পথে ফিরিয়া আসিতে। এবং সর্বোপরি শিষ্যের পদানত হইয়া ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কুলদানন্দ নিবেদন করিয়াছেন আকুল ভিক্ষা, সকাতর প্রার্থনা।...ইহাই কুলদানন্দের সদ্‌গুরুজীবনের অতুলনীয় মহিমা। শিষ্যরূপে ভগবান বিজয়কৃষ্ণের নিকট অবিচল নিষ্ঠায় ও আনুগত্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তেমনি সদ্‌গুরুরূপেও শিষ্যের কল্যাণচিন্তায় ও প্রকৃত শান্তিবিধানে তিনি ছিলেন ঠিক তেমনিই আত্মহারা, শিষ্যের ধর্মজীবন গঠনের আদর্শ সহায়ক।...শিষ্যের মানসিক স্থৈর্য ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজেকে এইভাবে বিলাইয়া দিবার দৃষ্টান্ত সত্যই সুদুর্লভ!...

একদিকে যোগিরাজ কুলদানন্দের অসামান্য তপঃপ্রভাব, অন্যদিকে সদ্‌গুরু কুলদানন্দের সহৃদয় অনুশাসন—ইহা বৃথা হইবার নয়। গুরু-শিষ্যের মাঝে যে সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার অবসান হইল। এতদিনে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন সন্তোষনাথ। উদ্ধত, উন্নত শির গভীর ভক্তিতে অবনত হইল গুরুদেবের শ্রীচরণতলে। পর্বতের বুক চিরিয়া প্রবাহিত হইল পূত মন্দাকিনী।...

ইহাতে খুবই সন্তুষ্ট হইলেন কুলদানন্দ। অন্তরঙ্গ ভক্তের তাপিত-প্রাণ শীতল করিয়া অন্তরে লাভ করিলেন গভীর শান্তি ও তৃপ্তি। তখন

অজস্রধারে বর্ষিত হইল তাঁহার অনন্ত স্নেহময় অক্ষয় আশীর্বাদ। সন্তোষ বাবুকে তিনি লিখিলেন,—

"পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের সন্তোষ, আমার ভরা মনের ষোলআনা আশীর্বাদ তুমি গ্রহণ কর। ভগবান গুরুদেব তোমার প্রতি চিরকাল সুপ্রসন্ন থাকুন। যে দুর্লভ অবস্থা লাভ করিয়া পরিবারবর্গের বিষম দুরবস্থায় তুমি চাকুরী, সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা বিসর্জন দিয়া বসিয়াছিলে, যে আনন্দে মগ্ন থাকায় লোকের গঞ্জনা অপবাদে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছিলে, সেই পরম স্বার্থ ও আনন্দ আমার একটী মাত্র কথায় তৃণের মত অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়াছ—ইহাতে আমি মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছি। তুমি আমার আশীর্বাদ-পাত্র হইলেও নমস্য। তুমিই ধন্য—তোমার সম্বন্ধে আমিও কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। তোমার ঐ অবস্থা লাভ হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশেষ আনন্দ হয় নাই, কারণ উহা তোমার কিছুই নয়। ঠাকুরের কৃপার দান মাত্র ভোগ করিয়াছ। কিন্তু ঐ আনন্দ তুমি একটী কথাতে তুচ্ছ করিয়া ফেলিবে ইহা সহজ নয়। তুমি অনুগত হইয়া আমার পূজনীয় হইয়াছ। আমি পুনঃপুনঃ তোমাকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিয়াছি ও করিতেছি।···

অসাধারণ উদারতায় ও ভাবমাধুর্যে চিঠিখানি, এক কথায়, সত্যিই অতি অপূর্ব। বারবার বিদ্রোহী হইবার পর শিষ্য বাধ্য ও অনুগত হইলে গুরু খুবই খুশী হইয়া আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতে পারেন। কিন্তু ভগবান বিজয়কৃষ্ণের বরপুত্র কুলদানন্দজী শিষ্যকে জানাইয়াছেন উদাত্ত অভিনন্দন, সশ্রদ্ধ নমস্কার। কুলদানন্দের দিব্য জীবনে সদ্‌গুরুর এই লীলা ও মহিমা সত্যই বিস্ময়কর।···এইভাবে সন্তোষনাথের মানসিক ও আত্মিক পরিবর্তন সাধন করেন; সদ্‌গুরুরূপে অনুগত শিষ্যদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার ইষ্ট-অনিষ্টের প্রতি তিনি ছিলেন যত্নশীল। ইহার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে কুলদানন্দজীর সদ্‌গুরু জীবনে।

দীক্ষাপ্রার্থীগণকে গোস্বামী প্রভু প্রবর্তিত অজপা সাধন প্রণালী ও প্রাণায়াম শিক্ষা দিতেন কুলদানন্দ। এই দুর্লভ সাধনপ্রাপ্ত ভাগ্যবানেরা

অনুভব করিতেন, তাহারা সত্যই নবজীবন লাভ করিয়াছেন। সদ্‌গুরু কুলদানন্দ তাঁহার শিষ্যদের বলিতেন: "কোন মনুষ্য এই সাধনের প্রবর্তক নন। উহা অনাদিকালের সাক্ষাৎ শ্রীমন্নারায়ণ প্রদত্ত সাধন। মহাদেবাদি যোগীশ্বরেরাও এই সাধন অবলম্বন ক'রে সিদ্ধকাম হয়েছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদাদি এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন। ইহা অনাদি-যুগের ঋষি ও পরমহংসদিগের সেবিত সিদ্ধ প্রণালী। গোসাঁইজী কৃপা ক'রে এই প্রথম গৃহস্থ জনগণের মধ্যে ইহা বিতরণ কচ্ছেন। সদ্‌গুরু প্রদত্ত এই নাম নিছক নাম নয়, অক্ষর নয় বা একটা শব্দ নয়। এই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তি সঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা।"...

॥ তিন ॥

১৩১৪ সাল পর্যন্ত কাশীধামই ছিল নীলকণ্ঠ কুলদানন্দের সদ্‌গুরু লীলা প্রকাশের প্রধান কেন্দ্র।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে পুরীতে গুরুদেবের সমাধি উৎসবে তিনি যোগদান করিতেন। এইরূপ যাতায়াতের ফলে ক্রমশঃ জনসমাজে তাঁহার জ্যোতি ও তপ প্রভাব বিস্তৃত হয়। দিন দিন শিষ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কাশী ও পুরী যাতায়াতের সময় তিনি কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। সেই সময়ে বহু ছাত্রছাত্রী ব্রহ্মচারীজিকে সাগ্রহে দর্শন করিতে আসিত। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্রমেই বিস্তৃত হয় সদ্‌গুরু কুলদানন্দের অপার মহিমা। ফলে দেখা দেয় দীক্ষার্থীর অবিরাম আনাগোনা। কাশীধামে অবস্থান কালেও কাশীবাসী অনেক ভক্ত নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৩১৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী উৎসবে যোগদানের পর কলিকাতায় আগমন করেন ব্রহ্মচারীজি। এই সময় মধুরায়ের গলিতে তাঁহার গুরুভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বাড়ীতে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। সামন্ত মহাশয় ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বর্ধমানে ছিল তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী, আর বড়বাজারে ময়দাপটিতে ছিল লোহার কারবার। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল ব্রহ্মচারীজিকে তাঁহার বর্ধমানের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাহা হইলে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্যলাভ করিবে। তাই বর্ধমানে যাইবার জন্য ব্রহ্মচারীজিকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইলেন দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু ব্রহ্মচারীজির তখন আর সময় ছিল না। পৌষ মাসে যাইতে সম্মত হইয়া তিনি কাশী প্রত্যাগমন করেন।

পৌষ মাসের প্রথমে কাশী হইতে কলিকাতা আসিলেন ঠাকুর কুলদানন্দ। দেবেন্দ্রবাবু আসিয়া নিবেদন করেন যে ইতিমধ্যে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ কেহ অলৌকিকভাবে স্বপ্নে তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছে এবং সাক্ষাৎলাভের জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল আছে। দশ বারো দিন পরেই দেবেন্দ্রবাবুর সহিত তিনি বর্ধমানে গমন করেন। দেবেন্দ্রবাবুর পরিবারের অনেকেই এই সময়ে দীক্ষালাভ করেন।

কাশী, পুরী ও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া শ্যামপুর, বর্ধমান, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানেও কুলদানন্দজী যাতায়াত করিতে থাকেন। বহু নরনারী ক্রমে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অমৃতমধুর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ করে। তাঁহার পতিত পাবন মনোমোহন দিব্য মূর্তি দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। সকলেই তাঁহার অলৌকিক তপ প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন।

কিন্তু ঠাকুর কুলদানন্দ কাশী হইতে আসিয়া অবস্থান করেন মাত্র দু চার দিনের জন্য। সেজন্য শিষ্যগণ দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার মধুর সঙ্গলাভে বঞ্চিত থাকেন। সুদূর কাশীধামে গিয়া সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করাও অনেকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইহাতে অনুগত শিষ্যদের ম্লান মুখচ্ছবি, ভক্তিমতী শিষ্যাদের বিদায় অশ্রু ব্যাকুল করিয়া তোলে ঠাকুর কুলদানন্দের সুকোমল হৃদয়। বাঙলা দেশে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় অবস্থান করিবার সবিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিতে

থাকেন। তবু চিরদিনের ন্যায় আজও সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন ভগবান গুরুদেবের উপর একান্ত নির্ভরশীল। এজন্য নিজে এ বিষয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা করিলেন না। কখনও কোন বিষয়ে নিজস্ব কিছুমাত্র কৃতিত্বই তিনি স্বীকার করিতেন না।

ব্রহ্মচর্য প্রদানের দ্বিতীয় বর্ষে গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন: 'প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা'।···গুরুদেবের সেই নির্দেশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল ব্রহ্মচারীজির তপঃসিদ্ধ অন্তরে। এইজন্য কিছুমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তাও ছিল তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। সদ্‌গুরু জীবনের কোন লীলা বা ঐশ্বর্য তিনি নিজস্ব মহিমা বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। ভগবান শ্রীগুরুদেবের চরণে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত। নিজের বলিতে কিছুই তাঁহার ছিল না, কিছুই তিনি রাখেন নাই। সাধক জীবনের ন্যায় সিদ্ধ ও সদ্‌গুরু জীবনেও গুরুদেবের শ্রীচরণে তাঁহার শরণাগতি ছিল প্রকৃত বিস্ময়কর। নিজস্ব গোপন সাধনা ও সমাধির মৌন আবরণ উন্মোচন করিয়া কখনও প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। সদ্‌গুরু লীলার প্রতি পদক্ষেপে তিনি ছিলেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণের উপর একান্তভাবে আত্মনির্ভরশীল। এজন্য তাঁহার সদ্‌গুরু জীবনেও প্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রচারের প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর। 'কুলদাকে দিয়ে আমার যে অনেক কাজ করাবার আছে'—গোসাঁইজীর এই বাণী ছিল তাঁহার জপমন্ত্র। মনে প্রাণে জানিতেন তাঁহারই আধারের মাধ্যমে নিত্য বিকীর্ণ হইবে গোসাঁইজীর অপরূপ জ্যোতি,···নিত্য সঞ্চারিত হইবে তাঁহাবই অমোঘ সদ্‌গুরু-শক্তি,···অপার ক্ষান্তি ও শান্তি। ···জানিতেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মরজগতে বর্ষিত হইতেছে বিজয়কৃষ্ণের চিন্ময়ঘন বরাভয়রূপী আশীষ-ধারা। সুতরাং গোসাঁইজীর ইচ্ছায় যথাসময়ে তাঁহার ভিতর দিয়া সাধিত হইবে আশ্রম স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি নিজে চিরদিন রহিবেন বিজয়কৃষ্ণের ছায়া ও প্রতিভূ, তাঁহার অজেয় শক্তির ধারক ও বাহক।···তাই আজ কুলদানন্দজীর মধ্য দিয়া বিজয়কৃষ্ণের নাম, রূপ, ভাব ও মহিমা শতধারে বিচ্ছুরিত হইতে চলিল সারা ভারতবর্ষে।···

প্রতি বৎসরে শ্যামপুরে দুইচারি সপ্তাহ কাল অবস্থান করিতেন কুলদানন্দজী। শিষ্যদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই অবসর যাপন। সন্তোষনাথ প্রমুখ শিষ্যদের এই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান ও সাধন-ভজনে উৎসাহ দান করিতেন। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে একদিন সন্তোষনাথ ও শরৎচন্দ্র বালিয়াল মহাশয়কে ব্রাহ্মণের নিত্য অগ্নিসেবার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করেন।

গোসাঁইজীর উপদেশের সারমর্ম এই ছিল যে—যে ব্রাহ্মণ শিষ্য-প্রশিষ্য এক বৎসর নিয়ম মত ত্রিসন্ধ্যা করিবেন, তিনি পর বৎসর গায়ত্রী মন্ত্রে ১০৮ বার আহুতিদানে নিয়মিত সাবিত্রী হোম করিবেন এবং তৃতীয় বৎসর হইতে সাধারণ হোমমন্ত্রে নিত্য অগ্নিসেবা করিবেন। এইরূপ সাগ্নিক ব্রাহ্মণই মাত্র মহাহোমে যোগদান করিবার অধিকারী।

গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃসংস্থাপন করাই ছিল কুলদানন্দের উদ্দেশ্য। সেইজন্য মহাষ্টমীর দিনে সমবেত ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে তিনি সমগ্র চণ্ডীপাঠ করিয়া হোম করিবার নির্দেশ দান করেন। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রায় চার ঘণ্টাকাল গব্যঘৃত সংযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা আহুতি দানে সপ্তশতী মহাহোমের শিক্ষা দান করেন।

১৩১৫ সালের প্রথম ভাগ। এই সময় হইতে দেখা দিল কতকগুলি ঘটনার পরিষ্কার যোগাযোগ। ফলে ঠাকুর কুলদানন্দের বাঙলা দেশে অধিক সময় থাকিবার সুব্যবস্থা হইল।

বাঙলার ইতিহাসে তখন আধ্যাত্মিক উন্নয়নের যুগ। বাঙলার ধর্মপিপাসু নরনারীর সচেতন দৃষ্টি সেই সময়ে নিবদ্ধ ছিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের মূর্তবিগ্রহ, অলৌকিক শক্তিধর এবং পঞ্চমপুরুষার্থ সিদ্ধযোগী কুলদানন্দজীর উপর। মস্তকে সুবিপুল জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ তুলসী পদ্মবীজ প্রভৃতির মালা, স্থির নেত্রে প্রদীপ্ত বৈরাগ্যের অমৃতাঞ্জন। তিনি রুদ্র অথচ মধুর, কঠোর অথচ কোমল, দৃঢ় অথচ শান্ত-সমাহিত। ব্রহ্মানন্দে বিভোর সেই জ্যোতির্ময় অধ্যাত্ম বিগ্রহ,

জ্বলন্ত পাবক সম সেই অপরূপ মূর্তি দর্শন করিয়া বাঙালীর নয়ন-মন তখন সার্থক। মন্ত্রমুগ্ধ সেই বাঙালীর সম্মুখে তিনি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিলেন বিজয়কৃষ্ণের সাধনার ধারা ও আদর্শ। ঋষিবাক্য অভ্রান্ত, বর্ণাশ্রম ধর্মের আদর্শই একমাত্র পথ—বিজয়কৃষ্ণের এই বাণী চতুর্দিকে বিঘোষিত করিলেন তাঁহারই বিগ্রহমূর্তি সদ্‌গুরু কুলদানন্দ।

এতদিন গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের গৃহে দুই চারি দিন করিয়া অবস্থান করিতেন। কিন্তু গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যসংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শিষ্য ও ভক্তগণও সর্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসায় গৃহস্থদের পক্ষে দেখা দিল নানা উদ্বেগ ও অসুবিধা। একটী স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন ক্রমেই অনুভব করিতে লাগিলেন কুলদানন্দজী।

গুরুভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সামন্তের লোহার দোকানের কর্মচারী ছিলেন মহানন্দ নন্দী ও নলিনাক্ষ তা। মনিবের বাড়ীতে প্রথম দর্শনেই কুলদানন্দের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন মহানন্দ। তাঁহার সহিত নলিনাক্ষেরও অন্তরে জাগে দীক্ষাপ্রাপ্তির প্রবল আগ্রহ। পুরী যাইবার জন্য কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়া ১৭ নং ছকু খানসামা লেনে শশীবাবুর বাড়ীতে ওঠেন কুলদানন্দজী। এই সময় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া নিতান্ত ব্যাকুলভাবে দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন মহানন্দ।

১৩১৫ সালে বৈশাখ মাসের শেষে তিনি দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষার পরই মহানন্দকে লইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী উৎসবে যোগদান করেন ব্রহ্মচারীজি। বৃদ্ধা জননীকে কাশীবাস করাইবার জন্য কিছুদিন পূর্বে তাঁহাকে কাশী আনিয়াছিলেন। কাশী হইতে আসিবার সময়ে মাতার শরীর ভাল ছিল না। পুরী হইতে ফিরিবার পথে মায়ের অসুখ বৃদ্ধি পাইয়াছে শুনিয়া শীঘ্রই কাশী চলিয়া গেলেন। ভাদ্র মাসে হরসুন্দরী কাশীপ্রাপ্ত হইলেন। পুত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জননীর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি মুখাগ্নি করিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। তাঁহার সামান্য বন্ধনটুকুও ছিন্ন হইল এতদিনে—তিনি ইহলোকে সর্ববন্ধনমুক্ত হইলেন।

ব্রহ্মচর্য গ্রহণের প্রাক্কালে জননীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যখন যেখানে থাকুন না কেন মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিবেন। গুরুদেবের কৃপায় সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলেন মাতৃভক্ত কুলদানন্দ।

এতদিন বৃদ্ধা জননীকে একা রাখিয়া কাশী ছাড়া অন্য কোথাও তিনি বেশীদিন থাকিতে পারিতেন না। এজন্য বাঙলা দেশের শিষ্যগণও তাঁহার দর্শন ও সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইত। এখন হইতে কী উপায়ে গুরুদেবকে কলিকাতা অঞ্চলে আনিয়া রাখা যায়, শিষ্যগণ তাহা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র একটী বাসস্থান নির্মাণের একান্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল।

জিতেন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাড়ী ছিল চন্দননগরে। পূজার সময় তিনি কাশী গেলেন—তাঁহার চন্দননগরের বাড়ীতে গিয়া কিছুদিন নির্জনে বাস করিবার অনুরোধ জানাইলেন ব্রহ্মচারীজিকে। কুলদানন্দজী সম্মত হইলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে কলিকাতায় আসিয়া জিতেন্দ্রনাথের মির্জাপুর ষ্ট্রীটের বাসায় উঠিলেন। এখানে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বিখ্যাত শ্রীমাণী পরিবারের গণেশ শ্রীমাণী সস্ত্রীক দীক্ষিত হইলেন।

বহু নরনারী ব্রহ্মচারীজিকে দর্শন করিতে আসিত। অনেক সময় তাঁহাদের সহিত নানা কথাবার্তাও বলিতে হইত। এতকাল নির্জনেই সাধন-ভজনে কাল কাটাইয়াছেন; এখন বহু লোকের সমাগমে স্বভাবতই অস্বস্তি ও অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন, ধর্মকার্যেও নানা বিঘ্ন দেখা দিল। তখন জিতেন্দ্রনাথ চন্দননগরে তাঁহার পৈত্রিক বাড়ীতে গিয়া থাকিবার জন্য শ্রীগুরুকে আবার অনুরোধ জানাইলেন; তাহা সমীচীন মনে করিয়া কুলদানন্দজীও চলিয়া গেলেন চন্দননগরে।

এখানে যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নলিনাক্ষ তা সর্বপ্রথম। পরে নলিনাক্ষের পিতা বেনীমাধব, অগ্রজ চুনীলাল এবং মহানন্দের অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী দীক্ষাগ্রহণ করেন। সেবা ও গুরুভক্তিতে জিতেন্দ্রনাথ ও সন্তোষনাথের ন্যায় মহানন্দ ও নলিনাক্ষও

ছিলেন সকলের আদর্শস্থানীয়। তাঁহারা ছিলেন কর্মবীর সদ্‌গুরু কুলদানন্দের লীলা-সহচর।

এই সমস্ত গুরুভক্ত শিষ্যদের মনে হইল, চন্দননগরে গুরুদেবের জন্য একটী স্বতন্ত্র আশ্রম নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শোনা গেল, ঠিক সেই সময় জিতেন্দ্রনাথের বাড়ীর পার্শ্ববর্তী বাড়ীটি বিক্রয় হইবে। অনুরাগী শিষ্যদের উদ্যোগে অবিলম্বে ব্রহ্মচারীজির নামে বাড়ীটি ক্রয় করা হইল। বাড়ীটি অত্যন্ত জীর্ণ ও পুরাতন—স্থানও অল্প, আর ঘর মাত্র দুই তিনখানি। রীতিমত সংস্কার ব্যতীত সেখানে বসবাস অসম্ভব; সংস্কার করিতেও বহু অর্থের প্রয়োজন। শিষ্যদের কেহই সঙ্গতিসম্পন্ন নহেন; তাঁহাদের যৎসামান্য অর্থ বাড়ীটি ক্রয় করিতেই নিঃশেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রাণে তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ, অফুরন্ত অধ্যবসায়। সংকল্প সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গুরুকৃপার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন।

নলিনাক্ষ তা সম্বন্ধে ভোলাগিরি মহারাজ এক সময় কুলদানন্দজীকে বলিয়াছিলেন: ইয়ে তো আপ্‌কা সংকল্প-সিদ্ধ্ লেড়কা হ্যায়, অশ্বমেধ কা ঘোড়া হ্যায়।...কথাটী প্রতি অক্ষরে সত্যে পরিণত হয় নলিনাক্ষের জীবনে। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা তখন স্বচ্ছল নয়; এজন্য বাহির হইতে গুরুভ্রাতারা খাদ্যদ্রব্য সহ আসিয়া গুরুসঙ্গ করিতেন। ইহাতে প্রাণে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন নলিনাক্ষ। স্বাধীন ব্যবসায় করিবার জন্য তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন। লোহার ব্যবসা করিবার ইচ্ছা একদিন শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিলেন। ঠাকুরও খুব সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্বাদ স্বরূপ দিলেন মাত্র একটী টাকা। শুভদিন দেখিয়া দিয়া সেইদিন হইতে মহানন্দ নন্দী মহাশয়ের সহিত কারবার চালাইবার পরামর্শ দিলেন তাঁহাকে। গণেশ শ্রীমাণীকেও অংশীদার করা হইল—তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী ও বৈভবের প্রভাব ব্যবসাতে আনুকূল্য সৃষ্টি করিল। দোকান খোলা হইল ২০ নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীটে।

আশীর্বাদের সহিত শ্রীগুরুর শক্তি সঞ্চারিত হইল সকলের অলক্ষ্যে। তাই স্বল্পকাল মধ্যেই সেই ব্যবসায় হইতে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল।

আর যে বাড়ীটী ক্রয় করা হইয়াছিল, সেই অর্থে তাহার যথোচিত সংস্কার সাধন করিয়া ১৩১৫ সালে আশ্রম স্থাপন করা হইল। ঠাকুর কুলদানন্দ স্বহস্তে এই আশ্রমে পঞ্চবটি স্থাপন করেন এবং মন্দিরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। তখন হইতে গুরুভ্রাতারা অবাধে ও নিঃসংকোচে গুরুসঙ্গ করিবার সুযোগলাভে ধন্য হইলেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে চন্দননগরে পথিপার্শ্বস্থ বেলতলায় আসন করেন ব্রহ্মচারীজি; সগু বিধবার আর্তনাদে তাহার মৃত স্বামীর দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বেলতলা ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানেই আজ আশ্রম স্থাপিত হইল—আশ্রমের সহিত বিজড়িত রহিল যোগিরাজ কুলদানন্দের অলৌকিক শক্তির কাহিনী।

ময়দাপট্টির একটী ভাড়া বাড়ীতে বাস করিত নলিনাক্ষের দোকানের প্রায় কুড়ি বাইশ জন কর্মচারী। তাঁহারা প্রায় সকলেই দীক্ষাগ্রহণ করেন। ঐ বাড়ীতেও গোস্বামী প্রভু ও মাতাঠাকুরাণীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেন ব্রহ্মচারীজি; কর্মচারীদের সমবেত সাধন-ভজন ও সেবা-পূজাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। নলিনাক্ষ, মহানন্দ, গগন নন্দী, কালি দত্ত প্রভৃতি দোকানে কঠোর পরিশ্রমের পর এখানে নিয়মিত সাধন-ভজন করিতেন। মধ্যে মধ্যে এখানে শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াও ধন্য হইতেন। ব্রহ্মচারীজির সতীর্থ মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় মাঝে মাঝে এখানে থাকিয়া সকলকে সাধন-ভজনে উৎসাহ ও শিক্ষাদান করিতেন। ব্রহ্মচারীজির দীক্ষা-বৈঠকে কয়েকবার উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেই সময়ে নানা অলৌকিক দৃশ্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়া মিত্র মহাশয় উপলব্ধি করেন এবং প্রকাশ করেন যে, গোস্বামী প্রভু প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মচারীজিব মাধ্যমে দীক্ষা দান করিতেন।

এই সময়ে গুরুভ্রাতাদের অনুরোধে বোলপুর ও কুমিল্লায় গমন করেন কুলদানন্দজী। মহানন্দ, নলিনাক্ষ এবং আরো কয়েকজন শিষ্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এখানেও অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহানন্দের ডায়েরী হইতে জানা যায়, বোলপুরে জনৈক গুরুভ্রাতার বাড়ীতে

ছিলেন ব্রহ্মচারীজি। অতি নিঃসহায় একজন বিধবা ব্রাহ্মণী দুর্জনদের তাড়নায় উৎপীড়িত হইয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। তাঁহাকে কৃপা করিয়া দীক্ষা দান করিলেন ব্রহ্মচারীজি; ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণীর সমস্ত আপদের শান্তি হইল। সেই সময় ঠাকুর কুলদানন্দ সকলকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন: নিজেকে দীন-হীন কাঙাল মনে না করা পর্যন্ত কিছুই হয় না। একটী লোক কঠোর তপস্যা করে এবং নানারূপ পুণ্য ও ধর্মকার্য করে; কিন্তু যদি তার মনে দীনতা না আসে তবে তার কিছুই হবে না। বরং একটী লোক যদি নানা দুষ্কার্য করেও নিজেকে দীন-হীন কাঙাল মনে করে, সে ঐ ধার্মিক লোক অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।...

ব্রহ্মচারীজির কুমিল্লা অবস্থানকালে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়! সদ্‌গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার পর হইতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সর্বত্রই সৃষ্টি হইত এক দিব্য মধুর পরিবেশ। চিরবৈরাগী এই মহাযোগী লোকালয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেই চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় তাঁহার ভুবন-মোহন রূপ, আর তপস্যার গরিমা। দুর্বার আকর্ষণে, সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শত সহস্র নরনারী এই মহাতাপসের শ্রীচরণে প্রণতি জানাইতেন; প্রার্থনা করিতেন তাঁহার অক্ষয় আশীর্বাদ। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীজির বিভূতিলিপ্ত, মহিমোজ্জ্বল মধুর মূর্তি দর্শন করিলেই সকলের মনে হইত, সত্যই তিনি সর্বসন্তাপহারী। নবজাগ্রত বাঙলার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নূতন দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল তাঁহার শুচিতা, বৈরাগ্য ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের উজ্জ্বল আদর্শ। বিজয়কৃষ্ণের বাণী ও জীবনবেদ ভারতীয় ঋষি ও মহাপুরুষদের শাশ্বত বাণীরই প্রতিধ্বনি। জনসাধারণের সম্মুখে লুপ্তপ্রায় সেই পূত বাণী ও আদর্শ বিজয়কৃষ্ণের অমোঘ শক্তিতে নূতন করিয়া সঞ্জীবিত করিবার জন্যই সদ্‌গুরুরূপে যোগিরাজ কুলদানন্দের এই মহিমান্বিত আবির্ভাব।...

॥ চার ॥

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ সশক্তিক যে দীক্ষা দান করিতেন, সেই সম্পর্কে শিষ্যদের একবার তিনি বলেনঃ এই শক্তির ক্রিয়া পাঁচশত বৎসর চলবে। আমি রক্তবীজের ঝাড় রেখে গেলাম—এক এক-জন থেকে সহস্র-সহস্র জন হবে।···বিজয়কৃষ্ণ আরো বলিতেনঃ সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না, গুরু করেন। প্রত্যেকটী শিষ্য তাঁর এক একখানা ইষ্টমন্দির।··· শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছেঃ

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্য বুদ্ধ্যাবস্যুয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

শ্রীভগবান বলিলেনঃ হে উদ্ধব! আচার্যকে আমাব স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কখনও তাঁহাকে অমান্য করিবে না এবং তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞানে নিন্দা বা দোষারোপ করিবে না; গুরু সর্বদেবময় জানিবে।···

গোস্বামী প্রভু এই ভগবৎ-বাক্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহার আসনে, বসনে, শ্রীঅঙ্গে শ্রীভগবৎ-মূর্তি প্রস্ফুটিত। শ্রীমৎ আনন্দ কিশোরের সাধনায় পরিতুষ্ট স্বয়ং জগন্নাথদেব আবির্ভূত হন ভগবান বিজয়কৃষ্ণ রূপে। সদ্‌গুরু রূপে তাঁহার প্রদত্ত দীক্ষা পরাদীক্ষা—ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সশক্তিক। আত্মা-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় এই দুর্লভ পরাশক্তি। ঋষিদের এই যে কলিজায় ধন বিজয়কৃষ্ণ বিলাইয়া গিয়াছেন, ইহার প্রভাব অভূতপূর্ব।···ইহার পশ্চাতে বিদ্যমান তপোভূমি ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের সাধনার ধারা—যে ধারার প্রবর্তক স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা।

বিজয়কৃষ্ণের বিভূতি, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যও ছিল অপ্রমেয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ব্রজবিদেহী মহান্ত শ্রীসন্তদাস বাবাজী বলিতেনঃ গোস্বামী প্রভু সাধনার দ্বারা অধ্যাত্ম অনুভূতির যে স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন, অনেক ধর্ম-প্রবর্তকও সেই স্তরে পৌঁছাইতে পারেন নাই।···তাঁহার অভীষ্টদেব মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ পরমহংস মহারাজের যোগৈশ্বর্য ও পরাশক্তি তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় আশ্রয় করিয়াছিল। অথচ বাহিরে তিনি ছিলেন অপ্রকাশ, আর অন্তরে শ্রীভগবানের সহিত সর্বদাই যোগযুক্ত।···

চন্দননগর ঠাকুরবাড়ীতে মহাহোম।

(১) বরদাকান্তজী ; (২) সারদাকান্তজী ; (৩) ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী।

তেমনি ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ মহারাজকেও আশ্রয় করিয়াছিল গোস্বামী প্রভুর পূর্ণ বিভূতি ও ঐশ্বর্য। জগদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ অপরূপ নীলকণ্ঠ বেশ দ্বারা স্বহস্তে সুসজ্জিত করেন জ্যোতির্ময় ভাব-বিগ্রহ, তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রতে, নিয়োজিত করেন বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে।···তাই, সাক্ষাৎ শিবমূর্তি কুলদানন্দজীর প্রশান্ত-গম্ভীর আননে উদ্ভাসিত বিমল জ্যোতি, অন্তরে মাধুর্যের অন্তরালে প্রবাহিত অনন্ত পরাশক্তি, আর তাহা হইতেই উৎসারিত কল্যাণধর্মের ঐশী প্রকাশ।···এই মহাযোগীর সদ্‌গুরুজীবনে সর্বত্রই প্রচারিত ব্রহ্মচর্যের বিপুল মহিমা। ভারতের সাম্প্রতিক কালের অধ্যাত্ম ইতিহাসে ইহার তুলনা সত্যই বিরল।

বিজয়কৃষ্ণ ও কুলদানন্দ গুরু-শিষ্য সম্পর্কের এক অভিনব ভাষ্য। ভারতীয় সকল শাস্ত্রমতে গুরুসেবাই আধ্যাত্মিক জগতের অর্গল উন্মোচনের একমাত্র উপায়। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং একনিষ্ঠ সেবার বিনিময়ে গুরু শিষ্যকে দান করেন ব্রহ্মজ্ঞান; তিনি দান না করিলে শাস্ত্রজলধি মন্থন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ক্ষমতা শিষ্যের নাই। কুলদানন্দ গুরুসেবা ও গুরুনিষ্ঠার জ্বলন্ত আদর্শ। বিনিময়ে বিজয়কৃষ্ণ কুলদানন্দকে সন্ন্যাস দিয়া যান নাই—দিয়াছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য। নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও প্রিয়তম শিষ্যকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বরং নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কারণ, ব্রাহ্মণ না হইয়াও এবং পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য পালন না করিয়াও সেযুগে সর্বজাতি সন্ন্যাস গ্রহণে উন্মুখ হইয়া ওঠেন। ইহা সন্ন্যাস নয়, সন্ন্যাসের অনুকরণ মাত্র। অথচ সেই সাজে নানা জাতীয় সন্ন্যাসীর সহিত অবাধ মেলামেশায় অনেক সময় দেখা দেয় অশুচিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা। পূর্ণ জ্ঞানলাভের পূর্বেই অজ্ঞান অবস্থায় কর্মত্যাগের ফলে জ্ঞান ও যোগ দুইই নষ্ট হইবারও আশঙ্কা। কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য আশ্রমে সন্ন্যাসআশ্রমের সব কিছু লাভ করা যায়। সদাচার, শুদ্ধাচার, গৈরিক বসন, কৌপীন ধারণ, ভিক্ষান্ন গ্রহণ—এইসব উভয় আশ্রমে একই প্রকার। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকিয়া নিষ্কাম কর্মাদি অনুষ্ঠানের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী।

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বান। ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরুগৃহে বেদ ও শাস্ত্র পাঠান্তে গুরুর আদেশে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন উপকুর্বান ব্রহ্মচারী। আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাসেরই নামান্তর। ভারতে সনাতন ধর্মের আদিগুরু চতুঃসন এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের প্রবর্তক। সন্ন্যাস, পরমহংস প্রভৃতি অবস্থা ইহারই অধীন। এই পথ যে কত কঠোর কুলদানন্দের সংগ্রাম ও সাধন জীবন তাহার পরিচায়ক। জীবনের অস্ফুট যৌবনালোকে এই ব্রতগ্রহণ করেন কুলদানন্দ। সেদিন ইহার পরিপূর্ণ মহিমা তাঁহার দৃষ্টিপথে উদ্‌ভাসিত হইয়া ওঠে নাই—উঠিল, যেদিন গোস্বামী প্রভু প্রিয়তম শিষ্যকে দান করিলেন নীলকণ্ঠের অতুল মর্যাদা।···

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভু জানিতেন তাঁহার জীবনে এই ব্রত পালনের আর অবকাশ নাই; কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম জগতে ইহার সবিশেষ প্রয়োজন। শত সহস্র শিষ্যের মধ্যে তিনি বাছিয়া লইলেন কুলদানন্দকে—তাঁহার মানসপুত্রই এই কঠোর ব্রতের উপযুক্ত আধার। শ্রীগুরু কৃপায় সেই ব্রত উদ্‌যাপনে সাফল্যলাভ করিলেন কুলদানন্দ। এই দিক দিয়া তিনি গোস্বামী প্রভুর পরিপূরক। এছাড়া, জনসেবা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম, সশক্তিক নাম ও প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য সন্ন্যাস অপেক্ষা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যই অধিকতর কার্যকরী। সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া কুলদানন্দজী আসিয়া দাঁড়াইলেন নর-নারায়ণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে। দুঃখ ও বেদনাহত জীবকুল ও পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহার অন্তরে জাগিল অধিকতর করুণা। সেই উদ্দেশ্যে কুলদানন্দের ক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণের এই ব্যবস্থা ও নির্দেশ।

কুলদানন্দজীর সদ্‌গুরু জীবন সেই নির্দেশ পালনের জ্বলন্ত আদর্শ। গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভের ফলে বুদ্ধির ভূমিকে অতিক্রম করিয়া বোধির ভূমিতে তিনি আজ আত্মপ্রতিষ্ঠ। তাইতো বাঙ্‌লা তথা ভারতে তিনি আজ শাস্ত্র ও সদাচার, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের জীবন্ত বিগ্রহ। তাইতো তাঁহার অহৈতুকী করুণার গঙ্গোত্রী ধারায় স্নান

করিয়া ধন্য হইতে লাগিল বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, সংসারাসক্ত, দুঃখাহত সহস্র সহস্র নরনারী।...ইহার পূর্ণ ইতিবৃত্ত প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল শতধারে বর্ষিত হয় তাঁহার সদ্‌গুরু লীলা ও বিচিত্র মহিমা। এই পঁচিশ বৎসরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা কখনও সম্ভবপর হইবে কিনা কে জানে। গুরুকৃপায় তাহা হইলে সেইদিন বোঝা যাইবে, ভারতীয় অধ্যাত্ম ইতিহাসে বিজয়কৃষ্ণ ও কুলদানন্দের অবদান সত্যই কত অনবদ্য, কত অপ্রমেয়।...

১৩১৫ সালে চন্দননগরে আশ্রম স্থাপন এবং গোসাঁইজী ও মাতাঠাকুরাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গনটী ক্রয় করা হয়। এই প্রাঙ্গনেও আশ্রম নির্মাণ কার্য চলিতে থাকে। কুমিল্লা হইতে আসিয়া কিছুদিন চন্দননগরে ও কলিকাতায় অবস্থান করেন কুলদানন্দজী। আশ্রম নির্মাণের সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাসে গমন করেন কাশীধামে।

কিন্তু কর্মী অভাবে আশ্রমের কার্য সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। ঠাকুরের ইচ্ছায় তখন নূতন উৎসাহী কর্মী অশ্বিনী নন্দী ব্রহ্মচারীজির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সংস্কার কার্যে যোগ দেন। পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক অশ্বিনীবাবু সংসার ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন। সেখানে মাধুকরী করিয়া সাধন-ভজন করিতেন তিনি। বৃন্দাবনে তাঁহার একটী কুঞ্জ ছিল, আর কলিকাতায় অখিল মিস্ত্রী লেনে ছিল নন্দী লিমিটেড নামে তাঁহাদের একটী বড় কাঠের কারবার। দ্বিতীয় কর্মী অচ্যুত কুমার নন্দী ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার—তিনি তখন ধানবাদ সহর নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত। ১৩১৬ সালের কার্তিক মাসে ব্রহ্মচারীজির নিকট দীক্ষিত হন অচ্যুত কুমার। তখন হইতে তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সরকারী কার্যে তিনি আর মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। চন্দননগরে কর্মীর অভাব জানিয়া তিনি সরকারী কার্য পরিত্যাগ করেন। কলিকাতায় আসিয়া পৈত্রিক ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং চন্দননগরে আশ্রমের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

কাশীধাম হইতে ১৩১৭ সালে চন্দননগরে প্রত্যাবর্তন করেন কুলদানন্দজী। অচ্যুতবাবুর সহকর্মী রাজেন্দ্র শঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় আষাঢ় মাসে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহানন্দ, নলিনাক্ষ প্রভৃতি অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন; আর অচ্যুতবাবু ও রাজেন্দ্রবাবু কলিকাতা হইতে গিয়া চন্দননগরে আশ্রম নির্মাণ কার্য তত্বাবধান করিতে থাকেন। ঠাকুর কুলদানন্দও স্বয়ং এই আশ্রম নির্মাণ কার্যে যোগদান করেন—শিষ্যদের সহিত তিনি নিজে ছাদ পিটাইতে আরম্ভ করেন! শিষ্যদের মধ্যে তখন দেখা দিল অফুরন্ত উৎসাহ; তাঁহারা রাজমিস্ত্রী ও কুলীর কার্য করিতে লাগিলেন। এমনকি মাথায় করিয়া ঝুড়ী ঝুড়ী মলমূত্রও পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই আশ্রম নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইল।

শারদীয়া মহাষ্টমী। জাতীয় জীবনে একটী মহাপুণ্য তিথি। দেশব্যাপী এই মহা আনন্দের দিনে সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয় মহামায়ার পূজা। ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া এই পুণ্য তিথিতে ভগবতী যোগমায়া দেবীর অস্থি প্রতিষ্ঠা করেন বিজয়কৃষ্ণ। কুলদানন্দের দ্বারা তিনি আনুষ্ঠানিক সকল কর্ম করাইয়া লইয়াছিলেন। এই দিনেই চন্দননগরে মহাহোমের প্রবর্তন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সদ্‌গুরু জীবনের একটী বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়।

১৩১৪ সালে শ্যামপুরে এবং ১৩১৫ সালে চন্দননগরে মহাহোম সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করেন। পরে দুই বৎসর স্থগিত রাখেন এই মহাহোমের অনুষ্ঠান। সেই আদর্শে শিষ্যদের সাগ্নিক ব্রাহ্মণরূপে আত্মগঠন করিবার সুযোগ দানই ইহার উদ্দেশ্য। চন্দননগরে আশ্রম নির্মাণ কার্য শেষ হইতেই শ্রীগুরুদেবের আরব্ধ কার্যটী বিরাট আকারে প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা জাগে কুলদানন্দের মনে। এ পরিকল্পনা মূলত গোস্বামী প্রভুর—গেণ্ডারিয়ায় ইহার সূত্রপাত। ১৩১৮ সালে চন্দননগরে মহাষ্টমী তিথিতে স্থায়ীভাবে মহাহোমের প্রবর্তন করেন কুলদানন্দজী—গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছায় স্থাপন করেন অক্ষয় কীর্তি।

তখন হইতে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এই মহাযজ্ঞ। সুদীর্ঘ যজ্ঞকুণ্ডের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসন গ্রহণ করিতেন ব্রহ্মচারীজি এবং তাহার ব্রাহ্মণ গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ। সমস্বরে উদাত্ত সুললিত কণ্ঠে ও সুমধুর ছন্দে তাঁহারা পাঠ করিতেন সমগ্র চণ্ডীর প্রত্যেকটী মন্ত্র। সাতশতটী মন্ত্রে সাতশতবার সঘৃত বিল্বপত্রে "ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া সকলে আহুতি দিতে থাকেন সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে। অবিরাম চারি ঘণ্টা ধরিয়া হোমধূমে ও মধুর গন্ধে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত হইত, শুচিস্নাত হইয়া উঠিত সমস্ত পরিবেশ।

অদ্যাবধি প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এই সপ্তশতী মহাযজ্ঞ। এই পবিত্র দৃশ্য দেখিবার জন্য দূরদেশ হইতে শত সহস্র ভক্ত নরনারীর সমাগম হয়। মহাহোমের পর উপস্থিত সকলকে বিতরণ করা হয় মহাপ্রসাদ। এই দৃশ্য দেখিলে মনে হয় ভারতে বুঝি পুনরায় বৈদিক যুগ দেখা দিয়াছে। বাঙলা দেশে আর কোথায়ও এইভাবে মহাহোম অনুষ্ঠিত হয় না। এই পবিত্র বৈদিক যজ্ঞ সম্পর্কে ঠাকুর কুলদানন্দ স্বয়ং বলেনঃ মহাহোমের এই অনুষ্ঠানটী বড়ই শুভ। ইহা ভারতবর্ষ হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছিল। আমি চন্দননগরে ইহা প্রবর্তন করিয়াছি বলিয়া ভোলাগিরি মহারাজ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আমাকে বিশেষ আশীর্বাদ করিয়াছেন।···আমি যখন থাকিব না, তোমরা এইখানে এই মহাহোম প্রচলিত রাখিবে।··· বস্তুত, ভারতের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই এই পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন কুলদানন্দ। চন্দননগরের পবিত্র ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের ধূলিকণায় আজও বিজড়িত ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের দীপ্ত মহিমা ও গৌরব।

সদ্‌গুরুর ভূমিকা কিরূপ সুকঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ, গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর দিব্য জীবন হইতে সে সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন কুলদানন্দজী। স্বীয় জীবনের প্রতি বাক্যে ও আচরণে প্রকাশ পাইত সেই শিক্ষা ও আদর্শ। তিনি জানিতেন গুরুবাক্য অবহেলা করিলে শিষ্যের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী ; তাই প্রকাশ্যে প্রায় কখনও কাহাকেও কোনপ্রকার আদেশ

প্রদান করিতেন না। বরং বলিতেন: তোমার পক্ষে এরূপ অবস্থায় এইটেই সমীচীন।··

গুরুবাক্য অসীম শক্তিযুক্ত। ইহা বুঝিয়া শিষ্যগণও গুরুর আদেশ অনুযায়ী কার্য করিতেন। আবার কাহার দ্বারা কোন কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহা বুঝিয়া তাহার দ্বারা সেই কার্য করাইয়া লইতেন কুলদানন্দজী। শিষ্যদের তিনি সর্বদা বলিতেন: তোমরা গোসাঁইয়ের মধ্যে আমাকে দেখবে। তাঁর পূজা করলেই সমস্ত অভীষ্ট লাভ হবে।···শিষ্যদের হইয়া তিনি সাধন-ভজন করিতেন; সকলকে নানা বিষয়ে শিক্ষা, উপদেশ ও সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় সাধনই ছিল সদ্‌গুরু কুলদানন্দের জীবনাদর্শ। ধর্মের সুদৃঢ় বর্মের মধ্য দিয়া তিনি শিষ্যদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিতেন। পার্থিব উন্নতির সহিত ধর্মাচরণের যে নিগূঢ় সম্পর্ক, পরম গুরু বিজয়কৃষ্ণের অনুকরণে সেই শিক্ষা প্রদান করিতেন।

পাশ্চাত্যপন্থী অনেকেই মনে করেন পার্থিব উন্নতির পথে ধর্ম একটী বিশেষ অন্তরায়। তাঁহাদের মতে উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকেই ভাগ্যলক্ষ্মী বরণ করেন—কিন্তু ধর্মকার্যের ফলে পার্থিব কর্মে দেখা দেয় অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য। ধর্ম ও কর্ম পরস্পর বিরোধী মনে করিয়া ধর্মকার্য ত্যাগ করেন তাঁহারা। এজন্য ব্যবসায়ী শিষ্যদের জীবনে কর্মের প্রকৃত মর্ম ও সার্থকতা শিক্ষা দিতেন ব্রহ্মচারীজি। বলিতেন, সমুদয় কর্ম ভগবদুদ্দেশ্যে করণীয়—পার্থিব স্বার্থ বা উন্নতি, সম্পদ বা বিপদ নির্বিশেষে সর্বদা অচল অটল ভাবে সৎপথে জীবন যাপন করাই প্রত্যেকের কর্তব্য। তিনি আরো বলিতেন, সংসারে আপদ-বিপদ জীবন গঠনের জন্যই সবিশেষ প্রয়োজনীয়। গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে শিষ্যদের জীবন গঠন করিতেন তিনি।

গুরুগত প্রাণ ব্রহ্মচারীজির দীক্ষা ছিল তাঁহার গুরুপূজারই অঙ্গ স্বরূপ। শ্রীগুরুচরণে তুলসী অর্পণ করিয়া নিত্য সর্বকর্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধন করিতেন। তেমনি প্রতি শিষ্যকেও তুলসীর ন্যায় গুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেন। নিজে সর্বক্ষণ গুরুদত্ত ইষ্টনাম

জপ ও গুরুর ধ্যান-ধারণায় দিন কাটাইতেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হইলে শ্রীগুরুর আদেশের অপেক্ষা করিতেন; এবং আদেশ পাইলে শুভ মুহূর্তে দীক্ষাদান করিতেন। দীক্ষাদানের পূর্বে কিছু সময় আসনে স্থিরভাবে বসিয়া নিমগ্ন থাকিতেন শ্রীগুরুর ধ্যানে। সম্মুখে তুলসী বৃক্ষ; সমস্ত ঘর ধূপধূনার পবিত্র গন্ধে আমোদিত। একটী স্বতন্ত্র আসনে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন দীক্ষার্থী নরনারী। আর ঢুলু ঢুলু নেত্রে গোসাঁইজীর অনুকরণে তিনি প্রদান করিতেন বিধি নিষেধ সম্পর্কিত মহামূল্য উপদেশ; পরে সুমধুর স্বরে প্রদান করিতেন স্বয়ং নারায়ণ প্রবর্তিত অনন্ত শক্তি-সমন্বিত ইষ্টনাম।···কিছুমাত্র উচ্চারণের পরিবর্তে সর্বদা শুধু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মরণ করিতে হয় নিতান্ত সঙ্গোপনে সেবিত ও সাধিত গুরুমুখী এই মধুর নাম। ইহাই মহাপ্রভু তথা গোস্বামী প্রভু প্রবর্তিত অজপা সাধন, মুনিঋষিদের কলিজার ধন।···শক্তিযুত ইষ্ট নামের প্রভাব আজীবন শিষ্যের জীবনে সবিশেষ কার্যকরী। এই নামের প্রাণময় ও চৈতন্যময় স্বরূপ-উপলব্ধি সাধন সাপেক্ষ—সাধন-ভজনের ফলে ক্রমে দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ হয়।

সাধনের মূলকথা সদ্‌গুরু, সৎশাস্ত্র ও স্বানুভূতি। গীতায় আছে: 'স্বভাবো অধ্যাত্ম উচ্যতে'। পরমেশ্বরের স্বকীয় যে ভাব তাহারই নাম অধ্যাত্ম। 'এষো ধর্ম্ম সনাতনঃ'—এই অধ্যাত্মে যুক্ত অবস্থাকেই বলে সনাতন ধর্ম। বিজয়কৃষ্ণ সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রবর্তক; আর কুলদানন্দের সদ্‌গুরু জীবন সনাতন ধর্মেরই জ্যোতির্ময় বিকাশ।

দীক্ষা প্রদানের সময়ে প্রতি দীক্ষার্থীকেই তিনি বলিতেন: স্বয়ং ভগবান গুরুমূর্তি ধারণ করে এই নাম দিচ্ছেন।···এইভাবে গুরুকে গ্রহণ করিতে না পারিলে এই সাধনের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার সম্যক উপলব্ধি সুদূরপরাহত। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে:

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তজনে॥"

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সকল ধর্মকর্মের মধ্যে ভগবান গুরুদেবের প্রতি অচলা ভক্তি ও সুগভীর প্রেম ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। সদ্‌গুরু

জীবনের প্রতি পদক্ষেপেও তিনি শিষ্যদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন সেই অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। দীক্ষাদানের পরই গদগদ কণ্ঠে তিনি বলিতেন: ভগবান গুরুদেবের শ্রীচরণে তোমাদের সমর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত।...

॥ পাঁচ ॥

বাঙলাদেশে চন্দননগর ঠাকুরবাড়ী আশ্রমই ঠাকুর কুলদানন্দের প্রথম স্বতন্ত্র স্থান। মহাহোম অনুষ্ঠানের পুণ্যভূমি হিসাবে ইহা সিদ্ধ পীঠস্থান, বাঙলার বুকে নূতন তীর্থ।

এই স্থানে আশ্রম নির্মাণের পর সকলের সুবিধার্থে অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায় সুকীয়া ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেন কুলদানন্দজী। মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য যাইতেন চন্দননগর আশ্রমে। বৎসরের প্রথমে জ্যৈষ্ঠ মাসে কিছুদিনের জন্য পুরী উৎসবে যোগদান করিতেন। সারা বৎসর তাঁহার অন্তর উন্মুখ হইয়া থাকিত এই উৎসবের জন্য। আবার ফিরিয়া আসিতেন কলিকাতায়—অতঃপর গোসাঁইজীর জন্মোৎসবে যোগদান করিতেন।

১৯১৭ সালে ভবানীপুরের মনোহরপুকুর রোডে মহা সমারোহে এই জন্মোৎসব প্রবর্তন করেন পাবলিক প্রসিকিউটার হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। তিনি ছিলেন গোস্বামী প্রভুর ভক্ত শিষ্য। কলিকাতার বহু শিষ্য ও গণ্যমান্য ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিতেন। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীজির সমুজ্জ্বল মূর্তিতে আলোকিত হইত সারা উৎসব প্রাঙ্গন। আনন্দে, উৎসাহে, সুমধুর কীর্তন ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইত। কিন্তু একাকী ধীর-স্থির গম্ভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন রহিতেন কুলদানন্দজী। অন্তরে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস—কিন্তু বাহিরে যেন নিবাত, নিষ্কম্প অনলাশিখা।...

মহাষ্টমীতে মহাহোম উপলক্ষে তিনি চন্দননগরে যাইতেন। বৎসরের শেষ তিন চার মাস অবস্থান করিতেন কাশীধামে। প্রাণের টানে সেখানেও ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইতেন অনেকে।

শ্রীমাণীদের বাড়ীতে মনোরমা দেবী ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীলা মহিলা। স্বামীর প্রতিকূলতায় দীক্ষা লইতে না পারিলেও কুলদানন্দজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি ছিল অপরিসীম। দেবর গণেশ শ্রীমাণীর মুখে ঠাকুর কুলদানন্দের কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। সামাজিক মানমর্যাদা সব ভাসিয়া গেল—গোপনে পালকী করিয়া উপস্থিত হইলেন শশীবাবুর বাসায়। কুলদানন্দজী তখন অতিমাত্র তুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ এক গ্লাস জল দিয়া সাহায্য করিবার কেহ নাই। মনোরমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তুঃসাহসী হইয়াই ঠাকুর কুলদানন্দকে তিনি লইয়া আসিলেন সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাসায়।

ত্রিতলের একখানি ঘরে অবস্থান করিতেন কুলদানন্দজী। শিষ্য গণেশ শ্রীমাণী ও তাঁহার স্ত্রী মনপ্রাণ ঢালিয়াই গুরুসেবা করিতে লাগিলেন; শ্রীগুরুর সাধনভজন, সেবাপূজা ও লোকজনের আসা যাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গণেশ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ কিন্তু ছিলেন একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিয়া তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণী মনোরমার প্রকৃতি ছিল অতীব মধুর; তিনিও ব্রহ্মচারীজির সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দেখা দিল অনিবার্য দ্বন্দ্ব। সন্দিগ্ধ, ঈর্ষান্বিত উপেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে রীতিমত ভৎ'সনা করিতেন—আর মনের তুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিতেন সতীসাধ্বী মনোরমা।

স্বামীর গঞ্জনা সত্ত্বেও একদিন দীক্ষ প্রার্থী হইলেন তিনি। গণেশ শ্রীমাণী সুকৌশলে দাদার অনুমতি লইলেন। কুলদানন্দ সবই জানিতেন—সতীর ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহাকে তিনি দীক্ষা দান করিলেন। প্রথমে মৌন সম্মতি দান করিলেও পরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন উপেন্দ্রনাথ—আর স্ত্রীর উপর চলিল নির্যাতন।···কিন্তু একনিষ্ঠ গুরুভক্তি বলে অম্লান বদনে সবই সহ্য করিলেন মনোরমা দেবী। কিছুদিন পরে গুরুকৃপায় তাঁহার জয় হইল, আর ধীরে ধীরে উপেন্দ্রনাথের চরিত্রে দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। অবশেষে তিনিও দীক্ষাপ্রার্থী হইলে সানন্দে কৃপা করিলেন কুলদানন্দজী। স্পর্শমণির অমৃতস্পর্শে

ধন্য হইলেন উপেন্দ্রনাথ—আর মনোরমা হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহাদের গুরুভক্তি, সৌজন্য ও আতিথেয়তায় তখন সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

ইদিলপুরের জমিদার যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী কুলদানন্দজীর গুরুভ্রাতা। তাঁহার অনুরোধে অগ্রহায়ণ মাসে কয়েক দিনের জন্য ইদিলপুরে গেলেন কুলদানন্দজী। সেখানে যোগেশচন্দ্রের পরিবারবর্গের এবং আরো অনেকের দীক্ষা হয়। অতঃপর কয়েক দিন তিনি ঢাকা অবস্থান করেন—ঢাকায় ইহাই তাঁহার শেষ পদার্পণ।

বর্ষ শেষে কলিকাতা হইয়া তিনি কাশীধামে গমন করেন। একদিন সপরিবারে নলিনাক্ষ উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের লইয়া ফাল্গুন মাসে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন ঠাকুর কুলদানন্দ। তখন সদ্‌গুরুর পূর্ণাঙ্গরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন; তাঁহার ভিতর দিয়া গোস্বামী প্রভুর শক্তি তখন পূর্ণবেগে উৎসারিত। শ্রীবৃন্দাবনেও সকলের পাপতাপ, দুঃখজ্বালা বরণ করিয়া তিনি বিলাইতে থাকেন সশক্তিক নামামৃত। মাসাধিক কাল গোপাল, গোবিন্দ, মদনমোহন দর্শন করিয়া আনন্দে দিন কাটিল। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িত অতীত দিনগুলির কথা,··· গুরুদেব ও মাতাঠাকুরাণীর কথা।···অমনি যেন তাঁহাদের প্রত্যক্ষ করিতেন,···হৃদয় দিয়া উপলব্ধি কবিতেন তাঁহাদের কৃপা ও আশীর্বাদ।···

চৈত্র মাসে শ্রীবৃন্দাবন হইতে সকলে রওনা হইলেন কাশীধাম। পথে ভীষণ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন নলিনাক্ষ বাবুর সহধর্মিণী। কাশী আশ্রমে পৌঁছাইবার পর অপরাহ্নে রোগিনীর অবস্থা খুবই সংকটজনক হইয়া পড়িল। একটু মহাপ্রসাদ দিয়া বলিলেন ব্রহ্মচারিজী: ভয় কি! ভাল হ'য়ে যাবে।···ধীরে ধীরে সত্যই তিনি আরোগ্যলাভ করিলে নলিনাক্ষের ভাঙ্গা বুকে আশার সঞ্চার হইল; অন্য সকলে বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রসাদে কলেরা আরোগ্য—ইহা মন্ত্রের বল, না আর কিছু?···

পরে সুস্থ হইয়া নলিনাক্ষের সহধর্মিণী ব্রহ্মচারিজীকে বলেন: স্বপ্নে দেখলাম, যেন ফুলের মালা নিয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজা

দিতে গিয়েছি; বিশ্বনাথের মাথার উপর একজন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ বসে রয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন—তুই এখানে কেন পূজা করতে এলি? তোর ঘরে এমন ঠাকুর রয়েছেন, তাঁর গলায় মালা দিয়ে পূজা করগে'।...এই ব'লে তিনি আমার মালা ফিরিয়ে দিলেন।...

বিচিত্র স্বপ্নবৃত্তান্ত—ইহার তাৎপর্য যেমন গভীর তেমনই মধুর। কিন্তু আত্মপ্রচার বিমুখ ব্রহ্মচারিজী তাহাকে বিশেষ আমল দিলেন না। শুধু বলিলেন: যাক্ সে সব কথা। কারো কাছে একথা বলো না—কেবল নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ওর সদ্ব্যবহার করো।...

এইরূপ আশ্চর্যভাবে রোগমুক্ত করা, সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন দেওয়া—এইসব যোগৈশ্বর্যকে কখনও প্রাধান্য দিতেন না কুলদানন্দজী। রোগমুক্তির জন্য কেহ অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিতেন: আমি তো ডাক্তার নই—ডাক্তারের কাছে যান।...কেহ ভবিষ্যতের কথা জানিতে চাহিলে বলিতেন: আমি জ্যোতিষী নই—ওসব কিছুই জানিনে। আমি কেবল ভগবানের নাম করি।...সত্যই ভগবানের সহিত সর্বদা যোগযুক্ত হইয়া থাকাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভের দিকে তাঁহার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। সাধক অবস্থায় নানা অলৌকিক দর্শনলাভ হইয়াছে, সিদ্ধিলাভের পরও লাভ হইয়াছে অনেক প্রকার যোগৈশ্বর্য; কিন্তু গোস্বামী প্রভুর সন্তান তিনি, তাঁহারই আদেশে সদ্‌গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ—একথা সর্বদাই স্মরণ রাখিতেন। স্বভাবজাত ভাবধারার দিক দিয়াও তিনি বলিতেন: এই সকল যোগৈশ্বর্য ও দর্শনাদি পথের দৃশ্যের ন্যায়। যেমন গন্তব্য স্থানে যেতে গেলে পথে অনেক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি সাধনার পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই নানারূপ সিদ্ধি ও শক্তি আসতে থাকে। দৃশ্য নিয়ে থাকলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যায়। তেমনি ঐশ্বর্য নিয়ে থাকলে ভগবৎ প্রাপ্তি বিলম্বিত হয় এবং কখনো কখনো সুদূরপরাহতও হয়।...

স্বীয় ইষ্টদেবের উজ্জ্বল আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াই কুলদানন্দের জীবনে সদ্‌গুরুলীলা প্রকটিত হয় এক নূতন দ্যোতনায়। ভগবৎপ্রাপ্তি

এবং শ্রীভগবানের পরমপদে বিলীন হওয়া ভিন্ন আর কিছুই কাম্য ছিল না তাঁহার জীবনে। একবার জনৈক ব্যক্তি ব্যাধি ও সাংসারিক অশান্তি হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে কুলদানন্দজী লেখেন: আমার কোনপ্রকার যোগৈশ্বর্য নাই, নিশ্চয়ই জানিবে। সাংসারিক বা শারীরিক কোন প্রকার উপকার আমার দ্বারা হইবে না। ভগবানের নাম করি মাত্র—ইহাতে কোন বুজরুকি নাই। শুধু ভগবানের নাম প্রণালী মত সাধন করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই আমার নিকট আসিবেন।···ইহাই কুলদানন্দের অন্তর-মাধুর্যের সত্য ও সার্থক পরিচয়।

কৈশোর হইতেই দুর্লভ সদ্‌গুরুসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন কুলদানন্দজী। বিজয়কৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে তাঁহার সঙ্গলাভের বিস্তারিত বিবরণ অতি নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেন তাঁহার দিনলিপিতে।

গোসাঁইজীর তিরোভাবের পর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; গুরুদেবের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই সেই দিনলিপিগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুভব করিতেন। ১৩২০ সালে তিনি কলেরা রোগে মরণাপন্ন হইলে তাঁহার জীবন সম্পর্কে সকলে হতাশ হইয়া পড়েন। তাঁহার অমূল্য ডায়েরীগুলি আর প্রকাশিত হইল না ভাবিয়া অনেকে অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকেন। গোসাঁইজীর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া ক্রমে সুস্থ হইলেন। গুরুভ্রাতাদের অনুরোধে ডায়েরীগুলি এবার প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন তিনি। কিন্তু নিতান্ত জীর্ণ কাগজে পেনসিলে লেখা ১২৯৮ সালের ডায়েরীখানা তখন বিলুপ্তপ্রায়; এজন্য দিবারাত্র খুব পরিশ্রম করিয়া সর্বপ্রথমে তিনি এই পাণ্ডুলিপিখানির সংস্কার সাধন করেন। এই সময়ে কাশী অবস্থান করিয়া তিনি এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩২১ সালের শেষভাগে নলিনাক্ষ বাবুর যত্নে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ নামে ইহা প্রকাশিত হয়; দিনলিপিগুলির ক্রমানুসারে এইখানি তৃতীয় খণ্ড।

এই সুবিস্তৃত দিনলিপিগুলি একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। পরবর্তী কালে ১২৯৩ হইতে ১৩০০ সালের ঘটনা সম্বলিত এই ডায়েরীগুলি প্রকাশিত হয় মোট পাঁচ খণ্ডে। সমগ্র চৌদ্দ বৎসরের দিনলিপি প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন কুলদানন্দজী। দুঃখের বিষয় গোস্বামী প্রভুর জীবনের অবশিষ্ট ছয় বৎসরের বিবরণ, বিশেষতঃ তাঁহার নীলাচল লীলার কাহিনী অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার এই অসম্পূর্ণ কার্যকে সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, এ বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।*

এই দিনলিপিগুলি জীবনচরিত নয়, ভগবান বিজয়কৃষ্ণের দিব্য জীবনের শেষ চৌদ্দ বৎসরের অমূল্য ইতিবৃত্ত—ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুর ও গৌরবময় অধ্যায়। সাধন জগতের বহুবিধ তথ্য ও রহস্যের উপর ইহা নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। সাধক জীবনে কুলদানন্দ কীভাবে কঠোর সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতে হয়। এইজন্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইবা মাত্র জনসাধারণের নিকট ইহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। অধ্যাত্ম জগতে ইহা এক নূতন জীবন-বেদ। অমূল্য এই গ্রন্থ রচনায় ও সম্পাদনায় কুলদানন্দ যে সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই গ্রন্থগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবৎ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের পার্শ্বেই পরম সমাদরে স্থান পাইবার যোগ্য।

একমাত্র অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে এই ইতিহাস রচনা সম্ভবপর ছিল না; এবং শিষ্যদের মধ্যেও একমাত্র কুলদানন্দ ভিন্ন আর কেহ এই দুরূহ কার্য এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থের 'নিবেদন'এ তিনি লিখিয়াছেন: "...ঠাকুরের নিকট সাধন পাইয়া প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর কাল অবিচ্ছেদে তাঁহার সঙ্গ করি। সে সময়ে তাহার কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ যেদিন যেমন দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, আমার সাধ্যমত যথাযথ ও

* যোগিরাজ কুলদানন্দ—তৃতীয় সংস্করণ ১২৪-২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বিস্তারিতরূপে ডায়েরীর সেই সেই তারিখে সেসব লিখিয়া রাখিয়াছি।” সুতরাং এই গ্রন্থরাজির বিস্তারিত ইতিবৃত্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ন্যায় অভ্রান্ত; ইহার মধ্যে কোথায়ও কল্পনার এতটুকু রেখাপাত নাই। আর, এই গ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক বিষয়গুলি কেহ কল্পনা করিতেও পারিত কিনা সন্দেহ।

“শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ” একাধারে বিজয়কৃষ্ণের সদ্‌গুরু জীবনের চিরমধুর ভাষ্য এবং কুলদানন্দের সাধক জীবনের আত্মচরিত—ইহা তত্ত্বকথার অপূর্ব আধার। ঠাকুর কুলদানন্দ লিখিয়াছেন: “আমার ডায়েরীতে বিশেষভাবে আমারই জীবনের নানাপ্রকার দুরবস্থা ও আকস্মিক দুর্দশায় ঠাকুরের অনুশাসন, উপদেশ, দয়া ও সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপার্থিব জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর নিদর্শন—যাহা তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন—সরলভাবে ও অকপটে যেমন যেমন পাইতাম, লিখিয়া রাখিতাম।”…গুরুদেবের ও নিজের কথা ছাড়া সতীর্থগণেরও বহু বিবরণ, তপঃসিদ্ধ বহু সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক কথা, ভারতের বহু তীর্থের বিবরণ শ্রদ্ধার সহিত প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি ছত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার এই নির্মল গঙ্গাস্রোতে অবগাহন করিলে সত্যই জীবন ধন্য হয়। গ্রন্থগুলি কুলদানন্দের সাধন জীবনের তথা ধর্ম সাহিত্যের এক অক্ষয় কীর্তি—এমন জীবন্ত, অনবদ্য ধর্মপুস্তক শুধু বাঙলা নয় জগৎ সাহিত্যে বিরল।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মনীষী ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এই গ্রন্থগুলি সম্পর্কে লিখিয়াছেন: “এই গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদিত হয়, শঙ্কা আসে, অনুসন্ধিৎসা জাগে—উহার অমর গ্রন্থকার ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের মহত্ত্ব কোথায়, চিন্তার ধারাও বা কিরূপ, প্রকৃত মাহাত্ম্যও বা কী?…এই গ্রন্থের কোথাও তিনি নিজেকে বড় করিয়া ধরিবার বা আত্ম-মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য উৎসুক হন নাই। এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই তিনি যেন গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়াছেন।”

বিজয়কৃষ্ণের তিরোভাবের পর কুলদানন্দের বহু সতীর্থ তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের একখানি জীবনচরিত লিখিবার জন্য অনুরোধ জানান।

এই বিষয়ে কুলদানন্দের বক্তব্য অতি সুন্দর। তিনি বলেন: ঠাকুরের সঙ্গে এই তের-চৌদ্দ বৎসর থেকে তাঁর যে সকল ব্যবহার দেখেছি, তাতে ক'রে তাঁর জীবন-চরিত লেখা বা সে বিষয়ে চেষ্টা করাও নিতান্তই অসম্ভব মনে করি। আমার সরল বিশ্বাস, তাঁর সম্পূর্ণ জীবনী হ'তে পারে না।···

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বর্ণিত বিজয়কৃষ্ণের উক্তি স্মরণীয়। শ্রীগুরুর জীবন বৃত্তান্ত তাঁহার স্বমুখে শুনিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতে এক সময়ে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন কুলদানন্দ। বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে সম্মত হইয়াও পরে মত পরিবর্তন করেন। অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কুলদানন্দ বলেন: জীবনের ও-রূপ আশ্চর্য ঘটনাগুলি চিরকালের জন্য একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যাবে? কেউ কিছু জানবে না?···বিজয়কৃষ্ণ উত্তর দেন: আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তোমাদের নিকটে প্রকাশ পাবে।···

ইহার পর গোস্বামী প্রভুর জীবনের শেষ চৌদ্দ বৎসরের এক প্রকার নিত্যসঙ্গী হইয়াও তাঁহার মূল জীবনী রচনায় বিরত হইয়াছিলেন কুলদানন্দ। তাঁহার গুরুমুখী জীবনে প্রতি কার্যেই গুরুদেবের প্রেরণা ও প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায় থাকিতেন তিনি। আর, সেইজন্যই গুরুদেবের তিরোভাবের পর প্রত্যক্ষ প্রেরণা অভাবে এই দীর্ঘকাল তাঁহার দিন-লিপিগুলি পর্যন্ত প্রকাশে ব্রতী হন নাই। লেখক হিসাবেও তাঁহার পক্ষে ইহা কম সংযমের পরিচয় নয়।

'নিবেদন' এর পরিশেষে কুলদানন্দ লিখিয়াছেন: ঠাকুরের কথা স্মরণ রাখিয়া অতি সাবধানতার সহিত এবং স্থলবিশেষে সংক্ষিপ্ত করিয়া ইহা প্রকাশ করিলাম।···এই কথা বলার তাৎপর্য এই যে, ঠাকুরের অন্তর্ধানের কয়েক দিন পূর্বে একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—'ব্রহ্মচারি, প্রত্যক্ষ সত্যও যাকে তাকে বলতে নেই। যদি বলতে হয়, চোখে আঙুল দিয়ে তাকে প্রমাণসহ দেখাতে হবে।' তাই সব কথা আমার লিখিবার যো নাই, বোবার স্বপ্ন দেখার মত।···

গোস্বামী প্রভুর ঐ একটী কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের বিপুল মহিমা এবং তাহা সম্পাদনায় কুলদানন্দের

বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব। এই দিনলিপি রচনায় গুরুদেবের যে সমর্থন ও আশীর্বাদ ছিল, গ্রন্থের অন্যত্র তাহা উল্লেখ করিয়াছেন কুলদানন্দ। পঞ্চম খণ্ডে দেখা যায়—একদিন মধ্যাহ্নে বিজয়কৃষ্ণ আসনে বসিয়া কুলদানন্দের বাঁধান ডায়েরীখানি হাত পাতিয়া চাহিয়া লইলেন এবং ডায়েরীর প্রথম ও শেষের দিকে কিছুক্ষণ দেখিয়া উহা প্রিয় শিষ্যের হস্তে দিয়া বলিলেন : বেশ! রেখে দাও।···কুলদানন্দ লিখিয়াছেন : ঠাকুরের অযাচিত স্পর্শে ডায়েরী যে আমার পরম পবিত্র হইয়া গেল, সন্দেহ নাই। আমাকে উৎসাহ দিতেই বুঝি ঠাকুর এরূপ করিলেন। কয়েক দিন পূর্বে ঠাকুর একবার বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মচারি যা লিখছে, একশত বৎসর পরে তা দেশের ঘরে ঘরে শাস্ত্ররূপে পঠিত হবে।···

এই অমূল্য গ্রন্থ যাঁহারা একবার পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন গোসাঁইজীর এই ভবিষ্যৎবাণীর তাৎপর্য। এই গ্রন্থ কুলদানন্দের জীবনের অক্ষয় কীর্তি,···জাতির রক্ষাকবচ ও অমূল্য সম্পদ,···অধ্যাত্ম ভারতের চির-উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। এই আলোকেই পথ চিনিয়া যুগে যুগে অগ্রসর হইবেন সাধন পথের শত-লক্ষ পথিক। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ইহারই মধ্যে বহু তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন; ভক্ত ও প্রেমিক লাভ করিবেন তাঁহাদের শত প্রশ্ন ও সংশয়ের সহজ সুন্দর সমাধান।

'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থ প্রকাশের পর বাঙলা দেশের সর্বত্র কুলদানন্দের মহিমা প্রচারিত হইল। তাঁহার খ্যাতি এতদিন সীমিত ছিল প্রধানত শিষ্য, ভক্ত ও সতীর্থ মণ্ডলীর মধ্যে। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের পর তাঁহারও সদ্‌গুরু-জীবনে শুরু হইল নূতন অধ্যায়। বহু নরনারী আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইতে লাগিল।

ইতিপূর্বে বাঙলাদেশে ভগবান বিজয়কৃষ্ণের মহিমা তেমনভাবে প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার বিচিত্র আধ্যাত্মিক রূপান্তরের বিবরণ জানিবার জন্য ছিল মাত্র স্বরচিত 'আশাবতীর উপাখ্যান'। কিন্তু 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় ইহার অতি সামান্য অংশই প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে গোসাঁইজী বলেন: আশাবতীর উপাখ্যান বামাবোধিনী পত্রিকায় যখন আমি লিখতে আরম্ভ করলাম, সামান্য একটু লিখতেই চারিদিকে ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হয়ে ঐ প্রকার সব লিখছি, সাধারণ ব্রাহ্মদের ভিতরে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন চল্‌ল। প্রাণের সত্য ঘটনার উপরে লোকের অনাদর, অশ্রদ্ধা দেখে বড়ই দুঃখ হলো—তখনই লেখা বন্ধ করে দিলাম। আশাবতীতে যা লেখা হয়েছে, তা তো কিছুই নয়, অতি সামান্য। তার পরের সব ঘটনা আরো অদ্ভূত—সে সব কেউ বিশ্বাস করবে না।···

কুলদানন্দের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবার পর চমকিয়া উঠিলেন ধর্মার্থী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক সমাজ। গেণ্ডারিয়ার নির্জন অরণ্যে জটাজুটশোভিত বিজয়কৃষ্ণ আপন সাধনার গরিমা লইয়া কীভাবে অবস্থান করিতেন, তাহার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইল ভাবুক বাঙালী। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বুঝিতে পারিল, ধর্মজগতে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু। সাগ্রহে জানিতে পারিল, তাঁহারই দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে আবির্ভূত সদ্‌গুরু কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি প্রচার করিতেছেন শাস্ত্র ও সদাচারের উদার বাণী, ব্রহ্মচর্যের নূতন মহিমা। বাঙলার মৃতপ্রায় সমাজ-জীবনে সঞ্চার করিতেছেন নবচেতনা, নাম ও প্রেমধর্মের দিব্য প্রেরণা।···

বাঙলার সহিত ভারতের বহু মহাপুরুষের প্রথম পরিচয়ের যোগসূত্র স্থাপন করেন বিজয়কৃষ্ণ। গিরি মহারাজ, গম্ভীরনাথজী, রামদাস কাঠিয়া বাবা, বারদীর ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভারতীয় মহাশক্তিশালী সাধু মহাত্মাদের কথা বাঙলায় সমধিক প্রচারিত হইল এই অমূল্য গ্রন্থের মাধ্যমেই। অধিকন্তু, এই সকল মহাপুরুষগণও বাঙলার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন শ্রীমৎ কুলদানন্দের ক্রমবর্ধমান প্রভাবেই। ভারতের বিশাল সাধুসমাজে বাঙলা ছিল যেন অপাঙক্তেয়। ১৩০০ সালের কুম্ভমেলায় বিজয়কৃষ্ণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভু এবং সেখানে দেখা দেয় বাঙলার মর্যাদাসম্পন্ন স্থান-লাভের শুভ সূচনা। পরবর্তী কালে সন্তদাসজী, মহাদেবানন্দজী,

কুলদানন্দজী ও দরবেশজী বাঙলাকে স্থায়ী আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে গুরুদেবের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করাও সদ্‌গুরু কুলদানন্দের আর এক অক্ষয় কীর্তি।

'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর হইতে এইভাবে দিন দিন ব্যাপক ও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল কুলদানন্দের সদ্‌গুরু-লীলা। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া দেখা দিল বিজয়কৃষ্ণের অমোঘ শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এক নির্মল অধ্যাত্ম ভাবে ভরিয়া উঠিল বাঙলার আকাশ বাতাস—বাঙালীর ধর্ম-জীবনে দেখা দিল নূতন ভাবের জোয়ার। শাস্ত্র ও সদাচারে, নাম ও গুরুবাদে বাঙালী নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইল তাহার লুপ্ত আস্থা ও গভীর বিশ্বাস।

॥ ছয় ॥

ফাল্গুন মাস, ১৩২১ সাল। আবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া এক মাস অবস্থান করেন কুলদানন্দজী। উপস্থিত শিষ্য-শিষ্যাগণকে অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন ধামের লীলারহস্য বর্ণনা করেন এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করান। সেখানেও কয়েকজনে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৩২২ সালের প্রথমে পুরী উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি ফিরিয়া আসিলেন সুকিয়া ষ্ট্রীটে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে দীক্ষিত হন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার সত্যরঞ্জন সেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতেন ব্রহ্মচারিজী।

এই সময়ে যে সব ভাগ্যবান দীক্ষালাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বদেশহিতৈষী জননায়ক ব্রজগোপাল গোস্বামী অন্যতম। তিনি ছিলেন শিয়ালদহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, কলিকাতা পৌরসভার সদস্য। অধিকন্তু তিনি শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশের সন্তান—গোস্বামী প্রভুর স্বজাতি। বংশগত সংস্কারবশে বাল্যকাল হইতে ব্রজগোপাল ছিলেন ধর্মানুরাগী। গোস্বামী প্রভুর পুরীযাত্রার পূর্বে ব্রজগোপালের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। থিয়োজফির উপর ঝোঁক আছে শুনিয়া গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে বলেন: ও বড় নীরস, তোমাকে এই পথেই আসতে হবে।...দীর্ঘ ষোল

বৎসর পরে স্বপ্নযোগে পিতৃদেবের নিকট মন্ত্রলাভ করেন ব্রজগোপাল। পরে ভগ্নিপতির অনুরোধে কুলদানন্দকে দর্শন করিতে আসেন সুকিয়া ষ্ট্রীটে। ব্রজবাবু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে তাঁহাকেও সেইভাবে প্রতি-প্রণাম জানান ব্রহ্মচারিজী।

কয়েক দিন পরে দীক্ষালাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ব্রজগোপাল বাবু। সাগ্রহে কুলদানন্দজী বলেন ঃ আমি তো আপনাকে দীক্ষা দিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম। নিশ্চয়ই আপনার দীক্ষা হবে।...

দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্র বিস্মিত হইলেন ব্রজগোপাল বাবু। তাঁহার স্বপ্নলব্ধ পিতৃদত্ত মন্ত্র আর ব্রহ্মচারিজী প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র একই।...এই যোগাযোগ হইতে প্রতীয়মান হয়, ঠাকুর কুলদানন্দ দীক্ষা প্রদান করিতেন স্বীয় গুরুদেবের আদেশে ও ইঙ্গিতে—সদ্‌গুরুরূপে ইহা তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৩২২ সালে গোস্বামী প্রভুর জন্মোৎসবের পূর্ব হইতে ভীষণ পীড়িত হন নলিনাক্ষ বাবু। তাঁহার সর্ব শরীর পচিয়া গিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইত—কেহ নিকটে যাইতে পারিতেন না। যন্ত্রণার উপশমের জন্য সকলে সহানুভূতি দেখাইয়া শ্রীনাম করিতে বলিতেন; কিন্তু নাম করিতে অস্বীকার করিতেন নলিনাক্ষ বাবু।

ঠাকুর কুলদানন্দকে একথা জানাইলে সস্মিত মুখে তিনি বলেন ঃ মহানন্দকে বলো, যেন ভাল করে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে।...মহানন্দদা অনুনয় বিনয় করিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলে নলিনাক্ষ বাবু গোপনে বলেন ঃ এই সময় আমি নাম করলে সমস্ত ভোগটা ঠাকুর গ্রহণ করবেন—আমার একটা দীর্ঘনিশ্বাসও তাঁর বুকে লাগে। আমি অনন্ত নরকে চলে যাই সেও ভাল, তবু ঠাকুরকে ভোগাব না, নাম করব না।...ভক্তশ্রেষ্ঠ নলিনাক্ষের প্রাণের কথা আমাদের জীবনে সঞ্চার করে গভীর অনুপ্রেরণা।

চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে লইয়া ঠাকুর কুলদানন্দ ভাদ্র মাসের শেষে গেলেন ঘাটশীলায়। এক মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সকল

কর্মভোগের অবসান হইল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে নলিনাক্ষ শ্রীগুরুকে বলিলেন: বাবা, আমি কোন দিন আপনার পায়ের ধূলো মাথায় নিই নি, কারণ আপনাকে স্পর্শ করবার ধৃষ্টতা আমার ছিল না। আপনি কলিকাতা চলে যাচ্ছেন—আজ পায়ের ধূলো পাব কি?

অন্তিম পথযাত্রী গুরুভক্ত শিষ্যের মস্তকে পদস্থাপন করিলেন শ্রীগুরুদেব। তাঁহার সস্নেহ আশীর্বাদে নিঃসংশয়ে মুক্তিলাভ করিলেন নলিনাক্ষ। যতদিন দেহে ছিলেন, গুরুসেবা ও গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গেলেন তিনি।

সকলকে লইয়া চন্দননগরে চলিয়া আসিলেন কুলদানন্দজী। মহাহোমের পর বৎসরের বাকি কয়েক মাস কাটাইলেন কাশীধামে।

নলিনাক্ষের অন্তিমকালের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী, শিশুপুত্র গৌরাঙ্গ এবং কন্যা মৃদুহাসিনীর রক্ষণাবেক্ষণের গুরুভার একপ্রকার স্বহস্তেই গ্রহণ করেন কুলদানন্দজী; আর মহানন্দ ব্যবসায়ের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসে কাশীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ব্রহ্মচারিজী। বিপত্নীক মহানন্দের সহিত নলিনাক্ষের কন্যা মৃদুহাসিনীর বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি পুরী উৎসবে যোগদান করেন। অল্পদিন পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন তাঁহারা। অনুগত উভয় পরিবারের মধ্যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মধ্যে এই সংযোগ স্থাপন করিলেন ব্রহ্মচারিজী।

বরিশালের প্রসিদ্ধ জমিদার রাখাল রায় চৌধুরী ছিলেন গোসাঁইজীর অনুরাগী শিষ্য। তাঁহার একমাত্র পুত্র, সুকবি ও প্রিয়দর্শন দেবকুমার অল্প বয়সেই গোসাঁইজীর নিকট দীক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন কুলদানন্দের অতি প্রিয়পাত্র। পিতার মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়া গুরুভ্রাতাদের সঙ্গছাড়া হইয়া পড়েন তিনি। ব্রহ্মচারীজির সঙ্গেও এতকাল তাঁহার আর কোন যোগাযোগ ছিল না।

গিরি মহারাজের নিকট স্ত্রী শকুন্তলা দেবীর দীক্ষাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হরিদ্বার লইয়া যান দেবকুমার। সেখানে গিয়া শকুন্তলা দেবী স্বপ্নে দেখিলেন, যেন গোসাঁইজী ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া

বলিতেছেন : পুরী গিয়ে এঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর।···স্বামীকে স্বপ্নের কথা বলিলে সোজা পুরী চলিয়া গেলেন তাঁহারা। পুরী আশ্রমে প্রবেশমাত্র হতবাক হইয়া দেখিলেন, সদর দরজার নিকটে দণ্ডায়মান আজানুলম্বিত জটাজুট শোভিত ভুবনমোহন ব্রহ্মচারিজী। ···গভীর আবেগে শকুন্তলা দেবী বলিয়া উঠিলেন : এই মূর্তিই স্বপ্নে দেখেছি।···ইহার পূর্বে আর কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই।

দেবকুমারের মুখে স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়া ব্রহ্মচারিজীর প্রদীপ্ত আননে খেলিয়া গেল সস্মিত মধুর হাসি। পুরীতে গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব তখন সমাপ্ত হইয়াছে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে শুভক্ষণে ব্রহ্মচারিজীর নিকট দীক্ষালাভ করিলেন শকুন্তলা দেবী।

ইহার পর হইতে অনেক সময় ব্রহ্মচারীজির সঙ্গ করিতেন দেবকুমার। দুই-তিন বৎসর পরে একবার তাঁহাকে পরম সমাদরে তাঁহাদের বরিশালের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে স্ত্রী-বিয়োগ হইলে সান্ত্বনা লাভের জন্য তিনি কুলদানন্দের নিকটে ছুটিয়া আসেন। ব্রহ্মচারিজীর সমবেদনায় সদ্য পত্নী-বিয়োগাতুর দেবকুমারের সমস্ত শোক ও বিরহতাপ জুড়াইয়া যায়।

দেবকুমার বলেন : ব্রহ্মচারিজীর নিকট আসিতেই (পুরী, ঠাকুর বাড়ী) তিনি গভীরভাবে আলিঙ্গন করিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়েন, যেন তাঁহারই পত্নী বিয়োগ হইয়াছে। ব্লটিং কাগজে যেমন কালি শুষিয়া লয় তেমনি ব্রহ্মচারীর আলিঙ্গন আমাকে সমস্ত শোক-মোহ হইতে মুক্তি দেয়। পত্নীর অভাবে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে মনে করিতাম ; কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দেখিলাম আমার মধ্যে কোন কষ্ট নাই, আমি পরমানন্দে পুলীনপুরী ভবনে বাস করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারী সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অসাধারণ সহানুভূতি ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মচারীর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি শতগুণে বর্ধিত হইল।

পুরী হইতে ফিরিয়া সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অবস্থান করেন ব্রহ্মচারিজী। ঝুলন পূর্ণিমার পুণ্য দিনে এই বৎসর হইতে গুরুদেবের

জন্মোৎসবের আয়োজন করেন তিনি। এই উৎসবের সময় আমাদের সতীর্থ ভজননিষ্ঠ চুণীলাল দে পুষ্পপত্র দ্বারা পরিপাটিরূপে সাজাইতেন গোস্বামী প্রভুর প্রতিমূর্তি। সেইদিকে চাহিলে দর্শকমাত্রেই আর চক্ষু ফিরাইতে পারিত না।

ঝুলনের পর তিন দিন এখানে কীর্তন করিলেন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া গণেশ দাস। তাঁহার কীর্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন গোস্বামী প্রভু। এইজন্য ব্রহ্মচারিজী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। এই উৎসবে তাঁহার বিশিষ্ট সতীর্থগণের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, হেমেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি যোগদান করেন। আর, বিপিনচন্দ্রের সহিত আগমন করেন কীর্তনানুরাগী স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়*। গণেশ দাসের কীর্তন শুনিয়া চিত্তরঞ্জন আত্মহারা হইতেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু ব্যারিষ্টার ভুবনমোহন চ্যাটার্জিও এই উৎসবে যোগদান করিতেন। চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া একবার সশিষ্যে কীর্তন শুনিতে যান ব্রহ্মচারিজী। চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে খুব ভক্তি করিতেন এবং তিনি কলিকাতায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গ করিতেন।

সুকীয়া ষ্ট্রীটে ১লা ভাদ্র তারিখে অনেকেই দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ইনজিনীয়ার ভবেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। খুবই ভক্তিমান ছিলেন ভবেন বাবু। বর্ধমান জেলায় তাঁহার জন্মস্থান শাঁখারী গ্রামে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পাঠ, কীর্তন ও নির্জন সাধন ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন তিনি। তাঁহার রচিত 'শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন' পুস্তক তাঁহার সারাজীবনের শিক্ষা, গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অপূর্ব পরিচায়ক। গুরুদেবের সেবাতেও তিনি ছিলেন সর্বদাই উন্মুখ। শিষ্যের সেবা কীভাবে গ্রহণ করিতেন ব্রহ্মচারিজী, নিম্নের চিঠিখানি হইতে তাহা জানা যাইবে :

* তখনও তিনি 'দেশবন্ধু' আখ্যা লাভ করেন নাই।

"কল্যাণবরেষু—

স্নেহের ভবেন, তোমার পত্রখানি পড়িয়া বড়ই ঠাণ্ডা হইলাম—বড়ই আরাম পাইলাম। কীভাবে কী ভাষায় তোমাকে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না।

আমার কোন সেবা করিতে পারিলে না বলিয়া দুঃখ করিয়াছ। এই দুঃখ তোমার প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাভাবিক হইলেও আমি ও-কথায় দুঃখ পাইলাম। আর কী সেবা করিবে? তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করিতেছ। গোড়ায় সরুধারা গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া নদীনালার সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাগরে গিয়া মিলিয়াছেন। তোমাদেরও সাধন ভজন, শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসায় আমি বর্দ্ধিত হইতেছি। তোমরাই আমাকে নিজেদের শক্তিতে শক্তিশালী করিয়া মহাসাগরে টানিয়া নিতেছ। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা আর কী আছে?

তবে তোমরা আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি কর, ভালবাস—আমি তোমাদের সেই প্রকার কিছুই করিতে পারিলাম না। আমার নিকট তোমরা কখনও আদরযত্ন পাইলে না, স্নেহমমতা পাইলে না। এ দুঃখ নিয়ত আমার অন্তরে আছে এবং শেষদিন পর্যন্ত অন্তরে এই দুঃখ থাকিবে জানিও। ঠাকুর তোমাকে তাঁর অভয় চরণ অমূল্য সম্পদ দানে সুখী করুন, এই আকাঙ্ক্ষা করি। তোমরা আমার বুকের রক্ত। তোমরা যদি অবিকৃত থাকিয়া চিত্ত প্রফুল্ল রাখিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে রাজপুরুষের মত বিচরণ কর, সংসারে আমার মত সুখী কে? তোমরা বিকৃত হইলে আমার বুক-টনটনানি। তাহাতেই আমার রোগ, শোক, পরিতাপ যাহা কিছু।

সুখে থাক—আমিও সুখী হইব। আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

আঃ তোমার ঠাকুর ব্রহ্মচারী।

পুঃ তোমার পত্রখানা রাখিলাম। ক্লেশের সময় পড়িয়া আরাম পাইব।"

চিঠিখানি গুরু-শিষ্য সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ, অপূর্ব নিদর্শন। বরেণ্য, আদর্শ সদ্‌গুরু হইলেও তিনি যে ভক্ত শিষ্যদের সেবা লাভ করিবার যোগ্য অধিকারী, এই মনোভাব কখনও তাঁহার বিরাট হৃদয়ে স্থান পায় নাই। বরং শিষ্যের এতটুকু সেবা লাভ করিলেই যেন গলিয়া

যাইতেন, মগ্ন হইতেন গভীর আনন্দে। গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর নির্দেশে সমস্ত প্রতিষ্ঠার ভাব ও অহংবুদ্ধি এমনি করিয়াই তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।···

আবার সাধন ভজনে কিছুমাত্র অবহেলা দেখিলেই শিষ্যদের শাসন করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না ব্রহ্মচারিজী। শিষ্যেরা অনেকেই সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মিলিত হইতেন। এই সময় হইতে এখানে প্রতি বুধবারে সাধন-বৈঠক আরম্ভ হয়। সকল গুরুভ্রাতারা এখানে মিলিত হইয়া পাঠ, নাম, প্রাণায়াম ও কীর্তন করিতেন। পূরাণবর্ণিত ঋষির ন্যায় শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া তাঁহার সন্তানদের উপদেশ দিতেন কুলদানন্দজী। মহানন্দদা'র ডায়েরী হইতে দেখা যায়, ব্রহ্মচারিজী বলিতেন: "তোমরা সাধন ভজন কর কই? আচ্ছা, বল দেখি তোমাদের মধ্যে একজনও কি কখনও ঘুম কমাবার চেষ্টা করেছ? সমস্ত দিন বৃথা কার্যে তোমাদের সময় কেটে যায়। রাত্রিকালে সাধন ভজন করবার উপযুক্ত সময়—তাও নিদ্রাতেই কাটিয়ে দাও। কাজেই তোমাদের সাধন ভজন করবার সময়ই হয় না। আমি যখন ঘুম কমাবার চেষ্টা করেছিলাম, তখন ঘুমে ধরলে প্রথমে দাঁড়াতাম, পরে চলা ফেরা করতাম। তাতেও ঘুমে ধরলে হাতের আঙ্গুল প্রদীপের মধ্যে দিয়ে পোড়াতে যেতাম। তোমরা কি কেউ একদিনও আঙ্গুল পোড়াতে গিয়েছ? ঘুম না এলে বরং লম্বা হয়ে শুয়ে গা-পা টেপাতে থাক, যেন তাতে ঘুম আসে। প্রত্যহ চার ঘণ্টার বেশী ঘুমের দরকার নেই। ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত ধরে বলতে হয়েছে "মা দিবা স্বাপসী"। কিন্তু তা কে পালন কচ্ছে? তোমরা সাধন ভজনকে আপনার করলে কই?"

কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন: সাধন ভজনকে আপনার মনে হচ্ছে না কেন?···জলদগম্ভীর কণ্ঠেই বলিতেন ব্রহ্মচারিজী: সোজা কথায় বলতে গেলে গুরুর উপর নিষ্ঠা ও প্রকৃত বিশ্বাস হয়নি বলে।···

গুরুনিষ্ঠা এবং গুরুতে বিশ্বাস কী বস্তু, কুলদানন্দের জীবনই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনাদর্শ। বস্তুত, তাঁহার জীবনই ছিল তাঁহার বাণী।

এই সাধন বৈঠকে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সর্বশ্রী কালি বিশ্বাস, হরিচরণ বাবু, ভবেন বাবু এবং বগলাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অগ্রণী। তীব্র সাধনশীল হরিচরণ বাবুকে পরে ব্রহ্মচারিজী লেখেন :
"প্রীতিভাজনেষু—

সুকিয়া ষ্ট্রীটে নিয়মিতরূপে বৈঠকাদি করিতেছ শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বৈঠকের পূর্বে একটু নামসংকীর্তন যেমন প্রয়োজন, ধর্ম-গ্রন্থ পাঠও সেই প্রকার আবশ্যক। তোমরা আফিস আদালত, কাজকর্মে হয়রাণ থাক—একটা প্রয়োজনীয় কথা বলিতেও বাধা আসে, স্বচ্ছন্দভাবে বলিতে পারি না। যদি তোমাদের বিশেষ অসুবিধা না হয়, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ ঐস্থানে পাঠ কবিতে পার। সকলকেই যে তাতে নানা দিকে অসুবিধা করিয়া যোগ দিতে হইবে তাহা বলি না। তবে যিনি পারেন, যোগ দিবেন। এই প্রকার একটা নিয়ম থাকিলে ভাল হয়। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।"

আঃ ব্রহ্মচারী।

শিষ্যদের তুচ্ছ ক্লান্তি ও অসুবিধাও এতখানি অন্তর দিয়াই অনুভব করিতেন ঠাকুর কুলদানন্দ। আর সেইজন্য, অতি প্রয়োজনীয় কথাও তাঁহাদের বলিতে এমনি দ্বিধাবোধ করিতেন।

১লা আশ্বিন, ১৩২৩ সাল। এইদিনে শ্রীজিতেন্দ্রশংকর দাশগুপ্ত, তাঁহার স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী এবং কানাইলাল বসু মহাশয়ের দীক্ষা হয়। প্রথমে দীক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন জিতেন বাবু। কিন্তু ব্রহ্মচারিজীর প্রবল আকর্ষণী শক্তিতে অকস্মাৎ তাঁহার মতের পরিবর্তন হয়। দীক্ষার পর তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকেন প্রায় তিন সপ্তাহ। থাকিয়া থাকিয়া অজ্ঞাতসারেই নাম চলিতে থাকে শ্বাস প্রশ্বাসে। তাঁহার মনোগজতে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং ভাগবত পাঠে ছিল অপূর্ব অনুরাগ। কতকগুলি ঘটনা অবলম্বনে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে 'অমৃত প্রসঙ্গ' নামে পুস্তক

লেখেন। প্রফুল্লময়ী সুকবি—ঠাকুরের নির্দ্দেশে তিনি 'সদ্‌গুরু সঙ্গ' পুস্তক কাব্যে রচনা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু অর্থানুকূল্য না থাকায় প্রকাশিত হয় নাই।

মহাষ্টমীতে মহাহোমের পর দীক্ষালাভ করেন শ্যামপুরের জমিদার বিষ্ণুপদ বেরা। সুন্দরবনে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে ২০০ বিঘা জমি গুরুদেবকে তিনি দান করেন।

পৌষ মাসের প্রথমে দীক্ষালাভ করেন শ্রীচুণীলাল দে মহাশয়। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, সকলেরই প্রিয়। আর, যেমন গভীর সংযমী, তেমনই সাধনশীল। তাঁহার ফুলের কারবার ছিল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। উৎসবের সময় গোসাঁইজীর প্রতিমূর্তি ফুলপাতা দিয়া অপূর্ব সাজে সাজাইতেন।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুকিয়া ষ্ট্রীটে থাকেন ব্রহ্মচারিজী। পরে তিনি চলিয়া যান কাশীধামে।

॥ সাত ॥

পুরীতে গোস্বামী প্রভুর সমাধি-মন্দির জটিয়াবাবার মঠ নামে সুপ্রসিদ্ধ। নিকটে আর একটী স্বতন্ত্র আশ্রমবাটীর নিতান্ত প্রয়োজন অনুভব করেন ব্রহ্মচারিজী। গুরুদেবের মধুর লীলাভূমি এই নীলাচল—সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমাধিমন্দিরের সান্নিধ্যে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে জীবনের বাকি দিনগুলি যাপন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইদানীং পুরী উৎসবেও তাঁহার বহু শিষ্য সমাগম হইত। জটিয়াবাবার আশ্রমে সকলের স্থান সংকুলানের বড়ই অসুবিধা। শিষ্যগণ সপরিবারে সহজ ও স্বাধীনভাবে আশ্রমবাস ও সাধন ভজন করিবেন, ইহাও তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা।

প্রথম মহাযুদ্ধের বাজারে গুরুকৃপায় লোহার কারবারে প্রচুর অর্থাগম হয় নলিনাক্ষ বাবুর। মৃত্যুর পূর্বে ঐ অর্থের কিছু অংশ গুরুদেবের কোন প্রিয়কার্যে নিয়োগ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন

তিনি। ব্রহ্মচারিজীও পুরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। ১৩২১ সালে সমাধিমন্দিরের অদূরেই আঠার নালা নদীর ধারে কয়েক বিঘা জমি সংগৃহীত হয়। স্থানটীতে ছিল জঙ্গল, আর নিম্ন জলাশয়। এখানে আশ্রম নির্মাণ ছিল দুঃসাধ্য, বহু অর্থ ও আয়াস সাধ্য। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছায় সবই সহজসাধ্য। জঙ্গল কাটা হইল, আর প্রকাণ্ড জলা, চটক পর্বত হইতে শত সহস্র গরুর গাড়ী ভরিয়া বালি আনিয়া জমি ভরাট করা হইল। তাহার উপর ১৪ ফুট মাটীর নীচ হইতে ভিত্তি করিয়া পাথরের পাকা ইমারত নির্মাণ সুরু হইল।

এমন সময় নলিনাক্ষ বাবু অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিলে কার্য ব্যাহত হইল। তবু যোগ্যতা অনুসারে শিষ্যদের বিভিন্ন কর্মভার দিয়াছিলেন ব্রহ্মচারিজী। তাই মহানন্দ ও অচ্যুত নন্দীর তত্ত্বাবধানে কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন রমানাথ, নীলমণি, নারায়ণ মাইতি প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ। আশ্রম নির্মাণ কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৩২৪ সালের নববর্ষে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় আশ্রম সঞ্চারের দিন ধার্য করিলেন ব্রহ্মচারিজী। আশ্রম নির্মাণ ত্বরান্বিত করিবার জন্য চৈত্রমাসে কাশী হইতে তিনি চলিয়া আসিলেন কলিকাতায়। পুরী সমুদ্রতীরে 'সিন্ধু নিবাস' নামে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিয়া কর্মীবৃন্দ আশ্রম-নির্মাণ কার্যের তদারক করিতেছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন ব্রহ্মচারিজী।

এই সময়ে দীক্ষালাভ করেন গোপালগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক অমৃতলাল বিশ্বাস। স্কুলের হেডমাষ্টার গিরিশ বাবু ছিলেন গোসাঁইজীর শিষ্য। তাহার নিকট ব্রহ্মচারিজীর কথা শুনিয়া বৎসরাধিক পূর্বে দীক্ষাপ্রাপ্তির ইচ্ছা জাগে অমৃত বাবুর। কিন্তু তিনি ছিলেন মাংসাসী—মাংস ছাড়িতে হইবে বলিয়া এতদিন দীক্ষা লইতে পারেন নাই। এবার দীক্ষালাভের পরও মাংসের প্রলোভন কিছুতেই যাইতে চাহে না। অবশেষে একদিন ভাবিলেন, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মাংস ভক্ষণ করিবেন। সেইদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন—যেন গুরুদেব নিজেই মাংস রান্না করিয়া খাইতে দিয়াছেন।...পরদিন হইতে তাঁহার মাংস খাইবার লোভ চিরদিনের মত ঘুচিয়া যায়।

তাঁহার ডায়েরীতে তিনি তাঁহার সাধন জীবনে অলৌকিক দর্শন, শ্রবণ, উপলব্ধ ও প্রত্যক্ষ শ্রীগুরুর নানা যোগবিভূতির কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় মনোহরপুকুর রোডে মন্দির নির্মাণ করাইয়া গোসাঁইজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন। মূর্তি নির্মাণের জন্য আনীত হইল কৃষ্ণনগরের দক্ষ কারিগর। হেমেন্দ্র বাবুর অনুরোধে মূর্তি নির্মাণ কার্য দেখিতে গেলেন ব্রহ্মচারিজী। কারিগর তখন মূর্তি নির্মাণে ব্যস্ত। সেইদিকে নজর রাখিয়া ব্রহ্মচারিজী হেমেন্দ্র বাবুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

সহসা অগ্রসর হইয়া কারিগরের হাত হইতে তিনি যন্ত্রটী লইলেন। পরমুহূর্তে মূর্তির মুখের খানিকটা মাটি কাটিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য! গোসাঁইজীর মুখখানি বেশ যেন পরিস্ফুট হইল এতক্ষণে।···

সানন্দে বলিয়া উঠিলেন হেমেন্দ্র বাবুঃ ব্রহ্মচারি! আপনি যে কৃষ্ণনগরের কারিগরকেও হার মানালেন।···

ঈষৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন ব্রহ্মচারিজী। ছল ছল নেত্রে বলিলেনঃ দেখুন, গোসাঁইয়ের মূর্তি এক মুহূর্তের জন্যও আমার চোখের আড়াল হয় না।···তাঁর শ্রীমুখের ঐ স্থানটী দেখে, কি জানি কেন, মনে হল ঠিক হয় নি। তাই যন্ত্র হাতে নিয়ে শ্রীমূর্তি ধ্যান করে যন্ত্র চালিয়েছি।···

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারিজীর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। অশ্রু-কম্প-পুলকে অভিভূত হইল দেবদেহ। নিমীলিত নেত্রে তিনি নিমগ্ন হইলেন শ্রীগুরুদেবের ধ্যানে।

ইহাই প্রকৃত গুরুনিষ্ঠা। আর এমনি করিয়াই অসম্ভব সম্ভব হয় কেবলমাত্র গুরুকৃপায়।···

শেষ পর্যন্ত হেমেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে কোন মূর্তি স্থাপিত হয় নাই। পরিবর্তে গোস্বামী প্রভুর প্রতিকৃতির নিত্য সেবাপূজা হইয়া আসিতেছে।

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে গোসাঁইজীর তিরোভাব তিথি উৎসব। পুরীতে আশ্রমকার্য সমাধার জন্য অবিলম্বে সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিলেন ব্রহ্মচারিজী।

চৈত্রমাসের শেষে চলিয়া গেলেন পুরীধামে। আশ্রম নির্মাণকার্য দ্রুত সমাপ্তির জন্য নিজে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

১০ই বৈশাখ, ১৩২৪—শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। এই পরম শুভক্ষণে ঠাকুরবাড়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতঃপর ইষ্টদেবের শ্রীচরণতলে নিত্য বাস করিতে পারিবেন ভাবিয়া কৃতার্থবোধ করিলেন কুলদানন্দজী। ভক্তবাঞ্ছা ভগবানই পূর্ণ করেন—সদ্‌গুরু মঞ্জুর করেন একনিষ্ঠ শিষ্যের আন্তরিক প্রার্থনা। তাই গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দিরের পার্শ্বেই স্থাপিত হইল কুলদানন্দের জীবনের স্বপ্ন ঠাকুরবাড়ী আশ্রম। বৃক্ষলতা শোভিত আঠারোনালা নদীর উপর আশ্রমটী ঠিক যেন একটী তপোবন। তেমনি প্রশান্ত, গম্ভীর অথচ মধুর ইহার পরিবেশ। ছায়া-সুনিবিড় একটী মনোরম শান্তির নীড় যেন !···

আশ্রমে নানা শাক্‌সব্জি ও ফুল-ফলের বাগান প্রস্তুত হইল। ব্রহ্মচারিজী প্রতিষ্ঠা করিলেন গোস্বামী প্রভু ও জননী যোগমায়াদেবীর বিগ্রহ, আর মহাবিষ্ণুচক্র শালগ্রাম শিলা। এই শিলা তিনি হরিদ্বার চণ্ডীপাহাড় হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি ঠাকুরবাড়ীতে বিগ্রহত্রয়ের বিধিমত সেবাপূজা হইয়া আসিতেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে নবনির্মিত ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে এবার মহাসমারোহে গোসাঁইজীর তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। এই উৎসবে বারো তেরো শত দরিদ্রনারায়ণ ও ব্রাহ্মণদের ভোজন করান হইল। ব্রহ্মচারিজী নিজে প্রত্যেকের নিকট গিয়া সকলকে তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করাইলেন।

স্ত্রী-পুরুষদের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আশ্রমবাসের ব্যবস্থা হইল। হেমচন্দ্র বটব্যাল, উপেন্দ্র শ্রীমানি, ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, মনোরমা শ্রীমানি, কুসুম কুমারী প্রভৃতি শিষ্য-শিষ্যাগণ স্থায়ীভাবে আশ্রমে বাস করিয়া সেবাপূজায় ব্রতী হইলেন। দিনে দিনে আশ্রমের শ্রী ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইভাবে একে একে কাশী, চন্দননগর ও পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। পরবর্তী জীবনে ভুবনেশ্বরে ও শ্যামপুরেও আশ্রম স্থাপন করেন ব্রহ্মচারিজী। সর্বত্রই তিনি ইষ্টদেব ভগবান বিজয়কৃষ্ণের ও মাতা-ঠাকুরাণী যোগমায়াদেবীর প্রতিকৃতি স্থাপন ও সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন। একদিকে কঠোর বিধি-নিষেধ, অন্যদিকে অনাবিল আনন্দ উৎসব—এই উভয়ের মাঝে স্থাপন করেন মধুর সমন্বয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সমূহের ইহাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইজন্য আশ্রমগুলি ছিল সকল শ্রেণীর ভক্তদের আকর্ষণের কেন্দ্র—তাঁহাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনার উৎস।

নিয়মিত সেবাপূজা, সাধন-ভজন ছাড়াও গুরুভ্রাতা-ভগ্নি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতাদিরও সেবা করিতে সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ব্রহ্মচারিজী। গুরু-গোবিন্দ যে অসীম, অনন্ত,···সর্বত্রই তিনি যে স্বপ্রকাশ।···তাইতো একটী পুষ্প বা বৃক্ষলতার দিকেও তিনি তাকাইয়া থাকিতেন বিহ্বল নেত্রে। তুচ্ছ ইতর জীবের দুঃখেও ঢালিয়া দিতেন প্রাণের গভীর প্রীতিধারা। তেমনি শিশুর হাসিতে, পাখীর কাকলিতে অপূর্ব পুলকে অনুভব করিতেন আনন্দময়ের চিন্ময় সত্তা। পত্রমর্মরে, জলকল্লোলে তিনি কান পাতিয়া শুনিতেন প্রেমময়ের চিরমধুর সংগীত।··· তাপদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে সুশীতল মেঘবর্ষণে ছলছল চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন, সত্যই ভগবানের কী অপার করুণা।···

'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'—জগতে সবই ব্রহ্মময়, সর্বত্রই প্রেমময়ের অধিষ্ঠান। এই আদর্শের ভিত্তিতে আশ্রমবাসীদের পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতেন ব্রহ্মচারিজী। সংসার অসার হইলেও যাবতীয় সাংসারিক কর্মই সাধন-ভজনের ন্যায় অবশ্য কর্তব্য, প্রেমধর্মের মাধ্যমে প্রতি সংসার হইয়া উঠিবে ঋষি-পরিবার, প্রতি স্বামী-স্ত্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ—আশ্রমবাসী স্ত্রী-পুরুষের মাঝেও ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান শিক্ষা। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও ঋষিকল্প হইয়াও তিনি বলিতেনঃ সংসারীদের জন্যই আশ্রম। সংসার-ত্যাগী যারা তাদের স্থান বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে—আশ্রমে নয়।···সংসারধর্ম রক্ষার মূলে গৃহিণীদের স্থান

পুরোভাগে। এইজন্য আর্য-ঋষিদের আশ্রমদ্বারের ন্যায় ব্রহ্মচারিজীর আশ্রমদ্বার স্ত্রীলোকদের জন্য ছিল সদা উন্মুক্ত। পারিবারিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীচরিত্র গঠনের দিকে তিনি ছিলেন অধিকতর সচেতন।

আশ্রমে সেবাধর্ম শিক্ষা দিলেও আশ্রমকে সেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পক্ষপাতী ছিলেন না ব্রহ্মচারিজী। তিনি বলিতেন: এ কাজ আমাদের নয়।···ভগবানে নির্ভরতাই ছিল তাঁহার ব্রত ও আদর্শ। আকাশবৃত্তি অবলম্বন সেই নির্ভরতার নামান্তর। আশ্রমবাসীদের এই আদর্শ শিক্ষা দিতেন তিনি।

পুরীধামে তিন মাস অবস্থান করিলেন ব্রহ্মচারিজী। রথযাত্রার পর শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় সুকিয়া ষ্ট্রীটে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পবিত্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে গুরুদেব ভগবান বিজয়কৃষ্ণের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এবারও নিমন্ত্রিত হইয়া কীর্তন করিলেন বিখ্যাত কীর্তনীয়া গণেশ দাশ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এই উৎসবে যোগদান করায় তাঁহার সহিত ব্রহ্মচারিজীর বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিল।

উৎসবের পর দেশবন্ধুর অনুরোধে তাহার বাড়ীতে গণেশ দাশের কীর্তন হইল। ব্রহ্মচারিজীও নিমন্ত্রিত হইলেন। সেই কীর্তন সভায় উপস্থিত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ব্রহ্মচারিজীর সহিত তিনি আলাপ আলোচনা করেন। নরনারীর ন্যায় পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গের মধ্যেও যে ভাব ও ভাষার আদান-প্রদান চলে, ইহা গোস্বামী প্রভু বহুপূর্বে প্রকাশ করেন। তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, উদ্ভিদও মানবের ন্যায় সংবেদনশীল ও অনুভূতিসম্পন্ন। এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়াও ব্রহ্মচারিজীর সহিত সাগ্রহে আলোচনা করেন জগদীশচন্দ্র। প্রাণীতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্বের পশ্চাতে সর্বব্যাপী ভগবৎ সত্বার কথাই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্মচারিজী। বলেন—একমাত্র ভগবদিচ্ছাতেই সর্বজীব ও উদ্ভিদের

অন্তরে চলিয়াছে একই বেদনা ও আনন্দের প্রস্রবণ—পাত্র ও অবস্থা ভেদে তাহার কিছু তারতম্য দেখা দেয় মাত্র।···এই আলোচনার ফলে এক নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন জগদীশচন্দ্র, এবং অধিকতর উৎসাহে তিনি উদ্ভিদতত্ত্ব গবেষণায় ব্রতী হন।

এই সময়ে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস সস্ত্রীক দীক্ষিত হন। কিছুদিন পরে চার পাঁচটী সন্তান রাখিয়া তাঁহার সহধর্মিণী পরলোক যাত্রা করেন। তখন বিজয়কে সান্ত্বনা দিয়া ব্রহ্মচারিজী পত্রে লেখেন ঃ··· যতটুকু কর্ম ছিল শেষ করিয়া পরমানন্দে বগল বাজাইয়া সে তার চিরপ্রার্থিত নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার সকল দুঃখ ক্লেশের শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে আনন্দ করিতে।···তোমাদের জীবনের যাহা যথার্থ কল্যাণকর, দয়াল ঠাকুর সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন।···তার মৃত্যু মৃত্যু নয়।

কিছুদিন পরে সস্ত্রীক সর্বশ্রী কালিদাস বিশ্বাস, বিজয় কর, উপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি দীক্ষালাভ করেন।

অষ্টমী পূজা উপলক্ষে চন্দননগরে মহাহোম অনুষ্ঠানে যথারীতি যোগদান করেন ব্রহ্মচারিজী। অতঃপর কাশীধাম গমন করিয়া বৎসরের বাকি কয়েক মাস তথায় অতিবাহিত করেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২৫। পুরীধামে গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসবে যথারীতি যোগদান করেন ব্রহ্মচারিজী। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থান করেন অনেক দিন।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিবার কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য তাঁহাকে খুবই পরিশ্রম করিতে হয়। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে তিন-চার ঘণ্টা পুরাতন ডায়েরীগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া লিখিতেন। অপরাহ্ণে শিষ্যদের পাঠ করিতে বলিতেন—আর তিনি মন দিয়া শুনিয়া আবার এক আধটু

ব্রহ্মচারীবেশে শ্রীযোগেশ ভট্টাচার্য্য

বেলুড়ে

সন্তোষনাথজী ও গঙ্গানন্দজী

রদবদল করিতেন। এইরূপ কাজের মধ্য দিয়া রাত্র দ্বিপ্রহর হইয়া যাইত—সর্বক্ষণ তিনি যেন মধুর শ্রীগুরুসঙ্গে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

এইরূপ একনিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়া কাটিয়া যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। ফলে এই বৎসর উক্ত দুই খণ্ড শ্রীশ্রীসদ্-গুরুসঙ্গ প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে দীক্ষালাভ করেন আলিপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীবঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী এবং শ্রীযোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, এম, এ, (যোগেশ ব্রহ্মচারী)। অক্রোধ স্বভাব সাধু বঙ্কুবিহারী চরিত্র মাধুর্যে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। ঠাকুর কুলদানন্দজীর আইন সংক্রান্ত কার্যে তিনি ছিলেন প্রধান সহায়ক। পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রম ও শ্রীগুরুদেবের সমাধি-মন্দিরের তিনি ছিলেন একজন ট্রাষ্টি। যোগেশচন্দ্র প্রথমদিকে দর্শনশাস্ত্রের নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিতেন—সাধুকে তর্কে পরাস্ত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিতেন ব্রহ্মচারিজী। যাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা হয়, ব্রহ্মচারিজীর সেই পূর্ণ অবস্থা বুঝিয়া তিনি মুগ্ধ শ্রদ্ধায় আত্মসমর্পণ করেন। দোল পূর্ণিমায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাঁহার দীক্ষা হয়। ব্রহ্মচর্য ব্রতের কতকগুলি নিয়ম লাভের পর ব্রহ্মচারী বেশে তিনি ভারতের সকল তীর্থ পরিক্রমা করেন। কুম্ভ মেলাতেও তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছেন। গুরুদেবের পত্রাবলী সম্বলিত একখানি পুস্তক এবং গুরুদেব সম্পর্কে কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি অনেক নরনারীকে দীক্ষাদানও করিয়াছেন—বর্তমানে বালিগঞ্জে গ্রাম্য-যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা পূজা ও প্রচার কার্যে ব্রতী আছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২৬। গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি উৎসব। পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে ঠাকুর কুলদানন্দজী সমুপস্থিত।

তাঁহার শিষ্য ডাঃ অন্নদা চরণ ভট্টাচার্য মহাশয় স্ত্রী ও শিশুপুত্রসহ এই উৎসবে যোগদান করেন। অন্নদাবাবু তখন যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমা সহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত। পুরীধামে বেশীদিন

থাকিলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা—অথচ ৺রথযাত্রা দেখিয়া যাইবারও বড়ই আকাঙ্ক্ষা।

৺জগন্নাথদেবের কৃপায় অনুকূল অবস্থাও দেখা দিল। জটিল গলক্ষত রোগে আক্রান্ত হইলেন আশ্রমের প্রধান কর্মী মহানন্দ নন্দী—আর তাঁহার চিকিৎসার ভার পড়িল সুযোগ্য চিকিৎসক অন্নদাচরণের উপর। যথোচিত চিকিৎসায় রোগের প্রকোপ ক্রমশ প্রশমিত হইতে লাগিল। অন্নদা বাবুর সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন মহানন্দ নন্দী। আশাতীতভাবে শ্রীগুরুর সঙ্গলাভের সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন অন্নদাচরণ।

একদিন জনৈক ভদ্রলোক কপট দীক্ষাপ্রার্থীরূপে ঠাকুর কুলদানন্দের নিকট আসিয়া শেষে হস্তরেখা বিচার করিবার আবদার ধরিলেন। অমনি তাঁহাকে অন্নদা দাদার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ব্রহ্মচারিজী। হস্তরেখা বিচার করিবার কথায় অন্নদা দাদা তো অবাক। কিন্তু শ্রীগুরুর আদেশ শুনিয়া তাঁহার শরণ লইতেই তিনি অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন ভদ্রলোকের হস্তে সুস্পষ্ট অক্ষর ফুটিয়া উঠিতেছে যেন।···ডাক্তার অন্নদাচরণ দক্ষ হস্তরেখাবিদের ন্যায় সেগুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ভদ্রলোকের কুৎসিত জীবনের গোপন কথা প্রকাশিত হওয়ায় লজ্জায় স্থান ত্যাগ করিলেন তিনি। ডাক্তার তখন শ্রীগুরুর নিকট সমস্ত কথা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন: অপ্রিয় কথাগুলি আমার মুখ দিয়ে বলা ভাল মনে করি নি।··· এই তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারিজীর কৃপা ও আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলেন সকলে।

শীঘ্রই আর একটি ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার অধিকতর কৃপা ও বিভূতি প্রকটিত হইল। চারি বৎসর পূর্বে চন্দননগর মহাহোম সম্মিলনে সস্ত্রীক যোগদান করিয়াছিলেন অন্নদাচরণ। সন্তানাদি অভাবে তাঁহার স্ত্রী বিজনবালা খুবই বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন। একদিন তাঁহাকে জোড়া কলা খাইতে দিয়াছিলেন কুলদানন্দজী—অমনি গভীর ভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর প্রসাদ গ্রহণ করেন বিজনবালা। ফলে,

অচিরে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—শিশুর নামকরণ হয় গুরুদাস। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে গোস্বামী প্রভুর শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর নিজ আশ্রমের দ্বিতলে উঠিতেছিলেন ব্রহ্মচারিজী। সেইস্থানে ক্রীড়ারত শিশু গুরুদাস সহসা তাঁহার শ্রীচরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া আবদারের সুরে বলিল: আমাকে সাধন দেবেন বলুন—নইলে পা ছাড়ব না।···তিন বৎসরের অবোধ শিশুর কী অলৌকিক দাবী। ···সাধারণ কেহ হইলে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইত। কিন্তু শিশুর পৃষ্ঠে সস্নেহে মৃদু পরশ বুলাইয়া ব্রহ্মচারিজী বলিলেন: সময় হলেই পাবে।···

সেইদিনই অন্নদা ডাক্তার, মহানন্দ নন্দী প্রভৃতির সহিত ভুবনেশ্বর রওনা হইলেন তিনি। শিশুপুত্রকে লইয়া বিজনবালা রহিলেন পুরী আশ্রমে। দুইদিন পরে গুরুদাসের ভীষণ জ্বর হইল—তাপ উঠিল প্রায় চার পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত। ব্যস্ত হইয়া বিজনবালা শ্রীগুরুকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মচারিজীও অপরাহ্নে অন্নদাচরণকে পুরী যাইতে বলিলেন। পুরী পৌঁছিয়া শ্রীগুরুর কৃপা উপলব্ধি করিলেন অন্নদাচরণ, শিশুপুত্রের ঔষধের ব্যবস্থাও করিলেন। পরদিন ব্রহ্মচারিজীও পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিলে বিজনবালা শ্রীগুরুর চরণে কাঁদিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারিজীর অভয় আশীর্বাদে ৪ঠা আষাঢ় প্রাতে গুরুদাসের জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুপুরে ব্রহ্মচারিজী সদলবলে রথযাত্রা দর্শন ও রজ্জু আকর্ষণ করিয়া সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। গোসাঁই আশ্রমে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলেন।

মধ্যরাত্রে গুরুদাস পুনরায় প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। এক সপ্তাহ পরে তাহার রক্তবাহ্য আরম্ভ হইল। ঘোর বিকার অবস্থা দেখিয়া সকলে তাহার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল। অন্নদাচরণকে কুলদানন্দজী বলিলেন: আমাকে ঋণমুক্ত কর—আমি যে গুরুদাসকে দীক্ষা দেবার কথা দিয়েছি।···রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় রোগীর ঘরে ধূপধূনা দেওয়া হইল, শিয়রে স্থাপিত হইল তুলসী বৃক্ষ। ব্রহ্মচারিজী আসিয়া শিশুর মস্তকে বামহস্ত ও বক্ষে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। অর্ধঘণ্টা পরে শিশুর তাপ হ্রাস পাইল, আরও কিছুক্ষণ

পরে ১০০ ডিগ্রির নীচে জ্বর নামিল। শিশুকে তখন তিনবার নাম ধরিয়া ডাকিলেন ব্রহ্মচারিজী—অমনি সচেতন হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে অপরূপ মূর্তি দর্শন করিল শিশু গুরুদাস।···আর সংক্ষেপে উপদেশ দান করিয়া তাহার কর্ণমূলে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ঠাকুর কুলদানন্দ। শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইল—শ্রীনাম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে, এই আশঙ্কায় মূর্ছিতা হইলেন বিজনদিদি। কিন্তু গুরুদাস ক্রমে সুস্থ বোধ করিল—পরে মা-মা বলিয়া ডাকিয়া ক্ষুধার কথা জানাইল। তাহাকে মহাপ্রসাদের জল দিয়া দ্বিতলে গেলেন ব্রহ্মচারিজী এবং আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া রহিলেন। মধ্য রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবল জ্বর ও রক্তবাহ্য দেখা দিল। শীঘ্র সিভিল সার্জেনকে ডাকা হইল, কিন্তু কোন ঔষধ খাইতে বা ইনজেকসান লইতে শ্রীগুরু সম্মত হইলেন না। অগত্যা অন্নদাচরণ সামান্য হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিলেন—কয়েকদিনে শ্রীগুরুও সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অপার কৃপাবলে এইভাবে শিশু গুরুদাসকে দীক্ষাদান করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—শিশুর জীবন-সংশয় পীড়া নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে পুনরুজ্জীবিত করিলেন।···

॥ আট ॥

ব্রহ্মচারিজীকে নিজবাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য কিছুদিন হইতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন বরিশালের সাধক-কবি দেবকুমার। এবার পুরী উৎসবে গিয়াও তিনি বিশেষভাবে ধরিয়া পড়িয়াছিলেন। ঝুলন পূর্ণিমায় ব্রহ্মচারিজী নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যের সহিত গোস্বামী প্রভুর জন্মোৎসব পালন করিলেন। পরে ভাদ্রমাসে গুরুভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ গুহরায় ও কিরণ চাঁদ দরবেশ এবং কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে লইয়া বরিশাল পৌঁছিলেন তিনি।

মহানন্দে শ্রীগুরুকে অভ্যর্থনা করিলেন দেবকুমার ও তাঁহার ধর্মশীলা সহধর্মিণী শকুন্তলা দেবী। তাঁহাদের বাড়ীতে যেন সুরু হইল নিত্য মহোৎসব। শ্রীগুরু এবং অন্যান্য সকলের যথোচিত সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন তাঁহারা। সেই সঙ্গে প্রতিদিন প্রায় একশত জন করিয়া অতিথি-সেবাও চলিতে লাগিল। স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রায় প্রত্যহই গুরুভ্রাতা ব্রহ্মচারিজীর সহিত দেখা করিতে আসিতেন। নানা-প্রকার সদালোচনায় উভয়ের সময় কাটিত পরমানন্দে। সারা বরিশাল সহরে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সহরের গণ্যমান্য প্রায় সকলেই ব্রহ্মচারিজীর দর্শনলাভ করিতে আসিতেন।

পটুয়াখালির তৎকালীন এস-ডি-ও কালীমোহন বাবুর স্ত্রী দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া ব্রহ্মচারিজীকে চিঠি দিয়াছিলেন। পুরী যাইয়াও তাঁহার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারিজীর নির্দেশে জিতেন্দ্রশঙ্কর কালীমোহন বাবুকে খবর দেন। কালীমোহন বাবু জানান তাঁহার স্ত্রীর অন্য কোথাও গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাঁহার বাড়ী যাইবার জন্য তিনি টেলিগ্রাম করিলেন কিন্তু ব্রহ্মচারিজী সম্মত হইলেন না। বাধ্য হইয়া দেবকুমারের বাড়ী আসিয়া তবে কালীমোহন বাবুর স্ত্রী দীক্ষালাভ করেন।

বরিশাল হইতে প্রায় আঠাবো মাইল দক্ষিণে বর্ধিষ্ণু বাসণ্ডা গ্রাম। উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার। তিনি ছিলেন বরিশালের একজন প্রবীণ স্বদেশহিতৈষী ও বুদ্ধিমান জননায়ক। যৌবনে ভোগবিলাসে মত্ত থাকায় তিনি ধর্মানুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল বড়ই কোমল—এজন্য প্রথম হইতেই তিনি ছিলেন পরোপকারী। ষাট বছরের এই বৃদ্ধ কিছুদিন পূর্বে শ্রীশ্রীসদ্‌-গুরুসঙ্গ পাঠ করিয়া ব্রহ্মচারিজীর প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন। তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্রই উপেন্দ্রনাথের মনে দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন। দেবকুমারের বাড়ীতে একদিন নির্জনে ব্রহ্মচারিজীর নিকট নিজের অতীত জীবনের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় অকপটে প্রকাশ করিয়া তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। পতিতের বন্ধু ব্রহ্মচারিজীও কৃপা করিয়া সাদর

আলিঙ্গন দিলেন তাঁহাকে। ১০ই ভাদ্র তারিখে দেবকুমারের বাড়ীতে তাঁহার দীক্ষা হয়। সাত আট মাস পরে তিনি সন্ন্যাস রোগে নিত্যধামে প্রয়াণ করেন; কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ ব্রহ্মচারিজীর প্রভাবে গড়িয়া ওঠে।

উপেন্দ্রনাথের সহিত একই দিনে দীক্ষাগ্রহণ করেন বাসণ্ডা গ্রামের অন্য এক তরুণ জমিদার হিরণকুমার সেন। অকালে পিতৃহীন হওয়ায় তিনিও যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর সরলতা ও মাধুর্যে পূর্ণ ছিল। কৌতূহল বশে তিনি ব্রহ্মচারিজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। অমনি ব্রহ্মচারিজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়।···দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সৎপথে জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া ওঠে। উপেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও একদা নির্জনে নিজের সমস্ত পাপাচারের কথা অকপটে প্রকাশ করেন। দয়াল ব্রহ্মচারিজীও তাঁহার মস্তকে সস্নেহ পরশ বুলাইয়া আশীর্বাদ করেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই ইয়ার বন্ধুদের সহিত মদ্যপান ও সমস্ত কু-অভ্যাস চিরদিনের মত পরিত্যাগ করেন হিরণকুমার।

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় জগাই-মাধাই উদ্ধারলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সদ্‌গুরু ব্রহ্মচারিজীর নিকট উপেন্দ্রনাথ ও হিরণকুমারের দীক্ষাগ্রহণের কথাও সেই কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। দয়াল শ্রীগুরুর অনন্ত শক্তি ও অপার কৃপাবলে কত পাপী-তাপীই না এইভাবে উদ্ধারলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে।

বরিশাল হইতে ফিরিয়া চন্দননগরে মহাহোমে যোগদান করেন ব্রহ্মচারিজী। পরে সুকিয়া ষ্ট্রীটে গণেশ শ্রীমাণীর বাসায় অবস্থান করিতে থাকেন।

এই সময় পিতৃকার্য করিবার জন্য শিষ্য মনোমোহন পণ্ডিত তাঁহার অনুমতি লইয়া গয়াধামে রওনা হইলেন। গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া পাণ্ডাদের উৎপাতে বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। নিরুপায়ে শ্রীগুরুকে স্মরণ করিলেন—পরক্ষণে মনে কেমন একটা সংশয় উপস্থিত

হইল। গোসাঁইজী স্বয়ং ব্রহ্মচর্যব্রত ও নীলকণ্ঠ-বেশ দান করিয়া গিয়াছেন—তবু শ্রীগুরুর কোন ঐশ্বর্য-যোগবিভূতি কি নাই ?···সবই কি তবে স্তাবক ভক্তদের আত্মপ্রচার ?···গোসাঁইজীর যোগৈশ্বর্যের কথাও কি বুজরুগী ?···

সহসা চমকাইয়া উঠিলেন মনোমোহন। নিজের গাড়ীতে বসিয়া অবাক বিস্ময়ে দেখিলেন, অন্য দুই-তিনখানি ঘোড়ার গাড়ীতে শিষ্য-শিষ্যাদের সহিত চলিয়াছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর।···জোর গলায় তিনি বলিলেন: তুমি সোজা পাণ্ডাজীর বাড়ী যাও, আমরা অন্যত্র উঠব। সময়ে দেখা হবে।···মনোমোহন নিরাপদে নির্দিষ্ট পাণ্ডাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন—আহারাদির পর মন্দিরাদিও দর্শন করিলেন। গভীর রাত্রে তাঁহার তন্দ্রাবস্থায় শ্রীগুরু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন: গোসাঁইজীর শক্তি সম্বন্ধে তোমাদের লেশমাত্র সন্দেহেও আমার দুঃখের সীমা থাকে না। সন্দেহ নিরসন করবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে তাঁর শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ছুটে এসেছি। অষ্টসিদ্ধি কিছুই নয়—কী দেখতে চাও ? এককালে বহুস্থানে নিজ সঙ্গীগণসহ প্রকাশ—এটা যোগৈশ্বর্য বা সিদ্ধির কাজ নয়, একমাত্র ভগবান সদ্‌গুরুই এই লীলা প্রকাশ করতে পারেন।···আমাদের যেমন দেখলে তা গোসাঁইজী প্রকাশ করেছেন, আমরা কিন্তু সুকিয়া ষ্ট্রীটেই রয়েছি! অষ্ট বা অষ্টাদশ সিদ্ধি দেখতে চাও পরে দেখো—এখন তোমার গয়াকৃত্য সমাপন কর।"···

তন্দ্রাশেষে যেন নবজীবন লাভ করিলেন মনোমোহন। গয়াকৃত্যের পর বুদ্ধগয়া ও আকাশগঙ্গা দর্শনে গিয়া উভয় স্থানে শ্রীগুরুকেই ধ্যানস্থ দেখিলেন।···বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চমৎকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিল গভীর অনুতাপ—চোখের জলে তিনি শ্রীগুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়াও শুনিলেন শ্রীগুরু বহুদিন স্থানান্তরে গমন করেন নাই।···

ব্রহ্মচারিজী চিরদিন ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। তিনি ভগবান বিজয়কৃষ্ণের নিজহাতে গড়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—আত্মসংযম তাঁহার সমস্ত

লীলা ও বিভূতির প্রাণকেন্দ্র। এজন্য পরমাসিদ্ধি লাভ করিলেও যোগৈশ্বর্য প্রচারের মোহে তিনি কখনও আবদ্ধ হন নাই। সাক্ষাৎ ভগবৎরূপী গোস্বামী প্রভুর তিনি আদর্শ প্রতিভূ—আপন দিব্য জীবনে সদ্‌গুরু-লীলা প্রচার এবং সদ্‌গুরুর সেবা-পূজা প্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান ব্রত।···সেই ব্রত উদযাপনে তাঁহার নিজস্ব শক্তি ও ঐশ্বর্য সর্বদা ছিল প্রচ্ছন্ন। এজন্য ভক্তের অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সত্যই মহিমময়। তাঁহার এই আত্মগোপন লীলা উত্তরোত্তর সমধিক মাধুর্য মণ্ডিত হইয়া ওঠে। তবু লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে, এই ঘটনাও তাঁহার প্রচ্ছন্ন যোগ বিভূতির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

আধুনিক যুগে কত ব্রহ্মচারী, সাধু-সন্ন্যাসী সাজসজ্জার বাহার এবং নানা শাস্ত্রবুলি আওড়াইয়া লোকসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জনে উন্মুখ। কিন্তু গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণতলে বসিয়া ব্রহ্মচারিজী এই শিক্ষালাভ কয়িয়াছিলেন: প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা।···সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের অমোঘ শক্তিতে শক্তিমান হইয়াও নিজেকে তিনি সর্বদা প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া রাখিতেন। এজন্য ভক্ত-শিষ্য ও প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন কেহই তাঁহাকে সহসা চিনিতে বা বুঝিতে পারিত না।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন: "···অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ।" ব্রহ্মচারিজী ছিলেন গীতোক্ত উল্লিখিত গুণাবলীর মূর্ত বিগ্রহ। এই প্রসঙ্গে তাঁহার আত্মগোপন লীলার আর একটী উদাহরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা গান্ধীজির প্রিয় শিষ্য ছিলেন মহাদেব দেশাইজী, তিনি বাঙালী সহকর্মী কৃষ্ণদাসজীর মাধ্যমে ব্রহ্মচারিজীর 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। নতূন আলোক ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পরম শ্রদ্ধা ও আগ্রহভরে তিনি গ্রন্থগুলি নিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে গান্ধীজিও গ্রন্থগুলির পরিচয় পাইয়া অবিলম্বে ইহার বিশেষ ভক্ত হইয়া ওঠেন এবং জন কল্যাণের তাগিদে গুজরাটি ভাষায় গ্রন্থগুলি অনুবাদ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

ঠাকুরবাড়ী বৃন্দাবন

পুলিনপুরী স্বর্গদ্বার - পুরী

মহাগুহার সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, গঙ্গানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণ।
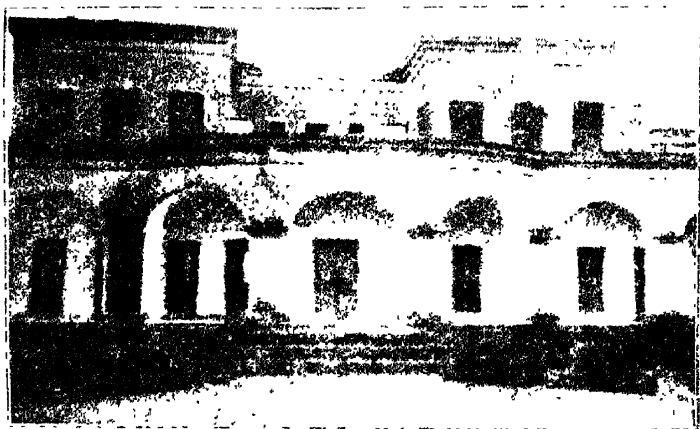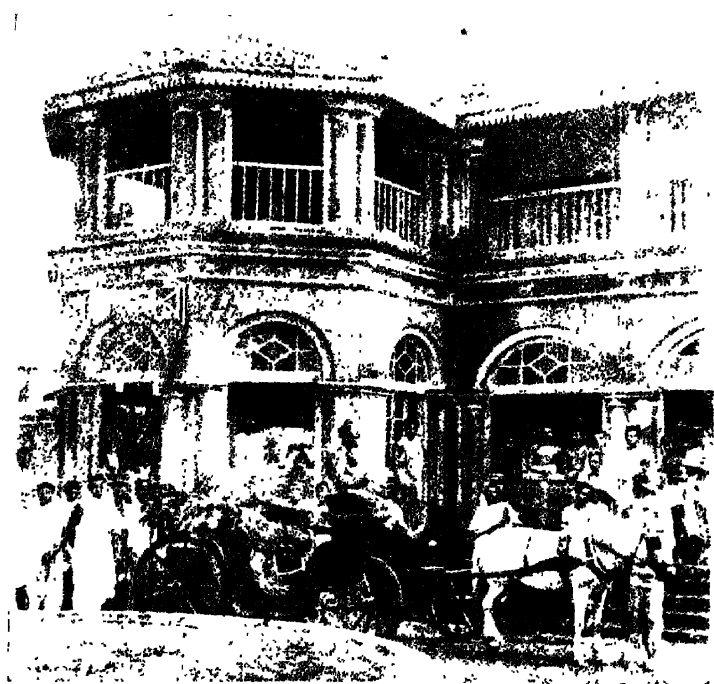
অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মচারিজীর সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন গান্ধীজী। কিন্তু গান্ধীজীর বিশ্বস্ত অনুচরকে করজোড়ে বিনয়নম্র বচনে বিদায় করেন ব্রহ্মচারিজী। তিনি বলেন: "গান্ধী মহারাজকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন—দেশের কল্যাণকল্পে তিনি যে কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তার সঙ্গে আমার কাজের মিল নেই। কাজেই আমি চাইনে যে, তিনি আমার কাছে এসে কৌতূহলী জনসাধারণের চক্ষে আমাকে প্রকাশ করেন।...আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি, নির্জ্জনে গোপনে থাকিতে চাই। তিনি যেন আমার কোন অপরাধ না নেন।"...আত্মপ্রচারের এতবড় সুযোগ এইভাবে হেলায় ত্যাগ করিলেন ব্রহ্মচারিজী। প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের তিনি যে ঘোর বিরোধী ছিলেন এই ঘটনা তাহার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

মহাহোমের পর এবার আর কাশী না গিয়া পুরীধামে গমন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। পুরীর জলহাওয়া অনেকেরই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। এজন্য ভুবনেশ্বরে গৌরিকুণ্ডের নিকট কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়া তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে পৌষ মাসে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর বাড়ী ভাড়া করিয়া ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহার নিকটস্থ জমিতে তাঁহার নির্দ্দেশে আশ্রম-নির্মাণ কার্যও আরম্ভ হইল। শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামিজীও এই সময়ে ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন। চণ্ডী পাহাড়ে তপস্যাকালীন ব্রহ্মচারিজীর অনেক উপকার করিয়াছিলেন স্বামিজী। এই সময়ে প্রায়ই তিনি ব্রহ্মচারিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন—সৎপ্রসঙ্গে দুইজনের বহু সময় কাটিয়া যাইত।

এইভাবে বৎসরের শেষ কয়েক মাস ভুবনেশ্বরে অতিবাহিত হইল।

১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরীধাম গমন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি উৎসবে যথারীতি যোগদান করিলেন। জটিয়া বাবার সমাধি মন্দিরে প্রিয় গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিদের মাঝে আজো

তিনি চির-অনুগত ভক্ত শিষ্যটী—আবার রাস্তার ঠিক ওপারেই ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে প্রিয় সন্তানদের মাঝে তিনি পরম স্নেহময় সদ্‌গুরু।··· শ্রীগুরুদেবের সুযোগ্য প্রতিনিধিরূপে ভ্রাতা-ভগ্নিদের মাঝে লাভ করেন সশ্রদ্ধ প্রীতি ও সমাদর—নীলকণ্ঠ বেশধারী শ্রীগুরুদেবরূপে শিষ্য-শিষ্যাদের মাঝে অনুভব করেন তাঁহাদের সুগভীর ভক্তিশ্রদ্ধা ও আনুগত্য। একই রাস্তার উভয় পার্শ্বে এই দুইটী আশ্রমে পরস্পরের গভীর ভক্তি ও ভালবাসার মধ্যে নীলকণ্ঠ কুলদানন্দই ছিলেন সূক্ষ্ম অথচ সুদৃঢ় মিলন-সেতু।···

শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া গোস্বামী প্রভুর জন্মোৎসবে তিনি যোগদান করিলেন।

এই সময়ে তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছিলেন। উৎসব অন্তে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য, অনন্ত কুমার সান্যাল, রোহিণী কুমার সেন, অমূল্য কুমার সেন এবং ডাক্তার হরগোবিন্দ দে চৌধুরী, এম-বি। কালিয়াবাসী শ্রীগুরুর চিহ্নিত সন্তান, সদাচারনিষ্ঠ বসন্ত কুমার প্রথমে পৌরহিত্য করিতেন—পরে গুরুকৃপায় একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় চারিধাম ভ্রমণ করেন। সেবা-পরায়ণ এই ব্রাহ্মণ পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে অনেকদিন সমাধি মন্দিরের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অনন্ত কুমার ছিলেন এ-জি-বি আফিসের অডিটর—কীর্তনে খুব অনুরাগী ও সাধননিষ্ঠ ছিলেন তিনি। রোহিণী কুমার খুব সুন্দর কীর্তন করেন—তিনি রেলওয়ে বিভাগের কর্মচারী। অমূল্য কুমার অকালে পিতৃহীন হইয়া নিজ অধ্যবসায় বলে বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন। হরগোবিন্দ প্রথমে কলিকাতায় পরে দ্বারভাঙ্গায় মধুবনীতে ডাক্তারী করিতেন।

মহাহোমে সশিষ্যে যথারীতি যোগদান করেন ব্রহ্মচারিজী। অতঃপর চন্দননগরে দীক্ষা গ্রহণ করেন মোড়লগঞ্জ নিবাসী অম্বিকা চরণ রায় মহাশয়।

অম্বিকা চরণের নিতান্ত আগ্রহে তাঁহার দেশের বাড়ীতে পদার্পণ করেন শ্রীগুরুদেব। বাড়ীতে সুন্দর ঠাকুরঘর নির্মাণ করেন রায় মহাশয়।

দরিদ্র-নারায়ণের সেবাতেও তাঁহার প্রচুর আগ্রহ ছিল। শ্রীগুরুদেবের শুভাগমনে তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ 'দিয়তাং ভোজ্যতাং' চলিতে লাগিল।

একদিন গভীর রাত্রে অনেকগুলি কুকুর আসিয়া ভয়ানক ডাকাডাকি শুরু করিল। পাছে গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় কিছু খাবার দিয়া তাহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন রায় মহাশয়। খাবার শেষ হইতেই কুকুরগুলির অধিকতর চিৎকারে তিনি দলশুদ্ধ সবগুলিকে প্রায় এক মাইল দূরে তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কুকুরের ডাকে অধৈর্য হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মচারিজী। অম্বিকা চরণের নিকট সব শুনিয়া বলিলেন: ঠাকুর তো বহুদিন আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। তাছাড়া, তোমাদের সঙ্গে যেমন, সেইমত পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গেও তো এই সময় একটু দেখাশুনা করতে হয়।···

খুব হাল্কা সুরে বলিলেও ব্রহ্মচারিজীর এই কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ···সারা জগৎ যখন সুপ্তিমগ্ন, তখন চলে সূক্ষ্মদেহী মহাত্মাদের যাতায়াত—আর তখনই ভগবান বিজয়কৃষ্ণ এবং বিদেহী আত্মা ও মহাপুরুষদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইত ব্রহ্মচারিজীর।···

মাঘ মাসে মহানন্দ, অচ্যুতকুমার প্রমুখ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইয়া বাসগুয় হিরণকুমারের বাড়ীতে গমন করেন ব্রহ্মচারিজী। তিন দিন তিনি এখানে অবস্থান করেন—এই সময় দূর গ্রাম হইতে বহু নরনারী শিশু-বৃদ্ধ দলে দলে তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হয়।

গুরুকৃপায় হিরণকুমারের জীবনে তখন দেখা দিয়াছে আমূল পরিবর্তন। ইতিমধ্যে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র দীক্ষালাভ করেন। তাঁহারা উপস্থিত সকল গুরুভ্রাতা-ভগ্নীকে জল পান করিতে না দিয়া শুধু ডাব সেবা করাইতেন। জমিদার-গৃহিনী হইয়াও হিরণ বাবুর সহধর্মিনী গুরুদেবের পূজা ও সেবার যাবতীয় কার্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। ঠাকুরসেবার জল দূরবর্তী নদী হইতে বহন করিয়া আনিতেন তিনি স্বয়ং।

হিরণকুমারের অনেক উচ্ছৃঙ্খল ইয়ারবন্ধুও ব্রহ্মচারিজীর শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহার অনেক আত্মীয়স্বজনও এই সময়ে দীক্ষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে সঙ্গে ফুলদল মধ্যস্থিত কীটও স্থানলাভ করে দেবতার চরণে—সৎসঙ্গে স্বর্গবাস হয় এইভাবেই।···পূর্বে এই গ্রামে দিনরাত বসিত টপ্পা গানের কুৎসিত মজলিশ; এখন হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসর ধ্বনিতে মুখরিত হইল দিগদিগন্ত সদ্‌গুরু ব্রহ্মচারিজীর কৃপা ও আশ্রয় লাভ করিয়া পুণ্যভূমিতে পরিণত হইল সারা বাসণ্ডা গ্রাম।

বাসণ্ডা হইতে বানরিপাড়া হইয়া গোপালগঞ্জে গমন করেন ব্রহ্মচারিজী। তাঁহার গুরুভ্রাতা গিরিশচন্দ্র দে মহাশয় স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। সরস্বতী পূজার দিনে এখানে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অনেক নরনারী তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেন। দীক্ষা অন্তে প্রত্যেককে আলিঙ্গন দানে ধন্য করেন দয়াল গুরুদেব।

গোপালগঞ্জ হইতে খুলনা আগমন করেন ব্রহ্মচারিজী। তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে সাদর অভ্যর্থনা জানান স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল ললিতকুমার দত্তচৌধুরী মহাশয়। ললিতকুমারের সহধর্মিনী দেশনেত্রী শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরাণী ছিলেন সাধিকা কবি—তিনি গভীর ভক্তি করিতেন ব্রহ্মচারিজীকে। ব্রহ্মচারিজীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্যে—নীলকণ্ঠ বেশধারী যেন স্বয়ং নীলকণ্ঠের দিব্যজ্যোতিতে সাড়া পড়িয়া যায় সারা খুলনা সহরে। তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন দৌলতপুর কলেজের কতিপয় অধ্যাপক। তাঁহারা প্রশ্ন করেন: গঙ্গাস্নানে কোন ফল হয় কি?

শাস্ত্র ও সদাচারের মূর্ত প্রতীক ব্রহ্মচারিজী মৃদুমধুর কণ্ঠে নিজস্ব ভংগিতে উত্তর দেন: গঙ্গাস্নানে ফল তো হয়ই—এমনকি—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যোঃ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

—শত যোজন দূরে থাকিয়াও গঙ্গানাম উচ্চারণ করিলেই দূরীভূত হয় সমস্ত পাপভার—তিনি প্রয়াণ করেন বিষ্ণুলোকে।···শাস্ত্রবাক্যে কত

সুগভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাস।···বহু কূট প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া ব্রহ্মচারিজীর অগাধ পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করিয়া হতবাক হইলেন অধ্যাপকবৃন্দ।

পরদিন দীক্ষা। সাধনপ্রার্থী হইলেন জনৈক বিধবা মহিলা। যক্ষ্মা-রোগগ্রস্তা শুনিয়া শিষ্যবর্গ তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আসন গ্রহণ করিলেন ব্রহ্মচারিজী। দীক্ষা প্রদানকালে বলিলেন ঃ সে মেয়েছেলেটী কোথায় ?

ঃ সে তো কালই চলে গিয়েছে—

ঃ খুঁজে দেখনা কোথাও আছে কিনা।

খোঁজাখুজির পর সকলে অবাক হইয়া দেখিলেন, মহিলাটী সত্যই চলিয়া যান নাই—লুকাইয়া আছেন ভাঁড়ার ঘরে। অন্যান্য কয়েকজনের সহিত তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন দয়াল ব্রহ্মচারিজী। পরে মহিলাটী রোগমুক্ত হন এবং সাধন-ভজনে উন্নত অবস্থা লাভ করেন।

এইদিন দীক্ষিত হন খুলনা (দৌলতপুর) নিবাসী শ্রীকালিনাথ ও শ্রীনিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। বিপ্লবী কর্মী কালিনাথ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ছাত্র—খুলনা ন্যাশনাল স্কুল ও পরে কালিয়া স্কুলের শিক্ষক হন। নিশিকান্ত তখন স্কুলের ছাত্র। সাধু দর্শনে গিয়া অগ্রজের নির্দেশে তাঁহার দীক্ষা হয়। শক্তি-সঞ্চারকালে তাঁহার চেতনা লোপ পায়, নানা জ্যোতি দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কর্ণমূলে নাম দিবার ফলে অর্ধঘণ্টা পরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। তবু কয়েকদিন যেন বেহুঁস অবস্থায় কাটিয়া যায়। আলিপুর জেলা শাসকের আফিসে বহুকাল চাকুরী করিয়া বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া সাধন-ভজনে মগ্ন আছেন।

ফাল্গুন মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ঠাকুর কুলদানন্দ। ভুবনেশ্বরে আশ্রম নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। শিবরাত্রির দিনে গৃহপ্রবেশ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে কয়েক দিন পরেই পুরীধাম রওনা হইলেন কুলদানন্দজী।

জিতেন্দ্রশংকরের পিতা এই সময়ে খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন। হাওয়া পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে লইয়া ভুবনেশ্বর আশ্রমের নিকট

একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন জিতেন্দ্রশংকর। শিবরাত্রির কয়েক দিন পূর্বে ভুবনেশ্বরে আগমন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। জিতেন্দ্রের রুগ্ন পিতার শিয়রে বসিয়া তিনি মধুমাখা স্বরে অনেক আশ্বাসবাণী ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অমৃতস্রাবী সুমধুর বচনে নিমেষে জুড়াইয়া যাইত ত্রিতাপদগ্ধ বৃদ্ধের দেহ মনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা। নূতন আশ্বাসে তাঁহার কোটরাগত চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়িত আনন্দধারা। শিবরাত্রির পরদিন জিতেন্দ্রের পিতা দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি ব্রহ্মচারিজীকে বলেন : আপনার শ্রীচরণে আমার একমাত্র ছেলেকে সমর্পণ করলাম।···সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ব্রহ্মচারিজী : বেশ, আমি গ্রহণ করলাম।

বিদেশে মৃতদেহ সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিলেন। সকলের উপর তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ও কৃপা সমভাবে বর্ষিত হইত। তাহার সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল সত্যই সুগভীর ও মর্মস্পর্শী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২৮। পুরীধামে গোসাঁইজীর তিরোভাব উৎসব। এই উৎসব মহা সমারোহে পালন করিলেন ব্রহ্মচারিজী।

গোসাঁইজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এবার আর কলিকাতা আসিলেন না—পুরীতেই উৎসব সম্পন্ন করিলেন। পূজার পূর্বে চন্দননগরে আসিয়া মহাষ্টমীতে মহাহোম সম্মিলনে যথারীতি যোগদান করিলেন।

মহাহোমের পর ৫ই কার্তিক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের আশুতোষ পাল এবং তাঁহার ভাগিনেয় বীরেশ্বর শেঠ দীক্ষালাভ করেন। আশুতোষ হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার ৺অভয়কুমার পালের পুত্র। তাঁহার স্ত্রী ভক্তিমতী সুশীলাবালা পূর্বেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুদেবের 'সদ্গুরুসঙ্গ' গ্রন্থ প্রকাশে সেবাপরায়ণা এই মহিলা সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক সময় অবস্থান করিতেন ব্রহ্মচারিজী এবং সদ্গুরুসঙ্গের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয় ঐ বাড়ীতেই। বীরেশ্বর শেঠ-এর সহধর্মিনী শ্রীমতী পদ্মরাণী শেঠও দীক্ষিত হন। এই ভক্তিমতী মহিলাও গুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পরে সস্ত্রীক দীক্ষিত হন আশুতোষ পালের ভ্রাতা পতিতপাবন পাল।

ঐ তারিখে নৈহাটী হাজীনগরের ব্যবসাদার ৺প্রাণকৃষ্ণ সাউ, পুলিশ কোর্টের উকিল চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নড়াইলের উকিল সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দীক্ষালাভ করেন। কিছুদিন পরে কলিকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার সস্ত্রীক দীক্ষিত হন। অতঃপর কাশীধাম গমন করিয়া মাঘ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন ব্রহ্মচারিজী। এই সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ সূতা ব্যবসায়ী ৺নিশি পালের পুত্র যতীন্দ্রনাথ পাল কাশীধাম গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মচারিজীর কৃপা ও গভীর স্নেহ সকলের প্রতি বর্ষিত হইত। তাঁহার মর্মস্পর্শী সহানুভূতি ও সমবেদনায় শিষ্যদের সকল দুঃখ-জ্বালা জুড়াইয়া যাইত, প্রাণ শীতল হইত। জিতেন্দ্রশংকর বাবুর পিতৃবিয়োগের দশ মাসের মধ্যেই এই বছরের পৌষ মাসে তাঁহার চৌদ্দ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী গভীর শোকসাগরে মুহ্যমান হইলে সর্বসন্তাপহারী ব্রহ্মচারিজী তাঁহাকে নিম্নলিখিত চিঠি লেখেন :—

"কল্যাণীয়া—

স্নেহের প্রফুল্ল! মা, তোমার পত্রখানা পড়িয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার ঘরের মাণিক যে গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানি। বহু ভাগ্যেই ঐ ছেলে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সামান্য কর্ম ছিল, শেষ হইতেই চলিয়া গেল। সকলেই নিজের প্রয়োজনে আসে, কর্ম শেষ হইলে কারো অপেক্ষা করে না— ইহাই নিয়ম। এখন উহার স্মরণে তোমাদেরও কল্যাণ হইবে, চিত্ত পবিত্র ও কোমল হইবে। শোক চাপিয়া রাখিতে নাই—যখন শোকের বেগ আসিবে, প্রাণ খুলিয়া কাঁদিও, উপকার হইবে। শোক অতি বিষম জিনিষ। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠও পুত্রশোকে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তত্ত্ব উপদেশে কোন উপকারই হইবে না। কেহ যদি সহানুভূতি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে পারে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, শোকের উপশম হয়। মহাভারত, রামায়ণ এই সময়ে পাঠ করিতে হয়।

ছেলেকে আহ্বান করিয়া ঐ পাঠ শুনাইবে। ঠাকুরের নাম কর—শীতল হইতে এমন ঔষধ আর নাই। স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া আনন্দ হইল। ঐসব স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়, জীবনের অবস্থা। দেবদেবী, ঋষিমুনি, গুরু যেসব স্বপ্নের ভিতরে থাকেন, তাহা মিথ্যা নয়। স্বপ্ন লিখিয়া রাখিও।

তুমি শান্ত সুবোধ মেয়ে, এই সকল অনিবার্য্য বিধির বিধান নিজের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া অস্থির হইও না। তুমিও দুদিন পরে কোথায় চলিয়া যাইবে তাহাই স্মরণ কর। মৃত্যুচিন্তা না আসিলে ধর্ম্মেকর্ম্মে প্রকৃত আগ্রহ হয় না। ঠাকুরকে নিয়ত স্মরণ কর—আর উপায় নাই। অন্যদিকে তাকাইবার আর অবসর নাই। সময় হয়ে এল—প্রস্তুত হও।

তোমরা আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। শীঘ্রই কলিকাতা যাইব।

আঃ ব্রহ্মচারী,

[১লা মাঘ, ২১৬ নং সোনারপুরা, কাশী]

চিঠিখানিতে জিতেন্দ্রশংকর ও প্রফুল্লময়ীর শোকের অনেক উপশম হইল। গুরুদেবের আদেশে তাহারা রামায়ণ-মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। শোকে শান্তিলাভের জন্য এই সকল ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করা যে কত প্রয়োজন, তাহা উপলব্ধি করিলেন। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রসকল মনুষ্যের হিতার্থেই রচিত—বাস্তবিক উহা আমাদের গুপ্তধন।

॥ নয় ॥

২রা মাঘ, ১৩২৮। কাশী সোনারপুরা 'ঠাকুরবাড়ী' আশ্রম। মহাহোম সম্মিলনের পর হইতে ব্রহ্মচারিজী এই আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রত্যূষে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন শ্রীযুত সত্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি বাঁকিপুরে সরকারী চাকুরীতে ব্রতী হইয়াছেন। জনৈক সহকর্ম্মীর বাসাবাড়ীতে টেবিলের উপর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থ দেখিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন; সহসা তাঁহার নজর পড়িল শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের অপরূপ

চিত্রখানির দিকে। দৃষ্টি আর ফিরিতে চায় না—বহুক্ষণ সাগ্রহে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল কে এই দিব্যকান্তি মহাপুরুষ? এ যে জন্ম জন্মান্তরের চির আপনার জন! মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল তাঁহার মনে। তাঁহার সহকর্মী বন্ধুটি ছিলেন ব্রহ্মচারিজীর নিকট আত্মীয়। বন্ধুর নিকট জানিলেন ব্রহ্মচারিজী তখন ৺কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন। প্রাণের প্রবল আকর্ষণে দুই দিনের ছুটি লইয়া গোপনে ৺কাশীধামে ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন তিনি।

আলাপ আলোচনায় জানিলেন, ব্রহ্মচারিজী নিত্যক্রিয়া অন্তে সাড়ে নয়টা নাগাদ দর্শন দান করেন। অদূরেই প্রবাহিতা পতিত পাবনী গঙ্গায় স্নান সারিয়া নীচে বৈঠকখানা ঘরে তিনি বসিয়া রহিলেন। সাধুদর্শনের প্রবল আগ্রহে, শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় কাটিতে লাগিল প্রতিটী মুহূর্ত।

বেলা ৮টায় দেখিলেন জনৈক ভদ্রলোক সরাসরি উপরে উঠিয়া গেলেন। সন্ধান লইয়া জানিলেন তিনি কলিকাতার একজন ধনী শিষ্য, নাম যতীন্দ্রনাথ পাল। দেওয়ালে বিলম্বিত ব্রহ্মচারিজীর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া মনে হইলঃ ধনীর গতিবিধি সর্বত্রই অবারিত— আর তিনি নগণ্য, অপরিচিত; তাই বুঝি তাঁহাকে নীচে বসাইয়া রাখা হইয়াছে।···

সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতল হইতে ধ্বনিত হইল ব্রহ্মচারিজীর গুরু গম্ভীর অথচ চিরমধুর কণ্ঠস্বরঃ হ্যাঁরে মহেন্দ্র! নীচে কেউ এসেছে কি? আমি যে প্রতীক্ষা কচ্ছি—শিগ্‌গির তাকে উপরে আসতে বল।···

তবে কি প্রাণের গোপন ব্যথা সত্যই জানিতে পারিয়াছেন অন্তর্যামী?···ভাবিয়া সত্যনারায়ণের হৃদয় স্পন্দিত হইল—সসংকোচে অথচ ব্যাকুল আগ্রহে উপরে উঠিয়া তিনি ঠাকুর ঘরে গেলেন।

যোগাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মচারিজী। তাঁহার সম্মুখে প্রজ্বলিত হোমকুণ্ড— দক্ষিণে সিংহাসনে ভগবান বিজয়কৃষ্ণ ও জননী যোগমায়া ঠাকুরাণীর অপরূপ চিত্রবিগ্রহ পুষ্পমাল্যে ও তুলসীচন্দনে বিভূষিত। ব্রহ্মচারিজীর

লোকললাম নীলকণ্ঠ বেশ, অপূর্ব জ্যোতির্ময় দেহকান্তি—সত্যই যেন ধ্যানমগ্ন সাক্ষাৎ মহাদেব!···হতবাক হইয়া সত্যনারায়ণ দেখিলেন ব্রহ্মচারিজীর সম্মুখে সত্যই একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। পলকে অভিভূত হইয়া করজোড়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভাবনেত্রে তাঁহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিলেন ব্রহ্মচারিজী। তিনি ইঙ্গিতে সম্মুখস্থ শূন্য আসনে বসিতে বলিলে মন্ত্রমুগ্ধের মত আসন গ্রহণ করিলেন সত্যনারায়ণ।

হোম সমাপন অন্তে প্রণাম মন্ত্র :—

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥···

উচ্চারণ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন ব্রহ্মচারিজী। পরে ভাবমুগ্ধ অবস্থায় বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আবৃত্তি করিলেন নাম মন্ত্র।···পলকে সত্যনারায়ণের মনে পড়িল পরমা ভক্তিমতী শ্রীরাধিকার কথা :

"সখি, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!"···

সত্যই হৃদয়-বীণায় ঝংকৃত হইল চিরমধুর শ্রীনাম। যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ চকিতে নাভিমূলে মৃদু আঘাত দিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না পথে ধাবিত হইল ঊর্ধ্বদিকে। কুলকুণ্ডলিনীর নৃত্যলীলায় সর্বাঙ্গে জাগিল অপূর্ব শিহরণ—অদ্ভুত স্পন্দন! শ্বাস প্রশ্বাসে নাম জপ করিবার কৌশল বুঝাইয়া দিলেন ব্রহ্মচারিজী। অমনি সেই নাম প্রবাহে সমস্ত শিরা উপশিরায় শুরু হইল তুমুল আলোড়ন!···ক্ষণকাল পরে ব্রহ্মচারিজী শিক্ষা দিলেন প্রাণায়াম। সেই মত প্রক্রিয়া করিতেই আসন হইতে এক হাত ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেন সত্যনারায়ণ—'ব্যোম্ মহাদেব' শব্দ উচ্চারণ করিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।···

'স্থির হও' বলিয়া তাঁহাকে সংযত করিতে চাহিলেন ব্রহ্মচারিজী। হৃদয় তবু বাধা মানিল না—সমস্ত আত্মসংযম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

কল্পনাতীত নানা ভাবের উদয় হইল—অনাস্বাদিত মধুর নামানন্দে আরম্ভ হইল বিচিত্র দর্শন ও শ্রবণ, প্রাণমাতান নাদধ্বনি।···নানা আসন মুদ্রার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। তাঁহার দেহ যেন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও লঘু হইয়া বায়ুমণ্ডলে উত্থিত হইল, নানা বর্ণাঢ্যের জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিল লোক-লোকান্তরে।···চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারকার অজানা জ্যোতির্লোকে। সেখানে সবই যেন মধুময়।···চিদানন্দময়। সে অনুভূতি বর্ণনাতীত—উপলব্ধি সাপেক্ষ।···

অচেতন সত্যনারায়ণের দিকে মাঝে মাঝে অপাঙ্গে চাহিতেছিলেন ব্রহ্মচারিজী, আর উচ্চারণ করিতেছিলেন: জয়গুরু-শ্রীগুরু।··· অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি লাভের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে সম্বিৎ ফিরিল সত্যনারায়ণের। হতচকিতের ন্যায় নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলেন শ্রীগুরুর ভুবনমোহন রূপ। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন: একেই কি বলে দীক্ষা? আমি তো কোন প্রার্থনা বা সংকল্প নিয়ে আসিনি—কোন সংস্কারও আমার ছিল না।

অমিয়মাখা উচ্চহাস্য করিলেন ব্রহ্মচারিজী। বলিলেন: সদ্‌গুরুর সঙ্গে আত্মার যোগ জন্মজন্মান্তরের—সময় হলে নিজে না এলেও গুরুকেই গিয়ে দীক্ষা দিয়ে আসতে হয়। তোমার আত্মা প্রার্থী হয়ে ঠিক সময়ে তোমাকে টেনে এনেছে। এই বয়সে সাধন পেলে—যথেষ্ট উন্নতি করে যেতে পারবে, জীবন সার্থক হবে। কিছুদিন চাকরি কর—সময়ে আপনি তা খসে যাবে। তখন একমাত্র ধর্মকর্ম, সাধন-ভজন নিয়েই থাকতে পারবে।···

কী মধুময় বাণী—কত সুনিবিড় স্নেহ ও প্রেমধারা! ব্রহ্মচারিজীর সেই অমৃত সিঞ্চনে অভিষিক্ত হইলেন সত্যনারায়ণ—অন্তরে স্পন্দিত হইল অভিনব অনুপ্রেরণা।

এইভাবে তাঁহার অন্তরে গুরুশক্তি সঞ্চার করিলেন ব্রহ্মচারিজী। পার্শ্বে উপবিষ্ট যতীন পাল মহাশয়কে বলিলেন: বড় চমৎকার আধার!···গোসাঁই একে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।···

তার-বিভাগের কর্মচারী সত্যনারায়ণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী—অথচ অভাবনীয়ভাবেই তাঁহার জীবনে আজ দেখা দিল নবজন্ম, সাধক-জীবনের সার্থক অভিষেক।…

বিদায়ক্ষণে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইলেন ব্রহ্মচারিজী। শ্রীগুরুর শক্তিসঞ্চার ও আশীর্বাদের ফলে সত্যনারায়ণের জীবনে সূচিত হইল আমূল পরিবর্তন। কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিবার পর মুসলমান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধুদের সহিত বড় প্রিয় হরিণ শিকার, গির্জায় ও ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান,—বহুদিনের প্রিয় সখ ও অভ্যাস সবই বন্ধ হইল। লোকসঙ্গ, বন্ধুবান্ধব, রাজনীতি চর্চা, বিপ্লবী কর্মপন্থা—সবই পরিত্যক্ত হইল। পরিবর্তে শুরু হইল শ্রীগুরু প্রদত্ত সুমধুর নাম জপ—আর সেই সাথে স্বপাক, স্বাত্বিক আহার। দাসদাসী থাকিতেও সর্ববিষয়ে শুরু হইল স্বাবলম্বন, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও কঠোর সাধন ভজন। প্রায় প্রতি রাত্রে সাধন প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন সূক্ষ্মদেহে আগত জনৈক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। মেরুদণ্ড পথে অনুভূত হইত কুলকুণ্ডলিনীর সুস্পষ্ট ক্রিয়া। ধমনী মধ্যে রক্তপ্রবাহ দেখিতে পাইতেন, শুনিতে পাইতেন সুমধুর কলধ্বনি। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, পঞ্চকোষ ও ষটচক্রের ভেদ রহস্য স্বতই অন্তরে অনুভূত হইতে লাগিল। শ্বাসপ্রশ্বাসে শ্রীনাম চলিল অবিরাম—আর তাহারই মাধুর্যে অন্যান্য কর্মে দেখা দিল স্বাভাবিক ঔদাসীন্য। মস্‌জিদের আজান ধ্বনি আর মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিতে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইত—প্রতি রোমকূপ হইতে যেন বিচ্ছুরিত হইত অমর্ত শ্রীনাম।…কেহ স্মরণ করিলে বা চিঠি লিখিলে স্পষ্ট অনুভূত হইত—পত্রপ্রাপ্তির পূর্বেই বহু ক্ষেত্রে উত্তর দিতেন। কেহ কোন প্রশ্ন বা সমস্যা লইয়া আসিলে অন্তর্যামীর ন্যায় তাহার সদুত্তর ও সমাধান বলিয়া দিতেন। কেহ খবর না দিয়া তাঁহার উদ্দেশে রওনা হইলে আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন এবং স্বয়ং ষ্টেশনে গিয়া অভ্যর্থনা করিতেন। আগত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের স্বরূপ কুক্কুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, সর্প, ভল্লুক ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে সচেতন

করিয়া দিত। আবার বহু উচ্চকোটির সাধক অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সঙ্গ ও উপদেশ দানে ধন্য করিতেন। যে-কোন পুস্তক মস্তকে ধারণ করিতেই অন্তর্নিহিত সমস্ত তত্ত্ব বোধগম্য হইত। এইভাবে অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মচারিজীর কৃপা ও আশীর্বাদে অত্যদ্ভূত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন সত্য নারায়ণ। যোগ্য আধারে-লীলায়িত হইতে লাগিল যোগিরাজ নীলকণ্ঠের অনন্ত শক্তির মধুর খেলা।···

মাঘ মাসের শেষে ব্রহ্মচারিজী কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার সত্যরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে উঠিলেন। অমনি গুরুসন্নিধানে গমন করেন জিতেন্দ্রশংকর। ব্রহ্মচারিজী কাশী হইতে ইতিপূর্বে পত্র দিয়া তাঁহাদের পুত্র-শোক অনেক লাঘব করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন: আত্মার বিনাশ নাই—ইহা ধ্রুব সত্য। কেবল একটা পর্দার আড়ালে থাকে এই মাত্র। যে যার প্রয়োজনে আসে—প্রয়োজন শেষ হলেই চলে যায়, আর কিছু মনে থাকে না। অভিমন্যুর শোকে অর্জুন যখন বড়ই শোক কচ্ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুকে অর্জুনের কাছে এনে দিলেন। অভিমন্যু এসে শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করলেন—অর্জুনের দিকে একবারও তাকালেন না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অভিমন্যু! তোমার পিতা দণ্ডায়মান—তাঁকে কিছু বললে না?···অভিমন্যু বললেন,—কৈ, আমি তো চিনতে পাচ্ছি না, আমার কোন্ জন্মের পিতা আপনি বলে দিন।···এই তো মানুষের অবস্থা—যাকে লোকে নিতান্ত আপনার বলে মনে করে, যার মায়ায় অন্ধ হয়ে আসল কর্ম ভুলে যায়, সেও কিছু নয়।···

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন: তোমার ছেলে এই ঘরের মধ্যেই আছে—দেখতে চাও? তোমায় দেখাতে পারি—কিন্তু তাতে তোমার কোন উপকার হবে না—তোমার ভয় করবে। নিয়ম মত সাধন ভজন করে যাও, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। একমাত্র নামই সম্বল—আর সব মিথ্যা।···

এই মহামূল্য উপদেশ বাণীতে জিতেন্দ্রশংকরের শোকতাপ দূরীভূত হইল—তিনি নূতন আলোক লাভ করিলেন।

এই সময়ে নারায়ণ দাস ভট্টাচার্য দীক্ষা লাভ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা আফিসে তিনি চাকুরী করিতেন—গোসাঁইজীর শত বার্ষিকীর সময় শ্রীমৎ কিরণ চাঁদ দরবেশজীর সহকর্মী ছিলেন।

নড়াইলের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর ৺অক্ষয় কুমার কাঞ্জিলাল, লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ৺বিধুভূষণ ভৌমিক, জোতিষচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীরাধিকা নাথ মিত্র প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক পূর্বেই পুরী এবং কলিকাতায় গিয়া দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত আগ্রহে মাঘ মাসের শেষভাগে নড়াইল গমন করেন ব্রহ্মচারিজী। সেখানে তখন দীক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম এমনকি দূরবর্তী গ্রাম হইতেও অনেকে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বরিশালের 'পথিক' মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কালিয়া গ্রামের শ্রীবিনয় ভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, সৌরীন্দ্রনাথ হর চৌধুরী, বি-এল এবং মহিষা-খোলার শ্রীকালিদাস বসু, বি-এ ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

ব্রহ্মচারিজী যখন যেখানে থাকিতেন প্রত্যহ অপরাহ্নে তাঁহার দর্শন মানসে দলে দলে শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইতেন। তাঁহার সান্নিধ্যের শক্তি ও মাধুর্য ছিল অসাধারণ—স্বতই মন অন্তর্মুখী হইত। তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্যোতিপুঞ্জে সকলের অন্তর উদ্ভাসিত হইত। সকলেই তাঁহার একটীমাত্র অমৃতবাণী বা মধুর উপদেশ লাভ করিবার আগ্রহে অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু অনেক সময় স্তিমিতনেত্রে নীরব নিশ্চল হইয়া রহিতেন তিনি। আর মাঝে মাঝে ঢুলু ঢুলু দুটী আঁখি মেলিয়া অদূরে কাহারও প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। তাহাতেই জুড়াইয়া যাইত তাহার অন্তর, উত্তর মিলিত সমস্ত প্রশ্নের। তাঁহার এই অর্থপূর্ণ নীরবতা ও গভীর দৃষ্টি কত সময় শিষ্যবর্গকে যে কত উপদেশ দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গতানুগতিক উপদেশ অপেক্ষা ইহা ছিল অধিকতর শক্তিশালী। কখনও বা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সর্বপশ্চাতে উপবিষ্ট কাহাকেও দু-একটী প্রশ্ন করিতেন ব্রহ্মচারিজী আর সেই সূত্রে সকলকে উপলক্ষ করিয়া নানা মধুর উপদেশ দিতেন। তাহাতে অনেকের সন্দেহ ভঞ্জন হইত—বহু সমস্যার সমাধান হইত। অনেকের

মনে হইত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই উপদেশ বর্ষিত হইতেছে বুঝি। একটু স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার অর্ধ নিমীলিত উজ্জ্বল চক্ষু দুটীর দিকে তাকাইলে অন্যদিকে আর দৃষ্টি ফিরাইতে ইচ্ছা হইত না। মন আপনা হইতেই শান্ত হইয়া যাইত—অন্তস্থলে অমৃতবর্ষণ করিত তাঁহার সস্নেহ, সুকোমল দৃষ্টি। ভগবৎ-জ্ঞান বা সাধনের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া রহস্যের ঘুর্ণিপাকে অস্থির হইয়া পড়িতেন অনেকে; কিন্তু একবার সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখীন হইলে রহস্যের পারাবারে সমুদিত হইতেন পূর্ণচন্দ্র। আর সমস্ত অন্ধকার ও পংকিলতা হইতে মুক্ত হইয়া অনাবিল আনন্দে আন্দোলিত হইত সারা অন্তর।···মনে হইত, বিশ্বপ্রকৃতির সুনিবিড় মাধুর্য বুঝি নিহিত সেই অনুপম আঁখি-পল্লবে।···

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২৯। পুরীধামে গোসাঁইজীর তিরোভাব উৎসবে যোগদান করিলেন ব্রহ্মচারিজী।

২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সিভিল সার্জেন ক্যাপ্টেন হরিশচন্দ্র সেন সস্ত্রীক দীক্ষিত হন। ইউরোপ প্রত্যাগত ক্যাপ্টেন সেন একমাত্র কন্যাবিয়োগে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে থাকেন। এমন সময় একদিন ব্রহ্মচারিজীকে দর্শন করিতে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর দগ্ধ প্রাণ শীতল হইল—মহিলাটী দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। দীক্ষা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না হরিশবাবুর, তবু স্ত্রীর আগ্রহে উভয়ে উপস্থিত হইলেন নির্দিষ্ট দিনে। হরিশবাবুর দীক্ষা লইবার কোন কথাই ছিল না—তবু ব্রহ্মচারিজীর দিব্য প্রভাবে স্ত্রীর সহিত তিনিও আসন গ্রহণ করিলেন অভিভূতভাবে। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার জীবনেন গতি ভিন্নমুখী হইল, অন্তরে দেখা দিল আদর্শ গুরুনিষ্ঠা। শ্রীগুরুর আশীর্বাদে পরে একটী পুত্র সন্তান লাভ করিলে অল্পবয়সে তাহাকেও দীক্ষা দিলেন ব্রহ্মচারিজী—পুরী ঠাকুরবাড়ীর অধিষ্ঠাতা-বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা "মহাবিষ্ণুচক্র" এর নামানুসারে তাহার নামকরণ করিলেন শ্রীমহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণু বর্তমানে বিলাতফেরত ডাক্তার—বিলাতে গিয়াও সর্বদা স্বপাক আহার করিয়া তিনি বর্তমান যুগে শাস্ত্র ও সদাচারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ

রাখিয়াছেন। এইভাবে অনেকেই ধন্য হইয়াছেন ব্রহ্মচারিজীর অযাচিত কৃপায়।

শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পুরীধামে থাকিয়া গোসাঁইজীর জন্মোৎসব পালন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। পরে কলিকাতায় আসিয়া উঠিলেন জিতেন্দ্রনাথ মোদকের ২৬।১, মির্জাপুর ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। ভাদ্রমাসে দীক্ষাগ্রহণ করেন গোস্বামী প্রভুর শিষ্য প্রেমানন্দ সাহার পুত্র পূর্ণানন্দ সাহা, জিতেন্দ্র নাথ মোদকের জামাতা পুলিন মোদক, এবং আশুতোষ পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিক পাল। পরে আশুতোষ বাবুর মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রেরও দীক্ষা হয়।

মহাহোমের সময় দীক্ষিত হন কয়েকজন ত্যাগী যুবক—উত্তরপাড়া ওয়াটার ওয়ার্কস্‌এর সুপারিনটেনডেন্ট প্রবোধ গোপাল ঘোষ, গুরুনিষ্ঠ, চিরকুমার অশ্বিনী কুমার চৌধুরী (কুমারানন্দ অবধূত) বাঁকুড়া জিলার ব্যোমকেশ কোঙার, ("সদ্‌গুরুসঙ্গে শ্রীশ্রীকুলদানন্দ" গ্রন্থের রচয়িতা) এবং নড়াইলের অক্ষয় কাঞ্জিলালের পুত্র দেশসেবক সচ্চিদানন্দ কাঞ্জিলাল। স্ত্রী ও একমাত্র কন্যার বিয়োগে দিশেহারা হইয়া পড়েন প্রবোধ গোপাল—আত্মীয় ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহাকে চন্দননগরে লইয়া যান। সকল কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারিজী বলিলেনঃ বাঃ বেশ হয়েছে—তোমার পরম উপকারই হয়েছে। এই তো সাধন-ভজনের উপযুক্ত অবস্থা।···শোকে সান্ত্বনার পরিবর্তে এমনি অদ্‌ভুত কথায় আশ্চর্যান্বিত হইলেন প্রবোধ গোপাল। পরে বুঝিলেন সে কথা কত সত্য। দুই-তিন দিন পরেই তাঁহার দীক্ষা হইল ; নিয়মনিষ্ঠার সহিত তিনি সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইলেন। কিছুদিন পরে চাকুরী ও সংসার ছাড়িয়া কাশীবাসী হন তিনি।

মহাহোম সমাধা করিয়া কাশীধাম রওনা হইলেন ব্রহ্মচারিজী। বড় দিনের ছুটির পূর্বে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া ডাক্তার সত্যরঞ্জন সেন মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিলেন।

॥ দশ ॥

মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। যতীন দাস মহাশয়ের দোকানে (Das Studio) টাঙান ব্রহ্মচারিজীর বাঁধানো ছবি। সেই ভুবনমোহন রূপের দিকে নজর পড়িল একটি সাহেব ও মেমসাহেবের। সে তো শুধু ছবি নয়—এক অনুপম দীপ্তি বিচ্ছুরিত সেই উজ্জ্বল স্থিরদৃষ্টিতে। তাহার দুর্বার আকর্ষণে বার বার সেই ছবির সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান বিদেশী দম্পতী। জাভায় তাঁহাদের একটী কন্যার মৃত্যুতে মেমসাহেব অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িলে এই মহাপুরুষই যেন সাক্ষাৎভাবে সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছিলেন। মেমসাহেব অতিমাত্র বিস্ময়াভিভূত হন। যোগিরাজকে প্রত্যক্ষ করিবার আগ্রহে প্রায়ই খোঁজ খবর লইতে থাকেন তাঁহারা।

২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় যতীনবাবু খবর পাঠাইলেন, পরদিন অপরাহ্ণ ২টায় ব্রহ্মচারিজীর সহিত দেখা করিতে আসিবেন সাহেব দম্পতী। ব্রহ্মচারিজী বলিলেন: সাহেব ও মেমসাহেব কীজন্যে আসতে চান, আগে থাকতে একটু জানা চাই। অনেক সময় তারা সাধু দেখলে করকোষ্ঠি গণাতে বা অলৌকিক কিছু দেখতে চায়—কিংবা রোগ সারাবার জন্যেও এসে থাকে। ওদের মনের গতি কোন্‌দিকে, তারা কী করেন এবং কোন্ দেশীয়– তা জানা দরকার। তোমরা কেউ মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়ে যতীনকে আজ রাত্রেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিও– তার নিকট সব শুনতে পারব।

খবর পাঠান হইল, কিন্তু সাহেবদের বিশেষ কোন পরিচয় যতীনবাবুও বলিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন, মেমসাহেব প্রত্যহ ব্রহ্মচারিজীকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেদিনও দুইবার আসিয়াছিলেন। আর সাহেব জাভা ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানাজার, সাতটা কোম্পানী তাঁহার অধীনে—বড়লোক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কী জন্যে ব্রহ্মচারিজীকে দেখিতে চান তাহা কিছুই অনুমান করা গেল না।

পরদিন বেলা দুইটার পর উপস্থিত হইলেন সাহেব দম্পতী। ব্রহ্মচারিজীর নির্দেশে তাঁহাদের উপরে আহ্বান করা হইল। সহাস্যে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন ব্রহ্মচারিজী। তাঁহার উভয় পার্শ্বে দোভাষী-রূপে রহিলেন যোগেশ ব্রহ্মচারী, ডাক্তার সত্যরঞ্জন এবং উকীল জিতেন্দ্রশঙ্কর।

ব্রহ্মচারিজী জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনারা কী বিষয় জানবার জন্য এসেছেন?

সাহেব: আমরা ধর্মবিষয়ে কিছু জানতে চাই। আমার মেম-সাহেবের জীবনে নানা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে—শোকাতুর অবস্থায় আপনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

: কী সব ঘটেছে বলুন—

: বালিকা বয়সে মেমসাহেব দূর আকাশে অনেক সুন্দর সুন্দর গান-বাজনা শুনতে পেতেন। কিছুদিন পরে সব বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু প্রায় ছয় মাস আগে, ভাবাবেশে আপনাকে দর্শন করবার পর, একদিন হঠাৎ কতকগুলি আলোর মত কী যেন দেখতে পেলেন।

: কী রকম আলো দেখেছিলেন?

: ক্যাণ্ডেল লাইটের মত।

: সেই আলো দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কত বড় এবং কয়টী দেখেছিলেন? আলো দেহের কোন্ স্থান হতে কত দূরে ছিল ব'লে বোধ হত?

নীরবে ধীর-স্থির এবং বিহ্বল ভাবে বসিয়াছিলেন মেমসাহেব। ব্রহ্মচারিজীর দিকে নিবদ্ধ তাঁহার জিজ্ঞাসু অপলক দৃষ্টি—চোখেমুখে ব্যাকুল আগ্রহ পরিস্ফুট। ব্রহ্মচারিজীর প্রশ্নে এবার সাগ্রহে তিনি উত্তর দিলেন: একদিন ঘরে বসে আছি—হঠাৎ মনে হ'ল যেন ললাটের তিন-চার হাত তফাতে খুব বড় বড় প্রায় এক ফুট উঁচু উনিশটী ক্যাণ্ডেল লাইট অর্ধচন্দ্রাকারে সাজান। দেখেই আমি চমকে উঠি। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর কোথাও কিছু নেই কেবল সেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। আমি বিহ্বল হয়ে দেখতে লাগলাম। সেই সঙ্গে যেন আকাশবাণী হ'ল—লক্ষ্য কর এবং দেখ (watch and look)।

সেই আলোকময় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। এর কারণ কী আমি জানতে চাই।

মেমসাহেবের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়াও ধীরভাবে বলিলেন ব্রহ্মচারিজী : আলোগুলির বর্ণ কী রকম মনে হ'ল? তার শিখাই বা কী প্রকার?

: আলোগুলি পীতবর্ণ, শিখা মোমবাতির মত। সেই থেকে স্থির হয়ে বসলে মনে হয় যেন আমার সূক্ষ্ম দেহ (Astral body) এই দেহ থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড়ায়।

: এই সূক্ষ্ম দেহের আকৃতি কীরূপ দেখতে পান বলে মনে হয়? তখন নিজ দেহ সজীব, না একেবারে মৃতের মত বোধ করেন?

ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলেন মেমসাহেব : মনে হয় যেন একটী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেহ থেকে বের হয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে—সেই মূর্তি যেন অবিকল নিজেরই প্রতিমূর্তি। নিজদেহ তখন অসাড় ও মৃতবৎ মনে হয়, পায়ের নীচে পৃথিবী কাঁপতে থাকে—সব কিছু যেন একটা স্বপ্ন। তখনকার মনের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে সূক্ষ্মদেহ আবার ভিতরে এলে আমার জ্ঞান হয়; কিন্তু কীভাবে যে ভিতরে আসে কিছুই বুঝতে পারিনে।

: সূক্ষ্মদেহ কীভাবে দেহ থেকে বের হয়ে যায় তা কিছু অনুভব করতে পারেন?

: না, তা বলতে পারি না।

: আপনার যে এইসব দর্শন ও অনুভূতি হয় এ খুব উত্তম অবস্থা।

: এইসব দর্শন কেন হয় জানবার জন্য আমরা বড়ই উৎসুক হয়েছি। আমাদের জীবন এমনভাবে গঠন করতে চাই যাতে রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারি, পরের উপকার করতে পারি। আমরা যেন নিজেরা ভাল হতে পারি এবং পরকে ভাল করতে পারি।

: আপনারা যাকে পরোপকার ভাবছেন অনেক সময় তা ক্ষতিকরও হ'তে পারে। কী করলে ঠিক পরের উপকার বা অপকার হয় তা বুঝা কঠিন। ক্ষুধিত নরনারীকে প্রচুর অর্থব্যয়ে সুখাদ্য ভোজ দিলে

অন্নদান করে বড়ই উপকার করেছেন ভাবতে পারেন, কিন্তু উদরাময় হ'য়ে বহুলোকের মৃত্যু হতে পারে; শেষে একটা মহামারীর সৃষ্টি হয়ে অনেক ক্ষতি হতে পারে। তেমনি রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারলেই সব সময় উপকার করা হয় না। মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মার চরম উৎকর্ষ সাধন। আত্মজ্ঞান লাভ করতে না পারলে কোন কার্যই সফল হয় না, আত্মার প্রকৃত সন্ধান না পেলে কিছুতেই শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। পরের কথা দূরে থাক, নিজের স্ত্রী পুত্র ভাই-বন্ধু সব ত্যাগ করে এই পরমাত্মার সন্ধান নিতে হবে; তাতে সিদ্ধকাম হ'তে পারলে জগতের উন্নতি আপনা থেকেই হতে থাকবে। আপনাদের মনের আসল উদ্দেশ্য কী তাই জানতে চাই। আপনার যে দর্শনাদি হয় কোনরূপ শক্তি অর্জন করে তাই বাড়াতে চান, না আত্মার সন্ধান করে পরম শান্তিলাভ করতে চান—তাই আমাকে পরিষ্কার ক'রে বলুন।

সচকিত হইয়া সকাতরে বলিলেন মেমসাহেব: আমার যে পুত্রকন্যা আছে, তাদের কী করে ত্যাগ করব?...

স্মিতহাস্যে ব্রহ্মচারিজী বলিলেন: না না—আমি তা বলছি না। পুত্রকন্যা কেন, কিছুই ত্যাগ করতে হবে না। সংসারে থেকেও আত্মার উন্নতি সাধন করে পরম শান্তি লাভ করা যায়। আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারলেই জগতের বিশেষ উপকার হবে। নিজে শক্তিশালী না হ'লে পরের উপকার ঠিকভাবে করা যায় না। আপনি কি চান ভেবে বলুন।

গম্ভীরভাবে একটু চিন্তা করিয়া মেমসাহেব বলিলেন: আমি পরম শান্তিলাভ করতে চাই, সর্বপ্রকারে সৎ হতে চাই।

: আপনার দর্শনাদি কি স্বাভাবিকভাবে হয়, না এই সম্বন্ধে আপনার কোন পূর্বসংস্কার ছিল?

: স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়—আর আমি কখনও কোন দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিনি।

: আপনি বিশেষ ভাগ্যবতী। কিন্তু এইরূপ দর্শনাদি লাভ করবার শক্তি অর্জন করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়—আগেই বলেছি, আত্মার সন্ধান লাভ ক'রে আত্মার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরম শান্তি ও

অতুলনীয় আনন্দ লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। আপনার দর্শনাদি পথের দৃশ্যের ন্যায় মনে করবেন—ওর কারণ অনুসন্ধান ক'রে কালক্ষেপ করবেন না। এখান থেকে দিল্লী যাবার পথে ডাইনে বামে কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, কত রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়; তার প্রত্যেকটীর কারণ ও ইতিহাস জেনে যেতে হলে গন্তব্য স্থানে পৌছাতে অনেক দেরী হয়ে যায়। দর্শনাদির কারণ জানতে ব্যস্ত হলে আপনারও পরম শান্তিময় ধামে যেতে দেরী হ'য়ে যাবে। চিন্তা করে দেখুন আপনি পরম শান্তি লাভ করতে চান কিনা।

ঃ হ্যাঁ চাই, আত্মার সন্ধান ও ভগবানের দর্শন চাই।

ঃ আলোক দর্শনের সময় যে আকাশবাণী শুনেছিলেন, সেই অনুসারে কোন প্রক্রিয়া করেন কি?

ঃ বিশেষ কোন প্রক্রিয়া করি না, তবে সময় সময় যেন ধ্যানের ভাব আসে—কতকটা যেন সমাধির মত হয়। তখন সূক্ষ্মদেহ শরীর থেকে বের হয়ে সামনে এসে পড়ে—আর সুষুম্নার ভিতর কেমন একটা দিব্য অনুভূতি হয়।

ঃ সুষুম্না অর্থে আপনি কী বুঝেছেন?

ঃ আমি বুঝি মেরুদণ্ড।

ঃ আচ্ছা, আপনি আকাশবাণী অনুযায়ী যা কচ্ছেন, তাই আর কিছুদিন করতে থাকুন। তাতে মনে শান্তি না পেলে আমাকে জানাবেন।

ঃ আমি তাতে মনে শান্তি পাচ্ছি না—আমি পরম শান্তি চাই।

ঃ আমি আবার বলছি—আপনি বড় ভাগ্যবতী, এইসব দর্শনাদি সাধন-অঙ্গের বড়ই অনুকূল। কিন্তু আত্মার সন্ধান পেয়ে শান্তিলাভ করতে হলে একটা বিশেষ প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক। আপনি কি তাই চান?

ঃ হ্যাঁ—আমি এই বিষয়ে প্রণালী ধরে শিক্ষা পেতে চাই এবং সেজন্যে শিক্ষক চাই।

: ভাল করে ভেবে ও বুঝে দেখুন। এই সাধন প্রণালী বহু পুরাতন এবং মুনিঋষিদের প্রবর্তিত। এ অতি গোপন বস্তু—এ পথ অবলম্বন করলে খুব গোপনে রাখতে হবে।

: নিশ্চয়ই, খুব গোপনে রাখব—সম্পূর্ণ স্বীকার ও অঙ্গীকার কচ্ছি।

সাহেব : আমারও একটা কথা—আমরা যে এখানে এসেছি তাও যেন খুব গোপনে থাকে।

সম্মত হইয়া সকলকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন ব্রহ্মচারিজী। মেম সাহেবকে বলিলেন : আপনার অবস্থা অনেক বিষয়ে এই সাধন প্রণালীর অনুকূল— কিন্তু বাধাবিঘ্নও যথেষ্ট আছে। আপনাকে মাংস ও মাদকদ্রব্য একেবারে ত্যাগ করতে হবে।

মেমসাহেব : মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি একেবারেই খাই না—আমি একবার মাত্র নিরামিষ আহার করি। আমার বেশী আহারের প্রয়োজন হয় না।

: আপনি ও সাহেব উভয়েই কি এই সাধন প্রণালী অবলম্বন করতে চান ?

সাহেব : হ্যাঁ—আমরা উভয়েই চাই।

: আমি শুধু নিজের ইচ্ছায় কাউকে এই সাধন প্রণালী দিতে পারি না। আপনাদের সম্বন্ধে নিজের মনে অনেক অনুসন্ধান করতে হবে—অনেক বিষয় জেনে দেখতে হবে, আপনাদের এই সাধন প্রাপ্তি হবে কিনা। যদি আপনাদের ভাগ্যে থাকে, তাহলে আগামী বুধবার আপনাদেব জানাব।

: আপনি অবশ্য আমাদের পরীক্ষা করে নেবেন।

: না—আমি পরীক্ষা করার কথা বলছি না। আপনাদের সম্বন্ধে আমাকে অনেক চিন্তা করে অনেক বিষয় জানতে হবে, সেজন্য কিছু সময় দরকার। বুধবারে তারিখ ও সময় নির্দেশ করে দেব—আপনাদের অসুবিধা হলেও তা অতিক্রম করে আসতে হবে।

সাহেব : আমরা অবশ্যই আসব।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মেমসাহেব বলিলেন: আমি নিশ্চয়ই এই সাধন প্রণালী পাব। গতকাল রাত্রে যেন সমাধি অবস্থায় পরিষ্কার দেখলাম, একজন যোগী মহাপুরুষ খুব নিকটে এলেন। পরিষ্কার শুনলাম তাঁর কথা: wait and see! আরও বললেন, তিনি এক বিশেষ মণ্ডলীর অধিবাসী—আমাকেও নাকি সেখানে যেতে হবে। আমি নিশ্চয়ই এই সাধন পাব।···

মেমসাহেবের চোখে-মুখে আত্মপ্রত্যয়ের উচ্ছ্বাস। ব্রহ্মচারিজী তাহা লক্ষ্য করিলেন—কিন্তু আর কিছু বলিলেন না। উভয়ে করমর্দন করিয়া বিদায় হইলেন রাত্রি সাড়ে দশটায়।

একদিন পরে ব্রহ্মচারিজী বলিয়া পাঠাইলেন—সাধন দেওয়া যাইতে পারে. তবে আরও দুই-তিন দিন বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে যেন তাঁহারা মনস্থির করেন।

নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাণ্ড হোটেলে গেলেন জিতেন্দ্রশঙ্কর। খবর পাইয়াই ত্রস্তভাবে আসিয়া সাহেব করমর্দন করিলেন। বলিলেন: আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি আসছেন। আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।

বিস্মিত হইলেন জিতেন্দ্রশঙ্কর। নিবেদন করিলেন ব্রহ্মচারিজীর কথা।

সাহেব: আমরা এখনই প্রস্তুত। যখন যেতে বলবেন তখনই যাব। আমরা তিন মাস চিন্তা করেছি—আর কিছুই ভাববার নেই।

ব্রহ্মচারিজীর নিকট গিয়া সাহেবের কথা জানাইলেন জিতেন্দ্রবাবু। ব্রহ্মচারিজী বলিলেন তাঁহাদের দীক্ষা হইলে একজন ভাল দোভাষীর দরকার হইবে। হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উপস্থিত ছিলেন—তিনি দোভাষীর কার্য করিতে সম্মত হইলেন। খুশী হইয়া ব্রহ্মচারিজী জিতেন্দ্র-বাবুকে বলিলেন: তুমি এখনই গিয়ে সাহেবকে বল যে দীক্ষার জন্য শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে তাঁদের জানান হবে—সে পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতেই হবে, তখন তাঁদের অসুবিধা হবে না—খুব সম্ভব রাত্রেই হবে।

সেইমত সাহেবকে খবর পাঠান হইল। পরদিন ১লা ফেব্রুয়ারী। সেইদিন সংবাদ দেওয়া হইল রাত ৯টায় দীক্ষা হইবে। ৮॥টায় গিয়া জিতেন্দ্রবাবু তাঁহাদের লইয়া আসিলেন। গাড়ীর মধ্যে মেমসাহেব বলিলেন: আগেই জানতে পেরেছি যে আমরা মনোনীত হব। কাল সমাধির মধ্যে দেখেছি যেন কয়েকজন যোগী একসঙ্গে বসে আছেন—তাঁদের মধ্যে সকলেই একজন মহাপুরুষের কাছে আমাকে উপদেশ নিতে বলেছেন।···

সকলে ব্রহ্মচারিজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাত্র ৯টায় যথারীতি দীক্ষা আরম্ভ হইল—শেষ হইল ১০॥টায়। সাহেব অতি সুন্দর প্রাণায়াম করিলেন—মেমসাহেবেরও মন্দ হইল না। উহাদের বার বার নাম শুনাইলেন ব্রহ্মচারিজী। মেমসাহেব অতি সহজভাবে তাকাইয়া গ্রহণ করিলেন সেই মহামন্ত্র। দোভাষীর কার্য করিলেন যোগেশ ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রশঙ্কর।

দীক্ষা অন্তে তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঘটনাটী শুধু উল্লেখযোগ্য নয়—বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সংস্কারমুক্ত, পাশ্চাত্য সভ্যতাগর্বী এক বিদেশী দম্পতী হইলেও অন্তরে তাঁহারা লাভ করেন বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ—তাই বহু সন্ধানের পর তাঁহারা আশ্রয়লাভ করিলেন ব্রহ্মচারিজীর শ্রীচরণে। তাঁহাদের মনে-প্রাণে বিশেষভাবে কার্যকরী হইল নীলকণ্ঠ কুলদানন্দজীর স্বর্গীয় প্রভাব। সনাতন ধর্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এখানেই—যোগ্য আধার হইলে দেশ-পাত্রের সমস্ত ভেদাভেদ সেখানে নিতান্তই অবান্তর।···

এইভাবে ব্রহ্মচারিজীর চরণাশ্রিত হইয়া ইউরোপীয় দম্পতি (মিঃ ভন-ডি-গ্রাফ ও তাঁহার পত্নী) সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন এবং ধর্মজীবন গঠন করিয়া ধন্য হন। আজীবন নিরামিষাসী ও স্বল্পভোজী ছিলেন মেমসাহেব। দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণ প্রভৃতিও তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল স্বাভাবিক ভাবে। শোনা যায়—ব্রহ্মচারিজীর কৃপায় মেমসাহেব আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চাবস্থা লাভ করিয়া বিলীন হইয়া যান তাঁহার শ্রীচরণে, আর সাহেবটী হিমালয়ে গোপন সাধন-ভজনে ব্রতী হন।

ইংরাজী শিক্ষায় তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও যে-কোন বিদেশীর সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন ব্রহ্মচারিজী। বিদেশীদের সহিত আলাপের সময় দোভাষী কেউ কেউ সাহায্য করিত; কিন্তু লক্ষ্য করিলে মনে হইত সকলের সব ভাষাই যেন জানেন তিনি।

পুরী ও কোনারকের মাঝামাঝি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সমুদ্রের ধারে একটী আশ্রম ও প্রকাণ্ড বাগান করিয়া বাস করিতেন আমেরিকার অধিবাসী ডঃ ইভানস্ ওয়েলস্। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি গবেষণা করিতেন। তিব্বতে দশ বৎসর বাস করিয়া তাহাদের ভাষা ও সাধন প্রণালী সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রহ্মচারিজীর সহিত তিনি প্রায়ই আলাপ আলোচনা করিতে আসিতেন—ক্রমে ব্রহ্মচারিজীর গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়েন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল ব্রহ্মচারিজীর। তাঁহার শ্রীমুখে সেই সমস্ত তত্ব এবং ভগবান বিজয়কৃষ্ণের দিব্য জীবন-কথা শ্রবণ করিয়া ভারতীয় সাধন প্রণালীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করেন ডঃ ইভানস্।

আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে ব্রহ্মচারিজীর নামে নিজ আশ্রমটি লিখিয়া দিতে চান তিনি; কিন্তু ব্রহ্মচারিজী সম্মত হন নাই। "ভারতীয় ও তিব্বতীয় সাধুগণের ইতিবৃত্ত" নামক তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকে ব্রহ্মচারিজীর প্রতিকৃতিসহ তাঁহার জীবনী আলোচনা করেন ডঃ ইভানস্। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন: শিষ্য একান্তভাবে গুরুতে আত্মসমর্পণ করিলে গুরু কৃপা করিয়া সমস্ত বিদ্যা শিষ্যে সঞ্চার করিয়া যান। শিষ্যকে আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; শ্রীগুরু নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিতে ও স্নেহ ভালবাসায় শিষ্যকে অনুগত করিয়া লন।...

চিকাগোর বিখ্যাত ধর্মযাজক রেভারেণ্ড মৌলমিন ব্রহ্মচারিজীর কাছে একটী বাণীর জন্য একবার অনুরোধ করেন। উত্তরে ব্রহ্মচারিজী বলেন: আপনারা যেভাবে পরিচয় নিতে আসেন তাতে এদেশকে

চেনা যায় না। ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিকতা—কাজেই ভারতকে জানতে হলে এই আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়েই জানতে হবে। সেজন্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তির সংস্রবে আসা চাই। তাঁদের নির্দেশিত পথে চলে, ঋষি-পন্থা অনুসরণ করলেই ভারত সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা। শুধু বাইরের দৃষ্টিতে বিচার আর বিশ্লেষণে ভারতকে জানা যায় না—যাবে না।···

রেভারেণ্ড মৌলমিনের সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনারা বিদেশে গিয়ে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন না কেন?

বড় মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল ঠাকুর কুলদানন্দজীর প্রদীপ্ত আননে। তিনি বলিলেনঃ পথের পাশে এক মুমূর্ষুকে দেখে এক পথিক ভাবলেন, একে তুলে একটু ভাল স্থানে রেখে আসি। অন্য জন ভাবলেন বিছানা-বস্ত্র যোগাড় ক'রে দিই। তারপর এক চিকিৎসক দেখতে পেয়ে তাকে পরীক্ষা ক'রে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সেই সময় এক সাধু ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন; মুমূর্ষুকে দেখে ভাবলেন—এর তো শেষ সময় উপস্থিত, একটু ভগবানের নাম শোনাই, পরকালের কল্যাণ হবে।···এমনি করে যার যেরূপ স্বভাব ও সংস্কার, সে তেমনি ব্যবস্থাই করতে চাইলেন এবং করলেন। ভারতীয় সাধুরাও তাঁদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে নিজেদের রীতি অনুযায়ী জগতের কল্যাণ করে থাকেন। সেজন্য তাঁদের বিদেশে ছুটতে হয় না, বক্তৃতা দিতে হয় না—প্রবন্ধ লিখে, বই প্রকাশ করে, প্রচারও করতে হয় না। তাঁরা নিজ আসনে বসে থেকেই এমন সব কাজ করে যান, যার শক্তি সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ সাধন করে। স্থূল দৃষ্টিতে তা দেখা যায় না বটে; কিন্তু সে শক্তি অমোঘ, অনন্তকাল ধরে সেই শক্তি কার্য করে থাকে।··

ব্রহ্মচারিজীর এই বাণী অধ্যাত্মবাদী ভারতেরই প্রকৃত মর্মকথা। শুধু আপন দেশ বা প্রাচ্যের জন্য নয়, আধ্যাত্মিক ভারতের যা কিছু চিন্তা ও কর্ম, ধ্যান ও ধারণা—সব কিছুই জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত। কিন্তু বড় সূক্ষ্ম, বড়ই বিচিত্র তাঁহাদের ক্রিয়াপদ্ধতি, আমাদের চিন্তা ও

অনুভূতির একেবারে বাহিরে···জগতের হিতের জন্য এইরূপ নীরব চিন্তাতীত সাধনায় ব্রহ্মচারিজী ব্রতী হইয়াছিলেন পরমগুরু ভগবান বিজয়কৃষ্ণের নির্দেশে।···তাঁহারই ইঙ্গিতে সুগভীর প্রেম ও প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হইয়া বিশ্বশান্তি ও বিশ্বহিতের অভিনব পথে অগ্রসর হন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।···

॥ এগারো ॥

ফাল্গুনের শেষ—দোল মহোৎসব। ব্রহ্মচারিজী অনুগত বিজয় বিশ্বাসকে বলিলেন: তোমরা দোলে কীর্তন কর না কেন?

বিজয়বাবু ও সকলে সারা দিনে প্রস্তুত হইলেন। দোলের উৎসব আরম্ভ হইল সন্ধ্যার পর। মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করিলেন ব্রহ্মচারিজী। কীর্তন খুব জমিয়া উঠিল—ব্রহ্মচারিজী চক্ষু মুদিয়া শুনিতে লাগিলেন। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল আবির বর্ষণ—লালে লাল হইয়া গেল সারা ঘরটী। ভাবাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ব্রহ্মচারিজী, তিনি যেন নেশাগ্রস্ত—টলিতে টলিতে সুরু করিলেন বিভোল নৃত্য, চক্ষু মুদিয়া হরিবোল বলিতে বলিতে সকলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। দীর্ঘ জটাগুলি খাড়া হইয়া উঠিল, দেবদেহের সর্বাঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল এক অপূর্ব জ্যোতি।···তখন প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে সকলে তাঁহাকে মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক অব্যক্ত উদ্দাম আনন্দ প্লাবনে সকলেই অভিভূত, আত্মহারা।···

সেই অবধি প্রতি বৎসর দোল-উৎসব আরম্ভ হইল। কীর্তন সম্বন্ধে গুরুভ্রাতা রেবতীমোহনের সহিত ব্রহ্মচারিজীর আলোচনা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিজী বলেন: একমাত্র নাম করলেই পরমার্থ লাভ হয়।···

রেবতীমোহন: শুধু তাই নয়—যারা শোনে তাদেরও কাজ হয়। এইজন্যে আমি খুব জোরে কীর্তন করি।

: নিশ্চয়ই—শুধু নরনারী কেন, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা যাদের কানে নাম প্রবেশ করে তাদেরও উপকার হয়।···

মহাপ্রভুর নামকীর্তন প্রচারের সার্থকতা মূলত এইজন্যই। বৎসরের শেষভাগে ব্রহ্মচারিজী গমন করেন পুরীধামে।

১৩৩০ সাল। পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রম। জ্যৈষ্ঠ মাসে গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি উৎসব সুসম্পন্ন করিলেন ব্রহ্মচারিজী।

শিষ্য মহানন্দ নন্দী মহাশয় ছিলেন কর্মবীর। কিন্তু বিষয়ানুরাগ ও কৃষ্ণানুরাগ সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। নিজ রুচি অনুযায়ী শ্রীগুরুর সেবা করিতে গিয়া মাঝে মাঝে বেশ অপ্রস্তুত হইতেন তিনি।

পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমকে স্বাবলম্বী করিবার আগ্রহ ছিল তাঁহার। অদূর ভবিষ্যতে সমূহ অর্থনাশ ও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া লোহালক্কড়ের ব্যবসার কতক লভ্যাংশ, আড়াই লক্ষ টাকার স্বর্ণ-মুদ্রা, তিনি অর্পণ করিলেন গুরুদেব ব্রহ্মচারিজীর শ্রীচরণে। প্রার্থনা জানাইলেন : এক লক্ষ টাকা আশ্রমের প্রয়োজনে গচ্ছিত থাক। বাকি দেড় লক্ষ টাকা আপনার ইচ্ছামত টোল, হাসপাতাল বা যে-কোন কল্যাণমূলক ব্যাপারে খাটাতে পারেন।

আজন্ম ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী উত্তর দিলেন : আমার এখানে যারা প্রকৃত ধর্ম-লাভের জন্য আসবে, তাদের যোগক্ষেম শ্রীভগবানই বহন করবেন, এক মুষ্টি অন্নের অভাব তাদের কখনও হবে না। আর আমার তো আকাশবৃত্তি, ভগবানের উপর নির্ভর না করে তোমার টাকার উপর নির্ভর করতে গেলে ব্রতভঙ্গ হবে, ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে। ইচ্ছা হলে লক্ষ লক্ষ টাকা ভূতে দিয়ে যায়। দেশের বহু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের এই টাকার দরকার—সেখানে এই টাকা দিয়ে দেও।···

শ্রীগুরুকে ঠিকমত চিনিতে পারেন নাই মহানন্দ দাদা। তাঁহার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও এই দান গ্রহণ করিলেন না ব্রহ্মচারিজী। মহানন্দ তবু নিবৃত্ত হইলেন না—এবার আর থোক টাকা না দিয়া শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিতে চাহিলেন বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন মহানন্দ। বিষয়-বৈরাগীকে কী দ্রব্যই বা উপহার দিবেন? অগত্যা শ্রীগুরুর চিঠি-পত্র, খাতা-কলম

প্রভৃতি রাখিবার জন্য দামী মখমল দ্বারা তৈয়ারী করাইলেন একটী সুদৃশ্য পত্রাধার—রঙ-বেরঙের রেশমী সুতা দ্বারা সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করাইলেন ঠাকুরের নাম। তাহার ভিতর রাখিলেন শ্রীগুরুর নামাঙ্কিত নানা প্রকারের খাম, কার্ড, চিঠির কাগজ ও নামমুদ্রিত ঝর্ণা কলম। এছাড়া, পুরু রঙীন পশমী কাপড় দ্বারা তৈয়ার করাইলেন একটী চমৎকার 'হোল্ড অল্'— আর, বিচিত্র বর্ণের রেশমী কাপড় দিয়া সুন্দরভাবে সেলাই করাইলেন একখানি হালকা বালাপোষ। সেই হোল্ড-অল ও বালাপোষে সুন্দরভাবে বড় বড় অক্ষরে লিখাইলেন শ্রীগুরুর নাম।

মনোমত দ্রব্যসম্ভার লইয়া মহানন্দ ফিরিয়া আসিলেন পুরী আশ্রমে। সেগুলি অর্পণ করিলেন শ্রীগুরু-চরণে।

নীরবে সবই খুলিতে বলিলেন ব্রহ্মচারিজী, নাড়িয়া চাড়িয়া সেগুলি দেখিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন বালকের মত। আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া জিনিষপত্রগুলি দেখাইলেন, উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন শিষ্য মহানন্দের রুচিবোধ ও আন্তরিকতার।

নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া স্থানান্তরে গেলেন মহানন্দ।

তখন প্রধানা পরিচারিকা মনোরমা শ্রীমাণীকে ডাকিলেন ব্রহ্মচারিজী, বলিলেন: এইসব জিনিষের উপর থেকে সেলাই খুলে আমার নাম তুলে ফেল—আর নামাঙ্কিত চিঠি লেখার কাগজ-পত্র পুড়িয়ে ফেল।...মহানন্দ আমাকে বাবু-সাধু সাজাতে চায়,...এইভাবে আমার নাম জাহির করতে চায়। এসবের প্রশ্রয় দিলে ক্রমে আশ্রমের আদর্শ নষ্ট হয়ে যাবে।...

কত সব দামী জিনিষপত্র—সব কিছুর মধ্যেই জড়িত মহানন্দ দাদার প্রাণভরা আন্তরিকতা। অপলকে তাকাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন মনোরমা।

সবই বুঝিলেন ব্রহ্মচারিজী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিজেই উঠিয়া পড়িলেন। সমস্ত জিনিষপত্র একত্র করিয়া তাহার উপর কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলেন,...পরক্ষণেই অগ্নিদেবতার উদ্দেশে আহুতি দিলেন সব কিছু।...বহ্নিশিখা নির্বাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে

জুড়াইয়া গেল চিরবৈরাগীর অন্তরের দহন—সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।···আর, ছুটিয়া আসিয়া মহানন্দ নির্নিমেষে বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিলেন সেই ভস্মরাশির দিকে। ঠাকুরের দিকে চাহিতে পারিলেন না—তবু অন্তরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল সর্বত্যাগী নীলকণ্ঠের প্রদীপ্ত মূর্তি।···

উপযুক্ত আধার বুঝিয়াই ভগবান বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রসম্মত নীলকণ্ঠ বেশে বিভূষিত করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীকুলদানন্দজীকে। তাইতো আজীবন তিনি সর্বেশ্বর হইয়াও সর্বত্যাগী। দুঃখের বিষয় মহানন্দ বহুদিন ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করিয়াও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার অপচেষ্টার জন্য বহুবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে ব্রহ্মচারিজীকে। তিনি যে সদ্‌গুরু—তাই এমনি করিয়াই সংশোধন করিতেন শিষ্যের ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপরাধ।···

শুধু শিষ্যদের নিকট হইতে নয়, বিরুদ্ধবাদী সতীর্থদের নিকট হইতেও তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নানা প্রতিকূল আচরণ। কিন্তু অপূর্ব কৌশলে সমস্ত হলাহল পান করিয়া বিনিময়ে তিনি পরিবেশন করেন পরম অমৃত। এখানেই তাঁহার নীলকণ্ঠ নামের সার্থকতা। এত ক্ষমা ও দয়া, এত প্রাণভরা ভালবাসা সত্যই নিতান্ত দুর্লভ।

পত্রযোগে জনৈক গুরুভ্রাতা শ্রীগুরুকে লিখিলেন—'সদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের কোন ঘটনা লিখিয়া তিনি গোসাঁইজীকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে তাহা উঠাইয়া না দিলে ব্রহ্মচারিজীকে তিনি হত্যা করিবেন।···ভদ্রলোক আবার কুলদানন্দজীর নিকট বিশেষভাবে উপকৃত ছিলেন। তখন চিঠিপত্র লেখার ভার ছিল অধম লেখকের উপর। এমনি পত্রে সবিশেষ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া নির্জনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম: কী উত্তর লিখব?

: এর আর কী উত্তর দেবে! গোসাঁইজীর জীবনের এত বড় ঘটনা, যা তিনি শ্রীমুখে বলেছেন, তা বাদ দেওয়া চলে না। আমি তো বুক পেতেই আছি, যার ইচ্ছা খুন করে যেতে পারে।···

সেই উত্তরই লেখা হইল। গুরুদেবের এমনি সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় তাঁহাকে খুন করা তো বহু দূরের কথা, পত্রযোগে প্রতিবাদ জানাইবারও আর উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই তাঁহার সতীর্থ ভদ্রলোক।···

গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দিরে সেবায়েতের দায়িত্ব লইয়াও শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের প্রতিকূল আচরণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তখন সমাধি-মন্দিরের সেবায়েত তাঁহার ছোট দাদা পূজনীয় সারদাকান্তজী। গোসাঁইজীর একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি; এজন্য তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন ব্রহ্মচারিজী। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইলেন অন্যান্য গুরুভ্রাতারা—সারদাকান্তজীকে সমাধি-সেবা হইতে অপসারিত করিবার জন্য নানা অপকৌশল অবলম্বন করিলেন তাঁহারা। ব্রহ্মচারিজী তাঁহার ছোট দাদাকে সাহায্য করেন—সেই আক্রোশে মোকদ্দমা রুজু হইল তাঁহারই নামে।···আশ্রমবাসী জনৈক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন, মিথ্যা অপযশ ও নানা নিন্দা-কুৎসাও রটনা করিলেন।···

ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে দেখা দিল তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। লেখক ও অন্যান্য ভক্ত শিষ্যেরা শ্রীগুরুর এমনি অমর্যাদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারিজী তখনও দিব্যি নির্বিকার—বরং শিষ্যদের বিরূপ মনোভাবে সেবক বসন্তকে সেইদিন রাত্রেই বলিলেন: বুড়ো মানুষ, বড় পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন- আফিং ও দুধের যোগাড় হয়েছে কিনা সন্ধান নিয়ে এস তো।

সন্ধান লইয়া জানা গেল, আফিং ও দুগ্ধ অভাবে সত্যই বড় কষ্ট পাইতেছেন বৃদ্ধ। অমনি ব্রহ্মচারিজীর আদেশে যথোচিত ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বৃদ্ধের চোখে-মুখে দেখা দিল ভ্রূকুটি-কুটীল হাসি।···ব্রহ্মচারিজী তবুও ক্ষমাশীল—তাঁহার দ্বন্দ্বাতীত অন্তর ধীরস্থির, তিনি যেন পাষাণ দেবতা!···কিন্তু বৃদ্ধের প্রতি শিষ্যদের অন্তর শ্রদ্ধাশীল হয় নাই বুঝিয়া তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য আবার বিধান দিলেন: বুড়ো মানুষ, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—একটু পদসেবা করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এসো।···

নির্বিচারে সে আদেশ পালিত হইল। তখন চোখের জলে বৃদ্ধ বলিলেন: দেখ বাবা, আমরা ভাই-ভাই যতই ঝগড়াঝাটি করি না কেন, তোমরা সেদিকে কান দিও না। ব্রহ্মচারী চিরকাল আমাদের মায়ের মত সকল অভাব অভিযোগের খোঁজ খবর নিয়ে সব ব্যবস্থাই করে দেন; নইলে কি আত্মীয় স্বজন ছেড়ে আমরা এখানে এভাবে থাকতে পারি? তোমাদের ঠাকুরের কাছে মান-অপমান সবই সমান—তিনি যে গোসাঁইজীর হাতে গড়া ব্রহ্মচারী, আমাদের সকলের গৌরব। তাঁর আশ্রয়ে এসে তোমরা সত্যই সাক্ষাৎ গোসাঁইজীর কৃপা পেয়েছ।···

বৃদ্ধের এমনি কথায় মুগ্ধ ও নিশ্চিন্ত হইলেন লেখক এবং অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ। মোকদ্দমাটী অবশেষে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও নেতাজীর পিতা জানকীবাবুর শালিসীতে মিটিয়া যায়।

ঝুলন পূর্ণিমা। গোস্বামী প্রভুর পবিত্র জন্মতিথি মহোৎসব নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হইল।

শ্রাবণ মাসে পুরী হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন কুলদানন্দজী। ভক্ত শিষ্য রায় সাহেব ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে আসিয়া উঠিলেন তাঁহার ৩০ নং ঝামাপুকুরের বাসাবাড়ীতে।

পুরীধামে গোস্বামী প্রভুর সমাধি-মন্দিরে বর্ণাশ্রম ধর্ম বজায় রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন ব্রহ্মচারিজী; ইহাতে অনেক গুরুভ্রাতা তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন। ঝামাপুকুরের বাড়ীতেও তাঁহার প্রতি অসূয়া ভাব প্রকাশ করিতে আসিতেন অনেকে। কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি কখনও কোন বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন নাই; বরং বিরুদ্ধবাদী গুরুভ্রাতাদের সবিশেষ আদরযত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন।

ভাদ্র মাসে ঝামাপুকুরের এই বাড়ীতে দীক্ষালাভ করেন অন্নদা চরণ দাস ও রমাপ্রসাদ মিত্র। লাভচাঁদ ও মতিচাঁদের দোকানে কাজ করিতেন দাস মহাশয়—তিনি ছিলেন গোসাঁই-শিষ্য হেমেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের প্রতিবেশী ও পুত্রস্থানীয়। রমাপ্রসাদ হুগলী জেলার কোন জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন—তিনি ছিলেন খুব ধীর শান্ত ও সাধনশীল।

আশ্বিন মাসে চন্দননগরে মহাহোম সম্মিলনে যোগদান করিলেন ব্রহ্মচারিজী। মহাহোমের পর ২৯শে আশ্বিন দীক্ষালাভ করেন মালদহ নিবাসী শ্রীনরেশ নারায়ণ মিত্র মহাশয়। বাল্যাবধি তিনি ধর্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার দীক্ষা হয় এবং তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিক বড় সুন্দর অবস্থা দেখা দেয়। এজন্য তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন ব্রহ্মচারিজী। হাতের লেখা ভাল বলিয়া তাঁহার দ্বারা 'সদ্গুরু সঙ্গ' গ্রন্থের কতক পাণ্ডুলিপি নকল করাইতেন। ব্রহ্মচারিজীর তিরোধানের পর কাশীর অনতিদূরে গঙ্গাতীরে পুণ্যশ্লোক তুলসীদাসজীর নির্জন ভজন কুটীর সংস্কার করাইয়া সাধন ভজনে নিমগ্ন হন নরেশচন্দ্র। গভীর রাত্রে একদা একদল ডাকাত অর্থলোভে তাঁহাকে আক্রমণ করে। কয়েক মাস হাসপাতালে চিকিৎসিত হইবার পর ফিরিয়া আবার অবিচলিতচিত্তে তিনি সেই ভজন কুটীরেই সাধন ভজন করিতে থাকেন। পরে অনুতপ্ত ডাকাতদের অনেকে তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়ে। "সনাতন নাম সাধনা" নামে তিনি একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁওয়ে গঙ্গানদীর মধ্যস্থিত পাহাড়ে 'তাপস আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে প্রতি বৎসর ব্রহ্মচারিজীর আবির্ভাব মহোৎসব পালিত হয়। চন্দননগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঝামাপুকুরে তিন চার মাস অবস্থান করেন ব্রহ্মচারিজী। এই স্থানে দীক্ষালাভ করেন আলিপুরের উকিল শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়। সাধন নিষ্ঠা ও মধুর প্রকৃতির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

এই সময়ে ব্রহ্মচারিজীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এজন্য কলিকাতার পুলিশ ইনস্পেক্টর পরিমল মজুমদার মধুপুরে একটী সুন্দর বাড়ী ভাড়া করিরা দিলে সেখানে এক মাস অবস্থান করেন তিনি। পরিমল বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন ; ঠাকুরের স্বাস্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি হইল।

সরস্বতী পূজার দিনে বহু শিষ্য সঙ্গে লইয়া তিনি গমন করেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাবধারার অনুপম মাধুর্য বিশেষ করিয়া উপভোগের জন্যই তাঁহার এই পরিক্রমা।

জগজ্জননী ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া করজোড়ে অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন ব্রহ্মচারিজী। মায়ের পূজা দিলেন ষোড়শোপচারে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের থাকিবার ঘরে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন—রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে নিভৃতে কত সুমধুর আলাপ, কত দিব্য ভাব বিনিময় হইয়াছে এই পুণ্যক্ষেত্রে।··· অতঃপর, পঞ্চবটী মূলে গিয়া আসন করিয়া বসিতেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন—সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন একঘণ্টা কাল। প্রত্যাবর্তনের সময় বলিলেন: স্থানটী সাধন ভজনের বড়ই উপযুক্ত—এখানে বসে তোমরা একদিন কীর্তন করো।···

কিছুদিন পরে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে চাহিলেন কয়েকজন অনুরাগী শিষ্য। শ্রীগুরু সম্মত হওয়ায় নাচিয়া উঠিলেন শিষ্যবৃন্দ—ঠাকুরকে মধ্যমণি করিয়া সকলে যাত্রা করিলেন পরমানন্দে। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে আভূমি প্রণাম করিয়া শাস্ত্রবিধি মতে পূজা দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে সকলের সহিত গেলেন পঞ্চবটী মূলে। ছায়াশীতল কুঞ্জবীথির পাশেই প্রেম প্রবাহিনী ভগবতী গঙ্গা। সেই প্রবাহে বুঝি বা প্রাণের প্রবাহ মিশাইয়া ভাব নিমগ্ন হইয়া বসিলেন ব্রহ্মচারিজী; আর সাগ্রহে কীর্তন আরম্ভ করিলেন ভক্ত গায়ক বিজয়কুমার বিশ্বাস, সেই সঙ্গে যোগদান করিলেন কালি বিশ্বাস ও আর সকলে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার আকুল বিরহ প্রসঙ্গে সুরু হইল মধুর কীর্তন—এ যেন করুণাময়ী মায়ের জন্য রামকৃষ্ণের সীমাহীন ব্যাকুলতা, ৺শ্যামসুন্দরের জন্য বিজয়কৃষ্ণের আবেগ-মধুর বিরহ বেদনা।···আর নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজীর ভাব সমাধি ও স্বর্গীয় জ্যোতিপুঞ্জ দর্শন করিয়া অসংখ্য নরনারীতে পরিপূর্ণ জনতা মুহুর্মুহুঃ সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল অপূর্ব ভাবাবেশে।···

পরে ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন সকলে। ফাল্গুনের শেষে শিবরাত্রির সময় চন্দননগরে গমন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। সারাদিন নিরম্বু উপবাস করিয়া সমস্ত রাত্রিতে চারি প্রহরে চারিবার হোম ও পূজা করিলেন, বাকি সময়ে ধীরস্থির ভাবে আসনে বসিয়া

নিমগ্ন রহিলেন মধুর নাম জপে।···বহুদিন পূর্বে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে গোস্বামী প্রভু স্বয়ং শির পাতিয়া গ্রহণ করেন প্রিয়তম মানস-পুত্রের ভক্তি-অর্ঘ। আজও পূজা করিয়া ফুলজল দিবার সময় মনে হইল, শির পাতিয়া গ্রহণ করিলেন শিবরূপী ভগবান বিজয়কৃষ্ণ।···

কলিকাতা হইতে অনেক শিষ্য আসিয়া যোগদান করেন। রাত্রি দুইটায় নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় কেহ কেহ গল্প-গুজব শুরু করিলেন। অমনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাদের ধমক দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বলিলেন : তোমাদের একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? শুভ সময় হেলায় নষ্ট কচ্ছ ? এটা গল্প-গুজবের সময় নয়—এমন শুভ মুহূর্ত আর পাবে না। এই সব শুভ মুহূর্তে স্থির হয়ে বসে নাম করতে হয়।···

প্রত্যূষে শিষ্যদের লইয়া গঙ্গায় স্নান-তর্পনাদি সমাপন করিলেন ; পরে সকলের মুখে শ্রবণ করিতে লাগিলেন মধুর শিব সঙ্গীত। এইভাবে সকল দেব দেবীর সেবা-পূজা ও মর্যাদা রক্ষা করিতেন এবং প্রয়োজন মত শিষ্যদের তাহা শিক্ষা দিতেন।

চন্দননগর হইতে নববর্ষে পুরীধাম গমন করিলেন।

॥ বারো ॥

১৩৩১ সাল। পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রম। এখানে থাকিয়া সম্পন্ন করিলেন বিজয়কৃষ্ণের তিরোভাব ও আবির্ভাব উৎসব। সাব রেজিষ্ট্রার সন্তোষনাথ প্রায় সারা জীবন চাকরি করিলেও আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চাবস্থা লাভ করেন। ইহার মূলে ছিল শ্রীগুরু কুলদানন্দজীর চরণে তাঁহার নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। ব্রহ্মচারিজী তাঁহাকে লেখেন : অফিসের কাজকর্মে অবহেলা করিয়া তুমি যদি সারাদিন সাধন ভজনে কাটাও তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট ; আর সাধন ভজন বন্ধ করিয়া যদি সারাদিন কাজকর্মে কাটাও তাহাতে আমি সন্তুষ্ট।···

সংসারীদের পক্ষে মহামূল্য উপদেশ। কর্তব্যের অবহেলা নয়—কর্তব্য সম্পাদনই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত ; সেজন্য প্রয়োজনমত সাধন

ভজন হইতে বিরত হইলেও ক্ষতি নাই। হাতে কাম, আর মনে নাম—গৃহীদের পক্ষে ইহাই ভগবান বিজয়কৃষ্ণের নির্দেশ। নিজ শিষ্যদের ক্ষেত্রেও শ্রীগুরুর সেই বাণী প্রতি অক্ষরে অনুসরণ করিয়াছেন ব্রহ্মচারিজী। এইভাবে সুকৌশলে শিষ্যদের প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী করাই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব।

প্রতি দুর্বল মুহূর্তে শিষ্যদের সচেতন করিয়া তুলিবার দিকেও সবিশেষ লক্ষ্য ছিল তাঁহার। কয়েক ঘণ্টার অসুখেই পরলোক গমন করিল সন্তোষনাথের একমাত্র পুত্র প্রতিভানাথ। সন্তোষনাথ তবু ধীর স্থির, স্বাভাবিক ভাবেই ব্রতী রহিলেন নিত্যকর্মে। পুরী আশ্রমে আসিয়া পারলৌকিক কর্মাদিও সম্পন্ন করিলেন। একদা সন্ধ্যায় সহসা গভীর শোকাবেগে অধীর হইয়া পড়িলে তাঁহাকে ধরিয়া ছাদে গুরুদেব সমক্ষে লইয়া গেল অধম লেখক। শ্রীগুরু বলিলেন: কি সন্তোষ! শোকাতীত অবস্থা লাভ করেছ, মহাপুরুষ বনে গেছ—আর ভাবনা কী?···

অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিলেন সন্তোষনাথ: পুত্রবিয়োগে একদিনের জন্যও আমাকে শোক স্পর্শ করেনি, গায়ে কোন আঁচই লাগেনি। তাই হঠাৎ মনে হ'ল শ্রীগুরুর কৃপায় একটা নিরাপদ অবস্থা লাভ হয়েছে। মনে এই কথা ওঠা মাত্র ভিতরটা যেন কাটা ছাগলের মত কেঁপে উঠল!···

তাঁহার পৃষ্ঠে শ্রীহস্তের সস্নেহ স্পর্শ বুলাইয়া দিলেন ব্রহ্মচারিজী। বলিলেন: ঠাকুর কৃপা করে তোমাদের স্নেহের আবরণে ঢেকে রেখেছেন—সকল সন্তাপ, সকল মলিনতা থেকে রক্ষা কচ্ছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়—অভিমান এলেই সর্বনাশ।···

ব্রহ্মচারিজীর আশীর্বাদে স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন সন্তোষনাথ। মূল্যবান উপদেশটীও বিশেষভাবে মনে রাখিল দীন লেখক।···আষাঢ় মাসে দীক্ষিত হন শ্রীমন্মথনাথ রায় চৌধুরী এবং কুমারখালির শ্রীঅরুণ কুমার সাহা। পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিলেও মন্মথবাবু প্রথমাবধি নিয়মিত সাধন ভজন করিয়া আসিতেছেন।

৬ই ভাদ্র তারিখে দীক্ষালাভ করেন ব্রহ্মচারিজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবিশ্বনাথ (কালো) এবং নাগপুরের প্রসিদ্ধ গায়ক ও অদ্ভুত হারমোনিয়ম

বাদক তুকারাম ভাতকুলিকর। শ্রীগুরুর অতি প্রিয়পাত্র বিশ্বনাথ বর্তমানে পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের সেবায়েৎ।

শারদীয়া মহাষ্টমীতে চন্দননগরে মহাহোম সম্মিলনে যোগদান করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মচারিজী কলিকাতা গমন করিয়া অবস্থান করেন আশুতোষ পাল মহাশয়ের কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। এখানে ১লা কার্তিক দীক্ষিত হন শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়। ইনিও সাধনশীল ও বিশিষ্ট কর্মী—বর্তমানে ব্রহ্মচারী সমাধি সংসদের একজন সদস্য।

দুই মাস কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর ব্রহ্মচারিজী গমন করেন কাশীধামে। এখানে কলিকাতা মট্‌লেনের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সরলাবালার দীক্ষা হয়। সরলাবালা গোস্বামী প্রভুর শিষ্য নবীনচন্দ্র ঘোষের নাতনী। কৃষ্ণচন্দ্র সুন্দর বেহালা বাজাইতে পারেন—পূজনীয় রেবতীবাবুর কীর্তন গানের সময় তিনি বেহালা বাজাইতেন।

কাশী হইতে অল্প অল্প জ্বর লইয়া মাঘ মাসে কলিকাতায় আসিলেন ব্রহ্মচারিজী। ঝামাপুকুরের ক্ষিতীশবাবুর বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় জ্বরবেগও ক্রমশঃ বর্ধিত হইল; রক্ত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন কালাজ্বর হইয়াছে। নিয়মিত চিকিৎসা আরম্ভ হইল—ছয়মাস ছুটি লইয়া সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন সিভিল-সার্জেন ডাঃ হরিশ সেন। নীলরতন বাবু এবং আরও প্রখ্যাত চিকিৎসক-বৃন্দ আসিয়া দেখিতে লাগিলেন; জ্বরের তবু উপশম নাই। কালাজ্বরে শীর্ণ ও মলিন হইল তাঁহার দেবদেহ। ব্রহ্মচারিজী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন বোটে করিয়া পদ্মানদীতে কিছুদিন অবস্থান করিবেন। তাহাতে সম্মতি দিলেন ডাক্তারেরা—বোটের ব্যবস্থাও হইয়া গেল। সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ডাঃ হরিশ সেন এবং অনেক ভক্ত শিষ্য-শিষ্যা। বীরেশ্বর শেঠ ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মরাণী শেঠ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জলাতঙ্ক রোগের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইতে আপত্তি জানাইলেন ব্যবস্থাপক মহানন্দ। বাধ্য হইয়া ব্যথিতচিত্তে বাসায় ফিরিলেন বীরেশ্বর বাবু—শ্রীগুরুর সেবায় রহিয়া গেলেন গুরুগতপ্রাণা সুযোগ্য সেবিকা পদ্মরাণী শেঠ।

দুঃখে, অভিমানে বীরেশ্বরের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইল। রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীগুরু সান্ত্বনা দিলে তাঁহার সব অভিমান তিরোহিত হইল, মন শান্ত ও আনন্দময় হইয়া গেল।

ফাল্গুন মাসে সকলকে লইয়া গোয়ালন্দ হইতে বোটে উঠিলেন ব্রহ্মচারিজী। প্রথমে ভাগ্যকুলের রাজবাড়ীর সম্মুখে বোট লাগান হইল। পরে লৌহজং (তারপাশা) হইয়া তাঁহারা গেলেন চাঁচরতলা কালীবাড়ী। এখানে আসিয়া ৺মা-কালী দর্শন করিয়াছিলেন গোস্বামী প্রভু; ব্রহ্মচারিজীও এখানে মা-কালী দর্শন করিয়া পূজাদি নিবেদন করেন। পরে রাজবাড়ী গমন করিয়া অবস্থান করেন দশ-বারো দিন। পদ্মার মুক্ত শীতল হাওয়ায় অনেক সুস্থ বোধ করেন, মনও প্রফুল্ল হইয়া ওঠে। পরে একদিন অবস্থান করেন পদ্মা-মেঘনার সঙ্গমস্থল কলাগাছিতে, মুন্সিগঞ্জ শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরী হইয়া তিনি গমন করেন নারায়ণগঞ্জে।

দুই মাস নৌকায় বাসকালীন দেখা দেয় ঝড়-ঝঞ্ঝা, অসুখ-বিসুখ ও নানা আপদ-বিপদ; তবু সব কিছুর মাঝে ব্রহ্মচারিজীর অপূর্ব স্থৈর্য ও যোগৈশ্বর্য লক্ষ্য করিয়া ধন্য হইলেন শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দ।

পথিমধ্যে হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইল বালক মহাবিষ্ণু। পিতা ডাঃ হরিশচন্দ্র সেন সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়াও হতাশ হইলেন, একমাত্র সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় মনোব্যথা নিবেদন করিলেন শ্রীগুরু-চরণে। দয়াল ঠাকুর নিজের ঝোলা হইতে নাক্স্‌ভমিকা (6x) বাহির করিয়া রোগীর মুখে দিলেন, আর সে অতি অল্প সময়ে আশাতীতভাবেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

কঠিন বসন্তরোগে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে আশুদাদার দুটী সন্তান। হরিশ-বাবুর চিকিৎসায় কিছুমাত্র উপশম হইল না—তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিধানমত গোসাঁইজীর চরণামৃত সেবনে ও গাত্রে বার বার লেপনে রোগ ক্রমশঃ সারিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যারাতে হঠাৎ কালবৈশাখীর উদ্দাম নৃত্যে নাচিয়া উঠিল প্রমত্তা পদ্মা—উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভে নৌকা তিনটী পরস্পরের গাত্রে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইবার উপক্রম হইল। নৌকার ভিতর শিষ্য-শিষ্যারা

ওলট-পালট খাইয়া আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে শ্রীনাম স্মরণ করিতে থাকেন—কিন্তু ব্রহ্মচারিজী নিশ্চিন্ত, দিব্য নির্বিকার। তখন বত্রিশজন মাঝি জলে নামিয়া অতি কষ্টে নৌকাগুলি বাঁচাইতে সমর্থ হইল।

কলাগাছিতে একদা গভীর রাত্রে নৌকায় ডাকাত পড়িল। এই অঞ্চলের ডাকাতেরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জানিয়া শিষ্য-শিষ্যারা প্রাণভয়ে আশ্রয় লইল নৌকার পাটাতনের নীচে। কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন মনে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন ব্রহ্মচারিজী—সস্নেহে দুর্বৃত্তদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন: কিরে বাবা, তোরা কী চাস্?—জটাশঙ্করের তেজোদীপ্ত অপরূপ রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া দস্যুসর্দার উচ্চৈস্বরে বলিয়া ওঠে: পয়গম্বর রে! সইর‍্যা পড়—ধুপধাপ করিয়া বোট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইল ডাকাতেরা।

ব্রহ্মচারিজীর জ্বর তখনও ছাড়ে নাই। তবু সকলকে লইয়া আসন্ন বুদ্ধ অষ্টমী যোগে লাঙ্গলবন্ধের স্নানে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার শরীরের এই অবস্থায় ইতস্ততঃ করিলেন সকলে। কিন্তু জ্বর অবস্থাতেই তিনি লাঙ্গলবন্ধ গমন করিলেন—সকলকে লইয়া রীতিমত স্নানও করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই স্নানের পর তাঁহার জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল; ক্রমশ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কথিত আছে—মাতৃহত্যার পর পরশুরাম নানা তীর্থ ভ্রমণের পর এইস্থানে এই যোগে স্নান করেন। ফলে তাঁহার হাতের লাঙ্গল মুক্ত হয়। ব্রহ্মচারিজীও রোগমুক্ত হইলেন। চৈত্রমাসের শেষে সকলকে লইয়া তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৩৩২ সাল। গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব পালন করিবার জন্য পুরীধাম গমন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। ঝুলন পূর্ণিমায় আবির্ভাব তিথিও পালন করিলেন।

পুরীধামে অবস্থান করিবার ফলে তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ হইল। ভাদ্র মাসে কলিকাতায় মির্জাপুর ষ্ট্রীটে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সঙ্গে আসিলেন ছোট দাদা সারদাকান্ত—তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই উদ্দেশ্য।

জিতেন্দ্রশঙ্করের বহুদিনের বড় ইচ্ছা ঠাকুরকে একবার তাঁহাদের দেশ কালিয়ায় লইয়া যাইবেন। একবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় ব্রহ্মচারিজীও সম্মত হইয়াছিলেন। এবার তাঁহার শরীর সুস্থ হওয়ায় ডাঃ হরিশ সেনের নিকট সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন জিতেন্দ্রশঙ্কর। ব্রহ্মচারিজী প্রত্যহ বিকালে প্রিন্সেপস্ ঘাটে ভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি ঘাটে আসন করিয়া বসিলে সম্মুখে ঘাসের উপর বসিলেন জিতেন্দ্র শঙ্কর। সারদাকান্তের শরীর বড় খারাপ, চিকিৎসায় কোন উপকার হইতেছে না—একথা জানাইলেন ব্রহ্মচারিজী। তাহাতে জিতেন্দ্রশঙ্কর মনে মনে হতাশ হইলেন। কিন্তু একটু পরে ব্রহ্মচারিজী তাঁহাদের দেশের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেনঃ আমার তো খুবই ইচ্ছা একবার তোমাদের দেশে যাই। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর আমার বেশ সুবিধার সময়; তখন একবার পূর্ববঙ্গের দিকে ঘুরে তোমাদের ওদিক হয়ে এলে ভাল হয়। কিন্তু কী করব, ছোড়দাদার যে অসুখ।

প্রত্যাশিত প্রস্তাব আপনা হইতেই উত্থাপন করিলেন অন্তর্যামী গুরুদেব। তাহাতে বড় আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করিলেন জিতেন্দ্র শঙ্কর। বলিলেনঃ আমার অনেক দিনের আন্তরিক ইচ্ছা একবার আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাই। আমাদের গ্রামে অনেক সাধনের লোকও প্রতি বছর আপনাকে সেখানে যাবার জন্যে অনুরোধ করতে বলে। আপনার সুবিধা হবে কিনা সেজন্য বলতে সাহস পাইনি।

ঃ ইচ্ছা তো খুবই আছে। ছোড়দাদার অসুখ একটু না কমলে বলতে পারিনে। দেখা যাক।

মনে অনেকটা আশান্বিত হইলেন জিতেন্দ্রশঙ্কর। পূজার সময় বাড়ী গিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। পূজার পর ঠাকুরের যাওয়া সম্পর্কে চিঠি দিলেন হরিশ দাদাকে। লক্ষ্মীপূর্ণিমার পর ঠাকুরের যাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। এদিকে মহাহোম সম্মিলনে যোগদান করিয়া চন্দননগর আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন ব্রহ্মচারিজী। তাঁহার অনুমতি লইয়া ডাঃ হরিশচন্দ্র জিতেন্দ্রশঙ্করকে চিঠি লিখিলেন—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন শিষ্য সহ পঞ্চমীর দিন তাঁহাদের বাড়ীতে পৌঁছিবেন

শ্রীগুরুদেব। সকলের মনপ্রাণ নাচিয়া উঠিল—গুরুভ্রাতা ও পুরোহিত বসন্ত দাদাকে লইয়া জিতেন্দ্রশঙ্কর সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিয়া গেলেন। সারা বাড়ী চুনকাম করান হইল, সামিয়ানা খাটান হইল ছাদের উপর। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে—বাড়ীতে আবার পূজার ধুম লাগিয়া গেল যেন।···

চতুর্থীর দিন ঠাকুর আসিতেছেন টেলিগ্রামে সংবাদ পাইয়া খুলনায় গেলেন জিতেন্দ্রশঙ্কর। বাজারের ঘাট তাঁহাদের বাড়ী হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী—রৌদ্রে হাটিয়া যাইতে বড় কষ্ট হইবে ঠাকুরের। কাজেই তাঁহাদের বাড়ীর ঘাটে ষ্টীমার লাগাইবার জন্য এজেন্টকে অনুরোধ করিলেন। প্রথমে আপত্তি করিলেও একজন সাধুর কথা শুনিয়া পরে সম্মত হইলেন এজেন্ট সাহেব।

অফুরন্ত উৎসাহে সারা রাত প্লাটফরমে বেড়াইতে লাগিলেন জিতেন্দ্র শঙ্কর। খুলনায় ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল রাত্রি চারিটায়; ঠাকুর ও গুরুভ্রাতাদের লইয়া মহানন্দে ষ্টীমারে গিয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত। পূর্বাচলে উষার আলোকচ্ছটা। দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত প্রভাতী সামগান,···বনে প্রান্তরে স্পন্দিত নব জাগরণ।···হৃদয় দিয়া সেই স্পন্দন অনুভব করেন যোগিরাজ কুলদানন্দ। শ্রবণ করেন নাদব্রহ্মের অনন্ত সংগীত।···প্রভাতী সুরে সুর মিলাইয়া গান করেন উষাকীর্তন। দিগন্তের কুহেলি মায়ার সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া উদয়াচলে নিবদ্ধ তাঁহার সুদূরপ্রসারী স্থিরদৃষ্টি।···ধ্যানস্তিমিত চোখে মুখে প্রতিফলিত উষার শুচিশুভ্র আলোর আভাস, চরণপদ্মে লুণ্ঠিত স্নিগ্ধ মলয়ানীল।···

রূপালি নদীর বুক চিরিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে ষ্টীমারখানি। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর শ্রীচরণস্পর্শে তাহারও অঙ্গে অঙ্গে ধ্বনিত নব কলতান। ষ্টীমারের আশেপাশে প্রাণের আনন্দে উড়িয়া বেড়াইয়া অভিনন্দন জানায় মুক্ত বিহঙ্গের দল।

ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় বেশ প্রফুল্ল দেখায় ব্রহ্মচারিজীকে। তাঁহার দিকে চাহিয়া খুবই খুশী হইয়া ওঠেন সকলে; গুরুদেবের সহিত মহানন্দে অগ্রসর হইতে থাকেন ভক্তবৃন্দ।

একটু পরেই পূর্বাচল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া স্মিতহাস্যে সমুদিত হইলেন দেব দিনকর। ব্রহ্মচারিজীর চন্দন-চর্চিত ভালে, হেমাভ দেবদেহে পরম স্নেহে লেপন করিলেন কনক প্রভারাশি।...যুক্ত করে ব্রহ্মচারিজী জানাইলেন সভক্তি প্রণতি—আত্মসমাহিত হইলেন পরক্ষণে। তখন নীলকণ্ঠের প্রদীপ্ত আননে সে কী অপরূপ ভাস্বর দ্যুতি।...মুগ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে অপলকে চাহিয়া থাকেন ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী।

বেলা ৮৷৷টায় ষ্টীমার লাগিল কালিয়ার ঘাটে। পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া ঘাটে বহু নরনারী অধীর আগ্রহে সমবেত হইয়াছিল। পলকে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ব্রহ্মচারিজীর জয়ধ্বনি—সকলেই ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িল প্লাবনের বেগে।

ষ্টীমার আসিয়া লাগিল জিতেন্দ্রশঙ্করের বাড়ীর ঘাটে। সেখানেও কূলে কূলে জনতার সে কী উল্লাস! মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারিজীকে লইয়া অগ্রসর হইলেন উচ্ছ্বসিত জনতা।

দ্বিতলের ঘরে লইয়া গিয়া আসন দেওয়া হইল ব্রহ্মচারিজীকে। জনতার তবু বিরাম নাই—অপার আনন্দে নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই যেন আত্মহারা। জীবন ভরিয়া ত্রিতাপ জ্বালার মাঝে প্রকাশ পাইয়াছে প্রাণের কত না আকুতি। এতদিনে তবে কি সত্যই দেখা দিয়াছেন প্রাণের ঠাকুর ?...

আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিকে ইতিমধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে আনন্দস্রোত—নীলকণ্ঠের পদার্পণে সেই আনন্দ বৃদ্ধি পাইল বহুগুণ। গভীর আবেগে সকলেই তাঁহার পদধূলি লইয়া ধন্য হইতে চায়। লোকের ভিড় তাই আর থামিতে চায় না কিছুতেই। সস্নেহ আশীর্বাদে সকলকেই পরিতুষ্ট করিলেন ব্রহ্মচারিজী।

কিছুক্ষণ পরে হোম, স্নানাহ্নিক ইত্যাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। মধ্যাহ্নে আহারাদি সম্পন্ন হইল মহাসমারোহে।

অপরাহ্ন। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখভাগ। প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে শান্ত সমাহিত ব্রহ্মচারিজী উপবিষ্ট—চতুর্দিকে মন্ত্রমুগ্ধ, উদ্বেলিত জনতা।

একজন প্রশ্ন করিলেন: গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে যদি কোন উপকার না হয়, বিশ্বাস না হয়—তাহলেও কি তা ধরে থাকতে হবে?

অন্তর্ভেদী আঁখি মেলিয়া চাহিলেন ব্রহ্মচারিজী। বলিলেন: যদি গুরুর উপদেশে অবিশ্বাসই হল, তাহলে বুঝতে হবে যে গুরুকরণই হয়নি। গুরুর উপদেশ মত সমস্ত কাজ নির্বিচারে করে যেতে হবে—এই হচ্ছে শাস্ত্রবাক্য।

আর একজন: আমরা 'রূপং দেহি, যশং দেহি' ইত্যাদি বলে যে সব প্রার্থনা করি, তাতে কি কোন ফল হয়?

: হয় বৈকি—সকাম প্রার্থনা করতে করতেই নিষ্কাম প্রার্থনা হয়ে যায়।

তৃতীয় ব্যক্তি: আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন।

: পরনিন্দা করো না, সত্যকথা বলো—এসব মামুলী উপদেশ আপনারা বহু বইতে পড়েছেন। ওরকম বৃথা উপদেশ দিলে কিছু লাভ হয় না। আর্ত হয়ে জিজ্ঞাসু হলে পুরাকালে সাধুরা উপদেশ দিয়ে যা বিহিত হয় করতেন।

ছোট কালিয়ার যজ্ঞেশ্বর সেন মহাশয় ব্রহ্মচারিজীর গুরুভ্রাতা, বয়স ৭৫ বৎসর। সকাল বেলা আসিয়াই ব্রহ্মচারিজীর সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। এখন আবার উপস্থিত হইলেন—উভয়ে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার করিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন: আপনার নিকট আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। জীবনে তো কত পাপ করেছি। মরণের আগে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করা কি আমার উচিৎ?

ধীরে ধীরে বলিলেন ব্রহ্মচারিজী: আপনি গুরুদেবের যে কৃপা পেয়েছেন, তাতে আপনার পক্ষে ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তের কোন দরকার নেই। একমাত্র গুরুদত্ত নাম জপ করলেই 'মোক্ষতে সর্ব্বপাপেভ্যো', সর্বসিদ্ধি লাভ হয়—এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে লোকশিক্ষার জন্য ঐ সবের প্রয়োজন আছে। আপনি সমাজের শীর্ষস্থানীয়, আপনি ঐ সব না করলে অনেকেই আর করবে না—ক্রমে ঐ সকল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান একেবারে লোপ পাবে। সেটাও তো ভাল না।—

খুশী হইয়া মাথা নাড়িলেন যজ্ঞেশ্বর বাবু: ঠিক বলেছেন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে উপরে লইয়া যাওয়া হইল এবং সাধনতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গূঢ় আলোচনা হইল। জিতেন্দ্র বাবুর স্ত্রী সুকবি প্রফুল্লময়ী দেবী এবং হরিশবাবুর স্ত্রী সাধিকা হেমন্ত দেবীর সেবাযত্নে অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন সকলে।

পরদিন সকালবেলা। শিষ্যবৃন্দসহ ব্রহ্মচারিজী নদীতে স্নানাহ্নিক ও তর্পণ করিলেন। বাড়ীর ছাদে চলিল সকলের পূজা, পাঠ ও হোমাদি নিত্যক্রিয়া। সারা বাড়ী যেন প্রাচীন মুনিঋষিদের পবিত্র আশ্রম। বেলা ১০টা হইতে ১॥০টা পর্যন্ত সুমধুর গোষ্ঠ কীর্তন হইল। ২টায় সুরু হইল ভোজ—আর ঘন ঘন চীৎকার: জয়—গুরুমহারাজের জয়। ...ব্রহ্মচারিজীও উপর হইতে নামিয়া আসিলেন সেই আনন্দের হাটে।

আহারাদির পর জিতেন্দ্রশঙ্করকে বলিলেন ব্রহ্মচারিজী: ভয়ানক খরচ হচ্ছে—যে আয়োজন তাতে তোমাদের বেশ কষ্টও হচ্ছে।

: আপনি ওকথা বলবেন না। এমন আনন্দ জীবনে আর কখনো পাইনি, পাবও না। এ কি টাকা দিয়ে পাওয়া যায়—এ শুধু আপনার কৃপা।...

কোন বিষয়ে কাহারও সামান্য ক্লেশের সম্ভাবনা দেখা দিলেই ব্রহ্মচারিজীর অন্তরে দেখা দিত এমনি সমবেদনা।

অপরাহ্নে শিষ্যবর্গসহ ব্রহ্মচারিজীকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন যজ্ঞেশ্বর বাবু। সযত্নে সকলকে জলযোগ করাইলেন। ফিরিবার পথে দুই ধারে অসংখ্য লোকের ভীড়। সন্ধ্যার পর ফিরিলেন সকলে।

এদিকে বসন্ত বাবুও ঠাকুর ও গুরুভ্রাতাদের নিজ বাড়ীতে লইবার জন্য আগ্রহান্বিত। কিন্তু তখন আর উৎসাহ নাই অনেকেরই। ব্রহ্মচারিজী ধমক দিলেন: তোমাদের বড়ই অন্যায়। বসন্ত প্রাণ দিয়ে তোমাদের সেবা করবার জন্য আয়োজন করেছে—তোমাদেরও যথাসাধ্য গ্রহণ করতে হবে। চল—আমিও যাচ্ছি।

লজ্জিত হইলেন শিষ্যবৃন্দ—ঠাকুরকে লইয়া সকলে বসন্ত দাদার বাড়ী গেলেন, তিনিও সকলকে সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন।

পরদিন সকালে ষ্টীমার যোগে ভক্তবৃন্দ লইয়া গোপালগঞ্জে রওনা হইলেন ব্রহ্মচারিজী। বেলা ১টায় পৌঁছাইয়া কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরকে লইয়া সকলে উপস্থিত হইলেন স্কুলের হেড মাষ্টার, ঠাকুরের গুরুভ্রাতা গিরিশচন্দ্র দে মহাশয়ের বাংলায়।

সকলের থাকিবার জায়গা দেওয়া হইল বোর্ডিংএ প্রকাণ্ড টিনের ঘরে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান, তাহার পরই মধুমতী নদী—বড় চমৎকার স্থানটী।

গোপালগঞ্জ বহু নমঃশূদ্র ভদ্র গৃহস্থের বাসস্থান। মিশনারী পাদ্রী সাহেবদের অপচেষ্টার ফলে অনেকেই হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন খৃষ্টান ধর্ম। নিঃসন্দেহে ইহা বর্ণ হিন্দুদের ঘৃণা ও অবহেলার প্রতিক্রিয়া। বহুদিন হইতে ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন ব্রহ্মচারিজী। ইতিপূর্বেও একবার গোপালগঞ্জে আসিয়া অনেক নমঃশূদ্র ভদ্রলোকদের দীক্ষা ও আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। তখন হইতে ঠাকুরের সেবায় মগ্ন হইয়া আছেন স্কুলের শিক্ষক অমৃত বাবু, জগদ্বন্ধু বাবু প্রভৃতি। সস্ত্রীক অমৃত বাবুর ঐকান্তিক নিষ্ঠাভক্তি দেখিয়া নিত্যসঙ্গী শিষ্যদের অনেকেই নিজেদের দুর্দশায় লজ্জিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে অমৃত বাবু জানাইলেন প্রায় দেড়শত নমঃশূদ্র দীক্ষাপ্রার্থী, অনেক খৃষ্টানও আছেন তাঁহাদের মধ্যে। অমৃত বাবুকে নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিলেন ব্রহ্মচারিজী।

দলে দলে নরনারী আসিয়া দর্শন করিতে লাগিল নীলকণ্ঠের অপরূপ মূর্তি। যে দেখে সেই হতবাক হইয়া চাহিয়া থাকে—নয়ন ভরিয়া দেখিয়াও সাধ মেটে না তাহাদের।…এতদিনে যেন সন্ধান পাইয়াছে মনের মানুষের।…প্রাণের ঠাকুরের !…

দীক্ষা আরম্ভ হইল শেষরাত্রে—আবার সন্ধ্যার সময়। তিনদিন ধরিয়া এইরূপ চলিল—দীক্ষার আর বিরাম নাই। এতদিন যাহারা ছিল অস্পৃশ্য তাহাদের সকলকে বক্ষে লইয়া যেন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছেন পতিতপাবনী স্রোতস্বিনী।…প্রায় দেড়শত নমঃশূদ্রের দীক্ষা হইল—সকলকেই আলিঙ্গন দান করিলেন ব্রহ্মচারিজী, শুদ্ধ শান্তভাবে

থাকিয়া সাধন ভজন করিবার উপদেশ দিলেন। ঠাকুরের কী দয়া,···কী অপূর্ব কৃপা।···নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজীর স্থির আয়ত চক্ষে প্রেমামৃত—আর দলে দলে নরনারীর চোখে ভক্তি অশ্রু, প্রদীপ্ত আননে অভিনব আনন্দের দ্যুতি।···সত্যই সে এক অপূর্ব দৃশ্য।···চারিশত বৎসর পরে প্রেমের অবতার আবার যেন প্রেমামৃত বিলাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ধরাধামে।···

স্থানীয় মোক্তার যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন সাধু বিদ্বেষী, কুটতার্কিক ও দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। কিন্তু ঠাকুর কুলদানন্দের দীপ্ত প্রভাবে চক্রবর্তী মহাশয়ও অবশেষে শরণাপন্ন হইলেন।

মাদারিপুর হইতে খুলনাগামী ষ্টীমারে সকলের সহিত বেলা দুইটায় রওনা হইলেন ব্রহ্মচারিজী। ষ্টীমারে ফার্ষ্ট ক্লাসে ডেকে একখানি ইজি-চেয়ারে তিনি বসিয়াছিলেন। তাঁহার আশেপাষে ছিলেন আরও অনেকে।

হীরেন্দ্রনাথ মিত্র (পাগল) বলিলেন: আমি এখন কলকাতা যাচ্ছি। দুই-তিন দিন পরে সম্বলপুর গিয়ে ওকালতি করব ঠিক করেছি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

: আমি সর্বদাই তোমাদের আশীর্বাদ করি—ঠাকুরের নিকট তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। বড়ই দুঃখের বিষয় তুমি কলকাতা থাকতে পারলে না।

: আমার সম্বলপুর যাওয়া ভাল হচ্ছে কিনা বুঝতে পাচ্ছিনে। আপনার অনুমতি পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

: আমি কখনও কারো স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিতে চাইনে।···আর সাংসারিক বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করাই ভাল।···আমাদের একটী গুরুভাইয়ের মেয়ের এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়। গোসাঁইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আর একটি পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে বললেন। সেখানে বিয়ে হবার অল্পদিন পরেই মেয়েটী বিধবা হল। তাতে গোসাঁইয়ের উপর তাদের বিরূপভাব দেখা দেয়। যা ভবিতব্য তাই টিক্রে দেখে গোসাঁই একথা বলেছিলেন—ভবিতব্য কেউ খণ্ডন করতে

পারে না। ভগবানের দিকে লক্ষ্য রেখে যা ঠিক মন থেকে আসে তাই করে যাও।···

কথাবার্তার মধ্য দিয়া ষ্টীমার বড়দিয়া আসিল সন্ধ্যার সময়। সেখান হইতে মটরলঞ্চে রওনা হইয়া শেষরাত্রে যশোহর জেলার মহকুমা নড়াইল সহর পৌঁছিলেন। ঠাকুরকে লইয়া সকলে গিয়া উঠিলেন বিধুবাবু উকীলের বাড়ীতে। প্রসিদ্ধ উকিল জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্তী, মোক্তার যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র ঘোষ এবং হেডমাষ্টার রাধিকা বাবু প্রভৃতি গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ আশ্রিত ছিলেন ব্রহ্মচারিজীর। ঠাকুরকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহিল না, সকলে মহানন্দে গুরুসঙ্গ করিলেন। নড়াইল হইতে বাসগুায় হিরণের বাড়ীতে গেলেন ব্রহ্মচারিজী। এবারেও কৃতার্থ হইলেন হিরণকুমার—ঠাকুর ও গুরু ভাইদের আন্তরিক সেবা যত্ন করিলেন।

দুই দিন পরে ব্রহ্মচারিজী গেলেন মোড়লগঞ্জে শিষ্য অম্বিকা রায়ের বাড়ীতে। এখানে তিনি দুই দিন অবস্থান করেন। ভক্তিমান অম্বিকাবাবু মনপ্রাণ ঢালিয়া সেবাযত্ন করেন শ্রীগুরুদেবের। কলিকাতা হইতে সন্দেশ, রসোগোল্লা, নানাপ্রকার ফল, বরফ ইত্যাদি আনাইয়াছিলেন অম্বিকাবাবু। আর একঘরে রাখিয়াছিলেন শুধু স্তূপীকৃত ডাব—পিপাসা মাত্রই সকলের জন্য সেই ডাবের জলের ব্যবস্থা ছিল। এখানে সর্বেশ্বর সাহা, রাইমোহন দাস, বিশ্বেশ্বর সাহা প্রভৃতি ধনী ব্যক্তিগণ আশ্রয়লাভ করেন ব্রহ্মচারিজীর।

এখানে থাকিতে শিষ্য অন্নদাচরণ দাসের একটু জ্বর দেখা দেয়। পরাণচন্দ্র ও অচ্যুৎকুমার তাঁহাকে লইয়া সকালে রওনা হইলেন কলিকাতায়। ব্রহ্মচারিজী এক রাত্রি খুলনায় উকিল দত্ত চৌধুরীর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া পরদিন রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিলেন সকলে।

॥ তেরো ॥

অন্নদাচরণ দাস ছিলেন হেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রতিবেশী ও পুত্র-স্থানীয়। দীক্ষার পর হইতে খুব আগ্রহ সহকারে সাধন ভজন করিতেন। ঠাকুরের নিকট অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহার বাড়ীতে সাধন বৈঠক স্থাপন করেন। ভবানীপুর অঞ্চলের সকলে প্রতি শনিবারে সেখানে মিলিত হইতেন। কিন্তু মোড়লগঞ্জ হইতে যে জ্বর লইয়া আসিলেন, তাহাই সান্নিপাতিক আকার ধারণ করিল। ১৩।১৪ দিন পরে ২রা নভেম্বর বেলা ১টায় দেহত্যাগ করিলেন অন্নদাচরণ।

মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ডাঃ সত্যরঞ্জনের বাড়ীতে ছিলেন ব্রহ্মচারিজী। অপরাহ্নে সকলে গেলেন তাঁহার কাছে। অন্নদাচরণের সদ্য বিচ্ছেদ-বেদনায় তাঁহাদের অন্তর ভারাক্রান্ত। ছোট ভাই রোহিনীকান্তের সহিত কথা বলিতেছেন ব্রহ্মচারিজী। রোহিনীকান্ত চলিয়া গেলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন সকলে। সমস্ত ঘরটী যেন শোকাচ্ছন্ন।

ক্ষণকাল পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্রহ্মচারিজী বলিতে লাগিলেন: এই তো মানুষের সব—অন্নদা কোথায় চলে গেল! তার সাজানো বাড়ীঘর, স্ত্রী-মাতা সকলেই ঠিক যেমন ছিল তেমনই রয়েছে, যেখানকার জিনিষ ঠিক সেখানে আছে—আর সে কোথায় কোন্ অনন্তে মিশে গেছে! যেন এক খণ্ড পাথর মহাসমুদ্রের মধ্যে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। আজ তো সুন্দর অট্টালিকা, বিষয়-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র তার কোন প্রয়োজনে লাগল না। সারা জীবন ধরে উন্মত্তের ন্যায় লোকে যে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য অর্থ রোজগার করে—তার কিছুই তো নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়! সমস্তই বৃথা পরিশ্রম। নিজের বাস্তবিক যা প্রয়োজন, তা কয়জন করে থাকে? সংসারে লোকে কেবল শঠতা, প্রবঞ্চনা, জাল-জুয়াচুরি করে অর্থ রোজগারের জন্য চতুর্দিকে ছুটফট করে বেড়ায়। সমস্ত রোজগার স্ত্রী-পুত্রের পায়ে ঢেলে দেয়—তাদের মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। স্ত্রী-পুত্র এই হিসেবে নরকের দ্বার—বাস্তবিক ধর্ম জীবন লাভের কণ্টক স্বরূপ। তাদের মায়া কাটাতে না পারলে নিজের যথার্থ কল্যাণ কিছুতেই হয় না। এই জন্যই ভাগবতে কোন

স্থানে লেখা আছে—যার কুপুত্র ও ভার্যা দুশ্চারিণী, সে বড়ই ভাগ্যবান ; কারণ তাহ'লে স্ত্রী-পুত্রের আচরণে বিরক্ত হ'য়ে তাদের মায়া সহজে কাটাতে পারে, বৈরাগ্যভাব আসতে পারে।

তোমরা স্ত্রী-পুত্র বলতে অস্থির হ'য়ে যাও। এই নশ্বর দেহ হ'তে আত্মা ছেড়ে গেলে স্ত্রী-পুত্রের দ্বারা দেহের যে সুখ হত তার বিন্দুমাত্রও স্মরণ থাকে না—সমস্তই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হ'য়ে যায়। কারণ আত্মার তো দেহ নেই, দৈহিক সুখের কথা মনে থাকবে কেন? কিন্তু স্ত্রী যদি প্রকৃত সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী হয়, তাহলে দেহান্তরের পর শুধু তার সেই ধর্মকার্যের সহায়তার স্মৃতিটুকু স্বপ্নে দেখার মত মাঝে মাঝে মনে হয়—আর কিছুই মনে থাকে না। ছেলেবেলার কোন বন্ধুর সঙ্গে খেলাধূলার কথা যেমন হঠাৎ সেই বন্ধুকে ২৫ বছর পরে দেখলে মনে পড়ে যায়, সেইরূপ। কিন্তু এ যুগে স্ত্রীকে প্রকৃত সহধর্মিণী ও সহকর্মিণীরূপে দেখা যায় না—এখন স্ত্রী কেবল বিলাসের সামগ্রী, দৈহিক সুখের উপকরণ যোগাবার বস্তু।…বাস্তবিক সহধর্মিণী হ'য়ে যদি দুই জনেই একটা খুঁটার দিকে লক্ষ্য রেখে জীবন কাটাতে পারে, তাহলে পরলোকেও সেই খুঁটার দিকে অগ্রসর হবার সময় পরস্পরের দেখাশুনা হয়, ধর্মের জন্য পরস্পর যতটুকু সাহায্য করেছিল তাই স্মরণপথে আসে ; নতুবা নিতান্ত অপরিচিতের মত কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তার ঠিকানা থাকে না। সেই খুঁটার সঙ্গে সূক্ষ্ম তারের সংযোগ করে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম না করলে স্ত্রীর সঙ্গে আর কী সম্বন্ধ থাকে! তোমাদের কারো স্ত্রীর বা পুত্রের একটু অসুখ হলে মুখখানা যেন একেবারে আমসির মত হয়ে যায়। স্ত্রী-পুত্র ম'রে গেল—তোমার তাতে কী? কে স্ত্রী—কে পুত্র? তোমার কোন্ কাজে তারা আসবে? স্ত্রী মরে গেলে অনেকে তার বুকের উপর পড়ে কাঁদতে থাকে—তাতে কী ফল হয়?…

নীরবে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া রহিলেন ব্রহ্মচারিজী। তাঁহার প্রশ্নগুলি রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল যেন। তাঁহার মহামূল্য উপদেশ ক্ষণে ক্ষণে সকলের অন্তর স্পর্শ করিতে লাগিল। পুনরায় ব্রহ্মচারিজী বলিতে লাগিলেন: অন্নদা সাধন গ্রহণ করেই এদিকটা

এত দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিল, এই দিকের সঙ্গে এমন গাঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কারো দেখা যায় না। মাত্র তুই কি আড়াই বছর তার সাধন হয়েছিল। সাধনের দিন থেকেই তার এই দিকটা একেবারে খুলে গিয়েছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সমস্ত কাজ ঠাকুরের জন্য নিয়োজিত করেছিল। এই কয়দিন নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ করে চলে গেল। আজ সে একেবারে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁচেছে। একবার ভেবে দেখ তার পরণের কত দামী পোষাক, শয্যা, সংসারের সমস্ত জিনিষ, আর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই এখানে পড়ে রইল—আর সে কোন্ অচেনা, অজানা জায়গায় চলে গিয়েছে।

পরলোকে সেই অজানা রাজ্যের দিকেই বুঝি শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন ব্রহ্মচারিজী। অন্নদা চরণের মুক্ত আত্মার উদ্দেশে বর্ষিত হইতে লাগিল তাঁহার অক্ষয় আশীর্বাদ।

ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তার মৃতদেহে কখন অগ্নিসংস্কার করা হয়েছে ?

বীরেশ্বর ঃ সোয়া বারোটায় দেহত্যাগ হয়েছে, চিতা জ্বালানো হয়েছে সাড়ে তিনটায়।

ঃ ভাল হয়েছে।···সাড়ে সাত দণ্ড অর্থাৎ এক প্রহর পরে দেহে অগ্নিসংস্কার করা বিধি। মৃত্যুর ঠিক পরেই আত্মা দেহের খুব নিকট দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেহের উপর বেশী টান থাকলে ঐ সময়ের মধ্যে আবার দেহে প্রবেশও করতে পারে। এজন্যে ঐ সময়টা দেখে অগ্নি-সংস্কার করা বিধি। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পরেও দেহে জীবন সঞ্চার হয়। কিন্তু প্রায়ই আত্মা দেহ ছেড়ে গেলে ঐ জড়, ক্লেশকর দেহকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। বিশেষতঃ যখন মুখে আগুন দেওয়া হয় তখন দেহের উপর আরও ঘৃণা হয়, তার মধ্যে আর প্রবেশ করবার ইচ্ছা থাকে না। দেহের শোচনীয় পরিণাম দেখে বীতরাগ দেখা দেয়—আত্মা শান্তিময় স্থান খুঁজতে থাকে। তখন পিতৃপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণ তাকে পিতৃলোকে নিয়ে গিয়ে সাধন-ভজন করাতে থাকেন। ঐ অবস্থায়

আত্মা কিছুদিন নিমগ্ন থাকলে পুত্র কন্যাদের প্রদত্ত পিণ্ড ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি দৃষ্টি দ্বারাই ভোগ করে তৃপ্তিলাভ করে। পরে পিতৃপুরুষের সঙ্গে এক বৎসর প্রেত হয়ে থাকে। সপিণ্ডকরণ শেষ হলে বিচারের জন্য যমলোকে উপস্থিত হয়।···দেহে অবস্থানের সময় প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তের যা কিছু শুভ-অশুভ চিন্তা-কর্ম, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস, ছোট বড় সমুদয় কর্মের একটা ফলক ললাটে আঁকা হয়ে যায়—তার কিছুই নষ্ট হয় না। গ্রামোফোন রেকর্ডের মত ললাটের ঐ কর্ম-ফলক বা রেকর্ড দৃষ্টে তার বিচার হয়। তখন কর্মফল অনুযায়ী পুনর্জন্ম হয়, যার যেরূপ কর্ম তার সেইরূপ জন্ম হয়।

ঃ বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই কি পুনর্জন্ম হয়ে থাকে?

ঃ না, সকলের পক্ষে তা হয় না। সৌভাগ্যবান্ পুরুষ 'তৃণ জলৌকা বৎ' অর্থাৎ ছিনা জেঁাকের ন্যায় তখনই জন্ম নেয়—যেমন ছিনা জেঁাক একদিকের অবলম্বন ছেড়ে দিয়েই অন্যদিকের অবলম্বন পায়, তেমনি বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ঐদিকের অবলম্বন ছেড়ে দেওয়া মাত্রই আবার জন্ম হয়। নতুবা কতকাল যে পরলোকে ঘুরে বেড়াতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। কেউ হয়ত বয়েল হয়ে জন্মে কলকাতার রাস্তায় গাড়ী টানে, কেউ বা ধনী কিংবা রাজপুত্র হ'য়ে জন্মায়।

ঃ নরকভোগ কি এই পৃথিবীতেই হয়ে থাকে—না, যমলোকে হয়?

ঃ না পরে—এখানে আর কী হয়? যমলোকে বিচারের পর স্বর্গ বা নরক ভোগ হয়। ঋষিরা স্বর্গ ও নরকের যে সব বর্ণনা দিয়েছেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য—কিছুই মিথ্যা, কল্পনা বা অতিরঞ্জিত নয়।···সদ্‌গতি লাভ করতে হলে গীতায় যেরূপ আছে সেইভাবে হওয়া চাই ঃ

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্‌দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥"

ভগবানের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই—শুধু ইষ্টনাম জপ করলেই হবে না। 'ওঁ ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ যার যে ইষ্টনাম। ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত, হৃদয়কমল নিরুদ্ধ ও ভ্রূ মধ্যে সন্নিবেশিত করে ওঁ এই একাক্ষর কেবল উচ্চারণ করলেই হবে না—'মামনুস্মরণ্' হওয়া চাই, তাঁকে স্মরণ করা চাই। সম্বন্ধ স্থাপন না হলে যথার্থ স্মরণ হয় না।

ইষ্টনাম জপ কর এবং আমাকে স্মরণ কর—এই উপদেশ শ্রীভগবান অর্জুনকে দিয়েছিলেন। যে ইষ্টনামের এত ফল, তাও ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না হলে বিফল হয়ে যায়। জীবদ্দশায় এই সম্বন্ধ করতে পারলে, প্রতি কার্যে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করলে, মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে স্মরণ হয়। মৃত্যুর তো আর অবধারিত কাল নেই। ভগবদুদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোন কার্যই সফল হয় না। দেহত্যাগ সময়ে তাঁর স্মরণ হলেই সদ্‌গতি হয়—নতুবা শুধু নামজপেও ফল হয় না।

ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করাই যখন মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন সমুদয় কার্যই ভগবদুদ্দেশ্যে করতে হয়। কার্যসকল বিশৃঙ্খলভাবে না করে সরু তারে বেঁধে রাখবার মত ভগবানের সঙ্গে যোগ রেখে করতে হয়।

তোমাদের ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রমের ফল সমুদয় কার্যই সংসারের জন্য ন্যস্ত করে থাক। স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে ব্যয়, তাই কেবল সার্থক মনে কর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলও ভগবদুদ্দেশ্যে ব্যয় করলে তা নিতান্ত বাজে ব্যয় বলে মনে হয়। কিন্তু প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টার ফলও ভগবদুদ্দেশ্যে ব্যয় করলে একটা সম্বন্ধ স্থাপন হয়—তা কয়জন করে? প্রতিদিন গরীব দুঃখীকে একটী দুটী কি চারটী পয়সা দিলে কিছুই আসে যায় না—সাধনের সময়কার একটী উপদেশও পালন করা হয়। তাই বা কয়জনে করে থাকে? কিছু দয়ার কাজ, অন্ততঃ একটী পয়সা দান না করলে যে সেই দিনটা বৃথা যায়—সম্বন্ধ স্থাপন হবে কি করে? সংসারের জন্য, স্ত্রী-পুত্রের সুখের জন্য কত সময় কত পয়সা অনর্থক ব্যয় হয় তা মনে হয় না; ভগবদুদ্দেশ্যে একটী পয়সা ব্যয় করবার সময় যত বিচারবুদ্ধি আসে। হিসাব করে কাজ করতে গেলে তা আর হয় না। ভাল কাজ করবার প্রবৃত্তি যখন আসে, তখনই তা করে ফেলতে হয়। তখন অর্থের অভাবের কথা ভাবতে গিয়ে হিসাব করতে গেলে সেই শুভ মুহূর্ত হারাতে হয়। বিনা বিচারে তখনই তা করে ফেলতে হয়, শেষে যা হয় হবে। আমাদের একটী গুরুভাই আট-দশ হাজার টাকা দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে দিনপাত কচ্ছিলেন। গোসাঁই যখন পুরীতে অনেক টাকা দেনা করে

সমুদয় দান করে ফেললেন, তখন তাঁকে দেনার দায় হতে মুক্তি দিবার জন্য চারিদিকে চিঠি লেখা হ'ল। গুরুভাইটী তা শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্পত্তি বিক্রয় করে ৩০০০৲ টাকা পাঠাতে প্রস্তুত হলেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র যথেষ্ট বাধা দিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। বললেন— এতকাল তো নিজের বোঝা বয়ে গেলাম, গুরুদেবের যদি সামান্য একটু বোঝাও লাঘব করতে পারি, তাহলে জীবন সার্থক হবে। এই বলে তিনি কোন বাধা না মেনে ৩০০০৲ টাকা দিয়ে দিলেন। শেষে তাঁর সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গেল। কেউ কেউ নিজে না খেয়েও অর্থ সঞ্চয় করে সুখ পায়। আমার এত অর্থ আছে কেবল এই কথা ভাবতেই সুখ। অর্থের অভাব থাকলে যে ভাল কাজ করা যায় না তা ঠিক নয়—জীবন ধারণের জন্য অর্থের অভাব হয় না। ভোগবিলাসের অভাবই অভাব মনে হয়।

গয়ার পাহাড়ে একদিন একজন বড়লোক গোয়ালা একজন সাধুর কাছে এসে কেঁদে পড়ল। জানাল—তার সর্বনাশ হয়েছে, তালুক-মুলুক সব নিলাম হয়ে গেছে। সান্ত্বনা দিবার পর সাধু জিজ্ঞেস করে জানলেন—ছয় মাস তার এই সর্বনাশ হয়েছে, কিন্তু ডাল, রুটি, তরকারি রোজই খেয়ে আসছে। তখন সাধু বললেন: তব তুম্‌কো ক্যা হুয়া? খানা তো মিল যাতা হ্যায়—আউর ক্যা মাঙ্গতা হ্যায়? ··

ধর্মজীবন যাপনের পক্ষে বেশী অর্থ থাকা একটী বিশেষ অন্তরায়। কোন প্রকারে দিনপাত হওয়ার মত অর্থ থাকলেই যথেষ্ট। একবার অর্থে স্পৃহা জন্মালে তার আর শেষ নেই। শত টাকা হলে সহস্র চায়, সহস্র হলে লক্ষ চায়, 'লক্ষাধিক স্তথারাজ্যং'। আকাঙ্খার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না; দিনরাত জাল-জুয়াচুরি করে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য দারুণ পরিশ্রম করে, কিন্তু কিছুতেই তার শান্তি হয় না। সাধুরা যে বলেন কামিনী-কাঞ্চন উভয়ই ত্যাগ করা দরকার, তা একেবারে ঠিক। কামিনী-কাঞ্চনে স্পৃহা থাকতে কিছুতেই ধর্মলাভ হয় না; কামিনীর স্পৃহা অপেক্ষা কাঞ্চনের স্পৃহাও কম ক্ষতিকর নয়। একবার গোসাঁইকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কামিনী বা কাঞ্চন, কার স্পৃহা

বেশী ক্ষতিকর ? গোসাঁই বলেছিলেন—কাঞ্চনের স্পৃহা ; কারণ কামিনীর স্পৃহা ভোগ করতে করতে শান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কাঞ্চনের স্পৃহার কিছুতেই শান্তি হয় না।

ক্ষণকাল নীরব হইলেন ব্রহ্মচারিজী। পুনরায় বলিলেন : অন্নদার ভগবৎ উদ্দেশ্যে খরচের তুলনা নেই। ধার করে পর্যন্ত কুণ্ঠাহীনভাবে খরচ করত, কার কী অভাব আছে বুঝে তা পূরণ করত। দান, পরোপকার ইত্যাদি নীরবে করে যেত—কাকেও জানতে দিত না। আমাকে কখনও কোন জিনিষ দিতে এলে দেখতাম তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে—সর্বদাই ভয় হত পাছে আমি গ্রহণ না করি, গ্রহণ করলে কী আনন্দই হ'ত! শুধু গ্রহণেই তার আনন্দ—এই তো চাই। এই যে তার বাড়ীতে বৈঠক হ'ত, তাতে প্রাণ ঢেলে দিয়ে খরচ করত। সাধন নেওয়ার পর থেকে সমানভাবে ভগবৎ উদ্দেশ্যে খরচ করেছে, অন্য কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বোধ হয় কিছু ধারও আছে। অনেকবার আমাকে বলেছিল চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ; আমি কত ব'লে সেই সংকল্প থেকে বিচ্যুত করেছি।

জিতেন্দ্র : তাঁর মা এখনও আছেন। বৃদ্ধার কষ্টের সীমা নেই।

: তার আর কী হবে। যমের সঙ্গে তো কোন চুক্তি নেই যে, মা আগে যাবে ছেলে পরে যাবে। স্ত্রীপুত্র-মাতা কেউ কিছু নয়, নিজের কাজই করে যেতে হয়। সাধন নিলেই তো হয় না—সাধনের কাজ করতে হয়, তা না হ'লে কিছুই হয় না।···

এতক্ষণে একেবারে নীরব হইলেন ব্রহ্মচারিজী। স্থির আয়ত দৃষ্টি তখনও সুদূর প্রসারিত—সেইসঙ্গে তাঁহার অন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে লোক-লোকান্তরে। যেন এ জগতের কেহ নন তিনি!···

সময় সময় রঙ্গরসে সকলকে আমোদিত করিলেও হাসি গল্পে কমই যোগদান করিতেন ব্রহ্মচারিজী। স্বভাবতই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, সদাগম্ভীর—নীলকণ্ঠেরই জীবন্ত ভাষ্য। একসঙ্গে তাঁহাকে এতক্ষণ এত কথা বলিতে বড় একটা শোনা যায় নাই। কিন্তু লোকান্তরিত পুণ্যাত্মা অন্নদাচরণের গুরুনিষ্ঠায় এবং অন্যান্য শিষ্যবৃন্দের কল্যাণ কামনায় আজ

শতধারে বর্ষিত হইল স্নিগ্ধ প্রস্রবণ,···আর রহিয়া রহিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল তাঁহার সেই মহামূল্য অমৃতময় বাণী।···

কার্তিক মাস। কিছুদিন মির্জাপুর ষ্ট্রীটে জিতেন্দ্র মোদক মহাশয়ের বাড়ীতে রহিলেন ব্রহ্মচারিজী। বৈঠকে সকলের যোগদান সম্পর্কে কঠোর নির্দেশ দিলেন। নিয়ম করিলেন—বৈঠকে অনুপস্থিত হইলে দুই আনা জরিমানা দিতে হইবে।

১৬ই নভেম্বর। জিতেন্দ্রনাথের বাড়ীতে বৈঠকের বন্দোবস্ত হইল। বৈঠকে সকলের সঙ্গে বসিলেন ব্রহ্মচারিজী। বৈঠকের নূতন প্রণালী দেখাইয়া দিলেন। পূর্বে নিয়ম ছিল ৪৫ মিনিট প্রাণায়াম ও ১৫ মিনিট নাম। নূতন প্রণালী হইল—প্রথমে পাঁচ মিনিট নাম ও ২০ মিনিট সহজ প্রাণায়াম, পরে ৫ মিনিট নাম ও ১৫ মিনিট অর্ধকুম্ভক যোগে প্রাণায়াম, তৎপরে ৫ মিনিট নাম ও ৫ মিনিট পূর্ণ কুম্ভক যোগে প্রাণায়াম এবং সর্বশেষে ৫ মিনিট নাম সাধন।

এই প্রণালী দেখাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারিজী বলিলেন: একেবারে স্থির হয়ে আসনে বসে নাম করতে হবে—হাত-পা বা শরীরের কোন অঙ্গ নড়বে না, শরীর নড়লে মনঃসংযোগ হবে না। খুব বড় পুষ্করিণী যখন স্থিরভাবে থাকে, তখন সামান্য একটা ঢিল ফেললেও সমস্ত জল আলোড়িত হয়। তেমনি স্থির হয়ে আসনে বসলে শরীরের বায়ু সাম্য অবস্থায় থাকে। একটু নড়া-চড়া করলেই বায়ু বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, মনঃসংযোগ হয় না।

নাম করিতে জনৈক শিষ্যের দেহ কম্পিত হইতেছিল। তাহাকে ধমক দিলেন ব্রহ্মচারিজী।

শিষ্যটী বলিলেন: কিছুতেই যে কাঁপুনি থামাতে পাচ্ছিনে।

: ওটা এক রকম ব্যাধি। ইচ্ছা করলেই থামাতে পারবে।

এইভাবে বাস্তব শিক্ষা দিতেন ব্রহ্মচারিজী।

অন্নদাচরণের দেহরক্ষার পর জিতেন্দ্রশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে ভবানী-পুরেও বৈঠক চলিতে লাগিল। ইহাতে খুব উৎসাহ দিলেন ব্রহ্মচারিজী।

শিষ্যদের আত্মোন্নতি ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্ধনের দিকে ছিল তাঁহার সজাগ দৃষ্টি। বৈঠকে সকলের নিয়মিত উপস্থিতির তাগিদ এইজন্যই।

অতঃপর ব্রহ্মচারিজী রওনা হইলেন পুরীধামে।

সেখানে অবস্থান করিলেন মাঘ মাস পর্যন্ত। ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক কমলাকান্তের সুযোগ্য ক্ষণজন্মা নন্দন নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। শিরায় শিরায় প্রবাহিত তন্ত্রসাধনার অদৃশ্য শক্তি। অধিকন্তু এখন তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত—সাধনা ও শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তাই এতদিনে বুঝি শক্তিময়ী কামাখ্যাদেবীর প্রতি প্রাণে জাগিল অনুরাগ। কামাখ্যা দর্শন মানসে তিনি রওনা হইলেন গৌহাটি।

কয়েকজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের চেষ্টায় ও যত্নে গৌহাটিবাস আশাতীতভাবে আনন্দদায়ক হইল। গৌহাটি উপস্থিত হইয়াই মায়ের বাড়ী গেলেন ব্রহ্মচারিজী। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পর্বত-শিখরে মায়ের মন্দির, গিরিরাজের উন্নত শীর্ষে যেন সমুজ্জ্বল মুকুটমণি। অপর পারে পাহাড়ের উপর তেমনি সুন্দর বিষ্ণুমন্দির। একদিকে অবিরাম ছাগবলির শব্দের সহিত তান্ত্রিকের কণ্ঠে ধ্বনিত জগজ্জননীর জয়ধ্বনি, অপরদিকে বৈষ্ণবভাবের মাঝে ভক্তবৃন্দের হরিধ্বনি—আর ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত উমানন্দ শিব। কী মধুর ভাব,···কী অপূর্ব দৃশ্য।···কালিকীর্তন ও হরিকীর্তনের সমন্বয়ে মুখরিত আকাশ বাতাস—তারই মাঝে উমানন্দ পরমানন্দে নিমগ্ন।···

অপার্থিব ভাবসমৃদ্ধ অপরূপ সৌন্দর্যরাশির দিকে অপলকে তাকাইয়া রহিলেন ঠাকুর কুলদানন্দ। ভাবাবেশে তাঁহার স্থির আয়ত আঁখি কোণে ফুটিয়া উঠিল অশ্রুবিন্দু। সদাশিব উমানন্দের সঙ্গে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর দিব্য জীবনের মধুর সামঞ্জস্য যেন—সিদ্ধ তান্ত্রিক-নন্দন তিনি, অথচ পরম বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণের মানসপুত্র। আপন জীবনে শাক্ত-বৈষ্ণবের লোকাতীত সমাবেশ,···আজ কামাখ্যায় আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন স্বীয় জীবনের সেই বিস্ময়কর প্রতিচ্ছবি। উমানন্দের উদার, প্রশান্ত, অসাম্প্রদায়িক ভাবমাধুর্যে তিনি লাভ করিলেন অপার আনন্দ।

এখানে পাণ্ডাদের সহৃদয় আতিথ্যপূর্ণ আচরণেও খুশী হইলেন ব্রহ্মচারিজী।

গৌহাটি হইতে তিনি শিলং গমন করিলেন। জনৈক শিষ্য একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। বাড়ীখানি মনোমত নয় বলিয়া কয়েকদিন পরে লাবান অঞ্চলে আর একখানি সুন্দর বাড়ী লওয়া হইল।

ঠাকুরের আগমনে সাড়া পড়িয়া গেল সমস্ত সহরে। নয়নাভিরাম শিলং-এর হাটবাজারে মেয়েদের রাজত্ব—ঠাকুরের বাজার সরকারকে বাজারের সেরা জিনিষ অল্প মূল্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল ধর্মপ্রাণ নারী বিক্রেতারা। এত বাজার, এত জিনিষপত্র যায় কোথায়—কাহার জন্য ?···সন্ধান লইল কৌতুহলী জনতা। সঙ্গে সঙ্গে সাধু দর্শনের আকুল আগ্রহ লইয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিল পাহাড়িয়া ও সাধারণ শ্রেণীর নরনারী। শ্রদ্ধাপ্লুত চোখে মুখে তাহাদের সে কী আকুলি-বিকুলি। উদ্বেল হইয়া উঠিল ঠাকুরের অন্তর, ছলছল চোখে সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিলেন।

শিলং হইতে আট মাইল দূরে রাজবাড়ী। বার্ষিক রাজ্যাভিষেক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইলেন ব্রহ্মচারিজী। রাজপ্রাসাদে সশিষ্যে উপস্থিত হইলেন কাঙালের ঠাকুর—শিরে আভূমিলম্বিত জটাজাল, উন্নত ললাটে বিচিত্র তিলকরেখা, বক্ষে সপ্তলহরী মালারাশি, তপ্তকাঞ্চন শ্রীঅঙ্গে পীত বহির্বসন।···হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল বিরাট জনতা—তাঁহার দুনয়নে কী অপূর্ব দ্যুতি···কী অনন্ত করুণা। কৈলাস হইতে তবে কি এতদিনে সত্যই আবির্ভূত স্বয়ং নীলকণ্ঠ !···

প্রথম চমক কাটিয়া গেল, বিস্ময় রূপান্তরিত হইল অভিনব আনন্দে। নিমেষে ঘুচিয়া গেল সমস্ত ভেদাভেদ, মান-অভিমান—এখানে যে সবাই সমান, সকলেই যে ঐ প্রাণের ঠাকুরের অধম সন্তান।···নর-নারী, রাজা-প্রজা, শিশু-বৃদ্ধ আজ যেন মন্ত্রমুগ্ধ···এক অব্যক্ত আনন্দে সেই বিরাট নীথর জনতা একযোগে মত্ত হইল নৃত্য ও সঙ্গীতে। মনে হইল এ অভিষেক যেন রাজার নয়, ঐ সর্বেশ্বর অথচ সর্বত্যাগী ভিখারী রাজার।···

॥ চৌদ্দ ॥

বৈশাখ, ১৩৩৩। জলবাতাসের গুণে স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইল। দুই মাস পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়। অল্প কিছুদিন পরে আবার রওনা হইলেন পুরীধাম।

ভগবান গোসাঁইজীর তিরোভাব ও আবির্ভাব উৎসব সম্পন্ন হইল। ঠাকুর কলিকাতায় ফিরিলেন শ্রাবণ মাসে।

একদিন অপরাহ্নে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুচরণে প্রণত হইলেন গুরুভ্রাতা বগলাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে স্মৃতি শাস্ত্র পাঠ করিবার উপদেশ দিলেন গুরুদেব। বলিলেনঃ প্রাতঃকাল থেকে শয়নকাল পর্যন্ত আমরা যেসব কাজ করি, সবই শাস্ত্রের নির্দেশ মত করতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে তার ব্যবস্থা আছে। প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে শৌচ, দন্তধাবন, স্নান, আহ্নিক, আহার, সাংসারিক কাজ, ব্যায়াম, ভ্রমণ, বিহার সমস্ত কাজ শাস্ত্রশাসন জ্ঞানে করতে হয়। এমনকি তোমরা যে চাকরী করছ তাও সাধনের বাইরে নয়, বাজে কাজ নয়।

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্বমদর্পণম্॥"

গীতার মহামূল্য উপদেশ—সব সময় সর্বকাজে মনে রেখ।

ভাদ্র মাস। শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন মৈমনসিং জেলার ডাক্তার, তাঁহার অন্তরে সদ্‌গুরুলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ গ্রন্থপাঠে এবং ব্রহ্মচারী মহারাজের অপূর্ব চিত্র দর্শনে মনেপ্রাণে অনুভব করেন গভীর আকর্ষণ—পত্রযোগে তিনি দীক্ষালাভের প্রার্থনা জানান। তখন ১২ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন ব্রহ্মচারিজী; তাঁহার নিকট ১২ই ভাদ্র তারিখে দীক্ষালাভ করেন অক্ষয় কুমার। দীক্ষার আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় সাধন প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন সাক্ষাৎ মহাদেবের অপরূপ রূপজ্যোতি দর্শনলাভে মন্ত্রমুগ্ধ।···পরক্ষণে মনে হইল, শ্রীগুরুদেবের উন্নত ললাট হইতে একটী প্রদীপ্ত জ্যোতিশিখা বিকীর্ণ হইয়া নিপতিত হইল তাঁহার

নিজ দেহে—অমনি তিনি কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রবল আকর্ষণে শ্রীগুরুর দেবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।···সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইল—বহুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া মনে হইল যেন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রতি শিরা উপশিরায় প্রবাহিত; আর বিপুল নামানন্দে তিনি নিমজ্জিত।···নবজন্ম লাভ করিয়া তিনি কৃতকৃতার্থ। অতঃপর কোন যুবতীর দিকে চাহিলেই সবেগে চলিত সতেজ নাম প্রবাহ! আর চিকিৎসার্থে বা কোন কারণে কোন তরুণীকে স্পর্শ করিতে হইলে দেহমনে দেখা দিত অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া—উষ্ণ নাভি-মূল হইতে চক্রাকারে উত্থিত হইত গোলাকার জ্যোতির্ময় পদার্থ,··· তাঁহার দেহে প্রবেশ করিত যেন তপ্ত লৌহশলাকা।···এইভাবে তিনি উপলব্ধি করেন শ্রীগুরুর শক্তি সঞ্চারের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।···

ইদানীং বৎসরের অধিকাংশ সময় ব্রহ্মচারিজী অবস্থান করিতেন পুরী, কলিকাতা ও চন্দননগরে। এই সময়ে পুনরায় দৈহিক দুর্বলতা অনুভব করায় আশ্বিনের প্রথমে কালিম্পং গমন করেন। কালিম্পং তিব্বতের সূচনা—তিব্বতী লামা সন্ন্যাসীদের কথা কতবার গোসাঁইজীর নিকট শুনিয়াছেন। তিব্বতের সিদ্ধকাম বৌদ্ধ যাজকদের সঙ্গে এইবার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগলাভ করেন। গগনচুম্বী হিমালয়ের মনোহর দৃশ্যাবলী ও স্নিগ্ধ শীতল বায়ু রুগ্নদেহে সঞ্চারিত করিল নব শক্তি, লামা সন্ন্যাসীদের সুমধুর আচরণে মনে জাগিল নূতন উৎসাহ। তিব্বতী লামা সন্ন্যাসীদের তপস্যাবিধি অতি কঠোর—তাঁহাদের লক্ষ্য 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।' কালিম্পংয়ে এই প্রকার অনেক একনিষ্ঠ সাধকদের পরিচয় লাভে আনন্দিত হন ব্রহ্মচারিজী।

শারদীয়া মহাপূজা। চন্দননগরে মহাষ্টমীতে সশিষ্যে মহাহোম সুসম্পন্ন করিলেন ঠাকুর কুলদানন্দ। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় সকলে সানন্দে ভক্তি সহকারে প্রণত হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে। ঠাকুরও দিব্য আনন্দে সকলের কপালে আঁকিয়া দিলেন চন্দন-রেখা, হস্তে দিলেন মহাপ্রসাদ—ধন্য হইলেন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী।

পূজার পর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ব্রহ্মচারিজী।

২রা অগ্রহায়ণ, বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী। ঠাকুরের পুণ্য জন্মতিথি। আশুতোষ পালের বাড়ীতে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। ঠাকুরের সম্মুখে 'রূপ' কীর্তন করিলেন বিজয়চন্দ্র, ঠাকুর নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে পুষ্পচন্দনে সজ্জিত করা হইল—চন্দন-চর্চিত, পুষ্পসাজে সুসজ্জিত নীলকণ্ঠের সে কী অপরূপ শোভা! একে একে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন; সকলের ললাটে চন্দন ও হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

ইহাই ঠাকুর কুলদানন্দের প্রথম আবির্ভাব তিথি উৎসব। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসর এই জন্মোৎসব গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে পালিত হইয়া আসিতেছে।

কিছুদিন পরে তিনি চলিয়া গেলেন পুরীধামে।

ফাল্গুন মাস। শিবরাত্রি ব্রত উপলক্ষে ব্রহ্মচারিজী এবার আসিলেন ভুবনেশ্বর আশ্রমে—শিবস্থানে থাকিয়া রাত্রির চারি প্রহরে বিধিমত শিবের পূজা ও ব্রত পালন করিলেন। কলিকাতা হইতেও কেহ কেহ গিয়া এই উপলক্ষে যোগদান করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন পুরীধামে।

দোল উৎসব উপলক্ষে পুরী গিয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন জিতেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্র পাল মহাশয়।

মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল দোল উৎসব। জিতেন্দ্রনাথের বাড়ীর তেতলার ছাদে সন্ধ্যার পর সমবেত হইলেন প্রায় পাঁচশত গুরুভ্রাতা, আবির মাখিয়া লাল হইয়া গেলেন সকলে। বিজয়চন্দ্র আরম্ভ করিলেন দোলের কীর্তন—কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিলেন ঠাকুর। শেষে এক একবার আসন ছাড়িয়া সকলের গায়ে আবির ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, আর চক্ষু বুজিয়া বলিতে লাগিলেন: হরিবোল—হরিবোল।···চতুর্দিকে সকলে লালে লাল—মধ্যমণি শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবেশে অভিভূত।···বড় চমৎকার সেই দৃশ্য।···কীর্তনান্তে মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন সকলে।

জিতেন্দ্রনাথের তেতলার ঘরে আসনে কুলদানন্দজী উপবিষ্ট। সম্মুখে বসিয়া আলাপ করিতেছেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, বিশেষতঃ পূর্বকালে জল ও জলাশয়ের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলিতেছিলেন। আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সানন্দে বলিলেন ঠাকুর ঃ স্বাস্থ্যের জন্যই 'জলচল' বলে একটা কথা আছে। জল শুদ্ধ না হলে শরীর সুস্থ হতে পারে না। আমাদের দেশে সুন্দর নিয়ম কানুন ছিল, সেই সব পালন করলে আর সহজে অসুখ বিসুখ হ'তে পারে না। সে সব পাশ্চাত্যের লোকেরা কল্পনাও করতে পারে না। ধর একাগ্রতা সাধন শিখাবার কথা। দ্রোণাচার্য সকলকে বৃক্ষের উপর পাখীর চক্ষু বিদ্ধ করতে আদেশ দিলেন; একে একে জিজ্ঞাসা করলেন—কে কী দেখছেন। সকলে পাখীর এক এক অংশের কথা বললেন। শেষে অর্জুন উত্তর দিলেন তিনি পাখীর কেবলমাত্র চক্ষুটী দেখছেন। তখন দ্রোণাচার্য বললেন, একেই বলে প্রকৃত একাগ্রতা। এমনি একাগ্রতা সাধন কি আর কেউ কখনও কোন দেশে শুনেছে? গোসাঁইয়ের মুখে শুনেছি, তিনি যখন স্থির হয়ে নাম করতে বসতেন তখন শিরায় শিরায় রক্ত চলাচলের কল্‌কল্‌ শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেতেন। আমি অবশ্য অতদূর বলতে পারিনে, তবে স্থির হয়ে বসলে শরীরের ভিতরের বায়ু ঝড়ের মত যে বইতে থাকে, সে সাক্ষ্য দিতে পারি।···তখন এমন অস্বস্তি বোধ হয় যে কুম্ভক না করে থাকা যায় না। এমনি একাগ্রতা সাধনে দৃষ্টিশক্তিও অনেক পরিষ্কার হয়। একদিন গোসাঁই পড়বার জন্য চশমা চাইলেন। আমি বললাম—আপনার চশমার দরকার হয়? গোসাঁই বললেন—চশমা এমনি রাখি, তবে ঐ বহুদূরে যে নারকেল গাছ দেখছ তাতে পিঁপড়ার সারি আমি দেখতে পাচ্ছি। ঐ পিঁপড়ার মুখে যে সাদা সাদা চিনি আছে তাও আমি দেখছি।···

হতবাক হইয়া এই অপূর্ব কথা শুনিলেন সকলে। ঠাকুর চাহিয়া রহিলেন অপলকে আনমনে—হয়ত বা চিরসাথী, জীবন দেবতা ভগবান গোস্বামী প্রভুর দিকে।···

বৎসরের প্রথম ভাগে গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি উৎসবে পুরীধাম গমন করিতেন ব্রহ্মচারিজী। সেখানে জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি দর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতেন শ্রাবণ মাসের প্রথমে। গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব তিথি উৎসব বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষেও কোন কোন বৎসর যোগদান করিতেন। অতঃপর শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে গমন করিতেন চন্দননগর আশ্রমে, মহাষ্টমীতে সুসম্পন্ন করিতেন মহাহোমের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। উহা দর্শন করিবার জন্য বহু লোক সমাগম হইত এবং গুরু মহারাজের জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া মহানন্দে সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। বিজয়া দশমীতে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে শিষ্য-শিষ্যাগণ ছুটিয়া আসিতেন চন্দন-নগরে, ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলে সকলকে গভীর স্নেহে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন দিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর। রাস পূর্ণিমার পূর্বদিন পুণ্য বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে কলিকাতায় তাঁহার আবির্ভাব তিথি উৎসব আরম্ভ হইলে শিষ্যবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া তিনি সকলের আনন্দবর্ধন করিতেন। বৎসরের শেষে সশিষ্যে শিবরাত্রি ব্রত ও দোল উৎসব পালন করিতেন এবং নানা ধর্মানুষ্ঠানে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন শিষ্য-শিষ্যাদের।

বৎসরের মধ্যে ইহাই ছিল ব্রহ্মচারিজীর প্রধান অনুষ্ঠান সূচী। কিন্তু তাঁহার শরীব ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ইতিপূর্বে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বোটে করিয়া পদ্মা নদীতে ভ্রমণ করেন এবং গৌহাটি, শিলং প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সাময়িকভাবে তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতিও হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য সকলে পুনরায় বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। সেই সঙ্গে ব্রহ্মচারিজীর তীর্থভ্রমণের ইচ্ছাও প্রবল হইয়া উঠিল। আপাততঃ দোল উৎসবের পরই তিনি পুরীধাম গমন করিলেন।

প্রথমে স্থির হইল শ্রীশ্রীঠাকুর এবার সশিষ্যে গমন করিবেন হরিদ্বার কুম্ভমেলায়। সেইমত ব্যবস্থাও একরূপ হইয়া গেল। কিন্তু এত ভীড়

যে ভাল বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল না; বিশেষত প্রকৃত সাধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনাও কম মনে হইল। কাজেই নাসিক যাইবার সংকল্প করিলেন ব্রহ্মচারিজী; গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ এই ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি কলিকাতায় জিতেন্দ্রনাথকে চিঠি দিলেন: আমার নাসিক যাওয়ার খুব ইচ্ছা। যদি যতীন পালের মত কোন ধনী লোক ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমাকে নাসিক লইয়া যাইতে পারে।

সেই চিঠি পাওয়ার পূর্বেই তাহার পরদিন পুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন জিতেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্র পাল মহাশয়। যতীন্দ্র পাল স্বপ্ন দেখেন শ্রীগুরু তাঁহাকে ডাকিতেছেন—ফলে কোন সংবাদ না পাইলেও তাঁহারা পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়। যতীনদাদা নাসিক যাওয়ার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিলেন—নাসিক, এলাহাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি সর্বত্র টেলিগ্রামও করিয়া দিলেন।

কেহ কেহ ভয় দেখাইল নাসিকে এখন ভয়ানক গরম। কিন্তু ডাঃ হরিশচন্দ্রের ছোট ভাই ক্ষিতীশ সেন মহাশয় ছিলেন নাসিকের জজ—সম্প্রতি ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে নাসিকে যাইবার উৎসাহ দিয়া বলিলেন—নাসিকে গরম বেশী হইলেও সেখানে একটি উপত্যকা আছে, তাহার আশে-পাশে বেশ ঠাণ্ডা। অতএব এলাহাবাদ হইয়া নাসিকে যাওয়াই স্থির হইল।

২৩শে মার্চ—বেলা ১॥ ঘটিকা। হাওড়া হইতে যাত্রা করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী যতিন পালের উদ্যোগে একটী ফার্ষ্ট ক্লাস, দুইটী সেকেণ্ড ক্লাস ও একখানি থার্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করিয়া বোম্বে মেলে রওনা হইলেন। সঙ্গে রহিলেন সস্ত্রীক যতীন্দ্র পাল, আশুতোষ পাল, মহানন্দ নন্দী, কালিদাস বিশ্বাস প্রভৃতি প্রায় ছত্রিশ জন শিষ্যশিষ্যা।

প্রথমে প্রয়াগধামে গিয়া একটী প্রকাণ্ড ধর্মশালায় উঠিলেন। তিন দিন এখানে থাকিয়া তীর্থ পাণ্ডার সাহায্যে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে

স্নান ও দেবালয়াদি দর্শন যথানিয়মে সম্পন্ন করা হইল। তীর্থের কার্যাদি সম্বন্ধে যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, সেদিকে ব্রহ্মচারিজীর সজাগ দৃষ্টি।···মেয়েদের মধ্যেও অনেকে মস্তক মুণ্ডন করিলেন—পাণ্ডাদের সর্বত্র দান করা হইল মুক্তহস্তে। শ্রাদ্ধ সময়ে ঠাকুর বলিলেন: ঐ দেখ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করতে করতে যাচ্ছেন, সকলে তোমাদের আশীর্বাদ কচ্ছেন।···প্রায় আড়াই শত ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্বক আহার করান হইল।

মাসাধিক কাল প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায় গোস্বামী প্রভুর সহিত অবস্থান করিয়া কত সাধু মহাত্মার দর্শন, কত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন কুলদানন্দ—একে একে সমস্ত মধুর স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।··· ভগবান গোসাঁইজীর ইচ্ছাতেই তাঁহার প্রিয়তম সন্তান আজ যুগের সদ্‌গুরু রূপেই সশিষ্যে সেই প্রয়াগধামে সমুপস্থিত।···

ব্রহ্মচারিজীর গুরুভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ গুহরায় তখন এলাহাবাদে ছিলেন। তিনি দেখা করিতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলেন: এই গরমের মধ্যে এতগুলি লোক নিয়ে তীর্থে বের হয়েছেন?

উত্তর দিলেন ব্রহ্মচারিজী: তুমি তো জান আমি আমার নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিনে।

সিদ্ধকাম যোগিরাজ কুলদানন্দজী যোগবিভূতির মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত; তবুও ভগবান গোসাঁইজীর প্রতি আজো তাঁহার কী অপূর্ব, সহজ সুন্দর নির্ভরতা।···

প্রয়াগ হইতে চিত্রকূট যাইবার কথা। কিন্তু পূর্বে বন্দোবস্ত না করিয়া এতগুলি লোক লইয়া যাইতে মহানন্দ প্রভৃতি ইতস্তত করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন: এমন অপূর্ব জায়গায় যাবেন না? বলেন কী?

ঠাকুর: আমার তো যাওয়ার ইচ্ছা—কিন্তু ছেলেরা বলছে সেখানে থাকবার ভাল জায়গা নেই, এতগুলি লোক নিয়ে অসুবিধে হবে—

: সেকি! আপনিই তো বললেন নিজের ইচ্ছায় কিছুই করেন না। আপনার ভিতর যিনি প্রবল ইচ্ছা দিয়েছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

গুরু-নির্ভরতায় আঘাত দেওয়ায় সোজা হইয়া বসিলেন আত্মসমাহিত নীলকণ্ঠ—মেঝেতে সজোরে তিনটি চাপড় মারিয়া বলিলেন: ঠিক বলেছ—আমি নিশ্চয়ই চিত্রকূট যাব।···

তখনই সকলকে চিত্রকূট যাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

নীলকণ্ঠের প্রদীপ্ত মূর্তির দিকে চাহিয়া কেমন জড়োসড়ো হইয়া পড়িলেন হেমেন্দ্র বাবু। বুঝিতে পারিলেন অসতর্ক মুহূর্তে অন্যায় করিয়া বসিয়াছেন।

এলাহাবাদের পাণ্ডাজীকে লইয়া সকলে রওনা হইলেন—কাট্‌নী হইয়া চিত্রকূট ষ্টেশনে পৌঁছিলেন রাত্রি বারোটায়। রাত্রে ধর্মশালায় যাওয়ার অসুবিধা, কাজেই রাত কাটিল প্লাটফরমেই। মহানন্দ দাদার ক্যাম্পখাটে দিব্যি শুইয়া পড়িলেন শ্রীগুরুদেব—উন্মুক্ত সুনীল চন্দ্রাতপ তলে যেন অনন্ত-শয্যায় শায়িত স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু। মেয়েরা গেলেন ওয়েটিং রুমের মধ্যে—আর প্লাটফরমে শ্রীগুরুর আশেপাশে রহিলেন শিষ্যবৃন্দ।

ঠাকুরের সহিত অবাধ মেলামেশার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ, নিশ্চিন্ত অবসর। বড়ই আমোদপ্রিয় যতীন্দ্র বাবু—সমস্ত রাত্রি গান গাহিয়া সকলকে দান করিলেন প্রচুর আনন্দ, ঠাকুরও বেশ উপভোগ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের নিকট দেশালাই চাহিলেন কালিদাস বাবু—শুনিতে পাইয়া ঠাকুর নিজ পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া দিলেন।···সঙ্গে সঙ্গেই ভক্ত শিষ্যেরা লজ্জায় মরিয়া গেলেন—কিন্তু পরে আনন্দে চোখে জল আসিল। শিষ্যদের সামান্য তামাক-চুরুট খাইবারও যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকেও দয়াল ঠাকুরের কত নজর।···

এমনি গভীর অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল—পূর্বাচলে হাসিয়া উঠিল উষার শুভ্র আলোক। ব্রাহ্ম মুহূর্তে সকলে ঠাকুরের উদার প্রশান্ত মূর্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। অতঃপর সকলে গিয়া পৌঁছিলেন ধর্মশালায়।

মন্দাকিনীর পূতধারায় স্নানাহ্নিক সমাপ্ত হইল। সকালে কিছু জলযোগের পর প্রায় দশটায় সকলে মন্দির ও পাহাড় দেখিতে বাহির

হইলেন। মন্দাকিনী গঙ্গা ও হনুমান ধারার পার্শ্বে চিত্রকূট পাহাড়ে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের বাসস্থান। কী সুন্দর স্থান, কী অপূর্ব তাহার দৃশ্য। পাহাড়ের চতুর্দিকে বাঁধান রাস্তা—তাহার ধারে ধারে ধ্যানগম্ভীর নানা দেবমন্দির। ব্রহ্মচারিজী অসুস্থ থাকায় তাঁহার জন্য ডুলী আনয়ন করা হইল; কিন্তু ভাবাবেশে তিনি পদব্রজেই সকলকে লইয়া চিত্রকূট পাহাড় পরিক্রমা করিলেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও কাহারও বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ নাই; সানন্দে গভীর ভক্তি সহকারে শিষ্যেরা সকলে ধ্বনি দিতে লাগিলেনঃ সীতারাম জয় সীতারাম—সীতারাম জয় সিয়াবর রাম।···সেই সঙ্গে শিষ্যারাও ঐ গান সমস্বরে গাহিয়া পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। মধ্যপথে একদল বিদ্যার্থী তাহাদের আচার্যের সঙ্গে আসিতেছিল; ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া আচার্য বলিয়া উঠিলেনঃ সাক্ষাৎ রামচন্দ্র হ্যায়—সাক্ষাৎ ভগবান রামচন্দ্র হ্যায়!···অমনি সকল বিদ্যার্থীরা ঘিরিয়া দাঁড়াইল শ্রীশ্রীঠাকুরকে, কিছুক্ষণ স্তবস্তুতি ও আরতি করিয়া গাহিতে লাগিল সংস্কৃত রামায়ণ গান। শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে ব্রহ্মচারিজী বলিলেনঃ সমগ্র রামায়ণটী ঐ গানের ভিতর আছে।···যে যেখানে ঠাকুরের দর্শন লাভ করে, সেই গভীর ভক্তি সহকারে হতবাক হইয়া চাহিয়া থাকে সেই ভুবনমোহন জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে।

শ্রীরামচন্দ্র ও ভরতের মিলন স্থান কাম্‌তা-নাথ পাহাড়, সেখানে আছে সেই অপ্রাকৃত মধুর মিলনের পদচিহ্ন। সেই স্থানে পৌঁছিতেই ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন ব্রহ্মচারিজী—আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেনঃ ঐ সেই শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন!···ভাববিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ঐ চিহ্নের উপর লুটাইয়া পড়িলেন এবং মুখ ঘসিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল—ধূলিধূসরিত হইল বিক্ষিপ্ত জটারাশি।···সেই সকরুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া অভিভূত হইলেন সকলে, ভাবমুগ্ধ অবস্থায় ঘিরিয়া বসিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। মাথার উপর প্রখর রৌদ্রতাপ—তবু কাহারও সেদিকে খেয়াল নাই, কাহারও মুখে কথাটী নাই। শুধু মাঝে মাঝে ঠাকুরের রুদ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিলঃ এই সেই পদচিহ্ন!···আর, রহিয়া রহিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত

নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে দুলিয়া উঠিতে লাগিল ঠাকুরের দিব্যকান্তি দেবদেহ। প্রায় এক ঘণ্টা পরে কোনরকমে নিজেকে সংযত করিয়া সকলের সহিত ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন ব্রহ্মচারিজী। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবমুগ্ধ।

আহারাদি ও বিশ্রামের পর তেমনি বিহ্বল অবস্থায় সকলকে ডাকিয়া একে একে দান করিলেন নিবিড় আলিঙ্গন। শিষ্যবৃন্দ ও শ্রীগুরু চরণে প্রণত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রহ্মচারিজী ভাবাবেশে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিবার ভাব দেখাইয়া বলিলেন: তোমাদের চেষ্টাতেই আমার এই তীর্থদর্শনের সৌভাগ্য হ'ল। তোমরাই ধন্য, ঠাকুর তোমাদের অশেষ কল্যাণ করবেন। সকলে ভাল করে দেখে নেও, এই তোমাদের পূর্বপুরুষের পুণ্যস্থান। ঐ দেখ, শ্রীরামচন্দ্র তোমাদের দেখছেন।···ঠাকুরের কী মধুর ভাব,···কী অপরূপ মূর্তি।··· সেই দিকে চাহিয়া মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন শিষ্যবৃন্দ।

যোগিরাজ কুলদানন্দজী জানিতেন, শিষ্যদের কৃতিত্বে তাঁহার এই তীর্থদর্শন হয় নাই—হইয়াছে ভগবান গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছায়। তবু তাঁহার কী বিচিত্র লীলা,···সন্তানদের প্রতি ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কৃপা!···

সন্ধ্যার সময় সকলে আরতি দেখিতে গেলেন মন্দাকিনী গঙ্গায়। এখানে শিষ্যদের তীর্থের কার্য যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া লইলেন ব্রহ্মচারিজী।

দারুণ গ্রীষ্মকাল বলিয়া স্থানীয় পাণ্ডাজীরা তাঁহাদের অভ্যাস মত সকলকে দিতেন ঠাণ্ডী সরবৎ। একদিন সিদ্ধির মাত্রা বেশী হওয়ায় সকল ভ্রাতাভগ্নি নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, হাত মুখের নানা ভঙ্গি করিয়া শুরু করিলেন হাসাহাসি। সকলকে দোতলায় ডাকিয়া পাঠাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, মহানন্দ দাদার হাত নাড়ার বিচিত্র ভঙ্গি দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। সদাগম্ভীর ঠাকুরের প্রাণখোলা হাসিতে সকলের মধ্যে ছুটিল হাসির ফোয়ারা—আর তাহারই উচ্ছ্বাসে অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল লুটোপুটি ও হাসির হুল্লোড়। খাইবার সময়েও চলিল

তাহার প্রতিক্রিয়া—লুচি ভাজিতে ভাজিতে হয়রাণ হইলেন বিশ্বনাথ দাদা, লুচি বেলিয়া হিমসিম খাইলেন মহিলারা। এক একজনে চার-পাঁচ জনের খাবার খাইয়াও নিরস্ত নয়। অবশেষে ঠাকুরের নির্দেশে তবে শেষ হইল সকলের আহারপর্ব।

এইভাবে আবেশে আনন্দে চিত্রকূটে কাটিয়া গেল চার-পাঁচ দিন। সেখান হইতে সকলে গমন করিলেন জব্বলপুর।

বোটে করিয়া দর্শন করিলেন নর্মদার জলপ্রপাত ও জব্বলপুরের 'মার্বেল রক্'। এই জলপ্রপাতের প্রস্তরখণ্ডে নাকি শঙ্করের অধিষ্ঠান। এখানকার প্রস্তরনির্মিত পাঁচটি 'নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ' সংগ্রহ করা হইল; তাহা ভবিষ্যতে নিজ সমাধিতে স্থাপন করা হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিলেন: সমাধি হল শ্মশান ক্ষেত্র, সেখানে শিব প্রতিষ্ঠা করাই নিয়ম। ভবিষ্যতে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে মন্দির প্রবেশের অধিকার দাবী করবে; নর্মদেশ্বর বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাতে কোন বাধা থাকবে না।···* লেকে আনন্দে নৌ-ভ্রমণ চলিল, সকলে মোহিত হইলেন চারিদিকের মনোরম দৃশ্যে। অতঃপর নর্মদায় শ্রাদ্ধাদি করা হইলে একটি উলঙ্গ সাধুর দর্শন মিলিল; তিনি সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় সূর্যের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া তীব্র সাধন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন সাধুজী।

জব্বলপুর হইতে বোম্বাই গমন করিয়া সহরে উৎকৃষ্ট ধর্মশালায় সশিষ্যে অবস্থান করেন ব্রহ্মচারিজী। এখানে বোম্বা দেবী ও মহালক্ষ্মী দর্শন করিয়া সকলে গমন করেন এলিফান্তা গুহায়—ঠাকুর সানন্দে উপভোগ করেন প্রাচ্য ভাস্কর্যের উন্নততম বিকাশ ও হিন্দু উৎকর্ষের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দর্শন করেন হরপার্বতী মিলনদৃশ্য। কালিদাসের

---

*পুরীতে ব্রহ্মচারিজীর সমাধি-মন্দিরে তাঁহার সমাধির পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এই শিবলিঙ্গ—তাঁহার নিত্যপূজার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

কুমার সম্ভবের আত্মপ্রকাশ সম্ভবতঃ এই স্থানে ; হিন্দুর কলঙ্ক কালা-পাহাড়ের অপকীর্তির বহু নমুনাও আছে এখানে।

বোম্বাইতে তিন-চার দিন অবস্থান করিয়া নাসিক যাত্রা করেন। নাসিকে গোদাবরী তীরে ধর্মশালায় সশিষ্যে প্রায় পনের দিন বিশ্রাম করেন ব্রহ্মচারিজী। সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এই স্থানেই হইয়াছিল বলিয়া স্থানটীর নাম নাসিক। সেখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি দান, পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজন ও বিদায়, মন্দিরাদি দর্শন প্রভৃতি তীর্থকৃত্যাদি সম্পাদন করেন সকলে।

একদিন সকাল নয়টায় ঠাকুরকে তেল মাখাইবার সময় কেহ কেহ তাঁহাকে গুরুভগ্নিদের পরস্পরের মধ্যে কলহের কথা নিবেদন করেন। তাহা শুনিয়া পরিতাপের সহিত প্রায় চারিঘণ্টা কাল নানা দৃষ্টান্ত সাহায্যে শিষ্যদের উপদেশ দান করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি বলেনঃ পরনিন্দা ও পরচর্চা গুরুতর অপরাধ, তাতে সমস্ত সাধন-ভজনের সুকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। একজন সদাচারী ব্রাহ্মণকে গঙ্গাতীরে উপাসনারত অবস্থায় চুলের মুঠি ধরে খড়্গের আঘাতে মাথা কেটে ফেললে যে পাপ হয়, তার চেয়ে শতকোটি বেশী পাপ হয় একটী পরনিন্দা করলে। সাধন দিবার সময়ে বিশেষ করে বলা সত্ত্বেও তোমরা এ বিষয়ে সচেতন নও—জটিলা কুটীলা সব, সকল জায়গায় ঝগড়া বিবাদ নিয়ে আছো।···আমার সঙ্গে থেকে, এই সাধনে থেকেও তোমাদের দুরবস্থা দেখে আমারই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছা হয়!···

এই প্রসঙ্গে একজন অন্তরঙ্গ সতীর্থকে লিখিলেনঃ আমার সঙ্গে নিয়ত ৫।৬টি স্ত্রীলোক থাকিলেও যখন যেখানে যাই দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হয়, আমার অনুমতিরও অপেক্ষা করে না। স্ত্রীলোকের দোষদৃষ্টি, দোষকল্পনা এবং দোষানুসন্ধান প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক—আমি ইহাদের বড়ই ভয় করি। যে কেহ ইহাদের নিকট কারো দোষের কথা বলিলে আগ্রহের সহিত শুনিবে—শুধু তাই নয় প্রচারও হইবে। দুই দল শিষ্যে শত্রুতা ঈর্ষা হিংসা সবই চলিবে, ফলে সব ছারখার হইবে। কত সতর্ক হইয়া শিষ্য সঙ্গে আমাকে বাস

করিতে হয়, কত প্রকার ভোগ অনর্থক ভুগিতে হয়—অন্যে কল্পনাও করিতে পারে না। ইহারা এই ১০।১২ বৎসর যাবত আমার উপর গুর্খা পাহারা—ঠিক নিক্তির কাঁটা হইয়া থাকিতে হয়। একটির প্রতি একটু প্রসন্ন দৃষ্টি করিলে সে সকলের বিষদৃষ্টিতে পড়িবে। কারো সঙ্গে নির্জ্জনে একটি কথা বলিবার যো নাই—তিন জন তিন দিক হইতে কান পাতিবে, জেরায় জেরায় তাহাকে অস্থির করিবে। কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার সকলের প্রতি ঠিক একপ্রকার না হইলে, শিষ্যদের মধ্যে ঈর্ষা হিংসা বিদ্বেষ নিশ্চয় জন্মিবে, আর তাহাতে আমার প্রতিও পক্ষপাত দোষ দিয়া চিরকালের মত সংশয় দৃষ্টিতে সহজ শ্রদ্ধাভক্তির গোড়া কাটিয়া দিবে।···

সন্তানদের এইভাবেই দোষত্রুটী ধরাইয়া দিয়া স্নেহের শাসন করিতেন ব্রহ্মচারিজী। সর্ব পাপ ও দুর্বলতা জয় করিয়া তাঁহাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার দিকে ছিল তাঁহার সজাগ দৃষ্টি।

নিজেকে সর্বদা সযত্নে গোপন রাখাই ছিল ঠাকুরের স্বভাবধর্ম। এজন্য তাঁহাকে পূজা করিবার কখনও কোন সুযোগলাভ করেন নাই শিষ্যবৃন্দ—এবার ভক্তবৃন্দের ভাগ্যে জুটিল অভাবনীয় অমৃতময় সুযোগ। দ্রাবিড় পণ্ডিতদের বিধান অনুসারে এখানে কোন ধর্মকার্যের পূর্বে গুরুপূজা অবশ্য কর্তব্য, তবেই নাকি অন্য বিগ্রহ পূজার অধিকার জন্মে—অগত্যা স্থানীয় পাণ্ডাদের অনুরোধে শিষ্যদের পূজা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আর মহানন্দে শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দ পুষ্পচন্দনে প্রাণ ভরিয়া সাজাইলেন প্রাণের ঠাকুরকে, পুষ্পমাল্যে আবৃত ও সুশোভিত হইল ব্রহ্মচারিজীর বরতনু। পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজার পুণ্যলগ্নে মনপ্রাণ ঢালিয়া সকলে পূজা করিলেন প্রত্যক্ষ নীলকণ্ঠ মহাদেবকে, তাঁহার আরতি করিলেন পঞ্চপ্রদীপে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থ শরীর, তবু প্রায় এক ঘণ্টার উপর ধরিয়া চলিল এই বিচিত্র পূজা ও আরতি। তাঁহাব সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হইল ফুলে ফুলে—নাক মুখের সম্মুখভাগ হইতে কোন প্রকারে পুষ্পপত্র সরাইয়া দিয়া তাঁহার শ্বাস গ্রহণের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। অসুস্থ ঠাকুরের চোখে মুখে

তবু এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নাই—সানন্দে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দের হাতে। নিমীলিত-আঁখি নীলকণ্ঠের আঁখিপদ্মে সে কী অব্যক্ত ভাবমাধুর্য, ··জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডলে সে কী অনুপম স্বর্গীয় দ্যুতি!···যেন চারিপার্শ্বে ভাববিহ্বল নন্দী ভৃঙ্গীর দলের মধ্যে আবির্ভূত সমাধিমগ্ন সাক্ষাৎ জটাশঙ্কর!···

ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে পূজা ও আরতি করিয়া ধন্য হইলেন এই সর্বপ্রথম।

এই স্থান হইতে গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থল জটাফটকায় গমন করিলেন। প্রস্তরে খোদিত শঙ্করজীর জটা হইতে ক্ষরিত হইতেছে বিন্দু বিন্দু ঝর্ণাধারা, ক্রমশ বড় হইয়া সেই প্রবাহ পরিণত হইয়াছে নদীতে। সেখানে স্নানাদি করিয়া সকলে দর্শন করিলেন পাণ্ডবগুহা। পাহাড় কাটিয়া প্রকাণ্ড ঘর নির্মিত করা হইয়াছে—তাহার ভিতর শতসহস্র লোক অবস্থান করিতে পারে। অতঃপর দর্শন করিলেন গৌতম মুনির আশ্রম, রাম-লক্ষ্মণের বাসস্থান এবং স্বর্ণমৃগ মারীচবধ ও রাবণের সীতাহরণ স্থান। ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের পূজাও সাঙ্গ হইল।

দারুণ গ্রীষ্মতাপে নিতান্ত অসুস্থ অবস্থাতেও সোৎসাহে পদব্রজে সকল তীর্থ দর্শন করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, আর শিষ্য শিষ্যারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ সর্বত্র অনুসরণ করিলেন তাঁহাকে। এখানে আঙুর খুব সস্তা বলিয়া গ্লাস গ্লাস আঙুরের রস পান করিতেন সকলে। একদিন কালি বিশ্বাস দাদা হুকায় আঙুরের রস পুরিয়া তামাক খাইতে দেন ঠাকুরকে—পরে ঠাকুর তাহা জানিতে পারিয়া বিশ্বাস দাদাকে প্রশংসা করেন।

পুনরায় বোম্বাই হইয়া সকলে উপস্থিত হইলেন দ্বারকায়। সমুদ্রের নিকট গিয়া উঠিলেন রাম রাম'ধর্মশালায়। দ্বারকানাথজীকে বিশেষভাবে পূজা ও ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া মন্দিরদ্বারে সশিষ্যে উপস্থিত হইলেন ব্রহ্মচারিজী। অমনি সমস্ত যাত্রী সরাইয়া দিয়া মন্দিরের পাণ্ডাজী গভীর শ্রদ্ধায় অভ্যর্থনা করিলেন। ভাবমুগ্ধ ঢুলু ঢুলু নয়নে দ্বারকানাথজীকে দর্শন করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও অন্য সকলে। বিগ্রহের সর্বাঙ্গে দামী সুশোভিত তৈল লেপন ও মর্দন করিলেন ঠাকুর, সুগন্ধী

জলে স্নান করাইয়া পূজা করিলেন পুষ্পমাল্যে। নিজের তোয়ালেতে যে গিনি ও টাকা পয়সা থাকিত, তাহা হইতে এক অঞ্জলি লইয়া প্রণামী দিলেন শ্রীবিগ্রহ চরণে।···যতিন পাল দাদা তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিলেন অতি দামী জরীর সাজপোষাক—তাহা দ্বারা বিগ্রহকে সুসজ্জিত করা হইল। দ্বারকানাথজীকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন ব্রহ্মচারিজী!··· সেই স্বর্গীয় মিলন-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া হতবাক হইয়া গেলেন পাণ্ডাজী। আর আত্মহারা ভক্তবৃন্দের মনে হইল, স্বয়ং কৈলাসনাথ ও দ্বারকানাথ আজ অপার্থিব মিলনানন্দে অভিভূত।···

প্রথম জীবনে যিনি ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী, আজ তিনিই অপ্রাকৃত প্রেমডোরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন পাষাণ প্রতিমার। বলিলেনঃ বিগ্রহ ঠিক যেন মাখনের মত কোমল ও সজীব,···পাথরের ব'লে মনেই হয় না।···হিন্দুর প্রেম ও পূজার নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত এখানেই।···

ভোগরাগের জন্য তিনশত টাকা দিলেন যতিন পাল—পর পর সকলে বিগ্রহ পূজা করিলেন। মহিলারা কেহ অঙ্গুরী, কেহ চুড়ী, হার প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ চরণে দান করিলে জমিয়া উঠিল স্তুপীকৃত অলংকার।

একদিন সকলে টাঙ্গা করিয়া গমন করিলেন গোপীতলাও। প্রবাদ আছেঃ গোপীরা এইস্থানে আত্মবিসর্জন দিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দেহ হইতে তিলকমাটী গোপী-চন্দনের উৎপত্তি। স্থানটী অত্যন্ত নির্জন—সেখানে চোর ডাকাতের ভয়ও ছিল। সেখানে সকলে স্নান-ক্রিয়াদি সমাপ্ত করিলেন এবং গোপীমৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অতঃপর রুক্মিণী মন্দিরে রুক্মিণী দেবী ও বহু দেবদেবীর দর্শন করিলেন। প্রতি বিগ্রহের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকেন ঠাকুর, আর তাঁহার দিকে মুগ্ধবিস্ময়ে চাহিয়া থাকেন শিষ্যবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলে। সেখান হইতে ষ্টীমার যোগে গমন করিলেন বেট-দ্বারকায়—এক একটি বিগ্রহ দর্শন করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল ব্রহ্মচারিজীর।

পুণ্যধাম শ্রীবৃন্দাবনের সহিত ব্রহ্মচারিজীর সাধক ও সিদ্ধ জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত। শ্রীগুরুদেব ও মাতাঠাকুরাণী যোগমায়া দেবীর

সহিত এই মধুর ধামে প্রথম অবস্থানের স্মৃতি তাঁহার অন্তরে বিশেষ করিয়া সমুজ্জ্বল। শ্রীভগবানের জন্য বিরহিণী শ্রীরাধিকার ব্যাকুল বেদনায় তাঁহার গোপন অন্তস্থল সদাই যেন ব্যথাতুর।···বৃন্দাবনের গোষ্ঠে, কদম্বতলে, যমুনার কূলে, কুঞ্জে কুঞ্জে, আকাশে বাতাসে সর্বত্রই আজিও চলিয়াছে আকুল বিরহের দহন।···সারা বিশ্বপ্রকৃতি যেন কান পাতিয়া শুনিতে চায় পরম পুরুষের প্রেমের বাঁশি—প্রাণবল্লভের সহিত মধুর মিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় আজও উজান বহিয়া চলে সারা বিশ্বের হৃদিযমুনায়।···ত্রিভুবনে লীলাময়ের প্রেমের লীলার অপূর্ব প্রতীক এই বৃন্দাবন—তাই বৃন্দাবন দর্শনের সাধ তাঁহার মিটিত না, ব্রজের রজের অণু-পরমাণুর প্রতি বরাবরই ছিল তাঁহার প্রাণের গভীর অনুরাগ, সহজাত তীব্র আকর্ষণ।···

সেই আকর্ষণে দ্বারকা হইতে ব্রহ্মচারিজী সদলবলে গমন করিলেন শ্রীবৃন্দাবন। যমুনা স্নানে তাঁহার কী গভীর আনন্দ! গোপিনাথ, মদনমোহন এবং শ্রীমতীর সঙ্গে পায়ের উপর পা দিয়া বাঁশি হাতে গোবিন্দজী দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণে সে কী আকুল আবেগ!··· প্রাণবন্যার সেই উদ্দাম উচ্ছ্বাস বাধা মানিতে চায় না, শিশুর মত অফুরন্ত পুলকে ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিতে থাকেন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজী। সেই অব্যক্ত আকর্ষণ ও মাধুর্যের আস্বাদনে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া থাকেন ভক্তবৃন্দ।

দিকে দিকে আজ অভিমানের বিপুল বন্যা—দেশে দেশে মদমত্ততার প্রবল সংঘাত।···তাহারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় প্রতি জাতি, প্রতিটী শ্রেণীর মধ্যে দ্বেষহিংসার হিংস্রকুটিল নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব ও হানাহানি। এমনকি তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যেও অনেকে এই প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত নন। সেই বিষরাশি হজম করিয়া অভিমান দূর করিবার জন্য নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজীর এই অপূর্ব লীলা।···

সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া লজ্জিত, অনুতপ্ত ও অনুপ্রাণিত হইলেন শিষ্যবৃন্দ। শ্রীগুরুদেবের সহিত বৃন্দাবন পরিক্রমা কালে তাঁহাদের মনে হয় যেন শ্রীভগবানের সহিত তাঁহারা গোষ্ঠবিহারে মত্ত ও কৃতকৃতার্থ।···

সেই আনন্দময় পুণ্যধামে নিরভিমান ব্রজবাসীদের বিনীত আলাপ-ব্যবহারে, সেবা ও ভজন নিষ্ঠায়, অনুরাগের গভীরতায় ভক্তহৃদয়ের অপার আনন্দ যেন চির ঘনীভূত।···

একদিন প্রত্যুষে সশিষ্যে মথুরায় রওনা হইলেন ব্রহ্মচারিজী। গোবর্ধন ও মানস-গঙ্গা দর্শন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিলেন। কালীয় হ্রদ, কেলী কদম্ব বৃক্ষ এবং আরও অনেক লীলাস্থানাদি দর্শন করিয়া প্রায় দশটায় সকলে পৌঁছিলেন মথুরায়। এখানে দেবকী, বাসুদেব ও গোপাল বিগ্রহ, কংস কারাগার, মথুরা রাজবাটী প্রভৃতি দর্শন করিলেন। পরে যমুনা স্নান সমাপ্ত করিয়া অপরাহ্ণে গমন করিলেন ঠাকুরবাটীতে এবং সন্ধ্যার পর যমুনার আরতি দর্শন করিয়া ধর্মশালায় উঠিলেন। মথুরায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে প্রত্যাবর্তন করিলেন শ্রীবৃন্দাবন।

এখানে অত্যধিক গরমে শরীর অসুস্থ হইল। চক্ষের জলে বিদায় গ্রহণ করিয়া সশিষ্যে আগ্রায় যাত্রা করিলেন ব্রহ্মচারিজী।

আগ্রায় পৌঁছিয়া অল্প সময়ের মধ্যে ভাল বাড়ীর সন্ধান না পাওয়ায় একটা হোটেলের সম্পূর্ণ পৃথক অংশে দুইখানি ভাল ঘর লওয়া হইল। প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা হইতে মুসলমান অধিবাসীরাও বদনা ডুবাইয়া জল লওয়ায় সেই জল ব্যবহার করিতে ইতস্তত করিতে থাকেন শিষ্যবৃন্দ। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মচারিজী সহজাত উদারতায় বলিলেনঃ সাধারণের হোটেলে সকল জাতিই থাকতে পারে, তাতে কী হয়েছে? প্রবাসে এভাবে থাকা ছাড়া উপায় কী?

অপরাহ্ণে সকলকে লইয়া দর্শন করিলেন আগ্রা সহর ও জগৎ-বিখ্যাত তাজমহল। তাজমহলের চতুর্দিকে বড় বড় গোলাপ, রাজপদ্ম ও নানারকমের পত্রপুষ্পে শোভিত বৃহৎ ময়দান ও তোরণ—পশ্চাতে প্রবাহিত নীলধারা যমুনা। তাজমহলের উপর-নীচ, চতুর্দিক ঘুরিয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারিজী—সমাধি-বেদীর নিকট নতজানু হইয়া সম্মান

প্রদর্শন করিলেন। একটি মোল্লা সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত কিছু সযত্নে দেখাইতেছিলেন—সমাধি হইতে কয়েকটি ফুল লইয়া তিনি দিলেন ব্রহ্মচারিজীকে। সাগ্রহে সে ফুল গ্রহণ করিয়া মস্তকে রাখিলেন ব্রহ্মচারিজী, আর মোল্লাজী তাকাইয়া রহিলেন স্তব্ধ বিস্ময়ে, গভীর শ্রদ্ধায়। তাজমহলের অতি সুন্দর গঠন, চমকপ্রদ কারুকার্য ও বিস্ময়কর নির্মাণ কৌশলের উচ্চ প্রশংসা করিলেন ব্রহ্মচারিজী। মোল্লাজী উপলব্ধি করিলেনঃ কুলদানন্দজী শুধু মাত্র সাধু নন, সুন্দরের উপাসক প্রকৃত জীবন শিল্পী।···

আগ্রার অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুও দর্শন করিয়া একদিন পরে সশিষ্যে রওনা হইলেন ব্রহ্মচারিজী। ২রা মে রাত্রিতে তাঁহারা পৌঁছিলেন কলিকাতায়।

পরদিন দলে দলে ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুর দর্শনলাভ করিতে আসিলেন। অপরাহ্ণে মাখনলাল গাঙ্গুলী মহাশয় আসিলে গুরুভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া সাদরে বসাইলেন ব্রহ্মচারিজী।

মাখন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কেমন বেড়িয়ে এলেন? কেমন ছিলেন?

ব্রহ্মচারিজীঃ বেশ ভালই ছিলাম—পথে কোথাও কোন কষ্ট হয়নি। শেষে বৃন্দাবনে এসে শরীর বড় খারাপ হয়েছে—সেখানে বড় গরম।

ঃ সবচেয়ে কোন জায়গা ভাল বোধ হল?

ঃ চিত্রকূট ও মন্দাকিনী গঙ্গা, আর দ্বারকার গোপীতলাও—এই দুই জায়গা সবচেয়ে ভাল লেগেছে। দ্বারকার যে স্থানে গোপিকারা প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের অস্থি-মজ্জায় ঐ স্থান হয়েছে। ওখানকার মাটী দিয়ে বৈষ্ণবেরা তিলক করেন; এমন সুন্দর স্থান যে দেখলেই বসে পড়তে ইচ্ছা হয়।···দ্বারকানাথের মন্দিরও অতি পুরাতন, সুন্দর তার কারুকার্য—প্রায় চার হাজার বছর আগে তৈয়ারি। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা এখন আর নেই, সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে—তাঁর তিরোধানের পর এই মন্দির তৈরি হয়েছে। দ্বারকানাথের মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের রাজমূর্তি।···মন্দাকিনী গিয়ে অত্যন্ত সুন্দর লাগল; চিত্রকূট পাহাড়ে

শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আছে।…নাসিকও অতি সুন্দর স্থান, তার কিছু দূরে পাণ্ডব গুহা দেখতে গিয়েছিলাম। পাহাড় কেটে প্রকাণ্ড তিনটী গুহা তৈরি হয়েছে—তার এক একটিতে প্রায় এক হাজার লোক থাকতে পারে। এখন গভর্ণমেণ্টের লোক পাহারায় থাকে।…

ঃ আর কী দেখলেন ?

ঃ গৌতম মুনির আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম। ত্র্যম্বকেশ্বর শিবের মাথা থেকে ঝরণা নেমে আসায় গোদাবরী নদীর উৎপত্তি। গৌতম মুনি কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে তপস্যা করতেন। প্রবাদ আছে—মুনির তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র গোমূর্তি ধারণ করে মুনির নিজ চাষের শস্য নষ্ট করতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি সেই গরুকে লক্ষ্য করে দর্ভ মারলে গরুটি মরে গেল। গোবধ-জনিত অপরাধের শাস্তি নিতে হবে বলে আকুল হয়ে মুনি শিবের আরাধনা করতে লাগলেন। তবেই ত্র্যম্বকেশ্বর শিব সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে মাথায় নিয়ে এলেন—সেই ধারাতেই গোদাবরীর উৎপত্তি। গঙ্গা আর গোদাবরীতে কিছুই পার্থক্য নেই।

আরো কিছু আলাপ আলোচনার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন মাখন বাবু।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুভাইদের লইয়া আনন্দ-উৎসব করিলেন যতীন্দ্র দাদা। অতঃপর গোসাঁইজীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে পুরীধাম রওনা হইলেন ব্রহ্মচারিজী।

॥ পনের ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৩৪। গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব প্রতি বর্ষের ন্যায় সম্পন্ন করিলেন ব্রহ্মচারিজী। বার্ধক্যের সীমায় শারীরিক অসুস্থতার দরুণ এবার নিজে বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না।

তখন সমুদ্রতীরে 'পুলিন-পুরী' বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সকালে সমুদ্র স্নানান্তে জগন্নাথদেব দর্শন করিতেন। পরে গরীব-দুঃখীদের পয়সা বিতরণ করিতে করিতে আসিয়া উঠিতেন গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দিরে। সভক্তি প্রণতি জানাইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় অপলকে চাহিয়া থাকিতেন গোসাঁইজীর আলেখ্যর দিকে। তাঁহার চোখেমুখে বিচ্ছুরিত

হইত এক অনুপম দীপ্তি—বহুক্ষণ কাটিয়া যাইত তেমনি অভিভূত-ভাবে।···তাহার পর যাইতেন নিজের ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে। তখন ইহাই ছিল তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য।

গুরুপূর্ণিমা—বৎসরের মধ্যে শ্রীগুরুর পূজা করিবার একটি মাত্র দিন। আমি ও টেলিগ্রাফিষ্ট বিনয় গাঙ্গুলী কটক হইতে উপস্থিত হইলাম পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতায় সকলেই ম্রিয়মান। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ঠাকুরের পূজাধিকারে বঞ্চিত হইলাম আমরা, সকলকে জলযোগ সারিয়া লইতে আদেশ দিলেন ঠাকুর। প্রত্যূষে নানা সুগন্ধ পুষ্পপত্রে মালা গাঁথিয়াছি, পূজার অন্যান্য উপকরণ সাজাইয়া পূজা করিবার ব্যাকুল প্রতিক্ষায় রহিয়াছি। এমন সময় ঠাকুরের বিরূপ আদেশে প্রাণে জাগিল গভীর বেদনা অন্যান্য সকলে হতাশ হইয়া জলযোগ করিলেন; কিন্তু মনের দুঃখে সারাদিন নিরম্বু উপবাসে থাকিবার সংকল্প লইয়া ছাদের উপর নির্জন ঘরে সমাহিত হইলাম শ্রীনাম সাধনায়।

বেলা এগারটায় অন্তর্যামী ঠাকুর বলিলেনঃ আমার শরীর বড় অসুস্থ; যদি এখনও কেউ জলটল না খেয়ে থাকে তবে এই সময় পূজা ক'রে খেয়ে নিক।···সকলে বাল্যভোগের প্রসাদ গ্রহণ করায় লজ্জিত হইল, আমার খোঁজ পড়িল—শ্রীগুরুর অপার করুণায় অভিভূত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিয়া ধন্য হইল এই দীন অধম। শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে গেলে তিনি মাথাটী আগাইয়া দিয়া বলিলেনঃ যদি কিছু দিতে চাও তবে মাথায় দাও, আশীর্বাদ কর।···দশটী টাকা শ্রীচরণে অর্পণ করিলে তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেনঃ তুমি আবার দেবে কি, তুমি ত নেবে।···

অপরাহ্নে ছাদের উপর আমরা সকলে ঠাকুরের সহিত নানা আলোচনায় রত। একজন গুরুভ্রাতা জীবন্মুক্তের লক্ষণাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ঠাকুর বলিলেনঃ মানুষ মরে গেলে যেমন তার দেহে দুঃখের অনুভূতি জাগে না, তেমনি জীবন্ত অবস্থাতেও যখন শরীরে সুখ-দুঃখ অনুভব হয় না, তখন সাধক মুক্তিপ্রাপ্ত হন। তাঁকেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলা যায়।

বিনয়বাবু তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ জনিত বেদনা নিবেদন করিলেন। সান্ত্বনার সুরে ঠাকুর বলিলেন: অবশ্যম্ভাবী যে ভোগ তার প্রতিকার যদি সম্ভব হত, তবে নলরাজা, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কখনও দুঃখে পড়তেন না।···

নানা আলোচনার মধ্য দিয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ঠাকুরের সহজাত আত্মগোপন প্রবৃত্তির জন্য এতদিন কেহ সাক্ষাৎভাবে তাঁহার পূজারতি করিবার সাহস পায় নাই। আজ কয়েকজনে পঞ্চোপচারে আরতি করিবার সঙ্কল্প করিলাম, আমি সমস্ত দায়িত্ব লইলাম নিজের উপর। গুরুভ্রাতা বসন্ত ভট্টাচার্যের সাহায্যে প্রস্তুত করা হইল সকল আয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুর ছাদের উপর নিজ আসনে আসিয়া বসিতেই বাজিয়া উঠিল কাঁসর-ঘণ্টা, খোল-করতাল—অভিনব প্রেরণায় আমরাও আরম্ভ করিলাম ঠাকুরের আরতি। যোড়করে নতশিরে নিশ্চল রহিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, তাঁহার দিব্য জ্যোতির দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন সকলে। পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় শ্রীগুরুদেবের অপূর্ব দ্যুতিতে মহানন্দে উলুধ্বনি দিয়া উঠিল গুরুভগ্নিরা। সুগন্ধ পুষ্পমাল্যে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিয়া সজলনয়নে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, ঠাকুরের নয়নে বিগলিত অপার করুণা, অক্ষয় আশীর্বাদ।···

শ্রীমন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আসিলে ঠাকুরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন একদিকে গুরুভ্রাতারা, অন্যদিকে গুরুভগ্নিরা। মহানন্দে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন সকলে; ঠাকুরের চোখে মুখেও তখন কত না আনন্দ।···সহসা পূর্ণিমার স্বচ্ছ আকাশ সমাচ্ছন্ন হইল ঘন কৃষ্ণমেঘে—আষাঢ় মাস, অবিলম্বে বৃষ্টিও আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সকলকে আহার সমাধা করিবার ইঙ্গিত করিলেন ঠাকুর, আর বাম হস্তখানি আবরণের ন্যায় মস্তকের উপর রাখিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিলেন নিশ্চিন্ত মনে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িল---সকলে হতবাক হইয়া দেখিলাম, ছাদের সকল দিকে বৃষ্টি পড়িলেও আমাদের মাথার উপর একফোটাও বৃষ্টি নাই।···বিস্ময়ে ও গভীর ভক্তিতে অভিভূত হইলাম সকলে। আমাদের আহার সমাপ্ত হইল, ঠাকুরও মুখ ধুইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন—অমনি সমস্ত ছাদ প্লাবিত হইল অঝোর ধারায়।

সহজাত আত্মগোপন লীলার জন্য আপন যোগৈশ্বর্য সর্বদা সঙ্গোপনে রাখিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর। নিতান্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আজ তাহার যৎসামান্য পরিচয় লাভ করিয়া কৃতার্থ ও অনুপ্রাণিত হইলাম সকলে।

বার্ধক্যের চাপে শ্রীগুরুর শরীর ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। এজন্য পুরীধামে সমুদ্রতীরে 'পুলিন-পুরী' বাড়ীতেই অবস্থান করিতে থাকেন তিনি।

এবার এখানে থাকিয়া গোস্বামী প্রভুর জন্মোৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার অন্যান্য শিষ্যবৃন্দের সহিত এখানে আগমন করেন বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের একজন বিশিষ্ট কর্মী ও আমাদের সতীর্থ শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়।

ইতিমধ্যে অতীনবাবু একবার ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় অতীনবাবু একদিন রাত্রে দেখিলেন—তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁহার গায়ে কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিতেছেন ; পরে হাত তুলিয়া তাঁহাকে অভয় দিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।···তাহার পর অলৌকিকভাবে অতীনবাবু রোগমুক্ত হইলে হতবাক হইলেন চিকিৎসকবৃন্দ। ভাবমুগ্ধ চিত্তে অতীনবাবু শ্রীগুরু কৃপার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং সদ্‌গুরুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

অতীনবাবু ছিলেন 'পথিক' নামে একটী পত্রিকার পরিচালক। নিজ জীবনে গুরুকৃপার অলৌকিক কাহিনী প্রকাশ করিয়া একখানি পত্রিকা শ্রীগুরুর নিকট প্রেরণ করেন। জটিয়াবাবার আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে তিনি পুরী আসিয়া গুরুভাই ভগ্নিদের মধ্যেও ঐ ঘটনা বিবৃত করেন।

আত্মপ্রচার বিমুখ শ্রীশ্রীঠাকুর অতীন বাবুর এই কার্য সমর্থন করেন নাই! সর্বসমক্ষে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলেন: অতিন, তোমার ধৃষ্টতা তো বড় কম নয়! তুমি আমাকে প্রচার করতে যাও কোন্

সাহসে ?···তুমি আমাকে কতটুকু জেনেছ বা বুঝেছ ? গুরুর মহিমা বুঝতে হলে পাহাড়-পর্বতে নির্জনে অন্তত বিশ বছর সাধন-ভজন করে এসো। গুরুর মহিমা এভাবে প্রচারের বিষয় নয়—কোন কিছু উপলব্ধি হলে সর্বদা গোপন রাখতে হয়। তোমাদের সবাইকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি। প্রচারের ভাব থাকলে আত্মোন্নতি ব্যাহত হবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। সর্বদা মনে রাখবে—প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা !···

আপন সাধন-জীবনে গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন কুলদানন্দজী ; সদ্‌গুরু জীবনের শেষ অধ্যায়ে আসিয়াও সর্বপ্রযত্নে সেই ব্রত তিনি প্রতিপালন করেন এবং শিষ্যবৃন্দকেও সর্বদা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। ইহাই তাহার সদ্‌গুরু লীলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই কর্ণধারগণ বিভিন্ন উপায়ে ও বহু অর্থ ব্যয়ে আত্মপ্রচারে তৎপর—ধর্ম-প্রচারের পুরোধা যাঁহারা, তাঁহাদের অনেকেও এই দুর্বলতা ও অপকৌশল হইতে মুক্ত নন। আত্মপ্রচারের ডামাডোলের মধ্যে গোসাঁইজী তথা ব্রহ্মচারিজীর এই মহান আদর্শ উচ্চ-নীচ, সাধু ও সংসারী নির্বিশেষে সর্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিবে সন্দেহ নাই।···

মহাহোম উপলক্ষে পুরীধাম হইতে চন্দননগরে গমন করেন ব্রহ্মচারিজী। অসুস্থতা সত্ত্বেও পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যের সহিত মহাহোম সুসম্পন্ন করিলেন, বিজয়োৎসব উপলক্ষে সকলকে দান করিলেন নিবিড় আলিঙ্গন।

শরীর ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়ায় গোসাঁইজীর সেবাপূজার স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন ব্রহ্মচারিজী। প্রায়ই মনে পড়ে লীলা সংবরণের পূর্বে ভগবান গোস্বামী প্রভুর বাণী : ঘরে ঘরে সদ্‌গুরুর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করাই আমার এবারকার আগমনের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হইয়াছে বিভিন্ন আশ্রমে, শত সহস্র ভক্তবৃন্দের ঘরে ঘরে। পুরীতে গোসাঁইজীর সমাধিমন্দিরে এবং নিজস্ব ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে তাহার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্যই তখন তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত।

মহাহোমের পর উপস্থিত শিষ্য ও শিষ্যাদের একদিন বলিলেন : আমার জীবনের সকল বাসনা কামনা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে—কিন্তু একটী মাত্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে সর্বদাই বড় উদ্বিগ্ন করে তুলছে। সেটী হচ্ছে—গোসাঁইয়ের সেবাপূজা ভোগাদি চিরকাল কীরূপে অক্ষুণ্ণভাবে চলতে পারে।...সেজন্য আমি একটা আবেদন পত্র ছাপাতে চাই—তাই নিয়ে তোমাদের মধ্যে একজন যদি সর্বত্র গিয়ে আমার যাঁরা আছেন তাঁদের আমার আকাঙ্ক্ষাটি বুঝিয়ে দেও তো ভাল হয়। যাঁর যেরূপ সাধ্য আমাকে ভিক্ষা দেবেন—আমি তো কারো কাছে এপর্যন্ত কিছু চাইনি।...

গুরুভ্রাতাদের মধ্যে ছিলেন গোপালগঞ্জের মোক্তার সতীর্থ যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি বলিলেন : আমাদের মধ্যে যে-কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কাজের ভার নিলে ভাল হয়।

তাঁহার দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন : হ্যাঁ, তুমি উপযুক্ত পাত্র—তোমার দ্বারা এই কাজ হ'তে পারে।...

যজ্ঞেশ্বর বাবুর চক্ষে দেখা দিল আনন্দাশ্রু। তাঁহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন : যজ্ঞেশ্বরকে একমাসের জন্যে আমি চাই।...

ঠাকুরের আদেশে স্ত্রীকে গোপালগঞ্জে রাখিয়া আসিলেন যজ্ঞেশ্বর বাবু।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বাহিরে কোথাও যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ব্রহ্মচারিজী। নানা স্থানের কথা উঠিল—অবশেষে একান্ত ভক্ত শিষ্য, কাটোয়ার হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সতীনাথ সিংহ রায় মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে কাটোয়ায় যাইতে সম্মত হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কাটোয়া সহরে গঙ্গার ধারে নির্জন পরিবেশে কোন ভাল বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল না। অপর পারে ঠিক গঙ্গার উপর অগ্রদ্বীপের জমিদার বাবুদের একটী দ্বিতল বাড়ী শূন্য পড়িয়াছিল ; কিন্তু বাবুরা ঐ বাড়ী কখনো কাহাকেও দেন নাই বলিয়া সে বাড়ী পাইবার ভরসা

কমই ছিল। তবু সতীনাথ দাদার প্রস্তাবে ব্রহ্মচারিজী স্বয়ং অবস্থান করিবেন জানিয়া বাড়ীটি সাগ্রহে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন জমিদার বাবুরা। গঙ্গার প্রবল ভাঙ্গন আসিয়া বাড়ীটি স্পর্শ করিয়াছিল—উহা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইবে বলিয়া দারুণ আশঙ্কা ছিল সকলের মনে। শোনা যায়, মহাপুরুষের পাদস্পর্শে বাড়ীটি যদি রক্ষা পায় এই ভরসাই বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়া দিবার প্রধান উদ্দেশ্য। বাবুদের সে ভরসা সফল হইল—গঙ্গার ভাঙ্গনের পরিবর্তে সেখানে নূতন চড়া পড়িয়া অচিরে বাড়ীটা রক্ষা পাইল।...

মহানন্দ দাদা, জিতেন্দ্র দাদা, মহেন্দ্র দাদা, রাজেন্দ্র দাদা, প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দসহ চন্দননগর হইতে রওনা হইলেন ব্রহ্মচারিজী—কাটোয়ায় পৌঁছিয়া বাবুদের এই বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। কাটোয়া হইতে গঙ্গা পার হইয়া বহু দর্শনার্থী শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হইতে লাগিলেন। অপরাহ্ণেই ভীড় বেশী হইত—গঙ্গাতীরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসন গ্রহণ করিতেন ঠাকুর, আর শত সহস্র নরনারী অপলকে চাহিয়া থাকিত তাঁহার ভুবনমোহন মূর্ত্তির দিকে।

কাটোয়া সংলগ্ন উদ্ধারণপুরে বাস করিতেন দরিদ্র গুরুভ্রাতা রাধামোহন ভট্টাচার্য। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করিতে আসিয়া তিনি শুনিলেন, ঠাকুর তখন বাড়ীর ভিতর আছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় ঠাকুরের পরিচর্যায় নিযুক্ত গুরুভ্রাতাদের অপরিচিত; ঠাকুরের শরীর অসুস্থ বলিয়া তাঁহার যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা বা নিয়মভঙ্গ না হয় সেদিকেও সেবারত গুরুভ্রাতাদের সদাসতর্ক দৃষ্টি। এজন্য পুনঃপুনঃ আবেদন সত্বেও শ্রীগুরুর দর্শনলাভে অসমর্থ হইলেন ভট্টাচার্য মহাশয়। প্রাণে দারুণ আঘাত পাইয়া মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন: ঠাকুরকে আর দর্শন করতে আসব না। নিজে দর্শন দিলেই তাঁকে দর্শন করব, আর যতদিন দর্শন না দেবেন ততদিন জলগ্রহণ পর্যন্ত করব না—তাতে প্রাণ যায় যাবে!...ঠাকুরকে দর্শন না করিয়া ফিরিয়া গেলেন দীন ভক্ত শিষ্য।

শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাট দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ব্রহ্মচারিজী! পরদিন প্রাতে নৌকাযোগে ঠাকুরকে লইয়া

সকলে রওনা হইলেন উদ্ধারণপুর। দত্ত ঠাকুরের সমাধিস্থলের নিকট গমন করিয়া সমাধির দিকে অপলকে চাহিয়া রহিলেন ঠাকুর—সানন্দে বলিলেনঃ বাঃ—বেশ আছ,···খাসা আছ! এই তো থাকবার স্থান।···বলিয়া ঠাকুর নমস্কার করিলেন—সাক্ষাতভাবে কাহারও সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ যেন।···

শ্রীপাট দর্শন করিয়া ফিরিবার কথা; কিন্তু গঙ্গার তীর বরাবর উত্তর দিকে চলিলেন ঠাকুর। অন্য সকলে তাঁহার অনুসরণ করিলেন—তিনি গিয়া দাঁড়াইলেন রাধামোহনের বাড়ীর দরজায়। ঠাকুরকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন রাধামোহন—তবে কি দীন সন্তানের গোপন মনোব্যথা সত্যই অন্তর্যামীর প্রাণে বাজিয়াছে? শ্রীগুরু মহারাজের চরণতলে লুটাইয়া আকুল ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন রাধামোহন; আর মস্তকে অঙ্গে কৃপাহস্তের পরম স্নেহময় অমৃতস্পর্শ বুলাইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন দয়াল ঠাকুর।

ঠাকুর এবং অন্য সকলকে বিহ্বল আনন্দে তাঁহার কুঁড়ে ঘরে লইয়া গেলেন রাধামোহন—সাধ্যমত সকলের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গীগণ সহ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সকলে রাধামোহনের প্রতিজ্ঞা ও নিরম্বু উপবাসের কথা জানিয়া অন্তর্যামী কৃপাময় ঠাকুরের আচরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করিলেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের নিকট ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ নাই, তাঁহার এমনি অপার স্নেহই প্রকৃত গুরুনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।···

অপরাহ্নে শ্রীগুরুকে লইয়া সানন্দে প্রত্যাবর্তন করিলেন সকলে।

কাটোয়ায় তখন ছিল শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মার্থীর সমাবেশ। এক দিকে মাতৃসাধক বামাক্ষেপা মহোদয়ের শিষ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের ভক্তবৃন্দ—অপর দিকে আদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দলের মধ্যে একদল শিক্ষিত ও প্রভাবশালী, অপর দল ছিলেন রামদাস বাবাজীর শিষ্য রাধারমণ দাস বাবাজীর আশ্রমে; আর সাধু বৈষ্ণব দল ছিলেন অভয়ানন্দ স্বামীর আশ্রমে। এছাড়া, ছিলেন পণ্ডিত সমাজ, ইংরাজী

শিক্ষিত আধুনিক সমাজ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুর মহোদয়ের শিষ্যবৃন্দ। দলগুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য না থাকিলেও সতীনাথ দাদার বাড়ী ছিল সকলেরই মিলনক্ষেত্র—কারণ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উর্ধে গোসাঁইজী ও ব্রহ্মচারিজীর অপার মহিমা সর্বদা কীর্তন করিতেন সতীনাথ দাদা।

এবার ব্রহ্মচারিজীর আগমনে তাঁহাকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কৌতূহল জাগিল বিভিন্ন দলভুক্ত অনেকের মনে। শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন তুলিয়া তর্কে তাঁহাকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যেও অনেকে ধরিলেন মাখরুন্ স্কুলের হেড পণ্ডিত মহাশয়কে। একদিন অপরাহ্ণে পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্ন করিলেন: জীবের সাধ্য কী?

স্থিতধী, আত্মসমাহিত শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব রয়েছে—সকলের সাধ্য তো এক হয় না! আপনি কোন্ জীবের সাধ্য জানতে চান?

তার্কিক দল ধারণা করেন নাই যে তর্কে পরাজিত করিতে গিয়া আপন জালে ধরা পড়িতে হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ও বুঝিলেন প্রশ্নটী বড় অজ্ঞের মত হইয়াছে। অপ্রস্তুত হইয়া বিনীতভাবে তিনি বলিলেন: আজ্ঞে আমার সাধ্য কী তাই বলুন।

সস্নেহ কণ্ঠে ঠাকুর বলিলেন: নিজের সাধ্য নিজের গুরুর কাছেই জেনে নিতে হয়, অপরের কাছে জানতে গেলে অকল্যাণও হতে পারে।···

গুরুনিষ্ঠার মধুর ইঙ্গিতে লজ্জায় অধোবদন হইলেন পণ্ডিত মহাশয়—আর দ্বিতীয় প্রশ্ন খুঁজিয়া পাইলেন না। ব্রহ্মচারিজীর সস্মিত অথচ জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে চাহিয়া তার্কিক দলও কেমন সংকুচিত হইয়া পড়িলেন। হয়ত বুঝিলেন, মশকের শক্তি লইয়া বৃষশৃঙ্গের উপর আস্ফালন করা নিতান্তই গর্হিত ও ধৃষ্টতার পরিচয়।···

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্থানীয় বিগ্রহ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। অমনি জমিদার অন্নদাপ্রসাদ সাহার প্রকাণ্ড গাড়ীখানি জোগাড় করিলেন সতীনাথ দাদা। গঙ্গা পার হইয়া ঠাকুর গাড়ীতে

আরোহণ করিলেন—গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, পশ্চাতে চলিলেন ভক্তবৃন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরূপ মূর্তি দর্শন করিবার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে, বাড়ীগুলির দরজা ও জানালায় ভীড় জমিয়া উঠিল—সকলেই মুগ্ধনেত্রে সেই জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইল।

সহসা একটী কীর্তনের দল সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুরের অনুগমন করিল। ক্রমশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এক দল দুই দল করিয়া বহু দলের সমাবেশ ঘটিল—প্রায় ছয় সাত শত কীর্তনীয়ার খোল করতাল ও সংকীর্তন ধ্বনিতে মুখরিত হইল দিগদিগন্ত। বিনা আয়োজনে এই অভাবনীয় আনন্দ-রোলে মুগ্ধ হইলেন সকলে—শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া সেই বিরাট নগরকীর্তন সহযোগে সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হইলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে। মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন ঠাকুর। কাটোয়ায় স্বতঃউৎসারিত এমনি বিরাট নগর-কীর্তনের কথা অদ্যাবধি আর শোনা যায় নাই।

অতঃপর শ্রীপাট শ্রীখণ্ড দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল ঠাকুরের। একখানি মোটর-বাস্ ভাড়া করিয়া শ্রীখণ্ডে যাইবার ব্যবস্থা হইল। কাটোয়ার ডাক্তার তারানাথ চৌধুরী ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী, শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্য হইলেও তিনি সতীনাথ দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঠাকুরকে যাঁহারা তর্কে পরাস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তারানাথ বাবু ছিলেন তাঁহাদের একজন নেতৃস্থানীয়। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত-ভাবে তিনি বলিলেনঃ আপনি শ্রীখণ্ডে যাচ্ছেন—শ্রীখণ্ডেই আমার বাড়ী। আপনি কি দয়া করে একবার আমার বাড়ী যাবেন না?···

মধুর হাসিয়া ঠাকুর বলিলেনঃ আপনার বাড়ী নিশ্চয় যাব।

সতীনাথ দাদার বাড়ীতে ছিলেন সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ আত্মায় অহিভূষণ সিংহরায়। ঠাকুরের সহিত একই বাসে শ্রীখণ্ডে যাইবার বড় আকাঙ্ক্ষা জাগিল তাঁহার প্রাণে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁহার বিলম্ব হওয়ায় অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের লইয়া ঠাকুরের বাস ছাড়িয়া দিল। যাত্রাস্থলে পৌঁছাইয়া নবীন যুবক অহি দাদা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা ও সতীনাথ দাদা বহু প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া

অগত্যা একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে সকলে রওনা হইলেন। কাটোয়া হইতে শ্রীখণ্ড প্রায় ছয় মাইল দূরবর্তী, ঘোড়ার গাড়ী পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিবে। ঠাকুরের বাস ততক্ষণে ফিরিয়া আসিবে ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই চলিলেন অহিদাদা।

কাটোয়া হইতে শ্রীখণ্ডে যাইবার একটী মাত্র রাস্তা। অথচ ঠাকুরের বাস পৌঁছাইবার পূর্বেই অহিদাদাদের ঘোড়ার গাড়ী শ্রীখণ্ডে পৌঁছিয়া গেল।···পরক্ষণে ঠাকুরের বাস পৌঁছিলে অহিদাদার চক্ষে নূতন করিয়া ঝরিয়া পড়িল অশ্রুধারা। তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

শ্রীপাট ও বিগ্রহাদি দর্শনের পর সতীনাথ দাদাকে লইয়া ঠাকুর উপস্থিত হইলেন তারানাথ বাবুর বাড়ীতে। তাঁহাকে স্বয়ং এভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন তারানাথ বাবু, ঠাকুরের চরণ ছুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন শিশুর মত। ঠাকুর শান্ত হইতে বলিলে তিনি যে ঠাকুরকে অপদস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া অধিকতর আবেগে লুটাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সস্নেহ মধুর বচনে সান্ত্বনা দিয়া ঠাকুর বলিলেন: তোমার কষ্ট হচ্ছে বলেই তো এসেছি!···তারানাথ বাবু শান্ত হইলে তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে একটী ডাবের জল পান করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে শিষ্যবৃন্দ সহ শ্রীখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন: জায়গাটা বেশ লাগছে, কিছুদিন থাকলে হয়।

শুনিয়া সতীনাথ দাদা ও কাটোয়ার অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু একদিন পরেই ঠাকুর চলিয়া যাইবেন শুনিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন সতীনাথ দাদা। ঠাকুরের চরণপ্রান্তে গিয়া বলিলেন: বাবা, এই বললেন জায়গাটা আপনার ভাল লাগছে, আর কিছুদিন থাকবেন—আবার আজই চলে যাবেন বলছেন কেন? আপনাকে আমি যেতে দেব না।···

ঠাকুর: তোমার জন্যই আমার যাওয়ার দরকার। তুমি সংসারী লোক, ছেলেমেয়ে আছে—যেভাবে খরচ কচ্ছ আর কিছুদিন করলে

সকলকেই তো পথে দাঁড়াতে হবে।…তুমি আমার জন্য অন্যায় ভাবে খরচ কচ্ছ—আর এখানে থাকব না।

ঠাকুর কাটোয়ায় আসিবার পর হইতে তাঁহার এবং গুরুভ্রাতাদের সকল খরচই সতীনাথ দাদা সানন্দে বহন করিতেছিলেন। শ্রীগুরুদেবের এই কথায় নিদারুণ দুঃখে ও লজ্জায় তাঁহার চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন ঃ কিছুতেই আপনাকে যেতে দেব না!…

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ঠাকুর বলিলেন ঃ জিতু, সতীনাথকে এখনই এক হাজার টাকা দেও।

অধিকতর দুঃখে কপর্দকও লইতে অসম্মত হইয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া রহিলেন সতীনাথ দাদা।

অবশেষে গুরুভ্রাতা ডাঃ এস, কে, রায় বলিলেন ঃ ঠাকুর কাটোয়া এসেছেন—তাঁর সেবার খরচ আপনি একাই সব দেবেন, আর আমরা সে সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হব, এ কেমন কথা? তাঁর সেবার ব্যয় বহন করবার আকাঙ্ক্ষা আমাদেরও তো থাকতে পারে!…

ডাঃ রায়ের কথায় সকলে মিলিয়া যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন স্থির হইল; তবে আর কিছুদিন কাটোয়া থাকিতে সম্মত হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

প্রায় তিন সপ্তাহ কাটোয়ায় অবস্থান করিয়া তাঁহার শরীর কিছুটা সুস্থ হইল। অক্টোবর মাসের শেষে সশিষ্যে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কাটোয়া অবস্থান কালে চতুর্দিকে ঠাকুরের মহিমা বিস্তৃত হওয়ায় অনেকে প্রার্থী হইয়া সাধনপ্রাপ্ত হন। বিরুদ্ধবাদীরাও ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য মনে করেন নিজেদের। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নিতান্ত গরীব—দীক্ষালাভের প্রার্থনা মাত্রই অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। আবার অনেক ধনী কতবার অনুরোধ জানাইলেও তাঁহাদের দীক্ষা দান করেন নাই ঠাকুর।

কাটোয়ায় যে জমিদার বাড়ীতে ঠাকুর অবস্থান করেন, তাঁহাদেরই একজন বাবু এইভাবে ব্যর্থমনোরথ হন। কলিকাতায় ফিরিয়া ঠাকুর

অবস্থান করিতে থাকেন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আশুতোষ পাল মহাশয়ের বাড়ীতে। ডাঃ এস, কে, রায়ের সঙ্গে সেখানে আসিয়াও ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করেন জমিদার বাবু। তবুও নির্বিকারে জবাব দেন ঠাকুর ঃ এখনো সময় হয় নি।···

অগ্রহায়ণ মাসে ভক্তশিষ্য গৌরাঙ্গ তা-এর বিবাহ উপলক্ষে চন্দননগর গমন করেন ঠাকুর। বিবাহ সুসম্পন্ন করাইয়া নব দম্পতীকে আশীর্বাদ করিবার পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

বড়দিনের বন্ধের মধ্যে একদিন শিষ্যবৃন্দ তাঁহাকে লইয়া গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। ভবতারিণীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া এবারেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী মূলে আসন করিয়া বসিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বিজয় দাদা মধুর গোষ্ঠ কীর্তন আরম্ভ করিলে সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। তাঁহার শান্ত-সমাহিত অপরূপ জ্যোতিতে অশ্রু-কম্প-পুলকে অধীর হইয়া উঠিলেন শিষ্যবৃন্দ। পঞ্চবটীতে নূতন করিয়া যেন স্বয়ং নীলকণ্ঠের আবির্ভাবে দলে দলে সমবেত হইল মুগ্ধ জনতা। মনে হইল যেন সেই সিদ্ধপীঠে সিদ্ধযোগীর বিপুল মহিমায় অন্তরীক্ষে সমবেত হইয়াছেন মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ এবং আরোও অনেক লোকান্তরিত মহাপুরুষ।···

কীর্তনান্তে গাছতলায় ঠাকুরকে খিচুড়ি ভোগ দিয়া মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন সকলে।

ডায়েবেটিজ রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠাকুরের শরীর ক্রমশ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। তবু এই দুই-এক বৎসরের মধ্যে অনেকে দীক্ষালাভ করেন—তাঁহাদের মধ্যে ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট ব্রজবিহারী বর্মণ, তাঁহার ভ্রাতা এডিসানাল জেলা জজ রাসবিহারী বর্মণ, তাঁহার জামাতা একাউনটেণ্ট জেনারেল আফিসের সুপারিনটেনডেণ্ট বিনয়কুমার বর্মণ, গোপালগঞ্জের রাইমোহন মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুরের শরীরের বিশেষ অবনতি দেখা দেওয়ায় বায়ু পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রিয় শিষ্য সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায়,

তাঁহার জামাতা রাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সবিশেষ আগ্রহে এই সময়ে বাঁকুড়ায় গমন করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বাঁকুড়ার শুষনিয়া পাহাড় অতি চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্থান। চণ্ডীদাসের লীলাক্ষেত্র, বাসুলির মন্দির, চতুর্দিকে মনোরম দৃশ্যাবলী—এক সঙ্গে ধর্ম, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ। এখানে প্রায় এক মাস অবস্থান করায় তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। পরম ধর্মপ্রাণ গুরুভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সামন্তের বাড়ীতে শিষ্যবর্গ সহ একদিন গমন করিয়া আনন্দোৎসব করেন।

বাঁকুড়ার শ্রীবারাণসী চট্টোপাধ্যায় বাইশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ছেষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত সমাজে নিয়মিত যোগদান করিয়া ব্রাহ্মসাধন প্রণালী অনুযায়ী কঠোর সাধন করেন। তবু প্রাণে প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া বড় মনোকষ্টে দিন যাপন করিতেন। তাঁহার প্রাণে শক্তি ও সান্ত্বনা জোগাইত যুগাচার্য বিজয়কৃষ্ণের ধর্মভাব, উদার মতবাদ ও মহান জীবনাদর্শ। ১৩০৩ সনের শেষে গোসাঁইজীর পুণ্য সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় হ্যারিসন রোডের বাসায় গমন করেন। তাঁহার প্রতি সকরুণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া গোসাঁইজী বলেন : তুমি তো আমার ঘরের ছেলে।···সেই প্রাণস্পর্শী দৃষ্টিতে অভিভূত হইয়া সস্ত্রীক দীক্ষাগ্রহণের সংকল্প করেন বারাণসী বাবু ; কিন্তু কিছুদিন পরেই গোসাঁইজী পুরীধাম গমন করায় সে আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হয় নাই। তদবধি গোসাঁইজীকে অন্তরে ইষ্টরূপে পূজা করিতেন তিনি।

গোসাঁইজীর যোগ্যতম সন্তান ব্রহ্মচারিজীর বাঁকুড়ায় সন্তোষনাথজীর বাসায় আগমনের সংবাদে বারাণসী বাবু প্রাণে অনুভব করেন গভীর আকর্ষণ। অপরাহ্ণে দারুণ শীতের মধ্যেও ঝড়বাদল উপেক্ষা করিয়া উপস্থিত হইলেন সেই বাসায়। ব্রহ্মচারী মহারাজ নিজ ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রথমে বারাণসী বাবুর দিকে স্মিতমুখে অপলকে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ, পরে আসন গ্রহণ করিলেন। বারাণসী বাবু বিস্মিত হইলেন—তিনি ব্রহ্মচারীজির সম্পূর্ণ অপরিচিত, জীবনে তাঁহার সহিত এই প্রথম

সাক্ষাৎ; তবু ব্রহ্মচারিজী নিতান্ত পরিচিতের মত চাহিয়া রহিলেন কেন? তবে কি সত্যই তিনি অন্তর্যামী?…

ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৎসঙ্গ চলিতে লাগিল। ভাববিহ্বল বারাণসী বাবু কথাপ্রসঙ্গে নিবেদন করিলেন প্রাণের কথা। গোসাঁইজীর মমতাপূর্ণ প্রাণস্পর্শী দৃষ্টির কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া বলিলেন: গোসাঁইজীর দর্শনলাভ করা অবধি এই ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন কোন সাধু নজরে পড়েনি যাঁর কাছে দীক্ষালাভের প্রার্থনা করতে পারি।…পরক্ষণে মর্মস্পর্শী ভাষায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: না, না—গোসাঁইজীর কাছে আমার যখন দীক্ষা হয়নি, তখন আমার আর দীক্ষার প্রয়োজন নেই।…

দীক্ষালাভের প্রার্থনা জানাইয়াও অনেকের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। আর বারাণসী বাবুর কথায় শান্তভাবে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা দীক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বলিলেন: শাস্ত্রমতে আপনার সাধন নেওয়ার বিশেষ দরকার।…

দীক্ষালাভের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী উপদেশ তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল বারাণসীবাবুর। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী মহারাজের মূর্তির পরিবর্তে সাক্ষাৎ গোস্বামী প্রভুর দর্শনলাভ করিয়া হতচকিত বিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এ কি! আমি যে আপনার ভিতর গোসাঁইজীকে দর্শন কচ্ছি!…

সস্মিত বদনে নীরব রহিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আর মুগ্ধ বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন বারাণসী বাবু। অন্য সকলেও অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণিকের জন্য যে কী অপূর্ব লীলা প্রকটিত হইল, তাহা শুধু নিজেই জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীগুরু মহারাজ।…

ক্ষণকাল পরে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বারাণসী বাবু বলিলেন: আপনি ভগবান গোসাঁইজীর হাতে গড়া সদ্‌গুরু—আপনি যদি কৃপা করে গোসাঁইজীর সেই দুর্লভ অমূল্য বস্তু আমাকে দেন, তবে এতদিনে আমার বিফল জনম ধন্য হয়!

অমৃতস্রাবী সুমধুর কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: শক্তি সঞ্চারই তো প্রকৃত দীক্ষা—তা আপনার গোসাঁইজীর নিকট হতে হ'য়ে গেছে।…

আমি তাঁর নিকট থেকে যে সাধন পেয়েছি, যে অবস্থা লাভ করেছি, দ্বিধা না ক'রে আপনাকে তা দেব—আপনার নিশ্চয় উপকার হবে।··· আপনি কাল সকাল আটটায় আসবেন।

আরও কিছুক্ষণ সৎসঙ্গ করিয়া বিহ্বল আনন্দে সেদিন ফিরিয়া আসিলেন বারাণসী বাবু। পরদিন সকালে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাঁহার পুনর্জন্ম হইল—ধর্মজীবনের সকল অভাব অশান্তি মিটিয়া গেল, আশাতীত ভাবে প্রাণে লাভ করিলেন অপার আনন্দ।···

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র কোঙার, অত্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় বাঁকুড়া হইতে একদিন ডিহিপাড়া গমন করেন ব্রহ্মচারী মহারাজ। গ্রামটীর মধ্য দিয়া ব্রহ্মচারিজীর মোটরগাড়ী অগ্রসর হইলে তাঁহার দর্শনলাভ করিবার আগ্রহে ছুটিয়া আসে আবালবৃদ্ধ বহু নরনারী। সকলেই অবাক বিস্ময়ে গভীর শ্রদ্ধায় চাহিয়া থাকে জটাজুট-শোভিত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দিকে। তাঁহার দুর্বার আকর্ষণে গ্রামের অনেকেই দীক্ষালাভ করিয়া ধন্য মনে করেন।

অতঃপর ব্রহ্মচারিজী সশিষ্যে গমন করেন বিষ্ণুপুর। রাজাহীন রাজ্য তখন রামহীন অযোধ্যার মত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়গুলি আবর্জনাময়, গগনচুম্বী ভাঙ্গা ভাঙ্গা মন্দিরগুলি চমৎকার কারুকার্য ও শিল্পকলার স্বাক্ষর বহন করিলেও আজ জঙ্গলাবৃত। সাধুরা আগমন করিলে এক তিথির বেশী অবস্থান করা বিধেয় নয় বলিয়া অল্পক্ষণ পরে চলিয়া যাইতেন। একদিন এই রাজ্যের রাজার পক্ষে অসহ্য হইয়া ওঠে সাধুদের বিরহ ব্যথা—কৌশলে সাধুদের ধরিয়া রাখিবার জন্য তিনি নির্মাণ করাইলেন তিনশত পঁয়ষট্টিটী মন্দির। প্রতি মন্দিরে এক এক তিথি করিয়া সাধুরা যেন অবস্থান করিতে পারেন সারাটী বছর। সেই রাজ্যের আজ কী শোচনীয় পরিণতি!

বিষ্ণুপুরের লুপ্ত সৌন্দর্যের মহিমায় সকাতরে রাজবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন ব্রহ্মচারিজী। প্রবেশ করিলেন রূপকথার ঘুমন্ত পুরী রাজবাড়ীর মধ্যে—বিভিন্ন মহলে অনেক সন্ধানের পর অনুভব করিলেন

প্রাণের স্পন্দন। কিন্তু রূপকথার রাজকুমারী নয়, অন্দর মহল হইতে সম্মুখে আসিলেন জীর্ণা-শীর্ণা রাণী—সভক্তি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

আন্তরিক আশীর্বাদ করিয়া কিছু ভেট দিলেন ব্রহ্মচারিজী। রাণী সে অর্থ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে বলিলেন: রাজা-রাণীর কাছে তাঁদের মর্যাদা দেওয়াই তো সাধারণের কর্তব্য—এ তো দান নয়। রাজাকে ভগবানের অবতার মনে করে মর্যাদা দেওয়া সনাতন রীতি। আপনাকে এ আমার মর্যাদা দেওয়া মাত্র, এতে আপনার রাজদাবী আছে। গ্রহণ করুন, এতে আপনার মঙ্গলই হবে।···

বলা বাহুল্য, সুযোগ্য রাজার পরিচালনায় বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীর অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত।

॥ ষোল ॥

মাঘ মাসের প্রথমে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ব্রহ্মচারিজী।

একদিকে ভগবান গোসাঁইজীর সেবাপূজার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, অন্যদিকে শিষ্য-শিষ্যাদের স্নেহ-যত্ন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি—উভয় দিকে শ্রীগুরু মহারাজের সদাসতর্ক দৃষ্টি। তাহারই সুযোগ লইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন বৈষয়িক মনোভাবাপন্ন কোন অন্তরঙ্গ শিষ্য; বিষয়বিতৃষ্ণ. চিরবৈরাগী শ্রীগুরুদেবকে অংশীদার করিয়া ইতিপূর্বে ব্যবসায় শুরু করেন তিনি। বলেন, আশ্রমে সমাগত ভক্ত শিষ্যদের আদর-আপ্যায়নই প্রধান উদ্দেশ্য। শিষ্যবৃন্দের তৃপ্তি, সুখ-সুবিধা ও মঙ্গলের তাগিদে আপত্তি করেন নাই শ্রীগুরু, বরং করেন আশীর্বাদ। ফলে শিষ্যটী হইলেন লক্ষপতি, আর বিষয়বিষে তাঁহার অন্তরে জাগিল প্রমত্ততা। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় প্রধানত যে ধনী শিষ্যের ঘরবাড়ী, সুনাম ও অর্থসম্পদের সুযোগ লইয়া ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠিল, প্রকারান্তরে সেই গণেশ শ্রীমাণী হইলেন প্রবঞ্চিত। শ্রীমাণীর যত অভিমান হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর।··· সহজাত গুরুনিষ্ঠা ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের জন্য তাঁহার সম্পর্কে ঠাকুর বলিতেন: ওর স্মৃতি আমার অন্তরে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।···

সেই আদর্শ ভক্ত শিষ্য ভুল বুঝিয়া অভিমানে ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিলেন—আর ঠাকুর পাইলেন দারুণ আঘাত।···

বিষয়-মদমত্ত শিষ্যের তবু চৈতন্য হইল না ; বরং শিষ্য ও ভক্তদের নিকট হইতে ঠাকুরের নামে সংগৃহীত অর্থ নিয়োজিত করিতে থাকেন সেই ব্যবসায়ে। আর ঠাকুরকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে কিছু তাঁহার নামে, কিছু নিজ আত্মীয়ের বেনামে খরিদ করেন প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। সবই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজার জন্য, সুতরাং ইহাতে আর অপরাধ কোথায় ?

বিষয়বিরাগী ঠাকুর কিন্তু প্রমাদ গণিলেন। গৃহী-সন্ন্যাসী ভগবান বিজয়কৃষ্ণের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আদর্শ মানসপুত্র শ্রীমৎ কুলদানন্দজী। যোগৈশ্বর্যশালী মহারাজা হইয়াও তিনি ভিক্ষাজীবি, আকাশবৃত্তিধারী। বৈষয়িক ও জাগতিক ধনসম্পদ তাঁহার নিকট যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এছাড়া, তাঁহার নামেও যদি কেহ কিছু গড়িয়া তোলে, তবু ব্রহ্মচারীর যথাসর্বস্বই যে শ্রীগুরুর উদ্দেশে সমর্পিত। এজন্য বিষয়ী শিষ্যকে তিনি লেখেন ঃ

···"কিছুকাল যাবৎ আমার মনে হইতেছে—ছোটদাদা এবং আমি অথবা আমাদের কেহ আর অধিক কাল ইহলোকে থাকিব না। এতকাল অক্লান্ত শ্রম করিয়া যে সমস্ত আমার জন্য করিলে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ীঘর, টাকাকড়ি যে সকল আমাকে করিয়া দিলে, যদি অচিরে তাহা ঠাকুরের (গোসাঁইয়ের) সেবায় অর্পিত না হইল,—তাহা হইলে পরে সমস্তই বৃথা মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যাইবে।

···সমস্ত ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া জীবিকা-নির্বাহের জন্য যদি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় তাহাতেই জীবন যথার্থ সার্থক হইবে। সুতরাং ঠাকুরের সেবায় ঠাকুরের একান্ত সেবকের হস্তে তাঁহার নির্দেশ মত সব কিছু অর্পণ করিয়া প্রাণের জ্বালা মিটাইতে ব্যস্ত হইয়াছি—এ বিষয়ে তুমি যথাসাধ্য আমায় সাহায্য কর এই আকাঙ্ক্ষা করি।

···সময় নিকটবর্তী, কোন আশাই বুঝি পূর্ণ হলো না—অথচ এই অর্থ ঐশ্বর্য্য লইয়া পরে বাঘে মহিষে রক্তারক্তি করিবে—এই আতঙ্কে সর্বদা বুক দুরদুর করে।···"

'ব্রহ্মচারীর যথাসর্বস্ব গুরুর' শাস্ত্রের এই অনুশাসন অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন ব্রহ্মচারী মহারাজ—তাঁহার নামে শিষ্যদের চেষ্টায় অর্জিত সব কিছু তাঁহার গুরুর একান্ত সেবক সারদাকান্তজীর হস্তে গুরুর নামে অর্পণ করিতেই তিনি আগ্রহশীল। ভবিষ্যতে সর্বনাশের পথ হইতে বিষয়বিষে জর্জরিত শিষ্যদের রক্ষা করিবার জন্যও বিশেষ সচেষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ। তাঁহার আশঙ্কা যে অমূলক নয় তাহা অচিরে প্রতি অক্ষরে সত্যে পরিণত হইতে চলিল। বৈষয়িক বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয়ে শিষ্যের আচরণে দেখা দিল প্রতিক্রিয়া, আশাতীত অর্থ ও বিষয়সম্পত্তির অতিরিক্ত প্রলোভনে প্রবঞ্চনার পথে শুরু হইল অধোগতি। বানের জলে যে বিপুল অর্থ ভাসিয়া আসিয়াছিল, ভাঁটার টানে অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহা পুনরায় নিঃশেষ হইতে লাগিল—বিষয়ী শিষ্য ও সেই সঙ্গে ঠাকুরও হইলেন ঋণজালে জড়িত, অবশেষে শিষ্য হইলেন দেউলিয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও আশ্চর্য নির্বিকার। তিনি লিখিলেন ঃ "... আমাদের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া দুঃখিত হইও না। চিরকালই কি একভাবে যায়? ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম নয়। এটি আকস্মিক কোন ত্রুটিতে হয় নাই। ঠাকুরের অলঙ্ঘনীয় নিয়মেই এ সকল হইতেছে, ইহা পূর্ব হইতেই ব্যবস্থাবদ্ধ। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সমস্তই তাঁর ব্যবস্থানুরূপ ঘটিতেছে। ঠাকুর কিভাবে কার কল্যাণ করেন—বুঝা বড় শক্ত। আমরা ফকিরের দল, আমাদের যথার্থ অবস্থা যদি ঠাকুর দয়া করিয়া আমাদের দেন, তাহা তো আনন্দেরই কথা। সকল অবস্থায় চিত্তের ধৈর্য্য ও সন্তোষ যদি এক প্রকার না রহিল—তাহলে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণের সার্থকতা কি? যা হয় হউক—সব গেলেও আমরা মহারাজা—আমাদের কিছুই যাবে না। চিন্তা কি?

...বৈষয়িক ব্যাপারে আমার সমস্ত ভারই তো তোমার উপর। উহা লইয়া আমার সহিত পরামর্শ অনাবশ্যক। যাহা ভাল মনে কর নিঃসঙ্কোচে করিবে। তোমার বুদ্ধি মত কিছু করিয়া যদি আমার

সর্বস্বান্ত হয়, বিন্দুমাত্রও আমি দুঃখিত হইব না—বরং ঠাকুরের আশীর্বাদ মনে করিয়া আনন্দ করিব। আমার এক মুঠো ভগবান দিবেন।

…পুরীর আশ্রম, অন্যান্য জায়গা জমি, এমনকি লোহার দোকান বিক্রি করিয়াও যদি এই দায় হতে নিষ্কৃতি পাইয়া সুস্থির হইতে পার আমার একটুকু আপত্তি নাই। ঋণগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু হলে বড়ই দুর্দশা। যাহা কিছু সমস্ত তুমিই করিয়াছ—এখন তোমার শান্তির জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে একটুকু দ্বিধা করিও না। ঠাকুরের কৃপায় ওসব ঐশ্বর্য্য হয়েছিল—এখন তাঁর ইচ্ছায় এসব গেলে আমাদের আর ক্ষতি কি? তাঁর ইচ্ছার উপরে নিজকে ছাড়িয়া দেও—যা হয় হউক।

…ঠাকুর আমাদের কাঙালকে বড় ভালবাসেন। সর্ব্বস্বান্ত না করিলে তিনি আমাদের ঠাকুর হবেন কিরূপে? কাঙাল করিলে তাঁরই শান্তিপ্রদ শ্রীচরণের আশ্রয়ে আমাদের টানিয়া নিতেছেন বুঝিব। আমাদের কোন দিকেই ঠক নাই। সংসারে থাকিলে রাজাধিরাজের মত—আর কাঙাল হলে ঠাকুরই আমাদের সম্পত্তি। এসব কাকবিষ্ঠা তুল্য বিষয়ের জন্য চিত্ত উদ্বেগযুক্ত করিও না। ভিতর ঠাণ্ডা রাখিয়া যাহা পার করিয়া যাও—যাহা হইবে তাহা ব্যবস্থাবদ্ধ আছে। তাহা কিছুতেই অন্যথা হবে না—এবং তাহা দ্বারাই জীবনের আত্মার যথার্থ কল্যাণ হইবে।"

সামান্য অংশ ব্যতীত প্রায় সমস্ত চিঠিখানি উদ্ধৃত হইল। বাহ্যত ইহার কোন কোন অংশ আপাতবিরোধী মনে হইতে পারে; কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করিলে বোঝা যাইবে, এই পত্রই শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালীন মনোভাবের নিখুঁত দর্পণ। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতিতে একেবারে উদাসীন। শুধু তাই নয়, বিষয়সম্পত্তি তাঁহার নিকট কাকবিষ্ঠা তুল্য; এজন্য ধনী শিষ্যটীকে উপলক্ষ করিয়া সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াও সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতেছেন তাঁহারই উপর। এ যেন পুতুল খেলা—'হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙ্গলাম।'…যে সব কিছু গড়িয়াছে, ভাঙ্গিবার ন্যায্য অধিকার তো তাহারই।…এই অত্যুদার মনোভাবের

জন্যই অদোষদর্শী ঠাকুর শিষ্যের এতটুকু দোষ-ত্রুটি দর্শন করেন নাই—বরং অপার স্নেহ ও সমবেদনায় সর্বস্বান্ত অধঃপতিত শিষ্যকে রক্ষা করিতে যত্নবান। বৈষয়িক তথা আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম তথা ভগবান শ্রীগুরুর দুর্লঙ্ঘ বিধানের উপর নির্ভরশীল ; শিষ্যকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে আজ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন সেই নিগূঢ় তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেবের প্রতি চিরদিনই একান্ত অনুগত ও গভীর ভক্তিপরায়ণ ; কিন্তু আজ তিনি শুধু আদর্শ শিষ্য নন—মহিমময় পতিতপাবন সদ্‌গুরু।…'সুখেষু বিগত স্পৃহঃ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা'— এই অবস্থায় নিজে উপনীত হইয়াও আজ তাঁহার তৃপ্তি নাই, পতিত শিষ্যকে সবলে আকর্ষণ করিতে চান সেই মহান আদর্শের পথে।…এছাড়া, অর্থই যে সর্ব অনর্থের মূল, বিষয়বিষ সত্যই যে কত বড় সর্বনাশা, তাহা চোখে আঙুল দিয়া সর্বসাধারণকে দেখাইয়া দেওয়াও হয়ত ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সেজন্য কাঙালকে পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়া অভিষিক্ত করিলেন রাজসিংহাসনে, পুনরায় তাহাকে পথের ধূলায় টানিয়া আনিয়া স্থাপন করিলেন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।…সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় শিক্ষা দিলেন অটল ধৈর্য ও ঈশ্বর নির্ভরতা।…

এই ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়াইয়া আপন কর্তব্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। ভগবান বিজয়কৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ঘরে ঘরে সদ্‌গুরুর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। এজন্য ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা 'ব্রহ্মচারী ভাণ্ডার' নামে স্থাপন করেন একটী স্থায়ী ভাণ্ডার—সেই ভাণ্ডার হইতে প্রতিমাসে যথেষ্ট অর্থ শ্রীগুরুর সমাধিতে রীতিমত সেবাপূজার উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করেন। গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দিরের পার্শ্ববর্তী নিজস্ব ঠাকুরবাড়ী আশ্রমেও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বিগ্রহত্রয়— শ্রীশ্রীমহাবিষ্ণুচক্র, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জিউ ও শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী ঠাকুরাণীর বিগ্রহ। এছাড়া, পুরী সমুদ্রতীরে পুলিনপুরী ঠাকুরবাড়ীতে এবং ভুবনেশ্বর, কাশী, শ্যামপুর ও গোপালগঞ্জ আশ্রমেও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ভগবান গোসাঁইজী ও

মাতাঠাকুরাণীর সেবা ও পূজা। তাঁহার অবর্তমানে সর্বত্রই সেই সেবা পূজা যাহাতে যথারীতি অক্ষুণ্ণ থাকে সেইদিকে ছিল তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টি। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থসম্পদ তাঁহার তরফ হইতে অর্জিত হইয়াছে একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই। এজন্য সমস্ত সম্পত্তি এবং ব্রহ্মচারী ভাণ্ডার ও সদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমুদায় অর্থ বিনিয়োগ করিয়া ভগবান বিজয়কৃষ্ণের সেবাপূজার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার সংকল্প করেন তিনি।

কিন্তু সর্বত্যাগী মহাদেবের পার্শ্বে ঘটিল নন্দীভৃঙ্গির সমাবেশ সংকল্প সাধনের অভিপ্রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের, কিন্তু সেই মহান লক্ষ্যের পশ্চাতে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপক সাজিয়া দাঁড়াইলেন বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন কতিপয় শিষ্য। বিশেষত, সেই বিষয়ীদের মধ্যমণি তখন দেউলিয়া, আর তাঁহাকে রক্ষা কবিবার জন্য চিরউদাসী ব্রহ্মচাবী মহারাজ কাঙাল সাজিতেও প্রস্তুত। অপার স্নেহময় পিতার আশ্রয়ে এইভাবে প্রশ্রয় পাইয়া বসিলেন বিষয়ী সন্তান—আর তাঁহাদের সহজাত প্রবৃত্তি বশে চলিল উইলের খসড়া রচনা। পূর্বোক্ত পত্র দুইখানির মধ্য দিয়া ঠাকুরের যে ইচ্ছা, শিক্ষা ও আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যথোচিত মর্যাদা দানের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইল গৌণ; তাঁহাদের ব্যবস্থাপনায় বিষয়ীদের সুবিধাবাদের প্রচ্ছন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সম্পাদিত হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের উইল। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় দলিলে দেখা দিল অনেক ভুল, ত্রুটি ও অসঙ্গতি, আর বিগ্রহের সেবাপূজা ও আশ্রম পরিচালনার অন্তরীক্ষে বিষয় বুদ্ধির নানা খেলা।...

বৈষয়িক বিচার বিশ্লেষণ পরিহার করিয়া নিতান্ত সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা চলে: সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া তাহার আয় তিনভাগে বণ্টন করা হইল—অর্ধেক ব্যয়িত হইবে বিগ্রহত্রয়ের সেবায়, সিকিভাগ পাইবেন সেবায়েত এবং বাকি অংশ ব্যয় করা হইবে আশ্রম সংরক্ষণের জন্য। সেবাপূজা ও আশ্রম পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হইল পাঁচজন মনোনীত সদস্য সম্বলিত একটী কমিটীর উপর। বিগ্রহত্রয়ের সেবাপূজার দায়িত্ব সেবায়েতের, কিন্তু তিনিও কমিটীর কর্তৃত্বাধীন—

এক কথায় কমিটীর সদস্যরাই শাসক, সর্বময় কর্তা। শ্রীগুরু মহারাজ মনোনীত করিলেন কমিটীর প্রথম পাঁচজন সদস্য—তাঁহারা এই দলিলের ব্যবস্থাপক এবং উইলে বর্ণিত প্রায় সমুদয় সম্পত্তির দাতা শ্রেণীভুক্ত।··· বলা বাহুল্য শ্রীগুরু মহারাজের চরণে নিবেদিত হইয়াছে অজস্র অর্থ ও অলঙ্কার, আর বিষয়ী শিষ্য তাহা নিয়োজিত করিয়াছেন ব্যবসায়ে; কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ বা স্বীকৃতি রহিল না এই উইলে।

এবার ১৩৩৪ সালে মাঘ মাসের প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর কাটোয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বিষয় সম্পত্তির নানা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য আনয়ন করা হইল এটর্নী বাবুকে—সমস্যা জটিলতর হওয়ায় নির্বিকার ঠাকুরকে বুঝাইয়া পুনরায় সৃষ্টি করা হইল 'অর্পণনামা'। ব্যবসায়ে দেউলিয়া হইয়া ভবিষ্যতে আশ্রমে নিজ স্বার্থ ও প্রভুত্ব বজায় রাখিবার কৌশল জাল বিস্তার করা হইল, অর্থপুষ্ট এইসব আইনজ্ঞদের মাধ্যমে। এক উকিল শিষ্যের বাড়ীতে সাবরেজিষ্ট্রারকে আনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বারা রেজিষ্ট্রী করান হইল সেই দলিল।*

এক বৎসর পরে একই বিষয়-সম্পত্তি লইয়া পুনরায় এই 'অর্পণনামা' দলিল সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য কী, তাহা বৈষয়িক মানদণ্ডে বিচার সাপেক্ষ। সে বিচার বা দলিল দুইটীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে উইলের প্রবেট লইবার পূর্বে অর্পণনামা সম্পাদিত হওয়ায় বাহ্যত ইহা উইলের সংশোধিত সংস্করণ এবং সেই হিসাবে প্রামাণিক। কিন্তু যে সমস্ত অসঙ্গতির সৃষ্টি হইল, তাহা ন্যায়বিচার তথা শ্রীশ্রীঠাকুরের মূল উদ্দেশ্যের পুরোপুরি অনুকূল নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে: বিগ্রহের সেবাপূজার ব্যয় অপেক্ষা দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের অঙ্ক এবারেও দেখান হইল অনেক কম—এই প্রধান অসঙ্গতির ফলে অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি গোসাঁইজীর উদ্দেশে অর্পণ করিবার যে সাধু-সঙ্কল্প ঠাকুরের ছিল, তাহা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিল সমধিক। দ্বিতীয়ত উইলে সম্পত্তির 'প্রায়' সমস্তই কতিপয় শিষ্যপ্রদত্ত লিখিত হওয়ায় আংশিক সম্পত্তিতে নিজ অধিকার বলে

* শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারিজীর লিখিত 'বৈষয়িক জগতে ব্রহ্মচারী' দ্রষ্টব্য।

তাহার যৎসামান্য কয়েক জনকে দান করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কিন্তু অর্পণ-নামায় 'সমস্ত' সম্পত্তি কতিপয় শিষ্যপ্রদত্ত লিখিত হওয়ায় ন্যায্য স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন ঠাকুর, কাহাকেও কোন কিছু দান করিবার সুযোগ তাঁহার আর রহিল না।...অবশ্য, চিরউদাসী ঠাকুরের বিষয়-অনাসক্তি সন্দেহাতীত—তাই আপন স্বত্বাধিকারের দিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না তিনি, দলিল কোনদিন পড়িয়াও দেখিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমর জীবনবেদ অনুধাবন কালে তুচ্ছ বৈষয়িক ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু গীতায় উক্ত ভগবদ্-ভাবের যিনি জীবন্ত বিগ্রহ, তাঁহাকেও বিষয়ীদের গোলকধাঁধায় কীভাবে ঘুরিতে হইয়াছে তাহার আভাস মাত্র দিবার জন্য এই প্রসঙ্গের অতি সংক্ষিপ্ত অবতারণা। দয়াল ঠাকুরের অপার স্নেহের রাজ্যে আশাতীত অধিকার লাভ করিয়া আত্মহারা হইলেন বিষয়ী শিষ্য—আর তাঁহাদের মত্ততার নিকট শুধু ঠাকুরের নিজস্ব সঙ্কল্প ও আদর্শ নয়, গোসাঁইজীর নির্দেশও প্রকারান্তরে গৌণ ও নিরর্থক হইয়া উঠিল। গুরুগতপ্রাণ ঠাকুরের পক্ষে এই ত্যাগস্বীকার ছিল অভাবনীয়; তবু পথভ্রষ্ট শিষ্যের মুখ চাহিয়া আপন সঙ্কল্প সাধনের পরিবর্তে শিষ্যের অভিপ্রায় মানিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হন নাই তিনি।...সেজন্য চিরনির্লিপ্ত, আজন্ম উদাসী হইয়াও বিষয়বিষে জর্জরিত হইয়াছেন,...এমনকি আশ্রমের বাহিরে বিষয়-মদমত্ত কোন কোন শিষ্য-শিষ্যার নির্লজ্জ অসদাচরণের জন্য তাঁহাকে কলঙ্কের ভাগী হইতেও হইয়াছে।...তবু আশ্রমদ্বার কাহারও নিকট বন্ধ করা দূরে থাক, অনন্ত স্নেহে ও অসীম ক্ষমায় পতিতোদ্ধারের জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন সেই দুঃসহ নরকাগ্নি।... ব্রহ্মচারিজীকে গোসাঁইজী একদিন বলিয়াছিলেন: তোমরা যদি নরকেও যাও, সেখানেও তোমাদের বুকে করে রাখবার একজন আছে।...গোস্বামী প্রভুর সেই অমর বাণী সার্থক হইয়া ওঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবনে।...

সেই সমস্ত গুরুতর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন গুরুনিষ্ঠ কোন কোন ত্যাগী শিষ্য—ঠাকুরের উপর অন্যায়ভাবে আরোপিত কলঙ্কের জন্য অস্থির হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যথোচিত প্রতিকার। তবুও অটল

ধৈর্যের সহিত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন ঃ ওরে তোমরা ওসব দিকে নজর দিও না—সবই আমি জানি ···কখনও বা প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ সক্রেটিসের মত অবস্থা তাঁহারও তো হইতে পারে। ···তাহাতে তাঁহার নিজের কিছুমাত্র ভয় বা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—কিন্তু হতভাগ্যেরা যে নরকের অতল তলে নিমজ্জিত হইবে, তাহাদের উদ্ধারের কোন পন্থাই রহিবে না।···মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মত শিক্ষিত, ত্যাগবৈরাগ্য সম্পন্ন ছেলেরা যদি আগে আমার কাছে আসতে!···ইহাকেই বলে ঃ পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।···

আদর্শ সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহের শাসন ছিল অতীব কঠোর। আবার, পতিত সন্তানদের সর্ব গ্লানি ও কলঙ্ক অপনোদন করিয়া আপন বক্ষে তাহাদের দিতেন নিরাপদ আশ্রয়। শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে নানা কামনা, প্রলোভন ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার উলঙ্গ পরিচয় পাইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেন রুদ্র মূর্তিতে। কিন্তু শত অন্যায় সত্বেও বিতাড়িত করা দূরে থাক কখনও কাহাকেও অভিশাপ পর্যন্ত দেন নাই; বরং শান্ত হইলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বলিয়াছেন ঃ এর পরে রাজা-রাজড়া হয়ে জন্ম নিয়ে ওদের প্রারব্ধের ভোগ কাটাতে হবে।···

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজ হইতে প্রথমে যাহা বলেন তাহাই তাঁহার কথা, পরে যে যাহা বলাইয়া লইতে চায় তাহাই বলেন। গোসাঁই সেবায় যথাসর্বস্ব অর্পণ করা যখন ব্যর্থ হইল তখন তিনি রহিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। যেন দশচক্রে ভগবান ভূত। শিষ্যদের বৈষয়িক প্রমত্ততায়, চারিত্রিক অধোগতিতে তাঁহার আচরণ গভীর প্রণিধানযোগ্য। সর্বজ্ঞ ত তত্ত্বদর্শী হইয়াও হয়ত বিষয়ীদের অধঃপতন দেখাইবার জন্যই ক্রটিপূর্ণ দলিল দুটীতে নির্বিচারে স্বাক্ষর করিলেন,··· শিষ্যের গুরুতর অন্যায় ও অপরাধে গ্রহণ করিলেন সমস্ত হলাহল. তাঁহার লীলা-মাহাত্ম্য সঠিক অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে গভীর চিন্তা ও অনুধ্যানেব ফলে মনে হয়, কামিনী ও কাঞ্চন সম্পর্কিত সর্ববিষয়েই প্রথম জীবন হইতে যেমন ছিলেন চির নির্লিপ্ত, তেমনি জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে সদ্‌গুরু রূপেও তিনি ছিলেন আশ্চর্য

নির্বিকার। শুধু বিষয়ীদের সংস্পর্শে নয়, মহিলাদের সঙ্গেও আচরণে তাঁহার শিশুসুলভ সারল্য ও নিঃসংকোচ ভাব ছিল চির অটুট। এজন্য কোন কোন সতীর্থ, শিষ্য ও সাধারণের নিকট হইতে তাঁহার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হইয়াছে অনেক কলঙ্ক ও অপমান। তবু তিনি ছিলেন পর্বতের ন্যায় অটল, বদনে অমিয় হাসি ছিল চির অমলিন। তাঁহার লীলা-মাহাত্ম্যের যথার্থ পরিচয় ও সার্থকতা হয়ত এখানেই। এজন্য কোন পথভ্রষ্ট, পতিত শিষ্য বা শিষ্যার দোষ দর্শন ও সমালোচনা নিরর্থক; বস্তুত নিজেদের প্রারব্ধ ভোগের সহিত তাঁহারা ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাপুষ্টির সহায়ক। নতুবা চির উদাসী হইয়াও তুচ্ছ বিষয়ীদের সঙ্গে জড়িত রহিবেন কেন? কামিনী-কাঞ্চন হইতে দূরে থাকিবার মত চিত্তের কোন বিকার বা কিছুমাত্র দুর্বলতা তাঁহার ছিল না; বরং ইহা লইয়া অবহেলে খুশীমত খেলা করিয়াছেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও উদ্বেগশূন্য অবস্থায়। শত অন্যায় ও অনাচারের মধ্যদিয়াও অটল ধৈর্য ও অসীম ক্ষমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কালজয়ী মহত্ত্ব ও মহাসিদ্ধির প্রদীপ্ত স্বাক্ষর,...অনন্ত দৈন্য, কামনা ও কলঙ্কের পাথারে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার চির ভাস্বর মহিমময় শ্রীমূর্তি।...জনহিতার্থে চরম বেদনার মধ্য দিয়াই তাই কি তাঁহার এই মহৎ শিক্ষা দান—নীলকণ্ঠরূপে এই অনুপম লীলা বৈচিত্র্য?...

অর্পণনামা দলিল সম্পাদিত হইবার পর পুরীধামে গমন করেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

নিজস্ব ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে বিগ্রহত্রয়ের সেবাপূজার আশানুরূপ না হইলেও যা হ'ক কিছু ব্যবস্থা হইল; কিন্তু গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দিরের জন্য বরাদ্দ হইল কেবলমাত্র সদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থের আয়ের অর্ধেক অংশ। তাহাতে ঠাকুরের উদ্বেগ দূর হইল না—সমাধিতে গোসাঁইজীর সেবাপূজার ব্যবস্থার জন্য নির্ভর করিতে হইল নিজের 'ব্রহ্মচারী ভাণ্ডারের' উপর।

আপনার জন্য জীবনে কখনও কাহারও নিকট কোন কিছু যিনি প্রত্যাশা করেন নাই, নিজের অবর্তমানে গোসাঁইজীর সমাধিতে সেবা

পূজার কী ব্যবস্থা হইবে সেই উদ্বেগে তিনি শিষ্যবর্গের নিকট প্রসারিত করিলেন তাঁহার ভিক্ষাপাত্র। যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও বসন্ত ভট্টাচার্য চাঁদা আদায়ের জন্য নানাস্থানে গুরুভ্রাতাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শেষে একমাত্র বসন্তদাদা এই কার্য্যে ব্রতী রহিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অনেকে নামে ও দানে অনুপ্রাণিত হইতেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে যে মুদ্রিত আবেদন পত্র প্রচার করা হইয়াছিল নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

পরম স্নেহাস্পদ শিষ্যমণ্ডলী—

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জিউর সমাধি ৺পুরীধামে রহিয়াছে, আপনারা জ্ঞাত আছেন। তাঁহার সেবাপূজা প্রভৃতির জন্য এ পর্য্যন্ত কোনও স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা নাই। আমার গুরুভ্রাতারা খুব অল্প সংখ্যকই জীবিত আছেন। ঠাকুরের সেবাপূজা কি উপায়ে চলিবে ভাবিয়া আমি সর্বদা উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা, কেবলমাত্র আপনাদের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা একটি স্থায়ীভাণ্ডার স্থাপিত হয়। তাহার আয়দ্বারা বর্ত্তমানের ন্যায় ঠাকুরের সেবাপূজাদি যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে চলিতে পারে, তাহার একটি সুব্যবস্থা হয়। ইহাতে ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রয়োজন। উক্ত ভাণ্ডারের জন্য আমি কাতরভাবে আপনাদের নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছি। সন্তুষ্ট-চিত্তে এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। এবং তদ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ, এবং ঠাকুরের ভোগে ঐ মহাপ্রসাদ অর্পণ, তৎপরে সমাধিবাসী ভক্ত মণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা ভিক্ষাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া "পুরী ঠাকুরবাড়ী" ঠিকানায় আমাকে জানাইবেন। এক বৎসরের মধ্যে প্রতিশ্রুত টাকা প্রদান করিলে সুখী হইব। ঠাকুর আপনাদের চির কল্যাণ করুন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক,
শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

চাকুরী উপলক্ষে তখন বহাল আছি কটক সহরে। সুযোগ পাইলেই পুরী আশ্রমে গমন করিয়া গুরু মহারাজের সঙ্গলাভে ধন্য বোধ করি।

একদিন রবিবার সকালের ট্রেণে রওনা হইয়া যথা সময়ে পৌছিলাম পুরী আশ্রমে। ঠাকুরের দেহ অসুস্থ, তবু যেন ভ্রূক্ষেপ নাই—সর্বদাই নামানন্দে বিভোর। শ্রীচরণে প্রণত হইতেই মধুর হাসিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সেই অমিয় হাসি দেখিলে শুধু আমাদের নয়, সকলেরই মনে হইত ঃ এমনটি আর দেখি নাই—নিমেষে যেন নিঃশেষ হইয়া যাইত সর্ব দুঃখজ্বালা, সমস্ত অশান্তি ও উদ্বেগ ঃ বড় ইচ্ছা হইত সর্ব স্বার্থ, সর্ব কাম্য বিসর্জন দিয়া শুধু সেই দিব্য শ্রীমূর্তির দিকে অপলকে চাহিয়া বসিয়া থাকি দিন রাত্রি, আর মাঝে মাঝে তাঁহার বচনামৃত ও মধুর উপদেশ লাভে কৃতার্থ হই।···

দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত অলোচনা হইতেছিল নানা বিষয়ে। সমাজ-জীবন যে কত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে, হিতকর কোন কর্তব্য সম্পাদন কালে যে কত বাধাবিঘ্ন ও বিরূপ সমালোচনা দেখা দেয়, সবিনয়ে তাহা নিবেদন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মধুব কণ্ঠে বলিলেন ঠাকুর ঃ

"জাড্যং হ্রীমতি গণ্যতে ব্রতরুচৌ দম্ভঃ শুচৌ কৈতবং
শূরে নির্ঘৃণতা মুনৌ বিমতিতা দৈন্যং প্রিয়ালাপিনি।
তেজস্বিন্যবলিপ্ততা মুখরতা বক্তর্য্যশক্তি স্থিরে
তৎ কো নাম গুণো ভবেৎ সুগুণিনাং যো দুর্জনৈর্নাঙ্কিতঃ॥

তুমি লজ্জাশীল হ'লে দুর্জনে বলবে তুমি জড় বুদ্ধি, নিয়মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী বীর্যবান হ'লে বলবে দাম্ভিক, কপট ও নিষ্ঠুর, সরল ও প্রিয়-ভাষী হ'লে বলবে তেজোহীন। তেজস্বী, বাগ্মী আর ধীর বুদ্ধি হলে বলবে তুমি উদ্ধত, বাচাল আর বোকা—গুণী ব্যক্তির এমন কোন গুণ নেই যাকে দুর্জন কলঙ্কিত না করে।···তাই ব'লে থেমে গেলে তো চলবে না, সাধ্যমত সমাজ সেবা করতে হ'বে, নিন্দা-প্রশংসা তুচ্ছ করে জনকল্যাণ ব্রত পালনের পথে এগিয়ে যেতেই হবে।···

নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হইলাম, কিন্তু অনুপ্রাণিত হইলাম অনেক বেশী। ঠাকুরের কথা শুধু কথা নয়—সেই বাণীর পশ্চাতে যেন কত শক্তি, কত আনন্দ ও অনুপ্রেরণা।...

পাশে বসিয়াছিলেন আর একজন গুরুভ্রাতা। তাঁহাকে ঠাকুর বলিলেনঃ তোমার স্ত্রীকে ব্রাহ্মণের পাদোদক খাওয়াতে বলেছিলাম, তুমি তা না করে চিকিৎসায় বহু টাকা ব্যয় করেছ—শেষে তাকে মারবার জন্য এখানে এনেছ। তোমাদের দুর্বুদ্ধি দেখে ব্যথা পাই।

সবিনয়ে গুরুভ্রাতাটি বলিলেনঃ গলায় পৈতে থাকলেই তো আর ব্রাহ্মণ হয় না—আমার কারো উপর বিশ্বাস নেই। বড় বড় ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছে, তাই স্ত্রীর শেষ ইচ্ছায় আপনাকে দর্শন করাতে এনেছি।

নীরবে ক্ষণকাল গম্ভীর হইয়া রহিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবান গোসাঁইজীর আদর্শে শাস্ত্র, সদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্মে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী। গোসাঁইজী ও মাতাঠাকুরাণীর পূজা করিবার অধিকার সকলেরই; কিন্তু আশ্রমে বিগ্রহের সেবাপূজা যাহাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই গোসাঁইজী ও মাতাঠাকুরাণীর বিগ্রহের পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছেন নিজস্ব পূজিত শালগ্রাম শ্রীশ্রীমহাবিষ্ণুচক্র। আজো' তিনি প্রকট করিলেন মধুর লীলা। রাস্তা দিয়া যাইতেছিল একটি উড়িয়া ব্রাহ্মণ—তাহাব দুই পায়ে গোদ, নোংরা পা দুখানি ধূলিধূসরিত। আশ্রমের একজনকে ঐ ব্রাহ্মণের পাদোদক আনিবার নির্দেশ দিলেন ঠাকুর। গুরুভ্রাতাটি প্রমাদ গণিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন।

তবু উপায় নেই—ঠাকুরের নির্দেশ, বিশেষতঃ গুরুভগ্নির প্রাণের দায়। গুরুভগ্নি ভক্তিভরে পান করিলেন সেই পাদোদক—আর অচিরে তিনি রোগমুক্ত হওয়ায় গুরুভ্রাতাটি হতবাক হইলেন, নিজের ভুলও বুঝিতে পারিলেন।...

সেইদিনই রাত্রে কটকে ফিরিব ভাবিয়া সঙ্গে শীতবস্ত্র বা বিছানাপত্র কিছুই আনি নাই; কিন্তু রাত্রে আশ্রমে থাকিয়া পরদিন কর্মস্থলে যাইবার আদেশ দিলেন ঠাকুর। স্বভাবতঃ ব্রহ্মচর্য ব্রতপালনে তৎপর ছিলাম, অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র বা শয্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ, সুতরাং সমস্ত

রাত্রি ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিলাম।

মাঘ মাস—বাহিরে শীতের দারুণ প্রকোপ। রাত্রে বিনা শয্যায় বা শীতবস্ত্রের অভাবে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ার কোন ভরসাই ছিল না। কিন্তু আসনে বসিয়া প্রথম প্রহরেই অনুভব করিলাম, আমি যেন কোন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সুকোমল শয্যায় শায়িত।···সেই অবস্থায় সারা রাত্রি কাটিয়া গেল পরম সুখে, গভীর নামানন্দে।···

প্রত্যূষে বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া প্রণত হইলাম শ্রীগুরুচরণে। ঠাকুর সস্মিত মুখে শুধাইলেন: শীতে কোন কষ্ট হয় নি তো ?···

মনে পড়িল রাত্রে পরমাশ্চর্য অনুভূতির কথা—বুঝিলাম সবই দয়াল ঠাকুরের অপার কৃপা। মুগ্ধ বিস্ময়ে ও আনন্দে চোখে জল আসিয়া পড়িল—দেখিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় মাখা বদনে পাগল করা সেই অমিয় হাসি, সেই অনন্ত স্নেহরাশি!···চোখের জলে শ্রীচরণে বার বার বিহ্বল প্রণাম জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।···

বৎসরের শেষভাগে এবার পুরী ধামেই অবস্থান করিতে লাগিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এজন্য কটক হইতে আসিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নির সহিত ঠাকুরকে লইয়া শিবরাত্রি পালন করিবার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইলাম। শিবরাত্রি উপলক্ষে রাত্রির চারি প্রহরে চারিবার শিবের উদ্দেশ্যে গোসাঁইজীর মস্তকে ফুলজল অর্পণ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরু মহারাজের সহিত আমরাও অংশ গ্রহণ করিলাম সেই পূজায়। কিন্তু আমাদের মস্তক চারিপ্রহরে প্রতিবার স্বতই অবনত হইল সাক্ষাৎ নীলকণ্ঠের শ্রীচরণতলে—এক অব্যক্ত প্রেরণায় সমস্ত পূজা-অর্চনা নিবেদন করিলাম তাঁহারই উদ্দেশে। শিবরাত্রির মাহেন্দ্র লগ্নে সাক্ষাৎ মহাদেবের পূজা করিবার এই আনন্দ সত্যই অপার্থিব ও সুদুর্লভ।···

পূজার লগ্ন ভিন্ন অন্য সময়ে ধ্যানমগ্ন রহিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—যেন সাক্ষাৎ যোগিশ্বর শিবশঙ্কর। তাঁহার সমক্ষে আমরাও নিমগ্ন রহিলাম অপার নামানন্দে।

তৃতীয় প্রহরে কীর্তনানন্দে মত্ত হইলাম সকলে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর হোম করিতে বসিলে আমরা কীর্তন বন্ধ করিলাম। ঠাকুর বলিলেন ঃ কীর্তন বন্ধ করতে হবে না—তোমরা আনন্দ কর।

ঃ এতে আপনার ব্যাঘাত হবে তো ?

আমার কথায় একটু গম্ভীর হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ক্ষণকাল পরে মৃদুমধুর কণ্ঠে বলিলেন ঃ ব্রহ্মচর্য বলতে তোমরা শুধু বীর্য ধারণ মনে কর। কিন্তু আসলে তা নয়। মনে কর একটা বড় হলঘরে বক্তৃতা হচ্ছে, আর তুমি পাশের লোকের পকেটে রক্ষিত ঘড়ির আওয়াজ মাত্র শুনছ।...আকাশে এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে, তুমি ঝাঁকের মধ্য থেকে একটা মাত্র পাখীকে দেখছ।...বহু লোকে নানা রকম সেণ্ট মেখে এসেছে, সব রকম মিলে একটা অদ্ভুত গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু তুমি প্রত্যেকটি গন্ধ পৃথক ভাবে অনুভব কচ্ছ।...ঝাল-টক-মিষ্টি মিশিয়ে খাবার তৈরী হয়েছে, তোমার জিহ্বা পৃথক ভাবে এক একটা স্বাদ আস্বাদন করছে।...এইভাবে যিনি দশ ইন্দ্রিয় এবং তাদের রাজা মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ক'রে আপন ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন, তিনিই প্রকৃত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।...তোমরা কীর্তন ক'রে যাও, তাতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।...

ঠাকুরের কথায় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না—ব্রহ্মচর্যের নূতন ব্যাখ্যায় দর্শন করিলাম নূতন আলোক, লাভ করিলাম অভিনব চেতনা।...

দোল উৎসব উপলক্ষে দৈহিক অসুস্থতা সত্বেও প্রাণ খুলিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিলেন শ্রীগুরুদেব। আর শিশুর মত অনাবিল আনন্দে আবীর দিয়া রাঙাইয়া তুলিলাম ঠাকুরের রাতুল সুকোমল চরণপদ্ম। ঠাকুরও সকলের অঙ্গে আশীর্বাদী আবীর ছড়াইয়া আনন্দ বর্ধন করিলেন চতুর্গুণ। অবশেষে গুরুভগ্নিরা যেন গোপীদের মত পিচকারী ভরিয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন আর ফাগুয়ার রঙের সহিত প্রাণখোলা হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিলেন সাক্ষাৎ যেন

গোপীবল্লভ!…কী অলৌকিক সেই হাসির উচ্ছ্বাস,…আর তাহারই তরঙ্গে আনন্দ-সাগরে ভাবের দোলায় আমরা সকলেই আত্মহারা!…

মনেপ্রাণে অনুভব করিলাম ঠাকুরের প্রাণখোলা হাসি, ঠাকুরের অটল গাম্ভীর্য—সব কিছুই অপার্থিব। কখন কোন বেশে কী খেলায় যে মাতিয়া ওঠেন, প্রকট করেন কোন্ লীলামাধুর্য—তাহা ছিল একেবারেই আমাদের ধারণার বাহিরে।…

দৈহিক অসুস্থতার জন্য পুরীধামেই নিবিড় নামানন্দের মধ্য দিয়া দিন কাটিতে থাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের।

॥ সতের ॥

বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল। কটক হইতে গমন করিলাম পুরী আশ্রমে। নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করিলাম শ্রীগুরুচরণে। বিশেষভাবে প্রস্তুত করাইয়া বড় বড় দশ সের রসগোল্লা আনিয়াছিলাম, তাহা আস্বাদন করিয়া খুব প্রশংসা করিলেন এবং সকলকে একটি করিয়া প্রসাদ দিলেন।

মাঘ মাস হইতে পুরী থাকিয়াও শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর সুস্থ হইতেছে না, বরং ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তৎসত্বেও আরো কয়েক মাস তিনি এখানে অবস্থান করিবেন স্থির করিলেন।

যথা সময়ে গোসাঁইজীর তিরোভাব তিথি উৎসব সম্পন্ন করিলেন।

গুরুপূর্ণিমায় কটক হইতে আশ্রমে গমন করিয়া সকলের সহিত অংশগ্রহণ করিলাম গুরুপূজায়। কিন্তু মনে তেমন আনন্দ কই? বরং ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতায় ও নিস্তেজভাবে সকলের চোখেমুখে নিরানন্দের আভাস।

মনের অশান্তিতে গুরুভ্রাতা সহকর্মী বিনয় গাঙ্গুলীকে লইয়া কিছুদিন পরে ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনার্থে আবার উপস্থিত হইলাম পুরী আশ্রমে। শ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবামাত্র বিনয়ের দিকে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেনঃ একি! তোমার বীর্য যে একেবারে তরল হয়ে গেছে দেখছি—তুমি তো পাগল হ'লে বলে! তুমি লম্বা ছুটি নিয়ে

তীর্থস্থানে বাস, সমুদ্র বা গঙ্গাস্নান, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ, বিগ্রহ ও সাধুদর্শন প্রভৃতি কর—তাতে যদি তোমার প্রারব্ধ কিছুটা ক্ষয় হয়; তা না হ'লে তোমার ভবিষ্যৎ যে একেবারে অন্ধকার!···

শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। বিনয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। এই প্রসঙ্গে তাহার জীবনের অল্পদিন পূর্বের কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় ডাক্তার সত্যরঞ্জনের বাড়ীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন বিনয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গৌরীবালা। শ্রীগুরুকে কিছুক্ষণ সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হন তিনি। তখন ঠাকুরকে ছয় মাসের শিশুর মত দেখিয়া বাৎসল্য প্রেমে অভিভূত ভাবে সেবা ও আদর যত্ন করেন। ফলে অনুভব করেন তাঁহার দেহ-মন্দির যেন অতিমাত্র শুদ্ধ ও পবিত্র, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে চলিয়াছে মধুর শ্রীনাম।···

মজঃফরপুরে পৌঁছিয়া রাত্রিকালে স্বামীর নিকট সানন্দে সমস্ত কথা ব্যক্ত করেন গৌরী দেবী। কিন্তু ভুল বুঝিয়া জ্বলিয়া উঠিল সন্দিগ্ধচেতা আত্মাভিমানী বিনয় গাঙ্গুলী—জ্ঞানহারা হইয়া ঝাঁটা দিয়া বেদম প্রহার করিল সাধ্বী স্ত্রীকে। এমন কি গোসাঁইজী ও ঠাকুরের ফটো ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল,···টেলিগ্রাম যোগে পাটনায় আমার কাছে জানাইল ঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ।···সংবাদপত্রে নানা কুৎসা প্রচার করিয়া সকলকে সাবধান করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিল।···আমার প্রস্তাব মত শ্রীশ্রীঠাকুরকে সুদীর্ঘ পত্র দ্বারা সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেন গৌরী দেবী। উত্তরে শ্রীগুরু লেখেন ঃ

কল্যাণীয়া—

স্নেহের গৌরী! তোমার পত্রখানি পড়িয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। কিন্তু সরল হৃদয় নিষ্ঠাবান শ্রীমান বিনয়ের নির্ম্মল প্রাণে যে আগুন লাগিয়াছে, তাহার আঁচে আমাকে এখনও পোড়াইতেছে।···

তোমার দীক্ষা গ্রহণে বহুবার আপত্তি করিয়াছিলাম। অসময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ, দেবদানবের সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও উহার অনিষ্ট করিতে সাধ্যমত প্রতিকূল আচরণ করে। এসব জানা

থাকা সত্বেও তোমার একান্ত আগ্রহে এবং শ্রীমান বিনয়ের অবস্থা ভাবিয়া দীক্ষা না দিয়া পারি নাই। ঠাকুরের অসাধারণ কৃপা বলেই এই ধাক্কা এত সহজে সামলাইয়া নিয়াছ।

দীক্ষা গ্রহণের পর আমার সঙ্গে তোমার জীবনে আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই এই কথা কেন বলিয়াছিলাম তা কি এখনও বুঝ নাই? আবার সাক্ষাৎ করিবে ইহা কি এখনও মনে করিতে পারিতেছ?

কামিনী ও কাঞ্চনের সংযোগেই মানুষের প্রকৃত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রমাণ পাইলেও ধারণার পরিবর্তন হয় না—মুখ বন্ধ করা হয় মাত্র। দিগভ্রম হইলে দেখিয়াছি পূর্ব্ব দিককে পশ্চিম দিক মনে হয়।···ভ্রম দূর হইলে সত্য কি নিজেই পরিষ্কার বুঝিতে পারে, যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

পর হইয়া ছেলের আদর খাইতে গিয়াছিলাম, তাই উপযুক্ত শিক্ষা। ···দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, জানালা দরজা খোলা, মিনিটে মিনিটে কত লোক যাতায়াত করিতেছে, ভগ্নির গা ঘেঁসিয়া বসিয়া অর্ধঘণ্টার জন্য সেবা করিয়াছিলে।···এই অবস্থায় কোন অভিসন্ধি বা কৌশলের অবসর কোথায়?···সেবার সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও কি কিছুমাত্র ভাবান্তর অনুভব করিয়াছিলে?···

···সাধন করিবে কি ছাড়িবে আমি তাহা বলিতে চাহি না।··· তবে একথা সত্য যে ঘোর দুরাচার পাপিষ্ঠ জঘন্য চণ্ডালও যদি সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের হাতে মহাপ্রসাদ দেয়, তাহা অগ্রাহ্য করে না।···

শ্রীমান বিনয়কে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে, তুমিও গ্রহণ কর।

আঃ ব্রহ্মচারী।

অতঃপর সদ্‌গুরুর অবমাননা ও সতীর অমর্যাদার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইল। অচিরে ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হইলেন গৌরী দেবী—তবু অনুক্ষণ তিনি স্মরণ করিতেন শ্রীনাম। নানা দেবদেবীও তাঁহাকে দর্শন দিতেন, আর নিজে অল্প শিক্ষিতা হইলেও গুরুকৃপায় সংস্কৃত ভাষায় স্তবস্তুতি করিতেন। অন্তিমকালে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেনঃ তুমি আমাকে বিদায় দাও, ঠাকুর আমাকে নিতে এসেছেন।···

ইহার পর চৈতন্য হইল বিনয়ের। শ্রীগুরুর পত্রখানি বার বার পাঠ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ঘটনা পরম্পরায় তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তখন ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম বিনয়ের জন্য। ক্ষমার অবতার শ্রীগুরু লিখিলেন: আমি কারো কোন অপরাধ লই না। অপরাধ উপরে চলিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে ব্যবস্থা হইতেছে, কোন উপায় দেখি না। সমস্ত দোষের ক্ষমা আছে, কিন্তু মর্যাদা লঙ্ঘনের অপরাধ ভগবান ক্ষমা করেন না।

"গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
যথা হয় গুরু নিন্দা তথা না যাইবে।
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে॥
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে॥"···

এজন্য বিনয়ের প্রায়শ্চিত্তের তখন সবে সূত্রপাত। সদ্‌গুরু যে শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ দ্বিভুজ মূর্তি। সদ্‌গুরু আশ্রিত অনেকের মনে এই অভিমান থাকে, নিশ্চিন্তে তাঁহারা যথেচ্ছ আচরণ করিবার অধিকারী; কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাহাদের প্রারব্ধ সঞ্চিত হয় না বলিয়া ফলভোগ আরম্ভ হয়. সঙ্গে সঙ্গেই।···

আজও ঠাকুরের নির্দেশ বিশেষ রেখাপাত করিল না বিনয়ের মনে। কটকে ফিরিয়া ঠাকুরের কথা কয়েকদিন স্মরণ করাইয়া দিলাম, বিনয় বিশেষ আমল দিল না। তখনই বুঝিলাম গুরুবাক্য অভ্রান্ত।···

অল্পকাল মধ্যে বিনয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল। নিরুপায়ে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া গেলাম পুরী আশ্রমে, শ্রীগুরুর নির্দেশ পালন করাইবার চেষ্টায় রহিলাম।

একদিন দেখিলাম বিনয় শান দিতেছে মস্ত বড় একটা ছুরি। কারণ ঠিক বুঝিলাম না, হয়ত কোন খেয়াল চাপিয়াছে ভাবিয়া প্রশ্নও করিলাম না বিনয়কে।

রাত্রে ছাদে মশারী খাটাইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, আমরাও কয়েকজন পাশে শয়ন করিয়াছি। নিশীথ রাত্রি, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

চুপিসারে সেই শানিত ছুরি হস্তে উপস্থিত হইল বিনয়—ঠাকুরের মশারী তুলিয়া তাঁহাকে খুন করিতে উদ্যত হইল।

সঙ্গে সঙ্গেই জননীর মত স্নেহকোমল কণ্ঠে ঠাকুর বলিলেন: কে, বিনয়! এসো বাবা—এসো।···

পলকে যেন শতবীণা রবে ঝংকৃত হইল সুমধুর সামগান। এক অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে বিনয় হতচকিত হইয়া গেল, তাহার শিথিল হস্ত হইতে স্খলিত হইল শানিত ছুরিকা। শিশুর মত উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বিনয় লুটাইয়া পড়িল শ্রীগুরু চরণে।···

ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ব্যস্তভাবে আমরা উঠিয়া বসিলাম, উৎসুক নেত্রে চাহিলাম ঠাকুরের দিকে। আশ্চর্য, নিরুদ্বেগে ঠাকুর বলিলেন: আমি অপরাধ করেছিলাম কিনা, তাই বিনয় আমাকে খুন করতে এসেছিল। এখন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে—তোমরা তাকে ক্ষমা কর।···

অসীম ক্ষমায় ঠাকুরই ধুইয়া মুছিয়া দিলেন সেই মারাত্মক অপরাধ। আমরা সকলে শুধু বজ্রাহত হইয়া রহিলাম। মনে পড়িল গীতার বাণী: বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।···

শেষে সত্যই পাগল হইয়া গেল বিনয়। এই সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর এইভাবেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে।

পুরীধামে গোসাঁইজীর আবির্ভাব তিথি উৎসব সম্পন্ন হইল। ঠাকুরের আদেশে সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিলাম আমরাই, তাঁহাকে যাহাতে কোনরূপ শ্রমস্বীকার করিতে না হয়, সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিলাম।

সাত মাসের অধিককাল পুরী অবস্থান করিয়াও শরীরের কোন উন্নতি দেখা গেল না। হাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কিছুদিন রাঁচি গিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। গুরুভ্রাতা অচ্যুত-দাদা রাঁচি গিয়া ভাড়া করিলেন একখানি বড় বাড়ী, নাম মোরাবাদী

জোড়াকুটী। পুরীধাম হইতে ঠাকুর কলিকাতায় গমন করিলেন। পরে সশিষ্যে রাঁচি পৌঁছিয়া এক মাস অবস্থান করেন। তাঁহার সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার দিকে সতত বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন স্থানীয়া শিষ্যা তরলাদেবী এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ। আর কৃষ্ণনগরের জমিদার ভক্তশিষ্য বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন তাঁহার মোটরগাড়ী। এজন্য প্রতিদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার এবং দর্শনীয় স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল। রাঁচির হ্রদ ও পাহাড়, জনার জঙ্গল, মোরাবাদী পাহাড়, হুড্রুর জলপ্রপাত ইত্যাদি দেখিয়া খুব আনন্দলাভ করেন শ্রীগুরুদেব।

স্থানীয় 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' দেখিয়া তিনি বলেন, ভারতে বহুল সংখ্যায় এমনি বিদ্যালয়ের যথেষ্ঠ প্রয়োজন আছে।···গোসাঁইজীও দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন: দেশের উন্নতির জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন 'ব্রহ্মচর্য পালন'।···দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই প্রয়োজন শুধু শাস্ত্রনির্দিষ্ট নয়, বিজ্ঞানসম্মত; কিন্তু পরবর্তী যুগ হইতে সে সম্পর্কে জাতীয় ঔদাসীন্য সত্যই শোচনীয় স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।··· গোসাঁইজীর মন্ত্রশিষ্য মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত 'ভক্তিযোগ' পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন: চরিত্র মানবের স্বর্গীয় সম্পত্তি।···সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ আজ স্বর্গ হইতে পথের ধূলায় অবলুণ্ঠিত।···কবি চণ্ডীদাস গাহিয়া গিয়াছেন: সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।···মনুষ্যত্বহীন সমাজের নিকট সেই সত্য আজ মিথ্যা পরিহাস।···গোসাঁইজী ও ঠাকুরের এই উপদেশ কবে জাতীয় জীবনে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কে জানে!···

রাঁচিতে থাকিবার ফলে কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেন ঠাকুর। মহাহোমের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিলেন চন্দননগরে।

তাঁহার শরীর তখন এতই রুগ্ন যে অপরের সাহায্য ব্যতীত উঠিতে বা বসিতে পারেন না। তবু মহাহোম সম্মিলনে যথারীতি যোগদান করিলেন, চারি ঘণ্টা পর্যন্ত হোম করিলেন সমানভাবে। দেখিয়া সকলেই

বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। রুগ্ন দেবদেহ তখন ঋজু, প্রদীপ শিখাবৎ নিষ্কম্প।...

আলোচনা সভায় মহাহোমের স্থান চন্দননগর হইতে কলিকাতা স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিলেন কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিষ্যবৃন্দ। অসুস্থ শরীরে এই সভাতেও যোগদান করিলেন ঠাকুর, চন্দননগরেই মহাহোম সম্মিলনের স্থান নির্ধারিত রাখিবার নির্দেশ দিলেন। ঐস্থানে কীভাবে মহাহোমের স্থান নির্ধারিত করা হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিলেন।

চন্দননগর হইতে কিছুদিন পরে কলিকাতায় আশুতোষ দাদার বাড়ীতে আগমন করিলেন ঠাকুর। শারীরিক দুর্বলতা বশত সকলের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলিতে কষ্টবোধ করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ গ্রন্থের ৫ম খণ্ড তখনও প্রকাশিত হয় নাই; অচিরে উহা প্রকাশ করিবার আগ্রহে অসুস্থতা সত্বেও খুব পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

একদিন সকালে এই সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল—বিষয়বস্তু গুরুনিষ্ঠা। ঠাকুর বলিলেনঃ গুরু ভগবানের প্রতিশব্দ। এক গুরুনিষ্ঠাতেই সবকিছু হয়। মানুষ যা কিছু সৎ কল্পনা করতে পারে সবই গুরুতে আছে।...নিজ দেহে চাপড় দিয়া বলিতে লাগিলেনঃ এটা গুরু নয়, যে শক্তিতে এটা হয়েছে তাই গুরু—সেই শক্তি ছাড়া আমার একটা হাতও তুলবার ক্ষমতা নেই। গুরুতে সমস্ত সদ্গুণ আরোপ করতে হয়। আমি এই হাতখানা তুললাম—এতে সদ্গুণ আরোপ করলে মনের যে ভাব হবে, যে তা করে না তার অন্যরকম হবে। গুরু সদ্গুণের আধার—গুরু নিষ্ঠা হ'লে সবই হ'ল। মহাদেব পার্বতীকে যোগ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন; শেষে যখন গুরুগীতায় গুরু সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন, তখন আর বেশী কথা বলতে পারলেন না। গুরুতত্ত্ব ভাষায় বুঝান যায় না, ওটা ভিতরের জিনিষ। তাই স্বয়ং মহাদেব আর কোন ভাষা না পেয়ে বললেন—"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।"...

ঐখানেই শেষ। গুরুবাক্য অবিচারে প্রতিপালন না করলে গুরু তত্ত্ব ঠিকমত উপলব্ধি করা যায় না। গুরুবাক্য পালন করার নামই

গুরুনিষ্ঠা। তবে গুরুর রক্ত-মাংসের দেহের ঐকান্তিক সেবা করলেও ক্রমে ফল পাওয়া যায়।···

সকলেই গভীর শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেন, অন্তর দিয়া গ্রহণ করিলেন এই গুরুতত্ত্ব। ইহা সর্ব মন্ত্রতন্ত্রের মূল,···অপার শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়াই এই অমৃতের উৎপত্তি। বিশেষত স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের বদননিসৃত এই বেদবাণী—গোমুখীনিসৃত মন্দাকিনী।···'মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং।'···

গ্রহণের স্নান উপলক্ষে কাশীধাম গমন করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব। এই পূত অনুষ্ঠান পালন করিবার জন্য সকলে বিশেষ আগ্রহ নিবেদন করিলেন। ফলে কাশীতে পক্ষকাল মাত্র অবস্থান করিয়া ঠাকুর প্রত্যাগমন করিলেন কলিকাতায় আশু পাল দাদার বাড়ীতে।

জন্মতিথিতে ভগবান গোসাঁইজী ও মাতাঠাকুরাণীর পটের সম্মুখে মঙ্গল আরতি, ঊষাকীর্তন ও হোম করা হইল। পরে ফুলে ফুলে সুসজ্জিত করা হইল শ্রীশ্রীঠাকুরকে, সমবেতভাবে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হইল শ্রীগুরু চরণে। বিজয়দাদা মধুর নামকীর্তন করিলেন—সারাদিন সকলে মত্ত রহিলাম ভজনানন্দে। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি হইল—শরীর রুগ্ন ও মলিন হইলেও মুদিতনয়ন জটাশঙ্করের সে কী অপূর্ব ভাববিগ্রহ।···

মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইল জন্মোৎসব। চারি-পাঁচ দিন পরে পুরী আশ্রমে গমন করিলেন ঠাকুর। পুরীধামে কিছুদিন অবস্থানের পর ঠাকুরের শরীর অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িল। চিকিৎসার জন্য পৌষ মাসের মাঝামাঝি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এখানে শিষ্য শিষ্যা সাধারণ দর্শনার্থী নরনারীর সর্বদাই বড় ভীড়। অসুস্থ শরীরে একটু নিরিবিলি থাকিবার সুযোগ সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম। এজন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে চন্দননগর গিয়া অবস্থান করিতেন। দেবদেহ ক্রমেই অত্যন্ত দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িল, অপরের সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতেও কষ্টবোধ হয়। সেই নধরকান্তি শরীর আজ অস্থিচর্মসার, সোনার বরণ অঙ্গের লাবণ্য যেন কালিমালিপ্ত।···

নলিনাক্ষ তা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর চুনিলাল তা মহাশয় তাঁহার ব্যবসাস্থল তারকেশ্বরের বাসায় ঠাকুরকে একবার লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইলেন। শ্রীগুরুদেবও তারকেশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাঘ মাসের শেষে সশিষ্যে গমন করিলেন তারকেশ্বর।

তীর্থক্ষেত্রে ঠাকুর কুলদানন্দজী চিরকালই মুক্তহস্ত। মন্দিরের ভিতর গিয়া পূজা করিলেন বাবা তারকনাথের, প্রণামী দিলেন একশত টাকা। সম্মুখে যেন আবির্ভূত তাঁহারই মূর্তবিগ্রহ ঠাকুর জটাশঙ্কর।* তারকেশ্বরে এই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যে সমবেত হইল ভাববিমুগ্ধ অসংখ্য নরনারী। রীতিমত দুর্বল হইলেও তখন মনে হইল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। ···ভূলুণ্ঠিত জটাজাল, চন্দনচর্চিত উন্নত ললাট, প্রদীপ্ত নয়নে অপূর্ব জ্যোতি, রুদ্রাক্ষভূষিত গৌরবর্ণ শ্রীঅঙ্গের ভাস্বর দ্যুতি—সবকিছুর অভূতপূর্ব সমন্বয়ে তীর্থযাত্রীদের মনেপ্রাণে সঞ্চারিত হইল মহাভাবের বিচিত্র দ্যোতনা।···

সাধারণ দর্শনার্থীদের পক্ষে তারকেশ্বর বিগ্রহের প্রকৃত রূপ দর্শনের সুযোগ বড়ই কম। রূপার আবরণ মাত্র দর্শন ও স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসেন সাধারণ যাত্রীরা। বিশেষ আগ্রহভরে অগ্রসর হইলে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় তারকেশ্বর শিলার উপরিভাগে তদাকারে লাক্ষা নির্মিত নকল স্তম্ভ। চুনীলাল দাদার প্রভাবে গুরুভ্রাতাদের প্রকৃত তারকেশ্বর দর্শনের ও তাঁহার পাষাণময় অঙ্গ স্পর্শের সৌভাগ্য হইল। বিশেষ পরিপাটীরূপে প্রায় দুই শত লোকের ভোগের আয়োজনও করিলেন চুনীলাল দাদা।

একদিন জিতু দাদা ও ভবেন দাদা আসিয়া গোপনে শ্রীচরণে নিবেদন জ্ঞাপন করেন: আপনি সকলের নিকট ভিক্ষা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে গোসাঁইজীর সেবার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে চান

*ঠাকুরের নীলকণ্ঠ বেশ ও ভূলুণ্ঠিত জটারাশি দর্শনে তাঁহাকে 'জটাশঙ্কর' আখ্যা প্রদান করেন ভোলাগিরি মহারাজ।

কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে আপনার পক্ষে ভিক্ষা করা অপমানজনক মনে করি। আপনি আদেশ করলেই আমরা যে কেউ এই টাকা দিয়ে দিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতকণ্ঠে বলিলেনঃ আমি তা জানি যে তোমাদের যে কোন একজনের নিকট চাইলেই আমি লাখ টাকাও পেতে পারি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ত তা নয়! এই সেবায় প্রত্যেকের সামান্যভাবে আর্থিক যোগ থাকলেও এখানকার সঙ্গে একটা যোগ থেকে যাবে, ৺জগন্নাথদেবের ভোগ হয়ে সাধু ভক্তেরা প্রসাদ পাবে, তাতে সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ হবে।···শিষ্যগণের ভবিষ্য প্রকৃত কল্যাণের দিকে ঠাকুরের কত সজাগ দৃষ্টি।

কয়েক দিন পরে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য ঠাকুর সশিষ্যে গমন করিলেন গিরিডি।

সেখানে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন জনৈকা শিষ্যা। চিকিৎসা সত্বেও রোগের বিশেষ উপশম হইল না। অসুস্থা শিষ্যা ও তাঁহার স্বামীকে ঠাকুর পাঠাইয়া দিলেন চন্দননগরে। আর অন্যান্য সকলকে লইয়া শিবরাত্রি উপলক্ষে গমন করিলেন ভুবনেশ্বর আশ্রমে। ঠাকুরের সহিত সকলে যথারীতি পালন করিলাম শিবরাত্রি ব্রত।

চন্দননগরে অসুস্থা শিষ্যাকে ডাক্তার মাগুর মৎস্যের ঝোল খাইতে বলিলেন; কিন্তু শিষ্যার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। ডাক্তারের কথায় তাঁহার স্বামী অনেক পীড়াপীড়ি করিলেও সম্মত হইলেন না। খুব বিশদ-ভাবে গুরুভ্রাতাটি সমস্ত বিষয় জানাইয়া পত্র দিলেন ঠাকুরকে; তিনি যাহাতে স্ত্রীকে মৎস্যের ঝোল খাইবার নির্দেশ দান করেন সেজন্য সবিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন।

ভক্তিমতী গুরুভগ্নিটী বাল্যাবধি নিরামিষভোজী। পত্র প্রাপ্তিমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর জরুরী তারযোগে উত্তর দিলেনঃ শ্রীমতী শরীর অপেক্ষা তাহার আত্মার বিশুদ্ধতার জন্য আগ্রহান্বিতা এবং এবিষয়ে যত্নপরায়ণা। ইহা যে কিছু অন্যায় কার্য্য তাহা আমি মনে করি না। মৎস্যের ঝোল না খাইলে যদি তুমি তাহার উপযুক্ত সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিতে চাও কিংবা না পার, তবে তাহাকে যেকোন ভাগাড়ে ফেলিয়া

দিয়া তুমি চলিয়া যাইতে পার, তাহাকে দেখিবার নিশ্চয়ই কেহ রহিয়াছেন।...

নিদারুণ অভিমানে আহত গুরুভ্রাতাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া রুগ্না স্ত্রী ও একজন ডাক্তার সহ উপস্থিত হইলেন ভুবনেশ্বর আশ্রমে। গুরুভগ্নিটী তখন জ্বরে কাতর, অত্যন্ত দুর্বল—তবু তাঁহাকে গৌরিকুণ্ডে স্নান করাইয়া সকলের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিবার আদেশ দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আদেশ পালিত হওয়ায় শিষ্যাটীর রোগ নিরাময় হইল; অল্প দিনের মধ্যেই আশাতীতভাবে তিনি সুস্থা হইলেন। গুরুনিষ্ঠা ও গুরুকৃপার আশ্চর্য পরিচয় লাভ করিয়া শ্রদ্ধাপ্লুত হইলাম আমরা সকলেই।

কয়েক দিন পরে সকলকে লইয়া ঠাকুর গমন করিলেন পুরী আশ্রমে। সমুদ্রতীরে ফাল্গুনের হাওয়ায় অনেকটা সুস্থবোধ করিলেন।

তবু ঠাকুরের শরীর নিতান্ত দুর্বল বলিয়া সর্বদাই আমাদের মনে নিরানন্দ। এজন্য দোল উৎসবে সকলে সাগ্রহে আবীর অর্পণ করিলাম শ্রীগুরুচরণে, পরম স্নেহময় পিতার মত ঠাকুরও আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু ফাগুয়ার উৎসবে ঠাকুরকে মধ্যমণি করিয়া সে আনন্দের হাট আর বসিল না।...

চৈত্র মাস—গভীর রাত্রি। দ্বিতলে নিজস্ব কক্ষমধ্যে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। পার্শ্বস্থ কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন জনৈকা গুরুভগ্নি। সম্মুখস্থ ছাদে আমরা অনেকে নিদ্রামগ্ন।

ঠাকুরের ঘরে কেমন একটা শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল গুরুভগ্নির। মনে হইল বিষম লাগিয়া শ্বাসকষ্ট হইতেছে ঠাকুরের। অমনি এক গ্লাস জল লইয়া তিনি ছুটিলেন ঠাকুরের ঘরে। শয্যাপার্শ্বে পৌঁছিবা মাত্রই কোন অদৃশ্য দুটী বলিষ্ঠ বাহু তাঁহাকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ করিল পনের-ষোল হাত দূরে।...সহসা সেই পতনের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল আমাদের। ত্বরিতে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, ছাদের এক প্রান্তে পতিত হইয়া যন্ত্রণাধ্বনি করিতেছেন আহত গুরুভগ্নিটী।...শ্রীশ্রীঠাকুরও তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া দরদভরা কণ্ঠে বলিলেন: তোদের কত

করে বারণ করেছি, রাত্রে আমি না ডাকলে কেউ আমার ঘরে ঢুকবি না। তোরা যেমন আমাকে নিয়ে আনন্দ করিস, তেমনি যারা চলে গেছে বা দূর হতে ব্যাকুলভাবে আমাকে ডাকছে, মাঝে মাঝে আমাকে দেহ ছেড়ে তাদের কাছেও যেতে হয়। চার জন মহাপুরুষ সর্বদা আমার আসন রক্ষা করেন।...এ অবস্থায় কেউ আসন স্পর্শ করলে তাঁরা শাসন করবেন বৈকি! এখন থেকে খুব সাবধান!...যাক, তোর ভোগ খুব অল্পের মধ্যে কেটে গেল।...

ভগ্নিটীর গায়ে মাথায় সস্নেহে শ্রীহস্তের কোমল স্পর্শ বুলাইয়া দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

ঠাকুরের কথায় আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখিবার চেষ্টা করিতাম। আর মাঝে মাঝে তাঁহার অহেতুক কৃপা ও অসীম স্নেহ অনুভব করিয়া ধন্য হইতাম। এতদিনে তাঁহার আত্মিক গতিবিধির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া লাভ করিলাম নূতন আলোক।...

আর একদিন ঠাকুরের অহিংসাবৃত্তির পরিচয় পাইলাম। গুরুভ্রাতারা আশ্রমে সুকৌশলে মস্ত বড় একটী গোখরা সাপ ধরিয়া হাঁড়ীতে পুরিলেন। আশ্রমে জীবহিংসা নিষেধ, সুতরাং সাপটিকে আশ্রম হইতে বহু দূরে ছাড়িয়া দিবার স্থির করিলেন।

দোতলায় দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। নামিয়া আসিয়া বলিলেন: তোমাদের এ দুর্বুদ্ধি হল কেন? আশ্রম তো বহু দিন হয়েছে, এখানে কত বনজঙ্গল ছিল—কোনদিন সাপে তোমাদের হিংসা করেছে কি? বনে জঙ্গলে সাধু সন্ন্যাসীরা ঘুরে বেড়ান, গভীর বনেও কত সাধু মহাপুরুষ বাস করেন; কিন্তু সাপে বাঘে তাঁদের অনিষ্ট করেছে এমন তো শোনা যায় না। অন্তর শুদ্ধ হ'লে কেউ অনিষ্ট করে না।...ওটাকে ছেড়ে দেও।

: কিন্তু ছাড়তে গেলেই যে কামড়াবে।

তবু ঠাকুরের আদেশে সাপটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এই আশঙ্কায় দূরে সরিয়া গেলাম আমরা সকলে।

কিন্তু ঠাকুর নিশ্চিন্ত, একেবারে নির্বিকার। হাঁড়ীর কাছে গিয়া সাপটী ছাড়িয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ফোঁস করিয়া ফণা ধরিয়া দাঁড়াইল সাপটি।

ঠাকুর তবুও নির্ভয়—এক পাও নড়িলেন না। করজোড়ে বলিলেন: বাবা, এরা ছেলেমানুষ, না বুঝে অপরাধ করেছে। এ অপরাধ আমারই—তুমি আমাকে ক্ষমা কর, নিজের জায়গায় চলে যাও।

আশ্রমের সকলেই তো ভয়ে অস্থির। তৎক্ষণাৎ ঠাকুরকে দংশন করিবে এই আশঙ্কায় কেহ কেহ লাঠি সোটা লইয়া উপস্থিত।

কিন্তু সাপটী দংশন করা দূরে থাক, ঠাকুরকে পরিক্রমা করিয়া চলিয়া গেল বাগানের দিকে।···

বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম সকলে। 'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ'—অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের সম্বন্ধে অপর সমুদায় জীবের হিংসাবৃত্তি দূরীভূত হয়।···পাতঞ্জল দর্শনের এই সূত্রটির তাৎপর্য প্রত্যক্ষ করিলাম। বুঝিলাম মহাসাধক শ্রীগুরুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্রুর হিংস্রকুটীল সর্পও অহিংস হইয়া উঠিয়াছে।···

মহাপুরুষের জীবনই শাস্ত্রের যথার্থ ভাষ্য। শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে, নিজ জীবনে তাহা প্রমাণ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। উপলব্ধি করিলাম যথার্থ শাস্ত্রবাক্য অনুধাবন করিতে হইলে মহাপুরুষের সঙ্গলাভ অপরিহার্য।···

ব্যাপারটি স্মরণমাত্র মনে হইত আমাদের আশ্রমটি সত্যই যেন মুনিঋষির তপোবন। সহরের প্রান্তে নরেন্দ্র সরোবর তীরে গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দির, তাহার পার্শ্বেই আঠারনালা নদীর ধারে ঠাকুরবাড়ী আশ্রম। সেই নির্জন পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত পরিবেশে শেষরাত্র ৩টা হইতে রাত্রি ৯॥ পর্যন্ত পূজা পাঠ, হোম, আরতি, সাধন ভজন ইত্যাদি নিত্য অনুষ্ঠিত। এমনকি স্নান ও তর্পণ, ভোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণ, সবই চলিয়াছে ঠিক নিয়মমত। জীবহিংসা দূরে থাক, বিনা প্রয়োজনে পুষ্প বা একটী পত্রও কেহ ছিন্ন করিবে না। পরনিন্দা, দোষদর্শন, মাদকদ্রব্য ব্যবহার প্রভৃতি বর্জন, শাস্ত্র ও সদাচার পালন, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান—এক কথায় সাধন সম্পর্কিত সমস্ত বিধিনিষেধ নির্বিচারে মানিয়া

চলিয়াছে সকলে। দুইবেলা আশ্রম সেবা, গো সেবা ও কৃষিকার্যের মাধ্যমে শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগও বর্তমান। আলাপ ব্যবহার, চালচলন, আহার বিহার, সব কিছুর মধ্যে সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা পরিস্ফুট। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমের প্রাণ—তাঁহার আদর্শে ও প্রভাবে সবকিছু পরিচালিত, তাঁহার চিরমধুর সঙ্গলাভে আশ্রমবাসী নরনারী, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, আকাশ বাতাস পর্যন্ত কৃতকৃতার্থ। শ্রীগুরুদেবের প্রতি গভীর প্রেমভক্তির সহিত আশ্রমবাসী সকলের মধ্যেই প্রীতি ও হৃদ্যতার সম্পর্ক। জগৎ সংসারের হিংসা দ্বেষ, কলহ ও কোলাহল ছাড়িয়া আশ্রমে আসিলেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়—মন উদাস হইয়া ওঠে। এ যেন এক উদার, অতীন্দ্রিয় রাজ্য—চিরকাম্য পূর্ণতীর্থ, আনন্দময় স্বর্গধাম।···

॥ আঠারো ॥

বৈশাখ মাস, ১৩৩৬ সাল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে নববর্ষের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলাম সকলে। ঠাকুরও সকলকে জানাইলেন সস্নেহ আশীর্বাদ।

গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে নামমাত্র যোগদান করিলেন ঠাকুর। এজন্য উৎসব পরিণত হইল নিরানন্দ অনুষ্ঠানে। প্রিয়তম ভ্রাতা কুলদানন্দের অত্যধিক অসুস্থতায় সারদাকান্তজীও নিতান্ত ম্রিয়মান।

গোসাঁইজীর তিরোভাব উৎসবের পর জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি দর্শন করিতেন শ্রীগুরুদেব। এবার আর কিছুই দর্শন করিতে পারিলেন না। গুরুতর বহুমূত্র রোগে তাঁহার শরীর তখন একেবারেই অশক্ত।

শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রায়ই কলিকাতা আগমন করিতেন। এবার পুরীধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন চলাফেরা করিবার শক্তিও তখন তাঁহার ছিল না। ঝুলন পূর্ণিমায় গোসাঁইজীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শুধু একবার যাইতে চাহিলেন সমাধি-মন্দিরে।

নীলকণ্ঠ

যোগিরাজ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

নীলকণ্ঠ

যোগিরাজ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

ধরাধরি করিয়া লইয়া গেলে গোস্বামী প্রভুর আলেখ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন ক্ষণকাল। প্রণামান্তে সারদাকান্তজী আশীর্বাদ দিলে তাহা গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভাদ্র মাস পর্যন্ত অবস্থান করিলেন পুরী আশ্রমে; তবু রোগের কোন উপশম নাই। পূজার পূর্বে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া গমন করিলেন চন্দননগরে।

ঠাকুরের শরীর ভয়ানক দুর্বল বলিয়া শুধু কলিকাতা হইতে নয়, মফঃস্বল হইতেও বহু গুরুভ্রাতা এবার চন্দননগরে উপস্থিত হইলেন। সকলেই সবিশেষ চিন্তান্বিত জোরে কথা বলিতেই কষ্টবোধ হয় ঠাকুরের, এইরূপ অবস্থায় এবারকার মহাহোমে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন কিনা কে জানে! হোমকুণ্ডের সম্মুখে চার-পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া সমগ্র চণ্ডীপাঠ করা এবং আহুতি দেওয়া খুবই ক্লেশকর; এজন্য তাঁহার যোগদান সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন সকলে।

সপ্তমীতে সমস্ত দিন অত্যন্ত কাতর অবস্থায় শয্যাশায়ী রহিলেন ঠাকুর।

শারদীয়া মহাষ্টমী। প্রভাত হইতেই শুরু হইল মহাহোমের উদ্যোগ আয়োজন। কিন্তু ঠাকুর যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া কাহারও মনে আনন্দ নাই, প্রাণে নাই উৎসাহ। ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন চিকিৎসকগণ; এই অবস্থায় তিনি হোম করিতে বসিলে হৃৎ-যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হইয়া পড়িতে পারে, সকলের মনে এই আশঙ্কা।···

নির্দিষ্ট সময়ের আর পনের মিনিট মাত্র বাকি। ডাঃ হরিশ সেনকে শ্রীগুরু বলিলেন: তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে কি এমন কোন ওষুধ নেই যে আমি তাই খেয়ে শরীরে বল পাই, আর তিন-চার ঘণ্টা হোমে বসতে পারি? পরে দেহ গেলেও কোন ক্ষতি নেই।···

মহাহোমে যোগদান করিবার জন্য শয্যাশায়ী ঠাকুরের কী প্রবল আগ্রহ! কিন্তু তিন-চার ঘণ্টার জন্যও তাঁহাকে সবল করিয়া তুলিবার মত কোন বিধানই যে নাই ডাক্তারি শাস্ত্রে। নিরুপায় অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন ডাঃ সেন এবং অন্য সকলে।

তখনও কেহ ধারণা করিতে পারেন নাই, বাস্তবে যাহা অসম্ভব তাহাই সম্ভব হইবে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা-মাহাত্ম্যে।···নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পূর্বে সহসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং সোজা নীচে নামিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন মহাহোমের সম্মুখে।···

যাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে হয়, তাঁহার অকস্মাৎ এ কী নব শক্তির অপূর্ব খেলা ?···পলকে সাড়া পড়িয়া গেল চতুর্দিকে—যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। বিহ্বল বিস্ময়ে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল নিস্তব্ধ জনতা—আর গোসাঁইজীর প্রতিকৃতির দিকে তেমনি নীরবে তাকাইয়া রহিলেন লীলাময় শ্রীশ্রীজটাশঙ্কর।···

যথাসময়ে আরম্ভ হইল মহাহোম। লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া আজ যেন পূর্ণ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইলেন স্বয়ং ব্রহ্মা।···আর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঋজু নিষ্কম্প দেবদেহের নাভিমূল হইতে সমুত্থিত হইল অপূর্ব নাদধ্বনি; উচ্চ অথচ মধুর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন শ্রীগুরু মহারাজ—সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত সাগ্নিক শিষ্যবৃন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল : ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ অগ্নয়ে স্বাহা।···নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ভাবমুগ্ধ জনতা দর্শন করিতে লাগিলেন শ্রীগুরুদেবের এই অপূর্ব লীলা। ১৩১৮ সাল হইতে প্রতি বৎসর মহাহোম সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আর কখনও কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই তাঁহার ঋষিকল্প ধ্যান গম্ভীর এমনি অপরূপ মূর্তি। চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে তাঁহার উদাত্ত আহ্বান মন্ত্রে বুঝি আবির্ভূতা স্বয়ং মহামায়া মা চণ্ডিকা।···নূতন করিয়া আজ মুখরিত হইল দশদিক, পবিত্র মধুর হোমগন্ধে নূতন করিয়া আমোদিত হইল আকাশ বাতাস।···

তিন-চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। উত্থান শক্তি রহিত শ্রীশ্রীঠাকুর শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে দিব্য মধুর পরিবেশে সমাধা করিলেন সপ্তশতী মহাহোম। এই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া চিকিৎসকগণ স্তম্ভিত হইলেন, শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ ধন্য মনে করিলেন নিজেদের।

কেহ বুঝিতে পারিলেন না দেহাশ্রিত অবস্থায় ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ মহাহোম।···

মহাহোমের পর সকল শিষ্যবৃন্দ মিলিত হইতেন বার্ষিক সভায়। শ্রীগুরু প্রবর্তিত এই পূত অনুষ্ঠান যাহাতে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়, ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবারও সমবেত হইলাম সকলে, ঠাকুরের শরীরের অবস্থায় বিশেষ আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল; তাঁহার অবর্তমানে শুভ মহাহোম যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য আলোচনা চলিতে লাগিল।

হোমের পর বিশ্রাম করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন ঠাকুর, সকলের আলোচনা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। জিতুদাদা ও মহানন্দদাদাকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন: আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চল।

ঠাকুরকে ধরিয়া আনিয়া সভার মধ্যে আসন করিয়া দেওয়া হইল একখানি ইজিচেয়ারে। আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সকলের দিকে। তখনও কেহ বুঝি নাই সকলের সমক্ষে ইহাই তাঁহার শেষ কথা।...

ধীরে ধীরে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন: আজ তোমাদের উৎসাহ দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, চোখে জল আসছে।...মহাহোমের এই অনুষ্ঠানটি বড়ই শুভ। এই মহাযজ্ঞ ভারতবর্ষ থেকে একেবারে লোপ পেয়েছিল। এখানে আমি এর প্রবর্তন করেছি বলে ভোলাগিরি মহারাজ, কাঠিয়াবাবা, গম্ভীরনাথজী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আমাকে বিশেষ আশীর্বাদ করেছেন। তোমরা যে এই অনুষ্ঠান রক্ষা করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা কচ্ছ, তাতে আমার বড়ই আরাম বোধ হচ্ছে।...

: আমি যখন প্রথম পাহাড় থেকে এলাম, তখন গৌরাঙ্গের পিতা নলিনাক্ষ আমার সমস্ত ভার নিয়েছিল। ওরকম একটা ছেলেই আর দেখা যায় না। তার বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও সাধন নিষ্ঠার তুলনা নেই। সেই আমাকে বলল আমার জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা থাকবার স্থান করে দেবে, যাতে আমার কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। তারই উদ্যোগে জিতুর বাড়ীর কাছে এই জায়গা প্রথমে নেওয়া হয়, এখানে একতলা ছোট বাড়ী করা হয়। আমি কলকাতা এলে এই চন্দননগরে

এসে থাকতাম—এই আমার প্রথম স্বতন্ত্র স্থান। তারপর এই বাড়ী তৈরির জন্য আমি নিজে আর নলিনের পরিবারবর্গ সকলে খেটেছি। রাত্রে অবসর সময়ে ওদের নিয়ে ছাদ পর্যন্ত পিটিয়েছি। আর এখানেই মহাহোমের প্রবর্তন করেছি। তারপর ক্রমে আরো জমি খরিদ করে এখন এইরূপ হয়েছে।

ঃ আমার অভাবে তোমরাও এইখানেই এই মহাহোম প্রচলিত রাখবে। আমার অভাব হলে এখানে এলেই তোমাদের আমাকে স্মরণ হবে। তখন মনে হবে—ঐ স্থানে ঠাকুর বসতেন, ওখানে বসে আমাদের সঙ্গে ঐ কথা বলে গিয়েছেন, ঐ গাছটি তিনি নিজ হাতে রোপন করেছেন।··· তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে। অন্য স্থানে এই অনুষ্ঠান করলে এসকল স্মৃতি থাকবে না। আমার অভাবে আমার স্মৃতি তোমাদের আনন্দ দান করবে—এই স্থানে আমার স্মৃতি যত থাকবে এত আর কোথাও নয়। হয়ত বা কোন্ সময় তোমরা চাল-ডাল সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে দুদিন থেকে রান্নাবান্না করে খেয়ে যাবে। আমি তোমাদের উৎসাহ দেখে আর থাকতে পারলাম না—আজ আমার বড় আনন্দের দিন। ··

সভার কার্য বন্ধ হইয়া গেল, শ্রীগুরুদেবকে ঘিরিয়া বসিলাম আমরা সকলে।

সভার প্রধান উদ্যোক্তা গুরুভ্রাতা, ইঞ্জিনিয়ার ভবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়—সাধন-ভজনে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ। সকল গুরুভ্রাতাদের মধ্যে যাহাতে বেশ সঙ্ঘবদ্ধভাব বজায় থাকে ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। এই বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইয়া তিনি বলিলেনঃ আমাদের মধ্যে অনেকে ভাল করে সাধন-ভজন করেন না, এমনকি অনেকে দীক্ষা নিয়ে এদিকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও পান নি।

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ঠাকুর বলিলেনঃ যারা নিয়মমত সাধন-ভজন করে যাবে, তারা কৃতার্থ হবে। যারা করেবে না তাদের জন্যও চিন্তা নেই; হয় দুদিন আগে, না হয় দুদিন পরে। এই সাধন ব্যক্তিগত। তবে একটা জ্বলন্ত অঙ্গার এক জায়গায় পড়ে থাকলে বেশীক্ষণ জ্বলতে পারে না, কিন্তু কতকগুলি অঙ্গারের সঙ্গে থাকলে সবগুলি এক সঙ্গে

বহুক্ষণ জ্বলতে থাকে। সেই হিসাবে সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। নইলে সবাইকে পৃথকভাবে নিজ নিজ কার্য করে যেতে হবে। কোন চিন্তা নেই।

সকলকে অভয় দান করিয়া ভিতরে প্রস্থান করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

সভার কার্য পুনরায় আরম্ভ হইল। ঠাকুরের দেবদেহ যে দিন দিন ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, সেদিকে সকলের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন সতীর্থ যোগেশ ব্রহ্মচারী। শ্রীগুরুর প্রতি সকলের কর্তব্য বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সকরুণ আবেদন জানাইলেন। তাঁহার আন্তরিক ভাষণ অনেকের অন্তর স্পর্শ করিল, অনেকেই অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন।

সভার কার্য শেষ হইল। ঠাকুর বর্তমানে এইরূপ মহতী সভার উপর সকলের অলক্ষ্যে নামিয়া আসিল শেষ যবনিকা।

কিন্তু ঠাকুর যে বিশাল শিষ্য-পরিবার সৃষ্টি ও সংগঠন করিলেন তাহা অতুলনীয়। শিষ্যদের ইহজীবনের ইষ্ট-অনিষ্ট, উন্নতি-অবনতির সহিত পারলৌকিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি। স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী-সাধক, সকলেরই স্থান ছিল সেই বিরাট স্নেহসিক্ত হৃদয়ে। সকলেরই সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, বেদনা-আনন্দ, নিষ্ঠা ও সাধনা সমভাবে অনুভব করিতেন—অপার স্নেহডোরে বাঁধিয়া রাখিতেন সকলকেই। তাহার সদ্‌গুরু জীবনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এই অপার স্নেহময় রূপটি।···তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সংগঠিত হইয়াছিল এই বিশাল আধ্যাত্মিক পরিবার। তাঁহার অসীম স্নেহ ও দরদের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন সেই পরিবারের প্রত্যেকেই। নিজে সকল আধি-ব্যাধি, গ্লানি ও কলঙ্ক নীরবে সহ্য করিয়া সকলকে সমভাবে অকৃপণ হস্তে বিতরণ করিয়াছেন তাঁহার গভীর প্রীতি ও অক্ষয় আশীষ-ধারা। অথচ তিনি নিজে চিরদিন ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গের মত শূন্যচারী, চির বন্ধনহীন ও অনাসক্ত। ইহাই নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী মহারাজের মাধুর্যমণ্ডিত সদ্‌গুরু লীলার অনুপম বৈশিষ্ট্য।···

মাদুলি পূজা প্রবর্তনও শ্রীগুরু মহারাজের এক বিচিত্র শিক্ষা কৌশল। শ্রীগুরুর সেবা ও আশ্রম সেবায় যাঁহারা নিমগ্ন থাকিতেন,

স্বভাবতই প্রত্যক্ষভাবে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিবার প্রবল বাসনা জাগিত তাঁহাদের মনে। নিজেকে গোপনে রাখাই ব্রহ্মচারীর স্বভাব ধর্ম ; তাই তিনি গোসাঁইজীর পূতবস্ত্র, জটা, প্রসাদ প্রভৃতি কবচে পুরিয়া তাহার পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। আধারের যোগ্যতা বুঝিয়া এইভাবে অন্তরঙ্গ অনেককে মাতুলি পূজার অধিকার দান করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। এজন্য মাতুলির প্রণামী স্বরূপ প্রত্যেকের নিকট হইতে অর্থ লইতেন এবং সংগৃহীত অর্থদ্বারা জগন্নাথদেবের স্থায়ী ভোগের ব্যবস্থা করেন। এই ভোগ আশ্রমে আনিয়া নিবেদন করা হইত ভগবান গোস্বামী প্রভুকে, পরে আশ্রমস্থ সকলে গ্রহণ করিতেন সেই মহাপ্রসাদ। এইভাবে জগন্নাথদেবের সহিত আশ্রমের সূক্ষ্ম যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

এই মাতুলি পূজার ভিতর দিয়া শ্রীগুরুর অশেষ কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন ভক্ত সন্তোষনাথজীর মত অনেক সতীর্থ। এই সময়ে ভবেন বাবু, বগলা বাবু, প্রবোধ বাবু, অধম লেখক প্রভৃতিকেও মাতুলি পূজার অধিকার দান করেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

একদিন সমবেত সকলকে বলিলেন ঃ তোমরা মিরাক্‌ল্ মিরাক্‌ল্ (miracle) বল—অলৌকিক কোন কিছুর মোহ তোমাদের প্রচুর। তোমাদের এই হাজার হাজার গুরুভ্রাতাদের বুকে হাত দিয়ে বলতে বল যে, পথে বা বিপথে চললেও তাদের অন্তরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। তারা একজনও আমাকে ত্যাগ করতে পারে কি ? আর এইটেই কি একটা বড় মিরাক্‌ল্ নয় ?···

শিষ্যদের উপর তাঁহার কত গভীর বিশ্বাস ছিল, এই উক্তি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইহাতে তাঁহার সদ্‌গুরু মহিমার আর একটা দিক্ উজ্জ্বল হইয়াছে।···

এই প্রসঙ্গে একটী বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। আমার অন্তরে তখন শুরু হইয়াছে তুমুল সংগ্রাম। ব্যর্থ জীবনভার নিতান্তই দুর্বহ বোধ হইতেছে, অন্তরে জাগিতেছে আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান সঙ্কল্প। কয়েক বৎসর যাবৎ গুরুনির্দিষ্ট পথে কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সহিত যথারীতি

সাধন-ভজন করিয়া আসিতেছি; তথাপি শ্রীনামের সম্যক শক্তি ও মহিমা স্থায়ীভাবে অনুভূত হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি পাইতেছে দারুণ শুষ্কতা। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের পাঠ-বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। এক একবার কেমন যেন মনে হইতেছে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রেয়োলাভ হইবে বুঝি।

নিরুপায়ে মনের নিদারুণ জ্বালা নিবেদন করিলাম শ্রীগুরু চরণে। তিনি লিখিলেন: তোমার পক্ষে বর্তমানে যদি শুষ্কতাই কল্যাণকর মনে করি, তবে তোমার প্রার্থনা মত সরসতা দেওয়া চলে না। অন্যত্র আশ্রয় লইলে যদি প্রকৃত শান্তি পাইবে মনে হয় তবে তাহা করিতে পার, আমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি দিতেছি।···

সেই রাত্রে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলাম যেন। চক্ষের সম্মুখে অগণিত চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণায়মান—আর প্রত্যেকটির মধ্যে শ্রীগুরু প্রসন্ন বদনে বিরাজমান, তাঁহার শ্রীহস্তে অভয়-মুদ্রা।···পরক্ষণে শুরু হইল নানা বর্ণাঢ্যের স্নিগ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্য দিয়া লোক-লোকান্তর ভ্রমণ, প্রতি অনু-পরমাণুর মধ্যেই শ্রীগুরু ভগবান বাসুদেবের প্রত্যক্ষ দর্শন!···জীবনের সে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা।···আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ, আমার সকল ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ যেন স্তব্ধ, বিকল!···

ক্রমশ লক্ষ্য করিলাম আমার মৃতদেহটি ভূতলে লুটাইয়া পড়িল যেন।···আর চারিজন ভীষণাকৃতি যমদূত শবদেহটিকে ছয় চাকা যুক্ত একটী যানের উপর শায়িত করিয়া বন্ধন করিল লৌহ শৃঙ্খলে। পরে তাহাকে টানিয়া লইয়া নানা নদনদী, পথ-প্রান্তর, বনজঙ্গল, দেশ-দেশান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে একটী রম্য উদ্যানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে দেখা গেল একটি বাঁধানো বিল্ববৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন জনৈক রক্তমুখ শুভ্রকেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী—তিনি শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী মহারাজ!···অলৌকিকভাবে গোসাঁইজীর শ্রীগুরুদেবের দর্শনলাভ মাত্র আমার অন্তরে স্ফুরিত হইল সুমধুর শ্রীনাম—সঙ্গে সঙ্গে যমদূত, যানবাহন

সমস্তই লুপ্ত হইল। বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে বহুক্ষণ সম্ভোগ করিলাম এই দিব্য অনুভূতি ও নামানন্দ। শ্রীনামের শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সকল সংশয় পলকে তিরোহিত হইল শ্রীগুরুদেবের বিচিত্র লীলামাধুর্যে, অপার করুণা ধারায়। অধমের নগণ্য সত্তা পরিপ্লুত হইল সদ্‌গুরুর মাধুর্য মহিমায়!

আমার বহু সতীর্থই তাঁহাদের সাধন জীবনে নানা অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের এমনি অপূর্ব মহিমা এবং সর্বভূতে তাঁহার অধিষ্ঠান এইভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।...

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা ও লীলাবৈচিত্র প্রসঙ্গে জনৈকা গুরুভগ্নির পূর্ব অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগুরু মহারাজ তখন অবস্থান করিতেছেন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী এক যুবতী একদিন সমুপস্থিত। সঙ্গোপনে প্রাণের কথা নিবেদন করিবার প্রার্থনা করিলেন তিনি। আমি বাতাস করিতেছিলাম, অন্য সকলে ঠাকুরের ইঙ্গিতে স্থান ত্যাগ করিলেন। যুবতী তবু ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে ঠাকুর বলিলেন: ওর সামনে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলতে পার।...

শ্রীগুরুর কৃপায় বিষয়টি জানিবার সুযোগ ঘটিল।

মহিলাটি বলিলেন: আমার বহু আত্মীয়া আপনার শিষ্যা। আমারও দীক্ষা নেওয়ার খুব আগ্রহ। গোসাঁইজীকে আমি শিশুকাল থেকে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করেছি। প্রাণে আপনা থেকে প্রার্থনা ওঠে যেন তিনি কৃপা করে আমাকে আশ্রয় দেন। স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় থাকি, তবু কখনও রিপুর উত্তেজনা তেমনভাবে অভিভূত করতে পারে না। কিন্তু আপনার কথা চিন্তা করতে গেলে আমি যেন কেমন হয়ে যাই! আপনার ঐ সুন্দর মুখের জ্যোতি, গৌর কান্তি, দেহের মনমাতান গন্ধ, চোখের আশ্চর্য শক্তি—এসব ভাবলে জীবন-যৌবন, দেহ-মন-প্রাণ সবই যেন নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ি! স্থান-কাল জ্ঞান থাকে না, তাই আপনার কাছে বেশী

আসতে ভয় হয়। আমি কি পাগল হয়ে যাব? দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।

ক্রন্দনাবেগে লুটাইয়া পড়িলেন মহিলাটী, অশ্রুজলে ধৌত করিলেন শ্রীগুরুদেবের চরণকমল। সস্নেহে মস্তক স্পর্শ করিয়া নীরবে সান্ত্বনা দিলেন ঠাকুর।

মহিলাটী উঠিয়া বসিলেন। লক্ষ্য করিলেন মমতাপূর্ণ অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছেন ব্রহ্মচারিজী। পরে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। যুবতী সচকিত নয়নে দর্শন করিলেন, সম্মুখে উপবিষ্ট যেন সাক্ষাৎ শিবমূর্তি ভগবান গোসাঁইজী।...ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন, মুখ তুলিয়া পুনরায় দেখিলেন সম্মুখে ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মচারিজী।... তবে কি এ চোখের ধাঁধা? ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া চাহিতেই হতবাক হইয়া দেখিলেন—অর্ধাঙ্গ গোস্বামী প্রভুর, অর্ধাঙ্গ ব্রহ্মচারিজীর। ...বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে দর্শন করিলেন এইরূপ বিভিন্ন রূপের মুহুর্মুহু পরিবর্তন।...যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি প্রভাবে সাতবার পরিক্রমা করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবদেহ; পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেই সংজ্ঞাহারাভাবে পড়িয়া রহিলেন।...সম্বিৎ ফিরিলে অনুভব করিলেন, তাঁহার মস্তকে শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতেছেন। সেই পুণ্য স্পর্শে তাঁহার দেহ মন চিরতরে শুদ্ধ, শান্ত ও পবিত্র হইয়া গেল যেন।...

শ্রীগুরু মহিমা স্মরণ করিয়া আজও চোখের জলে ভাসিতে থাকেন প্রৌঢ়া সতীর্থা। ভাবাবেশে অপূর্ব ভঙ্গিতে গান করেন: পতিতপাবন শ্রীগৌরহরি, পতিতপাবন শ্রীগুরু ব্রহ্মচারী।...

সদ্‌গুরু কুলদানন্দজীর পূতস্পর্শে বহু নরনারীর জীবন এইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। অলৌকিক ভাবে তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন অনেকেই।

৺বিজয়া দশমী। দেবীর বিসর্জন। দেবী দুর্গার নয়, দেবী প্রতিমার। চিন্ময়ী রূপে আবার অধিষ্ঠিতা হইবেন মানব অন্তরে।

আমাদের অন্তরেও প্রতিধ্বনিত সেই বিসর্জনের বাদ্য।···শ্রীগুরুর দেবদেহ নিতান্তই ক্ষীণ ও দুর্বল। এই জীর্ণ অশক্ত শরীর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মহাপ্রয়াণের দিন কি নিকটবর্তী ?···

শ্রীগুরুদেব তবুও বিকারশূন্য। চিরদিন তিনি জয় করিয়াছেন আধি-ব্যাধি, সর্ব ইন্দ্রিয় ও অহমিকা। সর্ব গ্লানি ও কলঙ্ক, দুঃসহ ব্যাধি ও জরার মধ্য দিয়াও আজো তিনি অপরাজেয়। কোন মালিন্য নাই ঐ প্রশান্ত বদনমণ্ডলে, কোন বিক্ষোভ নাই ঐ অন্তর্ভেদী স্থির দৃষ্টিতে।···সর্ব উত্তেজনা ও কোলাহলের মধ্যেও তাঁহার স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ দূর আকাশে।

সন্ধ্যায় দেবীর বিসর্জন অন্তে সমবেত হইলেন প্রায় আড়াই হাজার শিষ্য। একে একে সকলে বিজয়ার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন; আর মিষ্ট মহাপ্রসাদ দানে সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, অভূতপূর্ব পরিবেশ।···ঠাকুরের দিব্য মুখমণ্ডল অনন্ত স্নেহে ভরপুর, আর শিষ্যবৃন্দের চোখ মুখ গভীর ভক্তিতে উদ্ভাসিত।···

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন বারাণসী বাবু। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই অশ্রুসজল চক্ষে স্নিগ্ধমধুর স্বরে ঠাকুর বলিলেন: বারাণসী বাবু, আজ বড় আনন্দ লাভ করলাম।···সত্যি আজ বড়ই আনন্দের দিন।···

সাধন লাভের প্রায় দুই বৎসর পরে সদ্‌গুরু সমক্ষে বারাণসী বাবুর এই প্রথম উপস্থিতি। সন্তোষ বাবু এবং তাঁহার জামাতা অধ্যাপক রাজেন্দ্র বাবুর সহিত মহাহোম উপলক্ষে তিনি চন্দননগর আশ্রমে উপস্থিত হন সন্ধ্যার পরে। পূর্বে তিনি কোন সংবাদ দেন নাই, কোন পত্রালাপও করেন নাই এতদিন। ঘরের মধ্যে বিপরীত দিকে শায়িত শ্রীগুরুকে প্রণাম করিতেই ঠাকুর বলেন: বারাণসী বাবু এলেন! আপনাকে দেখে বড় সন্তুষ্ট হইলাম।···শুনিয়া খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন বারাণসী বাবু। এতদিন পরে ঠাকুর তাঁহাকে না দেখিয়াও চিনিলেন কী করিয়া ?···

এখনও তাঁহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান জানাইলেন ঠাকুর। আনন্দে, আবেগে বারাণসী বাবুর চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। তিনি অনিমেষ

নয়নে চাহিয়া রহিলেন শ্রীগুরুর দিকে।···গোসাঁইজী এক সময়ে বলিয়াছিলেন ঃ সদ্‌গুরুকে শিষ্যের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের খবর রাখতে হয়।···বারাণসী বাবু বুঝিলেন, সদ্‌গুরু শ্রীমৎ কুলদানন্দজী সম্পর্কেও কথাটী সমভাবে প্রযোজ্য।···

ঠাকুরের শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশেষতঃ পায়ের জোর আর রহিল না···কেহ না ধরিলে উঠিয়া দাড়াইতেও কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার অন্তরের অবস্থা ছিল সকলের অগোচর। আমাদের মধ্যে তিনি ছিলেন আমাদেরই মত একজন; কিন্তু অহোরাত্র যে কিভাবে সমাহিত থাকিতেন তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। শুধু তাঁহার প্রদীপ্ত আঁখি যুগলের দিকে চাহিলে মনে হইত, তিনি যেন অন্য এক রাজ্যে বিরাজমান। সে রাজ্যে সর্বদা কী গভীর আনন্দে নিমগ্ন থাকিতেন কে জানে! · তবে সেই আনন্দের আবেশে দেহের দুঃসহ জ্বালার দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য ছিল না তাঁহার।···শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া সর্বদা প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিতেন সকলের দিকে।

কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থায় রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হইলাম আমরা। হাওয়া পরিবর্তনের জন্য অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার আলোচনা চলিল। শেষে গয়াধামে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ঠাকুর। আমি এবং যোগেশ ব্রহ্মচারীদাদা অবিলম্বে গয়া গমন করিয়া ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিম্নে এক ইঞ্জিনিয়ারের একটী বাগান বাড়ী ভাড়া করিলাম।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন শিষ্যশিষ্যা সহ ব্রহ্মচারিজী গয়া পৌছিলেন। তথাকার কবিরাজ শ্রীযুত সত্যচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রহিলেন তিনি। কবিরাজ মহাশয় নির্দেশ দিলেন কিছুতেই যেন ঠাকুরের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়।

বাড়ীটি জনবিরল স্থানে অবস্থিত, চোর-ডাকাতের ভয়ও ছিল। কিন্তু গুরুভগ্নিদের সঙ্গে ছিল বহুমূল্য অলঙ্কারপত্র। চোর-ডাকাতের

উপদ্রবের আশঙ্কায় তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্য প্রতিদিন রাত্রে দুইবার করিয়া বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হইত।

একদিন গভীর রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ করিবার জন্য বাহির হইয়াছি। ঠাকুরের ঘরের পাশ দিয়া যাইবার সময় শুনিতে পাইলাম কাহার সহিত যেন কথা বলিতেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই বিরক্তবোধ করিলাম। এই অসময়ে কে আসিয়া ঠাকুরের নিদ্রার ব্যাঘাত করিতেছে? জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি দিলাম। দেখিলাম—ঠাকুর হাত-মুখ নাড়িয়া কথা বলিতেছেন সুমধুর স্বরে, অথচ, ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। ব্যাপার কী জানিতে কৌতূহল হইল, দাঁড়াইয়া রহিলাম চুপিসারে। একাগ্র হইয়া শুনিলাম—ঠাকুরের ভাষা বাঙ্‌লা, হিন্দী, সংস্কৃত বা পরিচিত কোন ভাষাই নয়—অথচ তাহা অতি মধুর, শুনিলে কান জুড়াইয়া যায়।...

ক্ষণকাল পরে আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। ঠাকুরকে সবিনয়ে নিবেদন করিলাম: বাবা, কবিরাজ তো রাত জাগতে বিশেষ করে বারণ করেছেন, তবু আপনি না ঘুমিয়ে কথা বলছেন? আপনার যে শরীর খারাপ হবে।

আমাকে ভিতরে ডাকিলেন ঠাকুর। ছল ছল নেত্রে বলিলেন: দেখ বাবা, যখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে থেকে সাধন-ভজন করতাম, তখন সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি ছিল। তবু আহার যা কিছু জুটত, তাতেই শরীর কত সুস্থ ছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে মহাপুরুষদের দর্শন করে আসতাম। শরীর কত হাল্‌কা বোধ হ'ত, মনে হত যেন উড়ে চলেছি। কৃপা করে এখন তাঁরাই আমাকে দর্শন দিতে আসেন। এই সময় কি ঘুমিয়ে কাটান যায়?...

শুনিয়া বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না।...বলিলাম: মহাপুরুষদের দর্শন করার অধিকার কি আমাদের একেবারেই নেই? আমি তো কাউকে দেখতে পেলুম না—যে ভাষায় কথা বললেন, তাও বুঝতে পারলুম না।...

ঃ ও! তুমি ভাষাও শুনেছ নাকি! ও আর কিছু নয়—দেবভাষা আর, মহাপুরুষদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা। তাঁরা ইচ্ছে করলে দর্শন দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন।···

বুঝিলাম তাঁহাদের দর্শনলাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করাও প্রয়োজন।···তবে ঠাকুরের কৃপায় এতদিনে দেবভাষায় কথোপকথন শুনিবার সৌভাগ্য হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। মহাপুরুষের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইলে এমনি অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়—আর অহংকারের বশে নিজেদের যতই সবজান্তা মনে করি না কেন, তাহাতে সমস্ত মিথ্যা অভিমান ও অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।···

ঘটনাটি পরদিন সকলকে জানাইলাম। কৌতূহল বশে অনেকে রাত্রি জাগিয়া ঐরূপ কথা শুনিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। শুধু মহানন্দ দাদার নিকট জানিলাম, ইতিপূর্বে তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছে।

অন্য সমস্ত স্বাস্থ্যকর স্থানের পরিবর্তে ঠাকুরের গয়াধামে গমন তাৎপর্যপূর্ণ। এই গয়াধামে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সাধন-জীবনের পরিণতিতে তিনি লাভ করেন মহাসিদ্ধি—এখানেই তাঁহার সদ্‌গুরু জীবনের অরুণোদয়। এই গয়াধামের প্রতি ধূলিকণা তাঁহার সুপরিচিত, নিতান্ত আপনার। বুদ্ধ, শঙ্কর, মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া পরমহংসজী গোসাঁইজী, গম্ভীরনাথজী প্রমুখ কত মহাপুরুষের সাধনপূত এই পুণ্য তীর্থ। সেই মহাপুরুষদের সাহচর্য ও আশীর্বাদলাভের জন্যই কি অমর জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় গয়াধামে তাঁহার শেষ আগমন?···

এইজন্য শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এখানে আসিয়া বেশ প্রফুল্ল হইয়া ওঠেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সমস্ত দুর্বলতা ভুলিয়া শিষ্যদের তৃপ্তি ও উন্নতির জন্য সমাধা করেন বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি—সকলের তীর্থকৃত্য। বৌদ্ধগয়া, পরমগুরু গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাস্থান ও নিজ সিদ্ধপীঠ আকাশগঙ্গা প্রভৃতি দর্শনীয় যাবতীয় স্থানে সকলকে লইয়া গিয়া স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। শিষ্যদের আগ্রহে কোথায় কীভাবে সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন বিস্তারিতভাবে। বলেন, এই পীঠস্থানে সাধন করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে স্বল্পায়াসে উন্নতিলাভ সম্ভবপর।

নিশা জাগরণ করিয়া সাধন-ভজনে তৎপর হইবার নির্দেশ ও নানা উপদেশ দান করিয়া তিনি উদ্বুদ্ধ করেন সকলকে।

বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে এবার গয়াতেই সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব। এই উপলক্ষে বহু শিষ্য-শিষ্যা উপস্থিত হইয়া সকলে সমবেতভাবে গুরু-পূজা করিয়া ধন্য হইলেন। আরতি অন্তে ঠাকুর বলিলেনঃ এই বোধ হয় শেষ জন্মোৎসব—সকলে প্রাণভরে আনন্দ করে নে'।···

সারাদিন সমস্ত সমারোহের মধ্য দিয়াও মাঝে মাঝে এই একটী কথা ভাবিয়া গোপন অন্তরে অনুরণিত হইয়াছে নিরুদ্ধ বেদনা। এখন ঠাকুরের কথায় সারা অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুসজল হইল অনেকেরই।···এই শুভদিনে দয়াল শ্রীগুরুদেবের রাতুল চরণযুগল প্রত্যক্ষভাবে এমনি প্রাণ ভরিয়া পূজা করিবার সৌভাগ্য তবে কি সত্যই আর হইবে না ?···গুরু-আরতির পুণ্য বাসরে কাঁসর-ঘণ্টা, খোল-করতালের তালে তালে আর কি মনেপ্রাণে স্পন্দিত হইবে না এমনি দিব্য মধুর প্রেরণা ?···

গয়াধামে সশিষ্যে দেড় মাস অবস্থান করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় তিনি রাজগীর যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দুর্বলতার জন্য ট্রেণে ওঠানামা করা বা ঝাঁকুনি সহ্য করা তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মোটরে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বলেন। রাস্তায় একটা পুল খারাপ থাকায় মোটর চলাচল বন্ধ ছিল ; ফলে নিরুপায় দেখিয়া মহা সমস্যার মধ্যে পড়িলাম আমরা।

এমন সময় ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ব্যবস্থা হইয়া গেল আশাতীতভাবে। বিখ্যাত শিকারী বিজয়চন্দ্র সেন মহাশয় তখন হাজারিবাগের ডেপুটি কালেক্টর। সহসা কী এক প্রেরণা বশে ব্রহ্মচারিজীর দর্শনলাভের ইচ্ছা হইল ; মোটরযোগে তিনি উপস্থিত হইলেন গয়াধামে। সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ঠাকুর। বিজয় বাবুও স্থানীয়

ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং মোটর বাসের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে পৌঁছাইয়া দিলেন রাজগীরে।

এখানে শ্বেতাম্বর জৈন ধর্মশালার দ্বিতলে থাকিবার ব্যবস্থা হইল। কুণ্ডের উষ্ণ-প্রস্রবনে স্নান, ঝর্ণার জল ও প্রচুর ছাগদুগ্ধ পান এবং মুক্ত নির্মল বায়ু সেবনের ফলে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন ঠাকুর। জরাসন্ধ রাজার বহু কীর্তি, পাহাড়ের উপর নানা বিগ্রহ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বহু ঐতিহাসিক স্থানাদি সশিষ্যে দর্শন করিলেন।

একদা গভীর রাত্রে ঠাকুরের শরীরে দেখা দিল প্রবল কম্পন। সাধ্যমত সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও উপশম না হওয়ায় ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম সকলে। ঠাকুরের ইঙ্গিতে দেখা গেল, বাহিরে দারুণ শীতের প্রকোপে অত্যন্ত কাতর হইয়া কাঁপিতেছে একটী ভিক্ষুক। তাহাকে একটী কম্বল ও কিছু বস্ত্র দান করিলে তবে ঠাকুর সুস্থ হইলেন। ইহাতে অনুপ্রাণিত হইলেন ধনী গুরুভ্রাতা বদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া; ঠাকুরের অনুমতি লইয়া স্থানীয় সকল ভিক্ষুকদের বস্ত্র, কম্বল, অর্থ ও প্রচুর খাদ্যদ্রব্য দান করিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গলাভের জন্য এই সময়ে রাজগীরে আসেন তাঁহার তিনজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা—সারদাকান্তজী, দরবেশজী ও রেবতীমোহন সেন। রেবতী কাকার সুমধুর কীর্তন এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবার মধ্য দিয়া ঠাকুরকে আনন্দে রাখিবার জন্য সচেষ্ট রহিলাম সকলে।

প্রয়াগে এবার পূর্ণ কুম্ভমেলা। মেলায় যাওয়া সম্পর্কে গয়াধামে থাকিবার সময়ে আলোচনা হয়। ঠাকুরকে লইয়া কুম্ভমেলায় যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন সকলে। কিন্তু ঠাকুর বলেন: আমি অসুস্থ, মেলায় গোলমালের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া এসব বহু ব্যয়সাপেক্ষ।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাহাবাদের সতীর্থ নলিনী ঘোষ। তাঁহাকে বলা হইল প্রয়াগে মেলার বাহিরে একটি উপযুক্ত বাড়ীর যেন ব্যবস্থা করেন। আর, বিশিষ্ট গুরুভ্রাতারা ভরসা দিলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে কুম্ভে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা যায়, এই মর্মে কলিকাতায় পত্র

দিলাম মহানন্দ দাদাকে। সক্রিয় সাহায্যের জন্য একটী আবেদন-পত্র মুদ্রিত করিয়া বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন তিনি।

রাজগীরে পুনরায় কুম্ভমেলায় যাইবার প্রসঙ্গ আলোচিত হইল। ছোট জ্যেঠামহাশয় সারদাকান্তজী উৎসাহভরে দেখাইলেন মহানন্দ দাদার মুদ্রিত আবেদন-পত্র। ঠাকুর আমাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন ঃ তোমার কথামতই মহানন্দ এমন কাজ করেছে। আমার আকাশবৃত্তি—আমার সারা জীবনের ব্রত তুমি নষ্ট করলে। আমি কখনও কারো কাছে টাকাকড়ি প্রত্যাশা করেছি কি? আমার কোন আচরণে তা যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে আমি অপরাধী। ইচ্ছা হ'লে লক্ষ লক্ষ টাকা ভূতে দিয়ে যাবে। এখনি জিতুকে টেলিগ্রাম করে দেও যেন সকলকে জানিয়ে দেয়, এজন্যে কেউ কোন টাকা পাঠালে তা ফেরত যাবে।···স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়াগে গেলেও আমি মেলার অনেক দূরে থাকব, আমার ওখানে কেউ এসে যেন বিরক্ত না করে।

শ্রীগুরুর নির্দেশ মত জিতেন্দ্র মোদককে তার করা হইল; পত্রযোগেও বিস্তারিত লিখিয়া দিলাম। ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গে থাকিয়া কুম্ভ মেলায় কল্পবাসের সুযোগ এ জীবনে আর আসিবে কিনা কে জানে! তাই ঠাকুরের সঙ্গে মেলায় যাইবার জন্য উৎসাহের অবধি ছিল না আমাদের।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল, মেলাস্থান হইতে দূরে দুই মাসের জন্য ভাড়া করা হইয়াছে একটি সুন্দর বাংলো। স্থানটি এলাহাবাদের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে, আতরসুইয়া অঞ্চলে কাঁকরাহা-ঘাটের সন্নিকটে যমুনা তীরে। পাশে খড়ের ছাউনি নির্মাণ করিতেছেন ইঞ্জিনিয়ার অচ্যুত দাদা।

প্রয়াগ যাত্রার দিন স্থির হইল। পূর্বেই মোকামাঘাট ষ্টেশনে গেলাম, ষ্টেশন মাষ্টারের সাহায্যে দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণের একটি বড় তৃতীয় শ্রেণীর বগী গাড়ী সম্পূর্ণ খালি করাইয়া আসিলাম বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ সহ প্লাটফরমে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর; আমি টর্চ দেখাইয়া সঙ্কেত করিলে সকলে নির্দিষ্ট কামরায় আসিয়া উঠিলেন। সারা রাত্রি ঘুমাইয়া প্রাতঃকালে আমরা প্রয়াগে পৌঁছিলাম মকর স্নানের ছয়দিন পূর্বে।

॥ উনিশ ॥

মাঘ মাস, ১৩৩৬। প্রয়াগধামে পূর্ণ কুম্ভমেলা।

এই মহাতীর্থে এই পুণ্যলগ্নে ছত্রিশ বৎসর পূর্বে সশিষ্যে পদার্পণ করেন গোস্বামী প্রভু—আজ পুনরায় সশিষ্যে সমুপস্থিত শ্রীমৎ কুলদানন্দজী মহারাজ। সেদিন নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী ছিলেন যুগের সদ্‌গুরু গোসাঁইজীর মানসপুত্র—আর আজ তিনি সিদ্ধকাম মহাযোগী স্বয়ং সদ্‌গুরু।···

১৩০০ সালের পূর্ণকুম্ভে গোস্বামী প্রভুর সশিষ্যে যোগদান ভারতবর্ষের ধর্ম জগতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তৎপূর্বে ভারতের বিশাল সাধু সমাজে বাঙালী সাধকরা ছিলেন একপ্রকার অপাঙক্তেয়। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গোস্বামী প্রভুর অপার মহিমা প্রচারিত হইবার পর হইতে অধ্যাত্ম বাঙলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আসমুদ্র-হিমাচলে।

বস্তুত, ভারতের মহাত্মাগণের মধ্যে গোসাঁইজী সেদিন উড্ডীন করিয়াছিলেন ভাবমুগ্ধ বাঙ্‌লার প্রেমভক্তির বিজয় বৈজয়ন্তী। আজ স্বভাবতই শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরে সদাজাগ্রত ছিল সেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের সমুজ্জ্বল স্মৃতি। দীর্ঘকাল পরে বহু শিষ্যশিষ্যা পরিবৃত অবস্থায় পূর্ণকুম্ভে যোগদান করিতে আসিয়া তাঁহার ইষ্টদেবের মহান আদর্শের দিকেই ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি। আজ বিজয়কৃষ্ণ সশরীরে নাই, কিন্তু তিনি আছেন তাঁহারই বিশ্ববন্দিত মানসপুত্রের ধ্যাননেত্রে। তাই এই পুণ্যধামে এই মহা সম্মেলনে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী মহারাজ বহন করিয়া আনিয়াছেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণের বিজয় পতাকা।···শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাশ্রিত অবস্থায় ইহাই তাঁহার সদ্‌গুরু লীলার সর্বশেষ মহিমান্বিত অধ্যায়।···

ঠাকুর অসুস্থ বলিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে মেলাস্থান হইতে ছয় মাইল দূরে, নির্জন পরিবেশে। ঠাকুরের সঙ্গে জ্যেঠামহাশয় সারদাকান্তজী ও সেবিকাগণ আছেন যমুনা তীরস্থ বাংলোটীতে; আর কিরণ কাকা ও রেবতী কাকা সহ আমরা আছি নিকটস্থ পৃথক পৃথক ছাউনিতে। ঠাকুর কুম্ভস্নানে যাইতেছেন, এই সংবাদ রাজগীর হইতে পূর্বাহ্নে সকলেই জানিতে পারিয়াছিলেন। নানা স্থান

হইতে দলে দলে শিষ্য-শিষ্যাগণ মকর স্নানের পূর্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রয়াগধামে। বাংলোর নিকটস্থ ছাউনিতেই সকলের স্থান সঙ্কুলান হইয়া গেল।

এক মাসের জন্য ভাড়া করা হইল তিনখানি নৌকা। যমুনার মধ্য দিয়া নৌকা যোগে ত্রিবেণী সঙ্গমে যাইয়া নিত্য স্নান ও তর্পণ করিবার ব্যবস্থা হইল। সকলেই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে যাইতে আগ্রহশীল, এদিকে বাংলো ও ছাউনিতে এত জিনিষপত্র ও টাকাকড়ির তত্ত্বাবধান করিবে কে? ভাবিয়া ঠাকুর চিন্তিত হইলে আমি দায়িত্ব লইতে সম্মত হইলাম। নিশ্চিন্তে আমার মস্তকে শ্রীহস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ক্রমে ক্রমে আশ্রমে সমবেত হইলেন শতাধিক ভ্রাতাভগ্নি। দান-ধ্যান, সাধু-দর্শন, ভজন-কীর্তনে চলিতে লাগিল নিত্য উৎসব। কৃষ্ণনগরের গুরুভ্রাতা বদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া ও সিভিল সার্জেন হরিশচন্দ্র সেনের পিস্তল দুইটী থাকিত আমার নিকট; নির্ভয়ে আমি ছিলাম আশ্রমের প্রহরী।

কুম্ভে আসিয়া সারদাকান্তজীর আনন্দের অবধি নাই। সমস্ত দিন তিনি মেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া সাধুদর্শন করিতেন, আর দান করিতেন মুক্তহস্তে। মোরেলগঞ্জের শিষ্য অম্বিকাচরণ রায়কে ঠাকুর নির্দেশ দিয়াছেন: তুমি সব সময় ছোটদাদার সঙ্গে থাকবে; আর তিনি যখন যেখানে যা কিছু দান করতে চান, তা দেবে। টাকার দরকার হ'লে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও।...এ নির্দেশ অম্বিকা দাদার নিকট বেদবাক্য। মহাপুরুষের হাত দিয়া প্রাণ ভরিয়া অজস্র অর্থ দান করেন তিনি, আর লাভ করেন শ্রীগুরুর আশীর্বাদ।

প্রত্যহ নৌকাযোগে ঠাকুর সশিষ্যে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান, তর্পণ ও সাধুদর্শন করিতে যাইতেন। একদিন নৌকার মধ্যে গুরুভ্রাতা সন্তোষনাথজীর প্রবল প্রস্রাবের বেগ দেখা দিল, নৌকাখানি কূলে ভিড়াইতে সকাতরে অনুরোধ করিলেন তিনি। শ্রীগুরুকে সেকথা নিবেদন করিলে নৌকার এক প্রান্তে বসিয়া কার্য সারিবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যমুনার জল যে পবিত্র, সুতরাং ধর্মভীরু সাধক সন্তোষনাথ সঙ্কোচ বোধ

করিয়া প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিয়া রহিলেন। মাঘের দারুণ শীতেও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল তাঁহার সারা দেহ। শ্রীগুরু একটু হাসিলেন।

তীরে নৌকা ভিড়িলে লাফ দিয়া কূলে উঠিলেন সন্তোষনাথ। ত্বরিতে প্রস্রাব করিতে বসিলেন একটি পর্ণকুটীরের পশ্চাতে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন বিব্রতভাবে। বিভিন্ন স্থানে আরো দুই-তিনবার বসিয়াও উঠিয়া পড়িতে হইল।...নিরুপায়ে আমাকে বলিলেন: সর্বত্রই দেখি ঠাকুর মুখ হাঁ করে আছেন!...এখন উপায়?...

বুঝিলাম, ঠাকুরের আদেশ নির্বিচারে পালন না করিবার এই পরিণতি।...তবু সমবেদনায় ঠাকুরের নিকট গিয়া সব নিবেদন করিলাম। সস্মিত মুখে ঠাকুর বলিলেন: আচ্ছা—এইবার করতে বল।

অতঃপর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন সন্তোষনাথজী। তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়াও সর্বভূতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থিতি কৃপা করিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন আমাদের।...

চড়ায় উঠিয়া সাধু দর্শনে যাওয়ার জন্য ঠাকুরের বালকসুলভ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিতাম। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতাবশত চার দিনের বেশী নৌকা হইতে চড়ায় অবতরণ করেন নাই। এই চার দিনই কৃপা করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন আমাদের। নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুরকে পাল্কিতে তুলিতাম; অমনি ছুটিয়া আসিতেন সাধু-সন্ন্যাসীরা, আমাদের সরাইয়া নিজেরা পাল্কি বহন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন। ঠাকুরকে নানাভাবে সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন তাঁহারা।

একদিন এক ধুরন্ধর পণ্ডিত দণ্ডীস্বামী আসিয়া অভিবাদন জানাইলেন: ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।...সাশ্রু নয়নে স্তবস্তুতি করিয়া আমাদের বলিলেন: এঁর ভিতর বাহিরে সন্ন্যাসের সমস্ত লক্ষণ সুপরিস্ফুট। এমন মহাপুরুষ আমার চোখে আর কখনো পড়েনি। আপনারা খুব ভাগ্যবান!...

এইভাবে মেলার মধ্যে কখনও বা আমাদের ছাউনিতে অভিবাদন জানাইতেন অদ্ভুত বেশভূষাধারী নানা আকৃতির প্রাচীন ও নবীন সাধু-সন্ন্যাসী। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—মেরা রাম, মেরা

শ্যাম, মেরা বিজলীকা লাল, শিব শম্ভো, বম্ ভোলা, হর হর মহাদেও প্রভৃতি। অদ্‌ভূত ভাষায় বিচিত্র আলাপ আলোচনা করিতেন তাঁহারা। পরে ঠাকুরের শ্রীমুখে কোন কোন মহাত্মার পরিচয় জানিয়া বিস্মিত ও শ্রদ্ধাপ্লুত হইতাম।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাল্কীতে লইয়া সমস্ত প্রধান মঠগুলি পরিক্রমা করিলাম। প্রত্যেক স্থানে ঠাকুর যথোচিত মর্যাদা জ্ঞাপন করিয়া দুই শত হইতে হাজার টাকা দ্বারা প্রণাম করিলেন। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধু-মহান্তগণের দর্শনে ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন: মাত্র দুটী কথা বলবার জন্যে এখানে এসেছি। আপনার গুরুদেব কাঠিয়া বাবাজীর বাঙলা দেশের উপর যথেষ্ট কৃপা ছিল, বাঙলার বহু নরনারী তাঁর আশ্রয় পেয়েছেন। আপনিও বাঙলার ঘরে ঘরে সাধন প্রচার করুন। আর আপনার গুরুদেবের নানা প্রদেশে বহু কৃতী সন্তান আছে, তবু বাঙলার উপর তাঁর বিশেষ কৃপা ব'লে আপনাকেই গদি দিয়েছেন। আপনিও কোন বাঙালী ছেলেকে আপনার গদির উপযুক্ত করে যাবেন। কুম্ভে যাতে বাঙালী সাধুর আসন পরম্পরাভাবে বজায় থাকে, আপনাকে তার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।···

মেলা স্থলে চড়ায় গীতা-জ্ঞান যজ্ঞশালায় আসন লইয়াছেন গুরুভ্রাতা যোগেশ ব্রহ্মচারিজী। তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের প্রিয় জটাশঙ্করজীর নির্জন বাসের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন প্রায় সকল মণ্ডলেশ্বর। সাগ্রহে কেহ স্বয়ং কেহ বা প্রতিনিধি মাধ্যমে জ্ঞাপন করেন সনির্বন্ধ অনুরোধ—বিশেষ বিশেষ দিনে তাঁহাদের স্নান-শোভা-যাত্রায় হস্তী বা পাল্কি যোগে যেন অগ্রণী হইয়া চলেন ব্রহ্মচারী মহারাজ।···সকলকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া সহজাত বিনয়নম্র বচনে নিজের অক্ষমতা নিবেদন করিলেন ঠাকুর। উদাসী মহান্তরাও মিছিলে অগ্রণী হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন; তাঁহাদিগকেও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আত্মগোপন লীলাই তাঁহার জীবনের

বৈশিষ্ট্য, সুতরাং সাধুদের সঙ্গে চড়ায় বাস বা মিছিলে যোগদান করিয়া লোকচক্ষে আত্মপ্রচারের সুযোগ গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই।

কিন্তু দূর হইতে সাধুদের মিছিল দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার। যজ্ঞমণ্ডপের অগ্রভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সশিষ্যে আসন করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন যজ্ঞশালার সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী। কুম্ভ স্নানের দিন প্রত্যূষে মেলাস্থানে উপস্থিত হইয়া মিছিলের রাস্তার পার্শ্বেই আসন গ্রহণ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। রুগ্ন ও দুর্বল হইলেও তাঁহার সৌম্য মূর্তি, অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তি, তুষারশুভ্র তেজোদীপ্ত কলেবর, চরণচুম্বিত জটাজাল, সদাশিব নীলকণ্ঠবেশ স্নানার্থী সাধু মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। করজোড়ে অভিবাদন করিয়া, কেহ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম অন্তে তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া মিছিলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন সাধুবৃন্দ। অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান অবস্থায় সবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন এক উলঙ্গ নাগা সাধু। সহসা তাঁহার অশ্ব থমকাইয়া দাঁড়াইল, 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলিয়া তিনি প্রণত হইলেন ঠাকুরের শ্রীচরণ-প্রান্তে ; পরক্ষণে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া অগ্রসর হইলেন।···

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু মণ্ডলীর এই বিরাট শোভাযাত্রা ধর্ম জগতে অদ্বিতীয়। ইহা যেমন বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ—তেমনই সংযম, শৃঙ্খলা ও ত্যাগ বৈরাগ্যের দ্যোতনায় মহিমাময়। এই আদর্শ মিছিল দর্শন করিয়া সত্যই অন্তরে জাগ্রত হইল প্রকৃত ধর্মভাবের অনুপ্রেরণা। পরক্ষণে চাহিয়া দেখি ঠাকুরের চোখমুখ অব্যক্ত আনন্দে উদ্‌ভাসিত ! শত সহস্র সাধু তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে দেখিয়া সীমাহীন আনন্দে আমরা উৎফুল্ল। কিন্তু ঠাকুরের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই—মিছিলের উপর দিয়া তাঁহার স্থির আয়ত দৃষ্টি যেন নিবদ্ধ দূর দিগন্তে।··· মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহের সম্মুখে কীর্তনানন্দে আত্মহারা গোসাঁইজী, ছদ্মবেশী পরমহংসজীর নৃত্যছন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান, বিচারসভায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের উদাত্ত ঘোষণা, গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণতলে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রয়গ্রহণ—ছত্রিশ বৎসর পূর্বেকার সেই অপ্রাকৃত দৃশ্যাবলী আজও কি রূপায়িত ঐ মহাশূন্য-

লোকে ?···পরমহংসজী, গোসাঁইজী, কাঠিয়াবাবা গম্ভীরনাথজী, গিরি মহারাজ প্রমুখ বিদেহী মহাপুরুষ ও মহাত্মাবৃন্দ আজও কি সানন্দে দর্শন দিয়াছেন নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী মহারাজকে ?···

মাঘী সপ্তমী। আমাকে মস্তক মুণ্ডন করিবার আদেশ দিলেন ঠাকুর। ঠাকুর ঘরে লইয়া গিয়া কপাট বন্ধ করিলেন, নানা উপদেশ দান করিয়া সমাধিস্থ রহিলেন কিছুক্ষণ। পরে কৃপা করিয়া দান করিলেন চির আকাঙ্ক্ষিত বহুপ্রার্থিত ব্রহ্মচর্য ব্রত। বলিলেন: আর সুযোগ পাই কিনা বলতে পারিনে, তাই সব নিয়ম ব'লে দিলাম। ব্রহ্মচারী হ'য়ে তো আছই, ব্রতনিয়মগুলি মেনে চলা বৈতো নয়! চাকরিতে যতদিন থাকবে ততদিন ঠিকভাবে চলা কঠিন। চিন্তা নেই, চাকরি আপনি চ'লে যাবে তখন ধর্ম নিয়েই থাকবে। এই নিয়মে বারো বছর চলতে হয়, তোমার নয় বছর চললেই হবে। সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে।···

ব্রহ্মচর্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার সত্তাকে যেন অভিভূত করিয়া দিল ঠাকুরের এই অযাচিত কৃপা। ব্রত গ্রহণের কথা আপাতত গোপনে রাখিতে আদেশ করিলেন; আমার এই নবজন্মের সাক্ষ্য রহিলেন অন্তর্যামী স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর।···তাঁহার শ্রীমুখের অভয়বাণী পরম পাথেয় হইয়া রহিল আমার সাধন জীবনে।···

শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের গদিতে মহাদেবানন্দজী অধিষ্ঠিত। তাঁহার সঙ্গেও মর্যাদার আদান-প্রদানকালে সন্তদাস বাবাজীর নিকট যে দুইটী আবেদন জানান তাহার পুনরুক্তি করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বলা বাহুল্য, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা বা বাঙলার প্রতি পক্ষপাতিত্ব এ আবেদনের হেতু নয়। বরং গোসাঁইজীর মহিমা প্রচারের পরেও সাধুসমাজে বাঙালীর প্রতি যে অসূয়াভাব, যে বিজাতীয় মনোভাব ছিল, তাহা বিদূরিত করাই কল্যাণময় শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য। ধর্ম-শাস্ত্র, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, সর্বক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি যথার্থ কল্যাণধর্মের পরিপন্থী। এজন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে পরাভক্তি এবং

সর্বজনীন প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠা করাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু তথা গোস্বামী প্রভুর প্রধান আদর্শ। এবারের পূর্ণকুম্ভেও সেই মহান আদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

বাঙলার নরম মাটী, বাঙালীর কোমল হৃদয়, প্রেম-ভক্তির যোগ্য আধার। জীবন-নদীর অগ্রগতির পথে সঞ্চয়ের আবর্তেই পুঞ্জীভূত হয় সংকীর্ণতার আবর্জনা। এজন্য কলনাদী মন্দাকিনীর ন্যায় নিজেকে ছড়াইয়া বিলাইয়া দিতে দিতেই বিরাট হইতে বিরাটতর হইয়া অনন্ত মহাসাগর বুকে বিলীন হওয়াতেই বাঙালীর যথার্থ আনন্দ।···এই আদর্শের দিক দিয়াই তাহার উপাস্য দেবী মা শ্যামা ত্রিভুবনের সর্বৈশ্বর্যশালিনী হইয়াও উলঙ্গিনী,···তাহার প্রাণের দেবতা উমাশঙ্কর সর্বেশ্বর হইয়াও সর্বত্যাগী।···বাঙালীর প্রণামটী পর্যন্ত 'জগদ্ধিতায়' উৎসর্গীকৃত,···'মমাত্মা সর্বভূতাত্মা' ইহা তাহার স্বভাবধর্ম। মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ—সকলেই প্রেমের পাগল, ভক্তিতে আত্মহারা। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর—সকলেই সেই উদার আদর্শের বাহক।··· সম্প্রদায় বা প্রদেশ দূরে থাক, পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়া চন্দ্র-তারায়, গ্রহ-উপগ্রহে তাহার ঊর্ধ্বগতি,···বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লোকে লোকে তাহার নিমন্ত্রণ।···

এই উদ্দেশ্যে বাঙলার অভ্যুত্থানের জন্যই নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দজীর জীবন ধারণ। আকণ্ঠ হলাহল পান করিয়া অমৃত পরিবেশন করাই যাঁহার জীবনের ব্রত, নিজ প্রদেশের কোন সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন তাঁহার নিকট অবান্তর।···নিজ সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন তাঁহার নিকট শূকরী বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যজ্য। বিশ্বমানবের কল্যাণব্রত প্রতিষ্ঠার তাগিদেই বাঙলার উপর তিনি চাহিয়াছেন মহাপুরুষদের কৃপাবর্ষণ। অন্যায়, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার প্রতিরোধ করিয়া ন্যায়, প্রজ্ঞা ও প্রেমধর্ম স্থাপনের আদর্শে বাঙলার সন্তান অধ্যাত্ম জগতে অগ্রণী হইয়া যাহাতে ভারতের মুখোজ্জ্বল করে, ইহাই ছিল ঠাকুরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।···সন্তদাস বাবাজী ও মহাদেবানন্দজীর নিকট প্রাণের সেই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন মহাদেবানন্দ স্বামিজী। ঠাকুর বলেনঃ ঋষিরাই ধর্মের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন; গোসাঁইজী সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও সেই ঋষিদেরই প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন। চতুঃসনই সনাতন ধর্মের আদি প্রবর্তক—এই সনক সনাতনাদি ঋষিরা নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমাকেও গোসাঁই কৃপা করে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য দান করে গিয়েছেন।···

শিষ্যবৃন্দের আগ্রহে ও উৎসাহে একদিন সাধু-সন্ন্যাসীদের সমষ্টি ভাণ্ডারা দিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কৈলাস মঠের শ্রীমৎ কুমারানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় পঞ্চমী স্নানের পরদিন সহস্র সহস্র সাধুকে নিমন্ত্রণ করা হইল। পংক্তিতে উপবিষ্ট মণ্ডলেশ্বর ও মহান্তগণকে উপযুক্ত অর্চনা ও মর্যাদা দানের সময় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গেই সসঙ্কোচে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা বলিলেনঃ আপ তো মহাপুরুষ হেঁয়, আপ্‌সে হমলোগ্‌ ক্যায়সে পূজা লেঁ? হমলোগোঁকো অপরাধী ন কঁরে।

সবিনয়ে ঠাকুর বলিলেনঃ ইয়ে শরীর কাহিল হো গয়া। আব্‌ তো যানা হ্যায়, আপ্‌ সবকো পূজা করনেসে দুনিয়ামে আর্য ঋষিওঁকা কায়দা বহাল রহেগা।

সাধু-বৈষ্ণবের সেবা ছিল ঠাকুরের প্রধান আদর্শ। সাধু-বৈষ্ণবের সেবার ন্যায় পুণ্য কাজ আর কিছু নাই, গোসাঁইজীর এই শিক্ষা সফল হয় তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের জীবনে। যখন যে তীর্থ দর্শনে গিয়াছেন, যেখানে অবস্থান করিয়াছেন, সাধ্যমত সাধু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়া নিতান্ত নিষ্কিঞ্চনভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন সকলের আশীর্বাদ। প্রয়াগ ধামে আসিয়া তাঁহার এই সেবাধর্ম লাভ করে সার্থক পরিণতি।

ঠাকুরের শরীর এত দুর্বল যে ধরিয়া তুলিতে হইত। অথচ কুম্ভে আসিয়া স্নান, সাধু দর্শন, মণ্ডল পরিক্রমা সবই তিনি সম্পন্ন করিলেন। বস্তুত দেহ যতই অশক্ত হ'ক তাঁহার অন্তর ছিল অফুরন্ত শক্তি ও উৎসাহের ভাণ্ডার। এজন্য দৈহিক অসুস্থতা কখনও তাঁহার কর্তব্য কর্মে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

কুম্ভমেলায় সেবা, দান, ভাণ্ডারা, সাধুদর্শন এবং শতাধিক শিষ্যশিষ্যার বহুবিধ নিত্য খরচ প্রভৃতি কার্যে ব্যয় হইল প্রায় লক্ষ টাকা! কী ভাবে কোথা হইতে এই বিরাট অর্থ সম্পদ আসিল তাহা আমাদের ধারণাতীত। ঠাকুরের কথা বেদবাক্য—সত্যই হয়ত ভূতে যোগাইল এত টাকা!···

প্রয়াগ ধাম গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল, হিন্দুদের অন্যতম মহাতীর্থ। এই তীর্থে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে কল্পবাস ও গঙ্গাস্নানের জন্য সমবেত হয় অসংখ্য নরনারী। মাসাধিক কাল ধরিয়া এই বিজন পুলিন পরিণত হয় জনসমুদ্রে। প্রতি ছয় বৎসর অন্তর অর্ধ কুম্ভমেলা উপলক্ষে প্রয়াগ ধামের শোভা হইয়া ওঠে চমৎকার। পূর্ণ-কুম্ভমেলা উপলক্ষেই অপরূপ শোভা ও ঐশ্বর্যে এই পুণ্যধামের মহিমা হইয়া ওঠে সত্যই বর্ণনাতীত।

নয়ন ভরিয়া এই শোভা ও বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম সকলে। চকিতে মনে পড়িল পরমগুরু গোসাঁইজীর কথা ঃ কুম্ভমেলা সাধুদের কংগ্রেস।···এই বাণীর সার্থকতা হৃদয় দিয়া অনুভব করিলাম। পূর্ণকুম্ভ যোগে এই ধামে আসিয়া পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব করিতে পারা যায় অধ্যাত্ম ভারতের হৃৎস্পন্দন। যুগযুগান্তের বেদ-বেদান্তের ভারত, ব্যাস-বশিষ্ঠ, শঙ্কর-রামানুজ-শ্রীচৈতন্যদেবের ভারত, কুম্ভমেলায় পরিগ্রহ করে যেন এক অভিনব মহিমান্বিত রূপবৈচিত্র্য।

কে এই কুম্ভমেলার প্রবর্তক, কোন স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এই মহাসম্মেলন, তাহার কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য আজও অপরিজ্ঞাত। পুরাণবর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কুম্ভমেলার কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবাসুর সংগ্রাম ও সমুদ্র মন্থন শেষে জলধিগর্ভ হইতে উত্থিত হয় বহুবিধ অমূল্য রত্ন। সর্বশেষে সাগরগর্ভ হইতে অমৃত পূর্ণ একটি কুম্ভ হস্তে উঠিয়া আসিলেন ধন্বন্তরী। দানবেরা পাছে সেই অমৃতের অংশ দাবী করে, এই আশঙ্কায় কুম্ভটি লইয়া অদৃশ্য হইলেন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত—পশ্চাতে ছুটিল দানবেরা। স্বর্গলোকে পৌঁছিবার পূর্বে

ক্লান্ত জয়ন্ত কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেন মর্তের চারিটী সুউচ্চ স্থানে—পুরাণে এই স্থানের নাম প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনী। বিশ্রাম কালে জয়ন্ত এই চারিটী স্থানেই রাখিয়াছিলেন অমৃত-কুম্ভটি—তাহারই স্পর্শে বিশেষ মাহাত্ম্য অর্জন করে এই চারিটি ধাম। যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের সাধু সন্ন্যাসী, ধর্মার্থী তীর্থ-যাত্রীগণ এই চারিটী ধামকে মহাতীর্থ জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন। মর্তলোক হইতে স্বর্গলোক পৌঁছিতে জয়ন্তর সময় লাগে দ্বাদশ দিন। তাই দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই চারিধামে যে কুম্ভ হইয়া থাকে, তাহাই পূর্ণ কুম্ভ নামে অভিহিত। ইহাই কুম্ভের উৎপত্তির পৌরাণিক বিবরণ।

সাধারণ গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়ঃ কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি এবং মকর রাশিতে সূর্যের সংক্রমণ হইলে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইবে প্রয়াগধামে। এজন্য প্রয়াগে মাঘ মাসে কুম্ভমেলা হয়—আর হরিদ্বারে চৈত্র মাসে, উজ্জয়িনীতে বৈশাখ মাসে এবং নাসিকে শ্রাবণ মাসে এই মেলা হইবার কথা। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক স্থানে মেলা বসিবার বিধি ছিল ; কিন্তু মুসলমান যুগ হইতে নানা বিপর্যয়ে নাসিক ও উজ্জয়িনীতে মেলা বসে ছয় মাস অন্তর, আর প্রয়াগে অর্ধ কুম্ভ বসে ছয় বৎসর অন্তর।

ঐতিহাসিক বিচারে কুম্ভমেলার রাজনৈতিক দিকের আভাস পাওয়া যায়—ইহা সাধুদের রাজনীতি। দেশ রক্ষার মধ্য দিয়া ধর্ম রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতি তিন বৎসব অন্তব এক স্থানে মিলিত হইতেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। দেশকাল অনুযায়ী বিধি ও বিধানের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিয়া সংঘকে তাঁহারা পুনর্গঠিত করিতেন। পরে দিকেদিকে রক্ষী দলের অভিযান পরিচালনার জন্য হইত কুম্ভমেলার আয়োজন। ইতিহাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ গ্রন্থের পট-ভূমিকায় দেখিতে পাওয়া যায় সাধুদের দেশ ও ধর্ম রক্ষার এই প্রচেষ্টা।

তবুও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার, সেই তাগিদেই দেশ রক্ষার প্রয়োজন ছিল গৌণ। আধুনিক যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে মেলার রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কুম্ভমেলা এখন ভারতের ধর্মমেলা, সাধুদিগের কংগ্রেস।

মেলা অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলাম কলিকাতায়। আসিবার সময় ভীড়ের মধ্যেও জনৈক রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে একটি খালি কামরা সংগ্রহ করা হইল।

ফাল্গুন মাস, ১৩৩৬। শিবরাত্রি উপলক্ষে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে আমরা চন্দননগর আশ্রমে সমুপস্থিত।

সকালে ঠাকুরের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এবং ব্যারিষ্টার এ. কে. ঘোষ। সদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়া ডঃ বড়ুয়া বলিলেনঃ বিশ্বসাহিত্যে এমন অপূর্ব গ্রন্থ আর নাই। গ্রন্থগুলির ইংরাজি অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার প্রার্থনা জানাইলেন তিনি। গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে বৌদ্ধ দর্শনের সারমর্ম সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে দেখিয়া মুগ্ধ হন বড়ুয়া সাহেব। সেজন্য শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে জানিলেন কোন দিন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করেন নাই ব্রহ্মচারিজী। শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যাঁহাকে জানিলে সকল জ্ঞান সার্থক হয়, তাঁহার জীবন্ত বিগ্রহের সমক্ষে গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বিদায় লইলেন ডঃ বড়ুয়া।

বেলা প্রায় দশটায় আশ্রম প্রাঙ্গনে পঞ্চবটী তলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। উন্মীলিত চক্ষু দুটী কোন সুদূর অজানা রাজ্যে নিবদ্ধ। সহসা উত্তেজিতভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্তে সজোরে আঘাত করিলেন। ব্যাপারটি তখনকার মত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তবু ঠাকুরের এই সমস্ত কার্যকলাপের পশ্চাতে নিহিত থাকে অনেক অলৌকিক ঘটনা, যথা সময়ে তাহা প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের চিঠিপত্র লিখিবার দায়িত্বভার তখন এই অধমের উপর, এজন্য বহু বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে অন্তরে সঞ্চিত হয় নানা অভিজ্ঞতা। সেইজন্য ডায়েরীতে উল্লিখিত ঘটনাটি বুঝিবার উদ্দেশ্যে সময় ও তারিখ লিখিয়া রাখিলাম। কয়েকদিন পরে গোপালগঞ্জের সতীর্থ অমৃতলাল বিশ্বাস মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিলামঃ সেইদিন ঠিক ঐ সময়ে তিনি কয়েকজন গুণ্ডাদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন; একজন বর্শা দ্বারা তাঁহাকে

বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে সহসা উপস্থিত হইলেন বিকট দর্শন এক বিরাট পুরুষ, লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে সকলকে ধরাশায়ী করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হইয়া পড়েন অমৃত বাবু।···এমনি মহিমার অন্ত ছিল না দয়াল ঠাকুরের।

শিবরাত্রি উপলক্ষে গল্পগুজবে বা কোন উপায়ে বৃথা সময় কাটাইবার উপায় ছিল না আমাদের, শ্রীগুরু সমক্ষে আসনে বসিয়া থাকিতে হইত সমস্ত রাত্রি। আর চারি প্রহরে চলিত চারিবার হোম, পূজা-পাঠ ও স্তবস্তুতি। এবারেও শারীরিক এত দুর্বলতা সত্ত্বেও শিবরাত্রির অনুষ্ঠান শুরু হইল যথারীতি।

মধ্যরাত্রে শ্রীগুরুর নির্দেশে গান ধরিলাম: নাচে পাগলা ভোলা বাজে বম-বম-বম-বম।···গানটীর শেষ লাইন: নাদ উঠিছে সোঽহং সোঽহং।···গানের শেষে 'সোঽহং' কথাটী উচ্চারিত হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরও তাহা উচ্চারণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। মস্তকের উপর খাড়া হইয়া উঠিল সমস্ত দীর্ঘ জটাগুলি, সারা অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল এক অপূর্ব স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল জ্যোতি। তুষার শুভ্র দেবদেহ, উন্নত ললাটের উপর দীর্ঘ জটা সর্পফণার ন্যায় দোদুল্যমান। পলকে মনে হইল সাক্ষাৎ সদ্‌গুরু সদাশিব মহাদেব!···এই অপ্রাকৃত দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইলাম আমরা অনেকে। কোন কোন ভাগ্যবান সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে গিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।···

নরদেহে আত্মদর্শনের কী অপূর্ব অপ্রাকৃত লীলা!···পরক্ষণে ভাব সংবরণ করিলেন শ্রীগুরু মহারাজ। মায়া বিস্তার করিয়া সাধারণভাবে আলাপ-ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত সাধারণ লোকটী যেন। পরে কেহ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে গেলে ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন তাহাকে। বলিলেন: আপন ভজন কথা না কহিবে যথাতথা।···

সাক্ষাৎ শিবের সমক্ষে ইহাই আমাদের শেষ শিবরাত্রি!

অতঃপর পুরীধামে গমন করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। দোল উৎসব উপলক্ষে আমরা আবীর অঞ্জলি দিলাম বিগ্রহত্রয়ের এবং গুরুদেবের শ্রীচরণে।

চৈত্রমাসে পুরীধামেই অবস্থান করিলেন ঠাকুর।

এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা নামানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত থাকিতেন। সদ্‌গুরুরূপে তাঁহার অমর জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর অপার মাধুর্য্য-রসের লীলায় ভরপুর। এইরূপ কয়েকটি মধুর লীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল লেখকের।

গ্রীষ্মকালে ঠাকুর প্রত্যহ গমন করিতেন সমুদ্রতীরে পুলিনপুরী বাড়ীতে। সমস্ত দিন মুক্তবায়ু সেবন করিতেন, আর নিরালায় ডুবিয়া থাকিতেন নামানন্দে। রাত্রে ফিরিয়া আসিতেন ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে।

প্রাতঃকালে ঠাকুর ফিটনে উঠিবার সময় গোসাঁই সমাধির ফটকে রোজই করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিত একজন কুষ্ঠরোগী। ঠাকুরের দর্শনলাভ করিতেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বেচারি চলিয়া যাইত। পাছে সে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সতর্ক থাকিতাম প্রতিদিনই।

একদিন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় আসিতে একটু বিলম্ব হইল। পরক্ষণে আসিয়া দেখি—শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্ঠরোগীকে নিবিড় আলিঙ্গন দিয়া কর্ণে উচ্চারণ করিলেন মহামন্ত্র।...আর অভিভূত আনন্দে করতালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল কৃতকৃতার্থ কুষ্ঠরোগী।...

নিরুপায়ে হতবাক হইয়া রহিলাম। কিন্তু নিদারুণ আশঙ্কায় বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। অপরাহ্নে দেখিলাম দেবদেহে সত্যই অনেক-গুলি ফুস্‌কুড়ির মত দেখা দিয়াছে! অমনি সিভিল সার্জেনকে লইয়া আসিলাম সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি দেখিয়া বলিলেন, ফুস্‌কুড়ির রস লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।...পরীক্ষার পর রোগ-বীজাণু অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া ইনজেক্‌সানের বিধান দিলেন।

ঠাকুর তবুও নিরস্ত হইতে বলিলেন আমাদের। বাধ্য হইয়া আদেশ পালন করিতে হইল, কিন্তু মনের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইল। দুই-তিন দিনে সমস্ত উপসর্গ সত্যই মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

গোপন হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া রহিল শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরিসীম কৃপার কথা।...শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ন্যায় দুরারোগ্য রোগগ্রস্থ নরাধমকেও আলিঙ্গন

দান করিয়া এইভাবে দুঃসহ ভবজ্বালার হাত হইতে তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিলেন।···

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুর পুলিনপুরীর দ্বিতলে সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া শায়িত আছেন এবং এ অধম পশ্চাৎদিকে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। সহসা একটি গুরুভগ্নী চুপিসারে আসিয়া আমার হাত হইতে পাখাখানি লইতে গেলে শ্রীগুরু হঠাৎ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বলিলেনঃ সেবা করবার অধিকার পেয়েছ বলে কি সেবা দেবারও অধিকার হয়েছে? জান! ও বাতাস করলে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবে? গুরুভগ্নীটি লজ্জায় সরিয়া পড়িলেন। এ-সব তত্ত্ব বোঝা ভার। নীরবে বাতাস করিতে রহিলাম।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আর একটী লীলার কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন বেশ মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। জটিয়াবাবার মঠের একটী আমগাছ তলায় উপবিষ্ট আছেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

কাছে গিয়া তাঁহাকে আশ্রমের দালানে বসিবার অনুরোধ করিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেনঃ আমার অনিকেত ব্রত—আড়াই শ' বছর কোন আশ্রয়ে কখনো থাকিনি, গাছতলা বা আকাশের তলাতেই আমাদের বাস। সারা জীবন ভ্রমণ করে জগতের সমস্ত স্থান দেখেছি, লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্তদের সঙ্গ করেছি—আত্মার তবু তৃপ্তি হয় নি।···শেষে উপর থেকে এক আদেশ পেয়ে ব্রহ্মচারী মহারাজের কৃপালাভের জন্য এখানে বসে আছি।

ঃ তাহলে ঠাকুরের কাছে চলুন—

ঃ মহারাজজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সুসময়ের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে আদেশ দিয়েছেন।···

সর্বদা ঠাকুরের সেবাতেই আছি। অথচ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার কখন সাক্ষাৎ হইল, কীভাবে আলাপ করিলেন—কিছু বুঝিলাম না।···

পরদিন প্রাতঃকালে দেখিলাম সাধুজী অন্যত্র প্রস্থানোদ্যত। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, গত নিশীথ রাত্রে তাঁহার কার্যসিদ্ধি হইয়াছে।···

সাধনপ্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন, তাঁহার জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাই আজ সিদ্ধ হইয়াছে।

বিস্মিত হইয়া শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন : ইনি স্বভাবসিদ্ধ যোগী। বেরার অঞ্চলে জন্মস্থান, নাম পরমহংস মাধো মহারাজ। সামান্য একটু কর্ম বাকি ছিল—তাই এখানে এসেছিলেন।...

ঠাকুর বুঝাইলেন জলের মত। অবোধ বালককে রূপকথার গল্প শুনাইলেন যেন।...কিন্তু ঘটনাটি যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলামাধুর্যের কণামাত্র আস্বাদন করিয়া জীবন ধন্য মনে হইতে লাগিল।...ঠাকুরকে মনে হয় আমাদেরই একজন—আজ মনে হইল তিনি ধরাছোঁয়ার কত বাহিরে,...তাঁহার অপার মহিমা একেবারেই আমাদের ধারণাতীত।...সাধুটী স্বভাবসিদ্ধ যোগী ও পরমহংস, কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপালাভ ব্যতীত সিদ্ধির এই অবস্থাও ধর্মজীবনের চরম পরিণতি নহে!—এইজন্য লক্ষ লক্ষ সাধু-মহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়াও তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হয় নাই।...উপর হইতে কোন্ মহাপুরুষের আদেশে কে জানে—তিনি আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে লাভ করিলেন সর্বসিদ্ধি, আত্মার চরম ও পরম তৃপ্তি। ··ভাবিয়া অপূর্ব আনন্দে চোখে জল আসিয়া পড়িল।...বুঝিলাম, বড় বেশী নিকটে থাকি বলিয়াই উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখরের উচ্চতা উপলব্ধি করিতে পারি না—আসলে সত্যই আমরা পরম ভাগ্যবান।...

পূর্ব্ববৎসর পূজার পর কয়েকদিনের জন্য শেষবারের মত কাশীধামে গমন করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তখন দরবেশজীর (শ্রীমৎ কিরণ চাঁদ দরবেশ) আত্মীয়, পোষ্ট মাষ্টার অমূল্য কুমার বন্দোপাধ্যায় দীক্ষালাভ করেন।

এই সময়ের মধ্যে আরো বহু নরনারী দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে চেৎলায় গুরুদেবের আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ভজনশীল চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য (স্বামী দয়ানন্দ), চিত্রকর চিরকুমার শরৎ চন্দ্র ঘোষ, ব্রহ্মচারিজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও গোসাঁইজীর শিষ্য কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয়ের পুত্র গোপেশ চন্দ্র গুহঠাকুরতা,

একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার হরিসাধন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দরবেশজীর কাশী বিজয়কৃষ্ণ মঠে গোসাঁইজীর প্রকাণ্ড তৈলচিত্র এবং গোসাঁইজী ও ব্রহ্মচারিজীর আরো অনেক সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কন করেন শরৎ চন্দ্র। প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে নৌকার উপর দীক্ষাপ্রাপ্ত হন গোপেশ চন্দ্র। ইঁহার জননী কুসুম কুমারী দেবী বিনা অগ্নিতে রান্না করিয়া পরম সমাদরে ব্রহ্মচারিজীকে ভোজন করাইয়াছিলেন। জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রশঙ্কর ইতিপূর্বেই দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্র দাদার কনিষ্ঠ পুত্র সৌরীন্দ্রশঙ্করকেও মাত্র সাড়ে চারি বৎসর বয়সে দীক্ষাদান করেন ঠাকুর। তাঁহার বাল্যবন্ধু ব্যারিষ্টার ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী সুভাষিণী চট্টোপাধ্যায়, গোসাঁই শিষ্য বিশ্বম্ভর মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র ও আটঘরের ক্ষত চিকিৎসক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও কেদারনাথ মণ্ডল, মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধন বৈঠকের পরিচালক যোগীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও দীক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

শত অসুস্থতা সত্ত্বেও জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এইভাবে সদ্‌গুরুর মহিমা প্রচার করেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান গোসাঁইজীর নির্দেশ অনুযায়ী ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন সদ্‌গুরুর সেবা ও পূজা।

॥ বিশ ॥

বৈশাখ মাস, ১৩৩৭। নববর্ষের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাইলাম শ্রীগুরু চরণে। লাভ করিলাম মধুর ও অক্ষয় আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদে শীতল হইত ত্রিতাপদগ্ধ দেহমনপ্রাণ, নন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইত বুভুক্ষু অন্তরাত্মা।

বর্ষ যায়, আসে নববর্ষ। অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকে অতীতের স্মৃতি। সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে ভবিষ্যতের আশা ও স্বপ্ন। শ্রীগুরুর কত অপার স্নেহ ও কৃপা, কত দিব্য লীলা ও মহিমা অক্ষয় হইয়া রহিল স্মৃতির ভাণ্ডারে। কিন্তু ভবিষ্যতের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অচিরে যে সমাচ্ছন্ন হইবে গভীর আঁধারে, তাহা কি সঠিক বুঝিয়াছি তখনও ?—

গোষ্পদের জলে অনন্ত আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় বটে, কিন্তু ধরা পড়ে না। বিন্দু কী করিয়া বুঝিবে মহাসিন্ধুর বিচিত্র মহিমা ? এছাড়া বিভূতি বিস্তার শ্রীগুরুর আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। বরং অন্তর সমুদ্রের সুবিপুল ঐশ্বর্য সযত্নে সঙ্গোপনে রাখিবার জন্য তিনি ছিলেন সদা সতর্ক। তবু ভাববিহ্বল আত্মসমাহিত অবস্থায় মাঝে মাঝে নীলকণ্ঠের স্বর্গীয় দ্যুতি ও অন্তর মাধুর্যের লেশমাত্র প্রকাশিত হইত।

সেই কণামাত্র ঐশ্বর্যের অলৌকিকত্বে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে সমস্ত মনপ্রাণ ; কিন্তু তাঁহার অনাবিল মাধুর্য-রসেই চমৎকৃত ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে গোপন হৃদয়। অষ্টসিদ্ধির বিপুল মহিমা পরিপূর্ণভাবেই ছিল তাঁহার করায়ত্ব। আকাশগঙ্গায় দস্যুদল পর্যুদস্ত হইয়াছে এই অলৌকিক ঐশ্বর্যে। সদ্যবিধবার আর্তক্রন্দনে প্রাণদান করিয়াছেন তাহার মৃত স্বামীকে। নোয়াখালিতে জনৈক গুরুভ্রাতা পথ ভুলিয়া নিতান্ত দুর্গম পথে চোরাবালির মধ্যে পড়িয়া মৃতপ্রায় হইলেন ; সহসা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং কুম্ভীরের পৃষ্ঠে চড়াইয়া নদীপারে পৌঁছাইয়া দিলেন নিরাপদে। কোন শিষ্য যুবতীর মোহে নিশাকালে তাহার বক্ষলগ্ন হইলে একই সময়ে সমস্ত গবাক্ষপথে আবির্ভূত হইয়া রক্ষা করেন তাহাকে। শ্রীগুরুর এমনি বিভূতির অন্ত নাই—তবু নিতান্ত প্রয়োজনে বিশেষতঃ আপদকালেই তাহার কণামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অসংখ্য শিষ্যভক্ত ও সাধারণ নরনারীর জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়াছে তাঁহার সুনিবিড় মধুরভাবে,···তাঁহার অনন্ত প্রেমমাধুর্যে।··· নীলকণ্ঠের অমৃত পরিবেশনের সার্থকতা হয়ত এখানেই।

বস্তুত, এত দরদ ও সমবেদনা জীবনে আর কাহারও নিকট হইতে লাভ করি নাই। এত গভীর প্রাণভরা ভালবাসা যে কাহারও অন্তরে থাকিতে পারে ইহা ছিল আমাদের ধারণাতীত। মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নি, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব—সকলের ভালবাসাই তাঁহার প্রেমামৃতের তুলনায় নিতান্ত ম্লান, অতি তুচ্ছ। এই প্রেম ছিল যেন জীবন্ত ও জ্বলন্ত— তাঁহার গভীর আকর্ষণে পিতা পুত্রকে ভুলিয়া যাইত, জননী সন্তান ফেলিয়া ছুটিত, সাধক তাহার সাধন ছাড়িয়া অপলকে চাহিয়া থাকিত সেই প্রেমপূর্ণ দিব্যমূর্তির দিকে।···

বার বার শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াও সাধ মিটিত না আমাদের। সুযোগ পাইলেই তাঁহার শ্রীচরণতলে উপস্থিত হইতাম, ভাববিহ্বল নেত্রে সকলেই চাহিয়া থাকিতাম তাঁহার সদাপ্রসন্ন বদন পানে। অন্তরের সমস্ত প্রশ্ন স্তব্ধ হইয়া যাইত—দু-একটি প্রশ্ন করিলেই তিনি যে উত্তর দিতেন তাহাতে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান মিলিত। অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত সেই বাণী ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী—আর সেই কথার মধ্যে যে দরদ থাকিত, প্রাণ ভরিয়া তাহা উপভোগ করিয়া সুমধুর প্রেমরসে অভিষিক্ত হইত তাঁহার চরণাশ্রিত সহস্র সহস্র নরনারী।

বাহিরে ঠাকুর ছিলেন সদাগম্ভীর। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইলে বোঝা যাইত মাঝে মাঝে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে রঙ্গরসে প্রবৃত্ত হইতেন তিনি। এই উচ্চাঙ্গের হাস্য-পরিহাস সমস্ত মলিনতা বিদূরিত করিয়া আমাদের লইয়া যাইত এক অনস্বাদিত আনন্দরাজ্যে। মহিলাদের সঙ্গেও তাঁহার নিঃসঙ্কোচ রঙ্গরস ও অকুণ্ঠ মেলামেশা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকেই প্লাবিত করিত তাঁহার অন্তরের নিখাদ অমৃত-প্রবাহ। মহিলা এমনকি যুবতীরাও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে সহজেই ভুলিয়া যাইত সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ। কঠোর, সদাগম্ভীর যোগিরাজ তখন তাঁহাদের অভিন্নহৃদয় বান্ধবী যেন।···পঞ্চম খণ্ড সদ্‌গুরুসঙ্গ প্রকাশিত হইলে কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলাম শ্রীরাধিকার ন্যায় তাঁহার এই মধুরভাবের উৎস কোথায়।···২ খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন—১৩০০ সালে তিনি বাণরিপাড়া গমন করিলে সাজাল নামে উচ্চভাবাপন্ন এক মুসলমান ফকির কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সঙ্গী গুরুভ্রাতাদের প্রশ্ন করেছিলেন : উনি কি মাইয়া, না পুরুষ ?···পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন অপ্রাকৃত কান্তাভাব, এজন্য বাহিরে পুরুষাকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার মনে জাগে এই সংশয়।···

উচ্চকোটির সাধকদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হয় বিচিত্র স্বপ্নের মধ্য দিয়া, তাহার মধ্যে নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে ব্রহ্মচারিজীর মনে হইত—

কামিনী সঙ্গেও তাহার চিত্ত দিব্য নির্বিকার, সন্ন্যাস লাভের পূর্ণ যোগ্যতা তাঁহার সহজাত স্বভাবধর্ম। ১২৯৭ সালে বৈশাখ মাসে তিনি স্বপ্ন দেখেন : তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতা বলিতেছেন—জিতকাম না হলে সিদ্ধিলাভ হয় না।···সন্ন্যাসীর একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র দেখ।··· তিনি উলঙ্গ হইলে ব্রহ্মচারিজী সবিস্ময়ে দেখেন,—গুরুভ্রাতার উপস্থের চিহ্নমাত্র নাই, তাহা যোনিতে পরিণত হইয়াছে !···

পরবর্তী কালে এই স্বপ্ন সার্থক হয় ঠাকুরের দিব্য জীবনে। কুম্ভমেলা পরিক্রমার পূর্বে ১৩৩৬ সালে শেষবার গয়াধামে গমন করিয়া জনৈক শিষ্যকে তিনি লেখেন : বহুকাল হইতে আমার ছয় বৎসরের বালিকা, ষোল বৎসরের যুবতী বা ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধার মধ্যে কোন পার্থক্য বোধ নাই। আমার পুরুষাঙ্গ যেন যোনিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রস্রাব করিবার প্রয়োজনে অতি ক্ষুদ্র উপস্থটিকে গর্ত্ত মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিতে হয়।···

এই উক্তির মধ্যেই নিহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কামাতীত মধুর ভাবের নিগূঢ় রহস্য। মহিলারাও অন্তর দিয়া উপলব্ধি করেন তাঁহার এই শুকদেব-সুলভ নির্বিকার মাধুর্য ; এজন্য তাঁহারা ঠাকুরের মধুর সঙ্গলাভ করিতেন সম্পূর্ণ অবাধে ও নিঃসঙ্কোচে।

ঠাকুরের ১৩০১ হইতে ১৩০৬ সালের ঘটনা সম্বলিত ষষ্ঠ খণ্ড ডায়েরী আজও অপ্রকাশিত এবং আমাদের নাগালের বাহিরে। এই দিনলিপিতে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন : আমার মনে হয় আমি যেন পূর্ণযৌবনা স্ত্রীলোক এবং গোসাঁইজী পরম সুন্দর যুবা। মিলনের জন্য প্রাণ আমার সর্বদা ব্যাকুল। আমি যদি আমার প্রাণপ্রিয় গোসাঁইজীর বসিবার ঐ আসন হইতাম, তবে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া এ বিরহজ্বালা জুড়াইতাম। আহা ! আমি যদি গোসাঁইজীর চা-সেবার ঐ পাথরবাটী বা নারিকেলের মালা হইতাম, তবে শ্রীমুখের ওষ্ঠামৃত পান করিয়া জীবন-যৌবন সার্থক করিতাম।···

বৈষ্ণব-কাব্যে বিরহ-মিলনে প্রেমের যে অনুপম মাধুর্যের দ্যোতনা, ব্রহ্মচারিজীর প্রার্থনার মধ্যে সেই একই সুর প্রতিধ্বনিত। শান্ত-দাস্য-

সখ্যাদি ভাবের মধ্যে গোপীদের মধুর ভাবই সর্বোত্তম—চরম ভক্তি ভাবকেও অতিক্রম করিয়া পরম প্রেমামৃত রস প্রবাহে ইহার বিচিত্র বিকাশ।···শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও গোস্বামী প্রভুর ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই কান্তারসাশ্রিত অভিনব ভক্তি ও প্রেমের প্রকাশ। অন্যত্র ঠাকুর লিখিয়াছেন: শ্রীকৃষ্ণের তীব্র বিরহে শ্রীমতী যেমন তাঁহার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা উন্মনা ও পাগলপ্রায় থাকিতেন, সামান্য শব্দ কর্ণগোচর হইলে যেমন তাঁহার আগমন আশায় সচকিত হইয়া উঠিতেন, আমার অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে।···এ যেন গীতগোবিন্দ কাব্যের সেই রসমাধুর্য: পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপবানম্।···

ঠাকুরের সাধন জীবনে যে অবিচল ভক্তি ও প্রেমের বিকাশ, সদ্‌গুরু জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাহার সার্থক পরিণতি।···জীবন-দেবতা গোস্বামী প্রভুকে আশ্রয় করিয়া এ প্রেম সঞ্জাত হইয়াছে আত্মহারা শিষ্যের হৃদয়ে, সদ্‌গুরুরূপে তাহাই প্লাবিত ও কৃতার্থ করিয়াছে সহস্র সহস্র ভক্তমণ্ডলীকে। এই মধুর ভাব সাধারণের ধারণাতীত। সেইজন্য ভুল বুঝিয়া সাধারণ অনেকে তাঁহার উদ্দেশে বর্ষণ করিয়াছে জঘন্য কলঙ্ক ও অপবাদ। অন্তরে যিনি গোপী ভাবের মূর্ত বিগ্রহ, বাহিরে 'কলির কেষ্ট' রূপে চলিয়াছে তাঁহার অপপ্রচার। নদীপ্রবাহ দুই কূল প্লাবিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে যত ময়লা ও আবর্জনা তো বহন করিবেই পরে তাহারই ফলে শ্যামল শস্য সম্ভারে হাসিয়া ওঠে বন প্রান্তর। শ্রীশ্রীঠাকুরও আপন প্রেমপ্রবাহে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন সর্বগ্লানি ও অসম্মান, আর অকাতরে অযাচিত কৃপা ও প্রেম বিতরণ করায় ধন্য হইয়াছে সারা দেশ। তাঁহার সিদ্ধ ও সদ্‌গুরু জীবনের অন্তহীন লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সামান্যতম অংশ এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও আপন মহিমায় বিকশিত এই অনুপম মাধুর্য ও প্রেমামৃত।···

বৈশাখ মাস, অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর গমন করিলেন তাঁহার অন্যতম লীলাক্ষেত্র শ্যামপুরে।

এখানে সদ্‌গুরুর সেবাপূজার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন ধনাঢ্য ভক্ত বিষ্ণুপদ বেরা এবং প্রিয় অনুরাগী শিষ্য সন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের সহিত কেদারবাবু, হেমবাবু, ক্ষেত্রবাবু, শরৎ বাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যদের সহযোগীতায় ইতিপূর্বেই শ্যামপুরে নির্মিত হইয়াছিল ঠাকুরবাড়ী। সেবাপূজা প্রতিষ্ঠার জন্য এবার শিষ্য-বর্গের ঐকান্তিক আহ্বানে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও সেখানে উপস্থিত হইলেন গুরুগতপ্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুর। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য বাসরে ভগবান গোসাঁইজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। উইল তথা অর্পণনামা দলিলে বর্ণিত সর্তানুসারে শ্যামপুরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া শেষ করিলেন এতদিনের সঙ্কল্পিত অর্ধসমাপ্ত কার্য। তাঁহার কর্মময় জীবনের ইহাই শেষ কর্তব্য।…

শ্যামপুরে গমন করিলে ব্রহ্মচারিজী মাঝে মাঝে উঠিতেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য সন্তোষনাথজীর বাড়ীতে। সরকারী কর্মচারী হইলেও তাঁহার ন্যায় সদানন্দ, সাধনশীল, নিরভিমান ভক্ত ছিলেন সকলের আদর্শস্থানীয়। এমন দাস ভাবাপন্ন ভক্ত, এমন গুরুগত প্রাণ একনিষ্ঠ সেবক আধুনিক যুগে অতি দুর্লভ।

এখানে একটি পুরাতন শিব মন্দির সংলগ্ন আটচালা ঘরে শিষ্যবৃন্দসহ প্রায়ই বসিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর। গ্রামের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাধারণ নরনারীও সমবেত হইতেন। একদিন অপরাহ্ণে বসিয়া আছেন সকলে—ঠাকুর নীরব, কেমন যেন সমাহিত ভাব। সহসা শিব মন্দিরের মধ্য হইতে অগ্রসর হইল একটি বিষধর সর্প, উচ্চ ফণা দোলাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল ঠাকুরের সম্মুখে। আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন সকলে —ভীষণ সর্প এইবার বুঝি দংশন করে ব্রহ্মচারিজীকে। ঠাকুর কিন্তু নিশ্চল, আশ্চর্য নির্বিকার।…পরক্ষণে তাঁহার ভূলুণ্ঠিত জটাজাল অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে মস্তকে আরোহণ করিল বিষধর নাগরাজ, শিরে জটার উপর কুণ্ডলি পাকাইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিল রাজ ছত্রের মত। সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত, আশাতীত আনন্দে আত্মহারা! বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে এতদিনে তাঁহারা বহু ভাগ্যবলে প্রত্যক্ষ করিলেন নীলকণ্ঠ

বেশধারী ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর সর্পফণা শোভিত সত্যিকারের নীলকণ্ঠ মহাদেব মূর্তি!···অল্পক্ষণ পরে সর্পরাজ পুনরায় অবতরণ করিয়া প্রস্থান করিল শিবমন্দিরে।···

ঘটনাটি ভোজবাজির মতই বিস্ময়কর। অথচ তাহা সংঘটিত হইল প্রকাশ্য দিবালোকে, শত শত লোক চক্ষুর সমক্ষেই। তবু সাধারণের যুক্তিতর্ক, সংশয় ও অবিশ্বাস ঘুচিতে চায় কি?

মনে পড়ে গেণ্ডারিয়া আশ্রমের কথা। সেখানেও একদিন গোসাঁইজীর মস্তকে নাগরাজ আরোহণ করিয়া ধরিয়াছিলেন এমনি রাজছত্র। তাঁহার প্রাণপ্রিয় মানসপুত্রের ক্ষেত্রেও দেখা দিল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—প্রিয়তম সন্তানকে তাঁহার নীলকণ্ঠ বেশ দান সার্থক হইল এতদিনে।···

সেদিন চির অনুগত কুলদানন্দের প্রশ্নে গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন ঃ ···সরুনালে প্রাণায়াম স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকলে তাতে বড় সুন্দর একটি শব্দ হয়। সাপ সেই সুর শুনতে ভালবাসে।···সাপ এসে ঐ সুর ধরতে গিয়ে গায়ে ঘাড়ে মাথায় উঠে পড়ে।···মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে তা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। ওভাবে সাধন করলে তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠতে পারে।···

শ্রীগুরুদেবের এই নূতন আলোক সম্পাতে সেদিন সাধক কুলদানন্দ লাভ করেন অভিনব অনুপ্রেরণা। তারপর কাটিয়া গিয়াছে কত বৎসর—দেহমন অঙ্গার করিয়া কত কঠোর সাধনা করিয়াছেন, মহাদেবের ন্যায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন মহাযোগী। সর্পরাজের তবু প্রকাশ্য শুভাগমন হয় নাই এতদিন—হইল যখন দুঃসহ হলাহল পান করিয়া অম্লান বদনে পরিবেশন করিলেন প্রেমামৃত।···সদ্‌গুরু জীবনের পরিণতিতে এইভাবে উদ্‌যাপিত হইল তাঁহার নীলকণ্ঠ ব্রত, সার্থক হইল গোসাঁইজীর আশীর্বাদ।

॥ একুশ ॥

প্রথম জীবন হইতে কুলদানন্দ ছিলেন কলিকাতার নিত্যযাত্রী। সাধন জীবনে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন অনেকবার, গুরুদেব ও গুরুভ্রাতাদের নিকট অবস্থান করিয়াছেন। সদ্‌গুরু জীবনেও অনেক সময়ই থাকিতেন কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে।

ছকু খানসামা লেনে শশীবাবুর বাড়ীতে এবং রাজা লেনে গুরুভ্রাতাদের একটি মেসে মাঝে মাঝে থাকিতেন।

সুকিয়া ষ্ট্রীট। ভক্ত শিষ্য গণেশ শ্রীমানীর বাড়ী। গণেশবাবু ও বিভারাণীর গুরুসেবা সুপরিচিত। পাপাসক্ত উপেন্দ্র শ্রীমানীর সহিত সাধ্বী মনোরমা দেবীর সংগ্রাম এবং এই বাড়ীতে ঠাকুরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কাহিনী স্মরণীয়।

শ্রীমানীদের বাড়ীতেই অতিবাহিত হয় শ্রীগুরুর বিশেষ ঘটনাবহুল জীবন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াই পরিবর্তিত হয় উপেন্দ্রনাথের জীবনের গতি। ঠাকুরের সদ্‌গুরুসঙ্গ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় এই বাড়ী হইতে।

এখানে বিশিষ্ট সজ্জনগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং নানা প্রকার ধর্ম-প্রসঙ্গে আনন্দের সহিত দিন কাটিত। 'ডন' পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক সতীশ মুখোপাধ্যায়, লাখুটিয়ার জমিদার সুকবি দেবকুমার রায় এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ প্রায় প্রত্যহ যোগদান করিতেন ধর্ম-আলোচনায়। সুপ্রসিদ্ধ গণেশ দাসের কীর্তনে বহু ভক্ত সমাগম হইত। ঠাকুর কুলদানন্দের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগদান করিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও উপস্থিত হইতেন এই বাড়ীতে। এখান হইতেই তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতেন।

পরমগুরু গোসাঁইজীকে সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া নিজে আত্মগোপন করিয়া থাকাই ছিল ঠাকুরের স্বভাবধর্ম। শ্রীমানীদের বাড়ীতে মহা ধূমধামের সহিত গোসাঁইজীর জন্মোৎসব পালন করিতেন। সর্বত্র গোসাঁইজীর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই বাড়ীতে বহু নর-নারী দীক্ষালাভ করেন।

ঝামাপুকুরে পরমভক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অনেক সময় অবস্থান করিতেন ঠাকুর। চিকিৎসার জন্য একবার এখানে আটমাসকাল অতিবাহিত হয়।

বহু ভক্তশিষ্যের স্থান সঙ্কুলানের জন্য একটী বড় বাড়ী ভাড়া করেন ক্ষিতীশচন্দ্র। গুরুদেব সর্বদা সেখানে অবস্থান করিবেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সকাল-বিকাল ভ্রমণ করিতে ঠাকুর ভালবাসিতেন; তাঁহার জন্য একখানা মোটর গাড়ী ক্রয় করেন ক্ষিতীশচন্দ্র। তিনি ছিলেন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণ। তাঁহার পত্নী স্নেহশীলা দেবী, তিন পুত্র এবং পরিবারের সকলেই আত্মনিয়োগ করেন শ্রীগুরুর সেবায়।

এই বাড়ীতেই ঠাকুরের দর্শনলাভ এবং বাণী গ্রহণ করেন চিকাগোর ধর্মযাজক রেভারেণ্ড মৌলমিন এবং আমেরিকাবাসী ভূপর্যটকগণ।

মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ডাক্তার সত্যরঞ্জন সেন এবং জিতেন্দ্রনাথ মোদকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন ঠাকুর। উভয়েই ছিলেন অনুগত ভক্ত। সত্যরঞ্জনের বাড়ীতে দীক্ষালাভ করেন যাভা-নিবাসী ডাচ্ দম্পতী।

জিতেন্দ্রনাথের বাড়ীতে সাধন বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য সকলকে উৎসাহ দান করেন ব্রহ্মচারিজী। সকলের উৎকর্ষ সাধনের তাগিদে সঙ্ঘবদ্ধ উপাসনার প্রবর্তন করেন। প্রাণায়াম অভ্যাস এই সাধন বৈঠকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রজ্বলিত অঙ্গার পৃথকভাবে থাকিলে অচিরে নির্বাপিত হয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তাপ বিকীর্ণ করে বহুক্ষণ। সংঘবদ্ধ সাধন তেমনি বিশেষ কার্যকরী।···

ঘনিষ্ঠ ভক্ত-শিষ্য বগলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই সাধন বৈঠকের সুযোগ্য পরিচালক। ইঞ্জিনিয়ার ভবেন্দ্রনাথ মজুমদারও ছিলেন এই বৈঠকের প্রাণ। জিতেন্দ্রনাথের গুরুসেবা ও পত্নী শান্তবালার মধুর আচরণ ছিল তৃপ্তিদায়ক। বিজয় বিশ্বাস, কালী বিশ্বাস, রোহিনীবাবু, চুনীবাবু প্রমুখ গুরুভ্রাতাদের কীর্তনে ও উৎসাহে এই বৈঠক ছিল ধর্মপ্রেরণার প্রধান উৎস।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। এখানে ঠাকুর উঠিতেন প্রিয় শিষ্য আশুপালের বাড়ীতে। শেষের দিকে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে অবস্থান করিতেন।

ঠাকুরের আন্তরিক সেবা-যত্নে সর্বদা নিযুক্ত থাকিতেন আশুদাদা ও পতিতপাবন। তাঁহাদের সুযোগ্যা গৃহিণী সুশীলা দিদি ও ঊষা দিদিও

ছিলেন শ্রীগুরুর সেবায় আত্মহারা। গুরুগতপ্রাণা ভগ্নিদের একনিষ্ঠ গুরুসেবায় অনুপ্রাণিত হইতেন সকলে।

গুরুদেবের শিষ্য সংখ্যা এই সময়ে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রত্যহ সমবেত হইতেন দর্শনার্থী বহু শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্ত নর-নারী।

একদিন দর্শনপ্রার্থী হইলেন এক প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী সাধু। হিমালয়ে তিনি সাধন করেন চব্বিশ বৎসর, পরে গুরুর আদেশে তীর্থ পর্যটনের জন্য আগমন করেন জন-সমাজে। কলিকাতায় আসিয়া শুনিতে পাইলেন নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারিজীর কথা, তাঁহার দর্শনলাভের আগ্রহে ফুল ও ফল লইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

ঠাকুর তখন ১০৫° ডিগ্রী জ্বরে শয্যাশায়ী। সেকথা জানিবামাত্র পাঞ্জাবী সাধুটি সামান্য একটু ঔষধ দিয়া তৎক্ষণাৎ রোগ সারাইয়া দিতে চাহিলেন। সবিনয়ে অসম্মতি জানাইলেন ঠাকুর, যোগৈশ্বর্য দ্বারা প্রারব্ধ ভোগ এড়াইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এছাড়া, গোসাঁইজী ভিন্ন আর কাহারও নিকট কখনও প্রার্থী হন নাই, কাহারও অযাচিত সাহায্য গ্রহণও তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ।

প্রত্যাখ্যাত হইয়া অধিকতর শ্রদ্ধাপ্লুত হইলেন পাঞ্জাবী সাধু ধর্মদাস। অগত্যা মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া প্রণামান্তে ফুলফল হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শয্যাশায়ী থাকা সত্ত্বেও চকিতে উঠিয়া বসিলেন ঠাকুর, সাধুর প্রীতি উপহার সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পলকে যেন তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া গেল উভয়ের মধ্যে ; মধুর ভাবাবেশে উভয়েই তখন আত্মহারা।...

নীচে নামিয়া সাধুটি সজল চক্ষে বলেন ঃ এমন মহাপুরুষ আর কখনও দেখেন নাই তিনি।...

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অবস্থানকালে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হইত। তখন তাঁহার শিষ্য সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎসবে প্রচুর লোক সমাগম হইত। অত্যধিক ভীড়ের হাত হইতে সকলকে অব্যাহতি দিবার জন্য একবার জন্মতিথির পূর্ব দিনে সকলের আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া

পুরী রওনা হইলেন। এমন সময় যোগেশ ব্রহ্মচারী ভাবোন্মাদ অবস্থায় গাহিয়া উঠিলেন ঃ

ওগো, দাঁড়াও একটিবার—
একটি গানে নামিয়ে দেব সকল ব্যথার ভার।···

সিঁড়ি দিয়া নামিবার পথে থমকিয়া দাড়াইলেন ঠাকুর। ভক্ত গাহিয়া চলিলেন—চোখের জলে বারবার গাহিলেন শেষ লাইন দুটী ঃ

ওগো, হবে নাক দেরী, একটু দয়া কর—
আমার অশ্রুজলের মালাখানি গলায় পর।···

অগ্রসর হইয়া ভক্ত শিষ্যকে আলিঙ্গন করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। উপস্থিত বহু লোক প্লাবিত হইলেন সেই উচ্ছ্বসিত আবেগে।··· শিষ্যদের চক্ষে অশ্রুধারা, শ্রীগুরুর চক্ষেও অশ্রুবিন্দু। সে এক অপূর্ব দৃশ্য !···

ঠাকুরের বদনে মৃদু হাসি ফুটিল—বিচিত্র মধুর হাসি।···দেখা দিল অশ্রু ও হাসির অনবদ্য সমন্বয়।···ভক্তের নিকট হার মানিলেন ভগবান, ···এ আনন্দ সেই পরাজয়ের।···

সকলকে লইয়া ঠাকুর ফিরিয়া চলিলেন নিজের ঘরে, পুরী যাওয়া বন্ধ হইল।

আর একবার জন্মদিনে সমবেত বহু শিষ্য সমক্ষে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে দাঁড়াইলেন ঠাকুর। মহানন্দ দাদা তখন ব্যবসায়ে সর্বস্বান্ত; ভবিষ্যতে গোসাঁইজীর সেবাপূজা পরিচালনার জন্য ঠাকুর বিশেষ আগ্রহান্বিত। তাঁহার অবর্তমানে অবাধে সেবাপূজা যাহাতে চলিতে পারে সেজন্য একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিষ্যদের নিকট হইতে যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সর্বসমক্ষে তিনি আজ ভিখারী বেশে উপস্থিত। সবিনয়ে বলিলেন ঃ আমি করজোড়ে কাতরভাবে ভিক্ষা চাই।···ভিক্ষাপাত্র হস্তে এ যেন স্বয়ং বিশ্বেশ্বর! গুরুসেবা তথা লোকশিক্ষার জন্য কী মধুর আকৃতি!··· এখানেই সৃষ্টি হইল তাঁহার 'ব্রহ্মচারী ভাণ্ডার'। আর সাধ্যমত অর্থ ও অলঙ্কার প্রণামী দিয়া ধন্য হইলেন সকলে।

এক স্থানে বেশী দিন অবস্থান করা স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল ঠাকুরের। প্রাণের বিশেষ আগ্রহ না থাকিলে তিনি কাহারও বাড়ী গমন করিতেন না। তবে গোসাঁইজীর সেবাপূজা প্রবর্তন করিবার আহ্বান আসিলে সাগ্রহেই তিনি সাড়া দিতেন।

নলিনাক্ষের প্রতিষ্ঠিত লোহার ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার ময়দাপট্টিতে অনেক শিষ্যের সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থানের সুযোগ হইয়াছিল। এখানে শ্রীগুরু উপস্থিত হইয়া গোসাঁইজীর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাধন বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।

নিষ্ঠাবতী শিষ্যা রাধারাণী মল্লিকের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী এবং গুরুনিষ্ঠ অন্নদাচরণ দাস মহাশয়ের ভবানীপুরের বাড়ীতেও পদার্পণ করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ঠাকুরের অনুমতি লইয়া নিজ বাড়ীতে সাধন বৈঠক স্থাপন করেন অন্নদাচরণ। তাঁহার দেহত্যাগের পর সাধন বৈঠক স্থানান্তরিত হয় জিতেন্দ্রশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে।

ভক্তশিষ্য জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে গমন করেন ঠাকুর। শ্রীগুরুর প্রতি বিশেষ ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন জিতেন্দ্র বাবুর পত্নী সুকবি প্রফুল্লময়ী দেবী। কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে ঠাকুর এক সময়ে বলেন: আমার সময় সময় ইচ্ছা হয়, সদ্‌গুরুসঙ্গ বইটী গোড়া থেকে রামায়ণ মহাভারতের মত সহজ সরল পদ্যে যদি কেউ অনুবাদ করতে পারত!···পরবর্তী কালে ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী এই দুরূহ কার্য কতকটা সম্পন্ন করেন প্রফুল্ল দিদি—কিন্তু আনুকূল্য অভাবে আজো তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

ইঞ্জিনিয়ার অচ্যুতকুমার নন্দী মহাশয় ঠাকুর প্রতিষ্ঠার জন্য একখানি অতি সুদৃশ্য সিংহাসন প্রস্তুত করেন। শ্রীগুরু নিজে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিবেন, এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করায় সেই উপলক্ষে তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ীতে গমন করেন ঠাকুর। খুব ধূমধামের সহিত প্রতিষ্ঠা উৎসব পালিত হয়।

অনুগত শিষ্য রাসবিহারী বর্মণ ও ব্রজবিহারী বর্মণের আন্তরিক আগ্রহে তাঁহাদের প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ীতে গৃহ প্রবেশকালে পদার্পণ

করেন শ্রীগুরুদেব। রাসবিহারী বাবুর ভক্তিমতী পত্নীর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হন সকলে।

ধনী শিষ্য যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে কয়েকবার পদার্পণ করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভোগবিলাসের মধ্য দিয়া লালিত পালিত হইলেও শ্রীগুরুর জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন সদানন্দ যতীন দাদা। উৎসবাদিতে তাঁহার উৎসাহের ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। ভোজন সভায় বড় বড় হাঁড়ি মাথায় করিয়া যখন তিনি সোৎসাহে পরিবেশন করিতেন, তখন সকলেই সে দৃশ্য উপভোগ করিত। পুরী আশ্রমে শ্রীগুরুর জন্য বহু ব্যয়ে গাড়ী-ঘোড়ার সুব্যবস্থা করিয়া দেন যতীন্দ্রদাদা।

এমনি আন্তরিক আহ্বানে তিনি গমন করেন ৬০ নং সিমলা ষ্ট্রীটে বীরেশ্বর শেঠ মহাশয়ের বাড়ীতে। বীরেশ্বর দাদা ও তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী পদ্মরাণী ধর্মপ্রাণ আদর্শ দম্পতী। বিশেষত পদ্মরাণীর গুরুনিষ্ঠা ও সেবানিপুণতা সুপরিচিত। বায়ু পরিবর্তনের জন্য কয়েক মাস পদ্মাবক্ষে বোটে করিয়া অবস্থানের সময় পদ্মরাণী ছিলেন শ্রীগুরুর একনিষ্ঠ সেবিকা। কলিকাতায় ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি ছুটিয়া যাইতেন। এমন কি মধ্যরাত্রেও প্রাণের টানে অভিভূতভাবে পদ্মরাণী ছুটিয়া চলিলে প্রমাদ গণিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেন বীরেশ্বর দাদা। পদ্মরাণীকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেন: আমার পদ্ম এসেছে—আর চিন্তা নেই।···গুরুদেবের মধুর কথায় ও গভীর স্নেহে নিজেদের ধন্য মনে করিতেন শেঠ দম্পতী। সদা প্রফুল্ল ভাব ও অমায়িক আচরণের জন্যও তাঁহারা ছিলেন শ্রীগুরু এবং ভাইবোনদের প্রিয়পাত্র। তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে এই বাড়ীতে হোম, পূজা ও উৎসবানন্দের মধ্যে গোসাঁইজী ও মাঠাকুরাণীর চিত্রপট প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীগুরুদেব। সদ্‌গুরুর নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিদায়কালে শেঠ দম্পতীকে আশীর্বাদ করিয়া শ্রীগুরু বলিলেন: সন্তানাদি নাই বলে ঠাকুরের সেবা পূজা বিষয়ে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবো না। এমন মেয়ে এমন ছেলে আসবে যে বাড়ীটা আশ্রমেরই মত নিত্য উৎসবে জমজমাট হয়ে থাকবে।

এইভাবে কলিকাতার বহু বাড়ীতে, বাঙলা ও ভারতের বহু আশ্রমে ভগবান গোসাঁইজীর সেবাপূজা প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আন্তরিক আগ্রহ সত্বেও কলিকাতা এবং মফঃস্বলের অনেকের পক্ষে ঠাকুরকে আপন গৃহে লইয়া যাওয়ার বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অনেকের আমন্ত্রণ সত্বেও সকলের বাড়ীতে গমন করা ঠাকুরের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় নাই। তবুও ঠাকুরের কৃপায় ও আশীর্বাদে সহস্র সহস্র ভক্ত সন্তানের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সদ্‌গুরুর নিত্য সেবা ও পূজা। এইরূপ পরোক্ষভাবেও ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

॥ বাইশ ॥

বৎসরাধিক পূর্ব হইতেই সুচিত হয় শ্রীশ্রীজটাশঙ্কর বাবার মর্মান্তিক মহাপ্রয়াণ। বিভিন্ন সময়ে নানা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় তাঁহার লীলা সংবরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করিবার জন্য পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে উপনীত হন প্রসিদ্ধা শ্রীনাম সাধিকা মাতা লেডি গৌরাঙ্গ। নির্জনে উভয়ে আলাপ আলোচনা করেন। বিদায়ক্ষণে মাতা গৌরাঙ্গিণী ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলেনঃ মহাপ্রস্থান সমূহ নিকট—দেখা অন্তকালে।…ঠাকুর বলেনঃ মাঝে একটা পর্দা বই তো নয়! এপার আর ওপার—সবই সমান আনন্দধাম।…মাতা চলিয়া যাইবার পর সে কথা সকলকে জানান ঠাকুর। পলকে দারুণ ব্যথায় শিষ্যদের মুখ মলিন হইয়া গেল। তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া ঠাকুর বলিলেনঃ তা হ'লই বা, এ শরীর তো চিরদিন থাকবে না।…

অনেকদিন হইতে ব্যাধির প্রকোপ সহ্য করিতেছিলেন শ্রীগুরুদেব। তবু তাঁহার ভাবে বা কথায় মহাপ্রয়াণের কোন ইঙ্গিত প্রকাশিত হয় নাই কখনও। ইদানিং প্রায়ই তিনি বলিতেনঃ কথামালার রাখাল বালক ও নেকড়ে বাঘের গল্পের মত হবে। বার বার অসুখ হচ্ছে,

চারদিকে টেলিগ্রাম যাচ্ছে—সব ছুটে আসছে, আবার ভাল হচ্ছি। যখন সময় হবে তখন কেউ টেরও পাবে না।···

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিলেন: তোদের মত সুখী ত্রিভুবনে কেউ নেই রে! যে কয়দিন পারিস ভোগ করে নে, আর কয়দিন!···

দীর্ঘকাল রোগগ্রস্থ ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষার দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল সকলের। অনবধানতা বশত তবু যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিত, সে গ্লানি ও কলঙ্ক আমাদেরই। তাহাতে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না ঠাকুর, নীরব থাকিতেন অসীম ক্ষমায়। কিন্তু গুরুসেবার ত্রুটিতে যে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হয়, সেজন্য এক সময়ে সেবা-ব্রতীদের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য বলেন: অনেকদিন ভুগছি, সেবা করতে করতে বিরক্তি তো আসবেই। ছেলেও বেশীদিন অসুখে ভুগলে মা তার মৃত্যু কামনা করেন। মহাপ্রভু সেবার অবহেলা দেখেই চলে গিয়েছিলেন।

শিক্ষাদান প্রসঙ্গে এ কথার শেষের দিকে আছে মহাপ্রয়াণের আভাস। বিছানার চাদর একদিন একটু অপরিষ্কার দেখিয়া বলিলেন: এখন তো লক্ষ্য কচ্ছিস নে, এরপর এগুলো বুকে নিয়ে কাঁদবি।···

পুলিন-পুরী ভবনে একদিন তাঁহার ফিডিং কাপ আনিতে ভুল হইয়াছিল। অন্য পাত্রে কমলালেবুর রস দিলে বলেন: সমাধি-মন্দিরে আলমারি হবে, তাতে এরপর এসব জিনিষ সাজিয়ে রেখে দেখবি—আর বেশীদিন দেরী নেই।···

ঠাকুরের এই সমস্ত কথায় বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিত আমাদের—দেখা দিত দারুণ আশঙ্কা, অব্যক্ত যন্ত্রণা।···

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠে তাঁহার সমাধি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের ইচ্ছা। অন্তরঙ্গ শিষ্যবৃন্দের বদ্ধমূল ধারণা, তাঁহার এসব কার্য সমাপ্ত হইলেই তিনি মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইবেন। অতএব, এসব কার্য সম্পাদনে যত বিলম্ব হয়, ততই আরো কিছু বেশীদিন দেহে অবস্থান করিবেন

তিনি। শিষ্যদের এই প্রকার দীর্ঘসূত্রতায় একদিন অচ্যুতবাবুকে বলিলেন: কিছু তো করলে না, এর পর ঠকতে হবে।...

১৩৩৩ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর সশিষ্যে তীর্থযাত্রা কালে নর্মদা তীর হইতে নিজ সমাধির জন্য সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন একটি বড় ও চারটি ছোট বাণলিঙ্গ শিব। তীর্থভ্রমণ অন্তে ঐ লিঙ্গগুলির জন্য তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন সুদৃশ্য কষ্ঠি পাথরের একটি গৌরীপট। ১৩৩৬ সালে শ্রাবণ মাসে পুরীধামে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন তিনি। ঐ সময়ে পুরীতে ডাকিয়া পাঠান মহানন্দ প্রমুখ তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে। তাঁহাদের সহিত স্বীয় সমাধি-মন্দির ও সেখানকার সেবাপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রম সংলগ্ন পূর্বদিকের নির্দিষ্ট জমিতে সমাধি-মন্দির নির্মাণের আদেশ দান করেন। শ্রীমন্দিরের ভিতরে সমাধি বেদী ও ৺নর্মদেশ্বর শিব স্থাপনের নির্দেশ দান করেন এবং শিবের ও সমাধির সেবাপূজার বিধি-ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করাইয়া দেন। কিছুদিন পরে আশ্রমে সমাধি মন্দিরের স্থান সম্বন্ধে আলোচনায় স্থির হয় যে, সমাধি-মন্দির নির্মিত হইবে বিল্ববৃক্ষ ও তমাল বৃক্ষের পূর্বদিকে।

রাজগীর অবস্থান কালে ঠাকুর তাঁহার ইঞ্জিনিয়ার শিষ্য অচ্যুতবাবুকে বলেন: তুমি খুব শিগগির পুরী গিয়ে সমাধি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে এসো—পরে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।... তদনুসারে সমাধি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার জীবিত কালেই।

চন্দননগর ঠাকুরবাড়ীতে মহাহোম সম্মিলনে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের দারুণ দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া ডাক্তারেরা সকলে একবাক্যে হোমে বসিতে নিষেধ করেন তাঁহাকে। আসন্ন মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া তিনি বলেন: বাধা দিও না, এই আমার শেষ হোম—যা পার করে নেও।

গয়াধামে তীর্থযাত্রায় রওনা হইবার প্রাক্কালে আশুপাল ভবনে সমবেত শিষ্যবৃন্দের সমক্ষে ঘোষণা করেন বিদায়বাণী। রুদ্ধকণ্ঠে

করজোড়ে বলেন ঃ আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি, বয়স তেষট্টি বছর। তোমরা আমার বুকের ধন, ভবিষ্যতের আশা—তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর, ক্ষমা কর, আমাকে আমার স্থানে চলে যেতে দেও।···

পরে শিষ্যাগণকেও সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ বাবুদের কাছ থেকে তো বিদায় নিয়েছি, তোরাও আমায় বিদায় দে।···

গয়াধামে জন্মোৎসব উপলক্ষে আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে সহসা বলেন ঃ এই আমার শেষ জন্মোৎসব, প্রাণ খুলে আনন্দ করে নে।···

প্রয়াগধামে ঠাকুর যে চড়ায় বাস অথবা সাধুদের শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেন না, তাহাতে অনেকের আশঙ্কা হইল তাঁহার লীলা-সংবরণের দিন সন্নিকট। মাঘী সপ্তমীতে আমাকে ব্রহ্মচর্য ব্রত প্রদান-কালে এবং সমষ্ঠিভাণ্ডারার দিন মণ্ডলেশ্বরদের মর্যাদা দান কালে তাঁহার কথায় পাওয়া যায় সেই একই আভাস।

কোন অপরাধের জন্য পুরী আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন জনৈক গুরুভ্রাতা। বহুদিন নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি কুম্ভের ছাউনিতে উপস্থিত হইলে তাঁহার অস্বাভাবিক জটা ও বেশভূষা দেখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিবার নির্দ্দেশ দেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এবং সে আদেশ পালিত না হওয়ায় তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলেন ঃ তোমাদের স্বেচ্ছাচারী মনোমুখী ভাব দেখে আমার আর দেহে থাকবার ইচ্ছা নেই। কেউ কাছা খুললে, বিচিত্র তিলক-চর্চা করলে, কেউ জটা রাখলে, নানাপ্রকার মালা ধারণ করলে। কেউ অযোগ্য অব্রাহ্মণ হয়েও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বলে নিজেকে প্রচার করে বেড়াচ্ছ, কোন আদেশ বা উপদেশ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না।···তোমরা যতই বেচাল চল না কেন, যতই দূরে থাক না কেন, আমার দৃষ্টির বাইরে নেই।···এসব কারণে আমারও ভোগের অন্ত নাই।···

চন্দননগর আশ্রমে শেষ শিবরাত্রি উপলক্ষে বিল্ববৃক্ষতলে বগলা দাদাকে ডাকিয়া বলেন ঃ চাকরি ছাড়ার পর তুমি এই মন্ত্র জপ করবে, এইভাবে চলবে। আর কিছু বলার সুযোগ পাই কিনা বলা যায় না।

শ্যামপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সেবাপূজার সুব্যবস্থা করিয়া এতদিনের সংকল্পিত অর্ধসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করাও লীলাসংবরণের পূর্বাভাস।

কলিকাতায় ফিরিয়া একদিন একখানি বন্ধ খাম দিলেন মহানন্দ দাদার হস্তে। বলিলেন: মানুষের শরীরের কথা কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়ে পড়ে, তখন এর ভিতর যেমন লেখা আছে সেইমত কাজ করবে। তার আগে খামখানা খুলবে না।

অবিলম্বে অনেক শিষ্য-শিষ্যাসহ নিদারুণ অসুস্থ দেহভার লইয়া ঠাকুর গমন করিলেন পুরী আশ্রমে, ইষ্টদেবের শ্রীচরণতলে।

ছোট জ্যেঠামহাশয় সারদাকান্তজী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবার গোসাঁইজীর তিরোভাব তিথি উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার যেন ঠাকুরই বহন করেন। সানন্দে সম্মত হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। শিষ্যদের হস্তে সমস্ত কর্মভার অর্পণ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, তাঁহাদের আচরণে তাঁহার গুরুভ্রাতা ভগ্নিগণ যেন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হন। সমারোহে সুসম্পন্ন হইল তিরোভাব উৎসব।

একদিন ঠাকুরের দর্শনলাভ করিতে আসেন পতাকী পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপাশ্রিত শ্রীশ্রীআশু-হরিদাস। নিজে কোন আলাপ আলোচনায় তখন প্রবৃত্ত হইতেন না ঠাকুর। সর্বদা ভাবমগ্ন, আত্মসমাহিত অন্তর্মুখী অবস্থা—যেন বিচরণ করিতেন কোন সুদূর দ্যুলোকে। প্রয়োজন মত শক্তি সঞ্চার করিতেন কোন শিষ্যের মধ্যে, তাহার দ্বারাই আগন্তুকের প্রশ্নের সদুত্তর মিলিত। সেইভাবে জনৈক গুরুভ্রাতা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন—শ্রীশ্রীআশু-হরিদাস যে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন না, তাহা গোসাঁইজীর পক্ষে অবমাননা-সূচক। ইহাতে শেষ পর্যন্ত অপমানিত বোধ করেন শ্রীশ্রীআশু-হরিদাস। তখন শিষ্যটিকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়া করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রীমুখে এখন কেবল শান্তির বাণী, প্রতি কার্যে কেবল সাম্যভাবের পরিচয়।...

আর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি অনেকক্ষণ ধর্মপ্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলেন; কিন্তু ঠাকুরের

তখন অর্ধবাহ্য অবস্থা। সহসা নিজের মধ্যে কেমন একটা শক্তির প্রেরণা ও আলোড়ন অনুভব করিলাম। শাস্ত্র উক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম—নিজে প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ না করিলে বক্তৃতা দ্বারা জগতের কল্যাণ করা যায় না, বরং অনিষ্ট করা হয়।...'হরের্নামৈব কেবলম্' বলিয়া প্রণামান্তে উঠিয়া গেলেন সারদাকান্তজী। শ্রীগুরুদেব মস্তক সঞ্চালন করিয়া সমর্থন করিলেন যেন। নিজের প্রগলভতায় পরে সঙ্কোচ বোধ করিলাম।

ঠাকুরের সমুদ্রসৈকতের আবাসস্থল পুলিন-পুরীতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন দর্শন করিতে আসিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের দুইজন উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন—গোসাঁইজী যাহা কিছু লাভ করিয়াছেন তাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপাতেই। ঠাকুর ধীর, স্থির, গম্ভীর। চকিতে তাঁহার মনে পড়িল—গোস্বামী প্রভুকে পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া রটনা করায় জনৈক শিষ্যকে একদা কীভাবে শাসন ও তিরস্কার করিয়াছিলেন গোসাঁইজী। তাহার সাক্ষ্য ছিলেন কুলদানন্দজী স্বয়ং। তবু আজ নিজে প্রতিবাদ করিলেন না ঠাকুর—নিকটে বসিয়া ছিলেন আমাদের জনৈক সতীর্থ, অতর্কিতে নব প্রেরণায় তাঁহার কণ্ঠে জাগিল প্রতিবাদ। আবেগভরে তিনি বলিলেন: গোসাঁইজী নিজ ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সরল বিবৃতি দিয়ে গিয়েছেন। তাতে যাঁদের কাছ থেকে তিনি ধর্মলাভে সাহায্য পেয়েছেন সেই সাতজন মহাপুরুষের নাম আছে।... মানস-সরোবরের পরমহংস ব্রহ্মানন্দজীর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণের পরই তাঁর জীবনের অপূর্ব অবস্থা খুলে যায়, সমস্ত অভাব মোচন হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বমহিমায় মহিমান্বিত—তাঁকে 'সদ্‌গুরু শ্রীজগদগুরু'রূপে আপনারা প্রচার করেন কোন আপত্তি নেই, কিন্তু অন্যান্য মহাপুরুষদের অযথা তাঁর শিষ্যভক্ত বলে রটাবার এ অপচেষ্টা কেন?...শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে কত লোককে সদ্‌গুরু গোসাঁইজীর আশ্রয় নিতে পাঠিয়েছেন।...স্বামিজীরা ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন, আর নিজের বাচালতায় শ্রীগুরুর নিকট তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা জাগিল

গুরুভ্রাতাটির। কিন্তু ঠাকুর কিছুই বলিলেন না—তিনি তেমনি নীরব, শান্ত সমাহিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমগ্র জীবনটী যেন ছন্দবদ্ধ মহাকাব্য। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ন্যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন ন্যায় ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। পুরীতে সমবেত বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দকে ডাকাইয়া একদিন বলিলেন—তাঁহার সম্পাদিত অর্পণনামা দলিলে রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত ভট্টাচার্য ও লেখকের নাম উল্লিখিত নাই, এজন্য তাহা নাকচ করিয়া নূতন দলিল সম্পাদন করিবেন।···শিষ্যদের মধ্যে আলোচনা হইল, সাবরেজিষ্ট্রার সন্তোষনাথজী শেষে বলিলেন—দলিলের ক্রোড়পত্র হিসাবে ইচ্ছামত নাম সন্নিবেশ করা যাইবে, উহা নাকচ করিবার প্রয়োজন নাই।···

কিন্তু উৎসবের পর হইতে ঠাকুরের স্বাস্থ্য ক্রমাবনতির দিকে চলিল। সাধক, সিদ্ধ ও সদ্‌গুরু জীবনে সর্বদা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত তাঁহার চিন্তা ও কর্মধারা। এজন্য সকলের ধারণা, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের পূর্বে লীলা সংবরণ করিবেন না। কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল, দেউলিয়ার অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন মহানন্দদাদা। শুনিয়া আনন্দিত হইলেন ঠাকুর। বলিলেন ঃ মহানন্দকে লিখে দেও শিগগির চলে আসুক, আমাকে নিয়ে আর কয়দিনই বা থাকবে।···

সমুদ্রস্নানের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন দশহরার পুণ্য তিথিতে। সকালে গাড়ী করিয়া ঠাকুরকে আনয়ন করা হইল পুলিনপুরীতে, পরে চেয়ারে বসাইয়া লওয়া হইল সমুদ্রতীরে। সমুদ্রস্নান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন ঠাকুর। বলিলেন ঃ আঃ, অনন্ত সমুদ্র—এর স্পর্শেও মন পবিত্র ও প্রফুল্ল হয়। আরও কিছুক্ষণ গলা ডুবিয়ে থাকি, আর তো স্নান করব না।···

দেবদেহ অত্যন্ত অসুস্থ, তবুও দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া অনেকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন পুরীধামে। তাহাদের আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ঠাকুর। সদ্‌গুরু লীলার এই মহিমায় বিস্মিত হইলাম সকলে। অস্তাচলে

যতক্ষণ আছেন দেব দিনকর, ততক্ষণই শতধারে বর্ষণ করিতেছেন প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটা—আর সেই সঙ্গে বর্ণাঢ্যের বিচিত্র সুষমায় রাঙাইয়া দিতেছেন দিগদিগন্ত।···নরনারীর প্রকৃত কল্যাণে চিরদিন এইভাবে দশহাতে বিলাইয়া দিয়াছেন আপনাকে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়পাত্রে সযত্নে রক্ষা করেন যে দুর্লভ রত্ন, তাহাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অধ্যাত্ম সন্তান নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীকে। নিজের সদ্‌গুরু জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই অপার্থিব ইষ্টমন্ত্র সকলকে পরিবেশন করিলেন অকৃপণ হস্তে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মৃতপ্রায় বাঙালীকে সেদিন এইভাবেই সঞ্জীবিত করিয়া গেলেন ভগবান বিজয়কৃষ্ণ ও শ্রীমৎ কুলদানন্দ।

আষাঢ় মাস। ঠাকুরের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আর কোন লক্ষণই নাই। দিনে দিনে অনিবার্য গতিতে ঠাকুর অগ্রসর হইতেছেন মহা-প্রস্থানের পথে। সেজন্য দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই শিষ্য ও শিষ্যাগণের।

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ইউনানের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ঔষধ আনিলেন গুরুভ্রাতা ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন সেই ঔষধ ব্যবহার করিয়া একদিন হঠাৎ ঠাকুর বলিলেন: আমার দেহত্যাগে ক্ষিতীশের বড় লাগবে; কিন্তু এ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও তার হবে।

একজন প্রশ্ন করিলেন: এত লোক থাকতে ক্ষিতীশ বাবুর বেশী লাগবে কেন?

: রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফিরে এলে কৈকেয়ী বললেন—বাবা, তোমার যা ইচ্ছা তাই তো হল, তবে আমাকে কলঙ্কের ভাগী করা কেন? রামচন্দ্র বললেন—মা, তুমি ছাড়া এ কলঙ্কের ভার সহ্য করার ক্ষমতা আর কারো ছিল না। ক্ষিতীশ আমাকে ওষুধ দিচ্ছে কিনা, তার চিকিৎসা বিফল হবার ব্যথা সে ছাড়া বেশী করে আর কে সহ্য করবে?

অসুখ বৃদ্ধি পাইল। আহারে অরুচি ও অবসন্নতাও দেখা দিল অত্যধিক। সংবাদ পাইয়া জিতেন্দ্রনাথ পুরী গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন: এবার হয় এস্পার, না হয় ওস্পার। হ'লে খুব ভাল হব,···না হলে এই আমার শেষ ওষুধ।···

ডাক্তারের মতে ফলের রসই বর্তমানে প্রধান খাদ্য, কিন্তু এখানে তেমন ভাল ফল পাওয়া যায় না। এজন্য ঠাকুরকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন জিতুদাদা। ঠাকুর বলিলেন : কেন! কলকাতা থেকে রোজ একটা করে ফলের পার্শেল আনাতে পারিস না ?···কটা দিন আর খাওয়াবি ?···

গুরুভগ্নিরা তিন-চার রকম রঙের কালি ভরিয়া কয়েকটি ঝর্ণা কলম দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। তিনি বালকের মত একটি কাগজে নানা রঙের চিত্র করিলেন, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিলেন ৺তারকব্রহ্ম হরিনাম, হরের্নাম হরের্নাম···জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইত্যাদি। কাগজে আঁকিলেন অতি সুন্দর একটি চিত্রপট—আর লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম মাঝখানে সুকৌশলে লিখিয়াছেন—আমার এবারকার কাজ শেষ হইল।···

সেইদিন আমাকে বলিলেন : দেখ, আমি খাতায় ষষ্ঠ খণ্ড ডায়েরীর সূচীপত্র লিখেছি। তুমি আরো ছয় মাস ছুটি নিয়ে আমার কাছে থাক। আমি তো নিজে লিখতে পারব না ; তোমাকে বলে দিতাম, তুমি ওখানা লিখে শেষ করতে।

গোসাঁইজীর অন্তর্ধানের পরবর্তী অদ্‌ভুত কয়েকটি স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিতে লাগিলাম গুরু নির্দেশে। কিন্তু তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলাম। ঠাকুর বলিলেন : তুমি আর মহানন্দ ডায়েরিগুলি পড়ে যেমন ভাল বোঝ করবে। এতে অনেক গুহ্য কথা আছে— আমি তো ডায়েরী নষ্টই করে দিয়ে যাব বলেছিলাম।

সাহসে ভর করিয়া আবদারের সুরে বলিলাম : ডায়েরি তো নষ্ট করবার আপনার অধিকার নেই। একশ বছর পরে এ ডায়েরি শাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে—এ যে গোসাঁইজীর অনুশাসন।···

: তবে যা পার কর।···বলিয়া চক্ষু বুজিলেন ঠাকুর।

ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন তাঁহার গুরুভ্রাতা ডাক্তার বিপিন বাবু। জিজ্ঞাসা করিলেন : এখন অনেকেই তো সাধন দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে সদ্‌গুরু কে ? কী লক্ষণ দেখে সদ্‌গুরু চেনা যায় ?

ঠাকুর : মহাপুরুষেরা সব বিষয়ে লৌকিক পথে চলেন, সাধারণ লোকের মত জীবন কাটান—কাজেই বাইরের লক্ষণ দেখে সদ্‌গুরু

চেনা কঠিন। পূর্ব জন্মের সাধন ও সুকৃতির ফলে শিষ্য যখন নিজ গুরুতে 'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং' ইত্যাদি লক্ষণ দেখতে পায়, তখনই গুরু তার পক্ষে সদ্‌গুরু। ভগবান অনেকরূপে প্রকাশিত হন, তাঁহার কৃপামূর্ত্তি—সদ্‌গুরু কিন্তু এক। আধার উপযুক্ত হলে সময়ে সদ্‌গুরু শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হয়ে তাকে কৃপা করেন, স্বয়ং সদাশিবই সদ্‌গুরু। গোসাঁইজীর দেহত্যাগের আগে জিজ্ঞাসা করলাম—এরপর আপনাকে পাব কি ? গোসাঁই বল্‌লেন 'এরপর ভগবানকে পাবে, তবে আমাকে পাবে কিনা বলা যায় না।···এখন ভেবে দেখুন। আমাদের মনে হয় ভগবানকে পাওয়া, তাঁহার করুণা বিগ্রহ সদ্‌গুরুর সঙ্গেই তাঁহাকে পাওয়া।

ভাবিবার কথাই বটে—বিশেষতঃ শেষের কথাটী। সাধারণের ধারণা: ভগবান এক, সদ্‌গুরু অনেক। ঠাকুরের কথা ঠিক তার বিপরীত: ভগবান অনেক, সদ্‌গুরু এক।···শুনিলে সহসা চমক লাগে। চিন্তা করিলে বোঝা যায়: এখানে ভগবান অর্থে পরম উপাস্য বিভিন্নরূপে, আর সদ্‌গুরু পরাৎপর পরব্রহ্মের কৃপামূর্ত্তি। 'মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ, মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু'—এইভাবে আমরা অনেকেই পূজা করি নিজ নিজ গুরুদেবকে। কিন্তু বিভিন্ন দেহে ও মূর্ত্তিতে সেই জগদ্‌গুরুর একই কৃপাশক্তি সর্বত্র ক্রিয়াশীল। নদী-নালা, হ্রদ ও দীঘির মাঝে একই জলরাশি, রাজপ্রাসাদে আর পর্ণকুটিরে একই বায়ুপ্রবাহ—সমস্ত বৈষম্যের মাঝেই ধ্বনিত মধুর ঐক্যতান।···দেহধারী বিভিন্ন গুরুর অন্তরে দেহাতীত সদ্‌গুরু তথা জগদ্‌গুরু ভগবানের অধিষ্ঠান।···সুতরাং ব্যষ্টি গুরু ও দেবতা বহু, সদ্‌গুরু বা সমষ্টি গুরু এক।···'সর্বদেবোময়ো গুরু'। শিষ্য যখন নিজ গুরুতে সেই পরম পুরুষের দিব্য রূপ, লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করেন, তখনই গুরু তাঁহার নিকট সদ্‌গুরু।···

ঠাকুর বলিয়াছেন: আধার উপযুক্ত হলে সময়ে সদ্‌গুরু শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হয়ে কৃপা করেন।···অর্থাৎ সদ্‌গুরু কৃপা করিয়াই প্রকাশিত হন এবং কৃপাবর্ষণ তখনও থাকে অব্যাহত। পরে শিষ্য

সিদ্ধকাম হইলে অন্তরে দর্শন করেন গোলক-বৃন্দাবন, তখন ভক্তের হৃদয়াসনে শ্রীভগবানের মধুর অভিষেক। এইভাবে ঘুচিয়া যায় সদ্‌গুরু ও জগদ্‌গুরুর ব্যবধান—ঘরের মধ্যেও দেখা যায় মহাকাশ, দীঘির মধ্যেও মহাসমুদ্র। মন্নাথ ও জগন্নাথ তখন একাকার।...

গোসাঁইজীর উল্লিখিত অমূল্য বাণীর নানা ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, ভগবান অর্থে ঈশ্বর—সেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গুরু আমাদের নিকট মাধ্যম বা মিডিয়াম। ভগবদ্দর্শনের পর 'তৎপদং দর্শিতং যেন' সেই গুরুর আর প্রয়োজন কী? অথবা, ভগবৎপ্রাপ্তির ফলে সদ্‌গুরুর আর পৃথক কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নাই ভক্তের কাছে, সদ্‌গুরুই তখন স্বয়ং জগদ্‌গুরু। ভগবৎপ্রাপ্তির পর সদ্‌গুরুকে পাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর।...দ্বিতীয়ত, ভগবান অর্থে উপাস্য দেবদেবী—যে অর্থে ঠাকুর প্রথমে বলিয়াছেন, ভগবান অনেক। এই অর্থে ভগবদ্দর্শন লাভের পরেও ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্যই সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি অপরিহার্য।...সদ্‌গুরু আশ্রিত ভক্ত, সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে দেবতারা দর্শন দান করেন। সদ্‌গুরুর দেহাশ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে যে সেবা ও অর্চনা করেন দেবতারা, গোসাঁইজীর দিব্য জীবনেই আছে তাহার দৃষ্টান্ত। লীলা সংবরণের পর সেই সদ্‌গুরু স্বয়ং সদাশিবের দর্শনলাভ ঈশ্বরপ্রাপ্তির নামান্তর।...সাধনা ও সুকৃতি বলে দেবদর্শন হইতে পারে; কিন্তু তখন সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি হইবে কিনা সংশয়ের বিষয়—তাহা সাধকের কঠোরতর সাধনা ও সদ্‌গুরুর কৃপা সাপেক্ষ।...

মনে হয়, গোসাঁইজীর কথাটী এই দ্বিতীয় অর্থেই প্রযুক্ত। ইহাতে সদ্‌গুরুর পরিপূর্ণ মহিমা প্রকাশিত। এই ইঙ্গিত অনুযায়ী গোসাঁইজীর দেহত্যাগের পর গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দুশ্চর তপশ্চর্যায় ব্রতী হন ব্রহ্মচারিজী, লাভ করেন মহাসিদ্ধি। অতঃপর, সদ্‌গুরু ভগবান গোসাঁইজীর দর্শনলাভ করেন তিনি।

এইজন্য সদ্‌গুরু শুধু সাধু-মহাত্মাদের নিকট নন, দেবতাদের কাছেও পূজ্য। সদ্‌গুরু পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের প্রতিভূ, সদাশিবের জীবন্ত বিগ্রহ। তবু মানব সমাজে তিনি অতি সাধারণ, লোকশিক্ষার জন্যই নিরভিমান ও দীনাতিদীন। এজন্য তাঁহাকে জানিতে ও চিনিতে বড় ভুল হয়

জনসাধারণের। শুধু গুরুগত প্রাণ সাধক অগ্রগতির স্তরে স্তরে অনুভব করেন ঃ গুরু মনুষ্য নন—গুরুর মধ্যে ছোট-বড়, পর-আপন, গৃহী বা সন্ন্যাসী কোন ভেদাভেদ নাই। তিনি নরদেহে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, গুরুরূপে আবির্ভূত স্বয়ং পুরাণ পুরুষ।···তিনি দ্বন্দ্বাতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—সর্বগুণাধার হইয়াও ত্রিগুণরহিত। জগতের ত্রিতাপ জ্বালা দূর করিবার জন্য গুরু নিজেই দুঃসহ তাপদগ্ধ, নীলকণ্ঠ। সমস্ত দুর্ভোগ ও আসক্তি হইতে সাধকের উদ্ধারের জন্য নিজে লৌহদৃঢ় বন্ধন জ্বালা বরণ করিয়া দান করেন মুক্তির মহামন্ত্র, সঞ্চার করেন মহাশক্তি।···

এই হিসাবে গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি আরোপ করা নিদারুণ অপরাধ। গুরুনিন্দা, গুরুর বিচার বা সমালোচনা গুরুতর মহাপাপ—আর যে কোন কারণে বা যে কোন সংশয় বশত হউক না কেন, গুরুত্যাগ অর্থে ঈশ্বরত্যাগ!···গুরুকরণের পূর্বে শত প্রকারে চলিতে পারে গুরুর পরীক্ষা ও নিরীক্ষা, কিন্তু ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র গুরু স্বয়ং ইষ্টদেবতা। তখন যে কোন দিকে তিনি পতিত হইলেও অবিচারিত চিত্তে চাই শিষ্যের আত্মসমর্পণ।···গুরু যে কোন স্তরের হইতে পারেন—কিন্তু তিনি সদ্‌গুরু কিনা তাহা নির্ভর করিবে শিষ্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্ভরতার উপর, সুকৃতি ও সাধনার উপর। সেই সঙ্গে অপরিহার্য শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপা। ভক্তিলতা-বীজে সেই কৃপাধারা বর্ষণে প্রেমপুষ্পের সার্থক উন্মেষে শিষ্যের নিকট যে কোন গুরুই সদ্‌গুরু, অনাদি-অনন্ত পরম দেবতা।

'ন গুরোরধিকং তত্ত্বং'—এই হিসাবে গুরুতত্ব সর্বতত্বের সার কথা। এই সারতত্বই বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধন জীবন হইতেই ভগবান গোসাঁইজীর সহিত লীলা প্রসঙ্গে আপন উপলব্ধ সত্য প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—নাম, নামী ও নামদাতা এক এবং অভিন্ন। সদ্‌গুরু জীবনেও তিনি দেখাইয়াছেন—গুরু সর্ব প্রকারে শিষ্যের বিচারের উর্ধে, তেমনি শিষ্য যতই অধঃপতিত হউক, সে অহেতুক গুরুকৃপার পাত্র। গুরু শিষ্যের মধ্যে এইভাবেই অপার্থিব স্নেহ ও প্রেমের মহামিলন সেতু স্থাপন করিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁহার সদ্‌গুরু জীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ অবদান।···

॥ তেইশ ॥

অবশেষে আষাঢ় মাসের প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার আশু প্রয়োজন অনুভূত হইল। একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিবার প্রচেষ্টা চলিল দারুণ উৎকণ্ঠায়। সাধ্যমত চিকিৎসা ও পরিচর্যা সত্বেও প্রতিরোধ করা গেল না তাঁহার শরীরের ক্রমাবনতি।

স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজী ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন: এদের মুখ দেখে বড় কষ্ট হয়, মুখগুলি যেন কালি হ'য়ে গেছে। তুমি ইচ্ছে করলেই তো ভাল হ'তে পার।

নির্বিকারে ঠাকুর উত্তর দিলেন: ইচ্ছা করলে তো সবই হয়, তবে ইচ্ছা করব কেন? রয়েছি যে একজনের হাতে।...

এই একটি কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ঠাকুর ভগবান গোসাঁইজীর নিকট আত্মসমর্পিত। পরমগুরুর সহিত অনন্তকালের জন্যই তাঁহার সূক্ষ্ম যোগসূত্র সংস্থাপিত। সেখানে দেহমনের যে কোন অবস্থাতেই নিজের শত শক্তি ও বিভূতি সত্বেও নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন তাঁহার নিকট অবান্তর। বস্তুতঃ, ইহাই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।...

পথ্য গ্রহণের নির্দিষ্ট সময় বজায় রাখা সম্পর্কে বলিতে গেলেন সেবিকা নূতন দিদি। ঠাকুর বলিলেন: যখন যা খেতে চাই আর বাধা দিও না। ভাত খেতে পারব না ব'লে অন্য সময় খেতে চাইলে দেবে না, তা আর করো না—এ খাওয়ান আর বেশী দিন তো নয়।...

চোখের জলে ফিরিয়া আসিলেন নূতন দিদি।

ঠাকুরের সেবা সম্পর্কে কত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছি এতদিন। ঠাকুরও নীরবে তাহা মানিয়া লইয়াছেন একান্ত অনুগত সন্তানের মত।...

কাঁচা লঙ্কা পছন্দ করিতেন ঠাকুর। অথচ ডাক্তারের নির্দেশে তাঁহার পক্ষে লঙ্কা একেবারে নিষিদ্ধ। সকলকেই কঠোর নির্দেশ দিয়াছিলাম—ঠাকুরকে কোন রকমেই যেন লঙ্কা দেওয়া না হয়, তিনি চাইলেও নয়।... একদিন মিষ্ট কথায় সেবিকা দিদিকে চুপি চুপি বলিয়া কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা চাহিয়া লইয়াছেন ঠাকুর। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত—সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী সন্তানের মত লঙ্কাগুলি থালার নীচে লুকাইয়া

ফেলিলেন ঠাকুর। আমি কাছে গিয়া বলিলাম ঃ ওকি! আবার আপনি লঙ্কা খাচ্ছেন?

দুষ্ট বালকের মত দিব্য সাধু সাজিয়া বলিলেন ঠাকুর ঃ লঙ্কা খাচ্ছি! কই—না তো!

হাসি চাপিয়া বলিলাম ঃ থালার নীচে কী দেখি—

ধরা পড়িয়া ঠাকুরের শ্রীমুখে খেলিয়া গেল মধুর হাসি। সে হাসি অসীম স্নেহের, মধুর বাৎসল্য রসের।···সেবিকা দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ নাঃ—ওকে নিয়ে আর পারা যায় না, সবদিকেই ওর কড়া নজর।···

ঠাকুরের এইরূপ সূক্ষ্ম অথচ মধুর লীলার অন্ত ছিল না।

একদিন ছাদের উপর আমরা শ্রীগুরু সঙ্গে উপবিষ্ট। বড়দিদি মনোরমা শ্রীমানী কতকগুলি উৎকৃষ্ট কুল আনিয়া শ্রীগুরুর সেবার জন্য তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর কতকগুলি খাইতে দিলেন আমাদের।

ছোটদাদা হেমচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের গুরুনিষ্ঠা ছিল অনন্য-সাধারণ। তাঁহার নামানন্দে মগ্ন অবস্থা দর্শনে মুগ্ধ হইতাম আমরা। ঠাকুর তাঁহাকে আশ্রমের ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতেন। আশ্রম সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বহুকাল তিনি এখানে বাস করিতেছেন। আজ ঠাকুর তাঁহাকে স্বহস্তে কুল খাইতে দিলে পলকে সখ্যভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন তিনি। খাইবার সময় মনে হইল ফলটি অতি সুমিষ্ট—তৎক্ষণাৎ সেই অর্ধভুক্ত ফলটি পুরিয়া দিলেন ঠাকুরের মুখে। ···ভাবের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরও সানন্দে তাহা ভক্ষণ করিয়া মিষ্টতার প্রশংসা করিলেন।

সম্বিৎ ফিরিলে কৃতকর্মের জন্য দারুণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ছোট দাদা। কিন্তু ভাবগ্রাহী ভগবান শ্রীগুরুর অধর প্রান্তে খেলিয়া গেল বিচিত্র হাসি।···

সেই সূক্ষ্ম অভিনয়ের স্মৃতিতে আজ চক্ষে ফুটিল অশ্রুবিন্দু। ঠাকুর সবই জানিতেন, বুঝিতেন, এই দুরারোগ্য ব্যাধির গতিরোধ করা

যাইবে না। তবু বাধ্য শিশুর মত সব কথা মানিয়া চলিতেন শুধু আমাদেরই তৃপ্তির জন্য।···চোখের জলে নূতন দিদিকে বলিলাম ঃ ঠাকুর যখন যা খেতে চান দেবেন, আর তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেবেন না।···

গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দিরে সেবায়েত ছিলেন সারদাকান্তজী। ছোট দাদার প্রতি এযাবৎ সর্বদা লক্ষ্য ছিল ঠাকুরের। জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে প্রত্যহ মহাপ্রসাদ আনাইয়া দিতেন ছোটদাদাকে, সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। পুরী থাকিবার সময় ইহা ছিল ঠাকুরের নিত্যকর্ম। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তামাক সেবনের সময় তাঁহাকে দেখিলেই অতি সন্তর্পণে আত্মগোপন করিতেন। অগ্রজদের প্রতি চিরদিন তাঁহার প্রেমভক্তি ছিল সকলের নিকট উচ্চ আদর্শ। মাঝে মাঝে সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিত সারদাকান্তজীর। তখন জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সস্নেহ শাসনে তাঁহাকে সংযত রাখিতেন ঠাকুর।

অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইবাব পর হইতে নিয়মিতভাবে ছোটদাদার আর তত্বাবধান করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি অত্যধিক অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার নিকট যাইবারও আর শক্তি ছিল না। কয়েক দিন যাবৎ তিনিও খোঁজ খবর লইতে আসেন নাই ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে। সেজন্য দরবেশজীকে ঠাকুর বলিলেন ঃ ছোড়দাদা কি আমার অসুখের কথা কিছুই জানেন না ? মন্দির তো চিরকালই থাকবে, ব্রহ্মচারী যে কোথায় চললো একবারও কি তা ভাবেন ?

কথাটি জানান হইল সারদাকান্তজীকে। তিনি ব্যাকুলভাবে ত্রস্তপদে আসিয়া স্নেহের কনিষ্ঠকে দেখিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্তা বলিয়া অনেক স্বস্তিবোধ করিলেন ঠাকুর।

বসন্ত দাদাকে ঠাকুর বলিলেন ঃ তুমি বৌঠানকে ধানবাদে পৌঁছে দিয়েই কলকাতায় জিতুর বাসায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি শিগ্‌গির সেখানে যাচ্ছি।

কথাটী আমরা সকলে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, ঠাকুরের কলিকাতা যাত্রা আসন্ন। ঠাকুর যাইবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলে মহানন্দ দাদা

ষ্টেশনে গিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও সেইদিনের জন্য বার্থ-রিজার্ভ করিতে অক্ষম হইলেন। শ্রীগুরু আমাকে চেষ্টা করিতে বলিলে আমি যাইয়া সুকৌশলে একটি সেকেণ্ড ক্লাস কুপে-বার্থ রিজার্ভ করিয়া আসিলাম।

শুনিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন মহানন্দ দাদা। আমাকে বলিলেনঃ আমি তো আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারিনি। ষ্টেশন মাষ্টার আমাকে দেখিয়ে দিলেন, আট-দশ দিনের মধ্যে একটা দিনও খালি নেই। তুমি কী করে রিজার্ভ করলে, ভাই?

বলিলামঃ ঠাকুরের কৃপা থাকলে সবই সম্ভব হয়।···

কিছুদিন পূর্বে জোরগলায় তিনি বলিয়াছিলেনঃ ঠাকুরের কাছে কখনো যেতে আমার একটুও ভয় হয় না।···একটু পরেই গিয়া দেখিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ভয়ানক গম্ভীর। একটা অজানা সঙ্কোচ ও আশঙ্কায় বাহির হইয়া আসিলেন। অতঃপর দেখা গেল ঠাকুরের নিকট কিছুতেই আর যাইতে পারিতেছেন না—কেমন একটা শঙ্কায় সর্বদাই তিনি সন্ত্রস্ত। নিজেই হতবাক হইয়া বলিলেনঃ আমার এ কী হ'ল! ঠাকুরের কাছে এগুতে পাচ্ছিনে কেন?···

প্রায় সাত-আট দিন এইভাবে কাটিলে ভুবন অন্ধকার দেখিলেন। পরে তাঁহাকে ডাকিয়া ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলিলেনঃ কী মহানন্দ! আমার কাছে আসতে তোমার তো একটুও ভয় হয় না। আমিও তো তোমাকে কিছু বলিনি। তবু আজ কয়দিন তোমাকে আর দেখছি না যে?···

শ্রীশ্রীঠাকুরের মধুর হাসিতে এতদিনে দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন মহানন্দ দাদা। লজ্জিতভাবে শ্রীগুরুর চরণতলে প্রণত হইলেন।

মনে কোনরূপ অভিমান দেখা দিলে এইভাবে সকলকে অপূর্ব শিক্ষা দিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর।···

কলিকাতা রওনা হইবার পূর্বদিন মৃদু দিদিকে ও মাণিকের মাকে ঠাকুর বলিলেনঃ আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি জটা কেটে ফেলতে চাই।···সকলকে জিজ্ঞেস কর, জিতুকে ও হেমবাবুকে ডেকে দে।

কথা প্রসঙ্গে একবার ঠাকুর বলিয়াছিলেন, জটাই তাঁহার শক্তি। তাঁহার কথায় এখন সকলের দারুণ আশঙ্কা হইল, জটা কাটিলেই শক্তিহীন হইয়া দেহধারণে অসমর্থ হইবেন তিনি। তবু ঠাকুরের ইচ্ছা, বিশেষত আভূমি লুণ্ঠিত দীর্ঘ জটাভারে নিদারুণ অসুস্থতার মধ্যে সত্যই তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে—বাধ্য হইয়া অনুমতি দিলেন কিরণ কাকা, রেবতী কাকা, ছোট জ্যেঠামহাশয় সকলেই। পঞ্জিকা দেখিয়া জটা কাটিবার সময় নির্দিষ্ট হইল বারোটা পনের মিনিটে।

নির্ধারিত সময়ে সারা আশ্রমে সাড়া পড়িয়া গেল—শুধু মমতায় নয়, অব্যক্ত বেদনায় ও গভীর হতাশায়।···জটা ভিন্ন যে কল্পনা করা যায় না মহাদেবকে। অসাধারণ জটারাশি দেখিয়াই শ্রদ্ধাভরে গিরিমহারাজ নাম দিয়াছিলেন জটাশঙ্কর। এই জটাজাল শুধু তাঁহার শক্তি নয়—তাঁহার জ্যোতি, বিভূতি, মহিমা সবই।···এখনই কাটা হইবে সেই জটা—যেন পরিত্যক্ত হইবে শ্রীগুরু মহারাজের শিরস্ত্রান।··· তখন জটাশঙ্কর বাবার দিকে চাহিতে পারিব তো?···ভাবিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম ঠাকুরের নিকট। ধীরে ধীরে কম্পিত বক্ষে সমবেত হইলেন সকলে। কিন্তু যাঁহার জন্য সকলের এত উদ্বেগ, তিনি সর্ব ক্ষয়ক্ষতির মাঝে চিরদিনের মত দিব্য নির্বিকার।···

শেষ পর্যন্ত শিখা জঠা ও একটি বড় জটা রাখা হইল; অবশিষ্ট চারিটী জটা মূল পর্যন্ত কাটিয়া দিলেন ছোটদাদা ও যোগেশদাদা। তবু আর সহসা তাকাইতে পারিলাম না ঠাকুরের দিকে—দৃষ্টিও ঝাপসা হইয়া আসিল অশ্রুজলে। ভুবন অন্ধকার মনে হইল, চিরদিনের মত কি অন্তর্হিত হইল শ্রীশ্রীজটাশঙ্করের দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তি?···

আজ কলিকাতা রওনা হইবেন শ্রীগুরুদেব।

শেষরাত্র হইতে আশ্রমে সুরু হইল আরতি, কীর্তন, হোম ও পূজা-পাঠ। কিন্তু সব কিছুই প্রাণহীন, শুধু নিয়মরক্ষার নামান্তর।

কুঞ্জে কুঞ্জেও আজ যেন আর ধ্বনিত হইল না মত্ত মধুপের মধুর গুঞ্জন, প্রভাত পাখীর উচ্ছ্বসিত কলগান।···আশ্রমের চতুঃসীমা নীরব,

নিথর—আকাশ বাতাস যেন ভারাক্রান্ত। ক্ষণে ক্ষণে শুধু গুমরিয়া ওঠে মূক ধরিত্রীর দীর্ঘশ্বাস, আর আশ্রমবাসী সকলের নিরুদ্ধ ক্রন্দন।···

অপরাহ্নে ঠাকুরের বিদায় দৃশ্য কী মর্মস্পর্শী! দ্বিতল হইতে আমাদের সঙ্গে নামিয়া আসিলেন ঠাকুর, তাঁহার সাধের বাগানে বেড়াইতে চাহিলেন। ইজিচেয়ারে করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। প্রতিটী গাছের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, পত্রপুষ্প ও লতাকুঞ্জের গায়ে হাত বুলাইয়া কত আদর করিলেন তাহাদের। আমাদের বলিলেনঃ যখন যেখানে থাকি, এইসব গাছের প্রথম ফুল ও ফল আমাকে পাঠিয়ে দিও।···এমনি কথায়, ভাবে ও ইঙ্গিতে মনে হইল, সকলের নিকট হইতে এই যেন তাঁহার চিরবিদায়।···

ঠাকুরের ইচ্ছায় আনয়ন করা হইল আশ্রমের গাভী ধবলী শ্যামলীদের। প্রত্যেকের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। যে ফিটনে প্রত্যহ বেড়াইতেন, সম্মুখের গেটে সেই গাড়ী উপস্থিত। সেইদিকে গিয়া প্রিয় ঘোড়া লক্ষ্মীর গায়ে বুলাইয়া দিলেন স্নেহস্পর্শ। ঘোড়া ও গাভী দুটীর চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়িল অশ্রুধারা। তখন শিষ্য-শিষ্যা কেহই আর স্থির থাকিতে পারিল না—সকলের চক্ষেই বহিয়া গেল অশ্রুবন্যা।···

ধীরে ধীরে গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দিরে বিগ্রহের চরণতলে গিয়া দাঁড়াইলেন ঠাকুর। গোসাঁইজীর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া রহিলেন অপলক দৃষ্টিতে, নিস্পন্দভাবে। দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া সেই অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি বুঝি পৌঁছাইয়া গেল অসীম অনন্তে। পশ্চাতে রহিল সারা বিশ্ব—সেই অন্তর্লোকে মুখোমুখি শুধু ভগবান গোসাঁইজী, আর তাঁহারই প্রিয়তম মানসপুত্র। নীরবে নিভৃতে কী আলাপ হইল তাঁহাদের, ইহকাল আর পরকালের মাঝে স্থাপিত হইল কোন্ সূক্ষ্ম, অপার্থিব মিলন-সেতু—সে রহস্য জানিলেন শুধু তাঁহারাই!···

ধীরে ধীরে ঠাকুর আবার ফিরিয়া আসিলেন বাস্তব জগতে। জীবন দেবতার পদপ্রান্তে জানাইলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আমরাও সকলে সাষ্টাঙ্গ

প্রণাম করিলাম। চোখের জলে নিবেদন করিলাম শুধু একটি প্রার্থনা : হে পরমগুরু—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!···

সারদাকান্তজীর নিকট হইতেও প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন ঠাকুর। তাঁহার সঙ্গে সকলে ফিরিয়া আসিলাম ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে।

বিগ্রহত্রয়ের সম্মুখে প্রণত হইলেন ঠাকুর। অঙ্গনে নামিয়া একবার ফিরিয়া চাহিলেন সমস্ত আশ্রম বাড়ী, বৃক্ষলতার দিকে। নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, আকাশ, বাতাস সকলকেই অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিয়া উঠিলেন ফিটন গাড়ীতে।···

ঠাকুরের সঙ্গে আসিতে চায় শিষ্যশিষ্যারা সকলেই। প্রত্যেকের মস্তকে শ্রীহস্তের অমিয় স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া বলিলেন ঠাকুর : আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমি আর এখান থেকে কোথায় যাব?··· ঠিক সাতদিন পরে এখানেই ফিরে আসছি।···

ঠাকুরকে লইয়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম আমরা। বার বার কানে বাজিতে লাগিল ঠাকুরের কথা : আমি আর এখান থেকে কোথায় যাব?···মনে হইল : সত্যই তো—এ যে তাঁহার পরম শান্তির নিত্যধাম।···

যথাসময়ে ট্রেণ পৌঁছিল হাওড়া ষ্টেশনে।

অধীর আগ্রহে সমবেত ভ্রাতাভগ্নিরা ছুটিয়া গেলেন ঠাকুরের কামরার দিকে। গুরু মহারাজের জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক আজ আর মুখরিত হইল না, সকলেই জানাইলেন নীরব প্রণাম। এ কী চেহারা ঠাকুরের? তাঁহার সে জটাই বা কোথায়?···অনেকেরই চক্ষে বহিল অশ্রুধারা।

জ্বরাগ্রস্থ দেহ লইয়াও ঠাকুর তেমনই প্রসন্ন। সকলের দিকে তিনি নিক্ষেপ করিলেন স্নিগ্ধ সস্নেহ দৃষ্টি। সকলকে লইয়া গিয়া উঠিলেন মির্জাপুর ষ্ট্রীটে জিতুদাদার বাড়ীতে।

চিকিৎসার উত্তম ব্যবস্থা হইল সঙ্গে সঙ্গেই। সেবা শুশ্রূষাও চলিল প্রাণপণে। ঠাকুরের রোগমুক্তির জন্য সকলের সে কী গভীর ব্যাকুলতা!···

সকালেই ক্ষিতীশবাবু ঠাকুরকে দর্শনান্তে পরীক্ষা করিলেন। অপরাহ্নে পরীক্ষা করিলেন ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন। একসূরে প্লেট লইবার এবং প্রস্রাব, কফাদি পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থাও করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বে ঠাকুরকে গড়ের মাঠে ঘুরাইয়া আনা হইল। রাত্রে গায়ের তাপ বৃদ্ধি পাইল। সর্বোৎকৃষ্ট তামাক সংগ্রহ করা হইল, কিন্তু দেখা গেল তাহাতেও আর রুচি নাই ঠাকুরের।

পরদিন ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন প্রাচীন বিজ্ঞ কবিরাজ মাধব তর্কতীর্থ মহাশয়, বলিলেন আশু কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ বারিদবরণও পরীক্ষা করিলেন। ক্ষিতীশ বাবুর ঔষধ নির্বাচনের প্রশংসা করিলেন তিনি। ঠাকুরকে বলিলেনঃ আপনি আমার হাতে ভাল হবেন বলুন—তবে ঔষধ দি।···

নীরবে হাসিলেন ঠাকুর। বারিদবরণ নিজ হাতে ঔষধ খাওয়াইলেন।

ঠাকুরের চিত্ত প্রশান্ত, শ্রীমুখে সদা প্রফুল্লতা, কথাবার্তা সুস্পষ্ট। অথচ দুর্বলতা, অবসন্নভাব এবং রাত্রে জ্বরের তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সমস্ত লক্ষণ ভ্রম উৎপাদন করিতেছিল অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের।

পরদিন অপরাহ্নে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন কিরণকাকা ও রেবতীকাকা। বলিলেনঃ ভাই ব্রহ্মচারি! আমাদের পরমায়ু নিয়ে তুমি আরো কিছুদিন থাক, জগতের কল্যাণ হবে।···শুনিয়া মৃদু হাসিলেন ঠাকুর। সে হাসিতে নাই কোন উদ্বেগ, কোন উৎকণ্ঠা। উজ্জ্বল চক্ষু দুটীতে ফুটিল অধিকতর প্রসন্নতা। শুধু বলিলেনঃ আর দরকার নেই।···

রাত্রে অম্লের উদ্বেগও বৃদ্ধি পাইল। পরদিন সকালে অন্য ঔষধ দিলেন বারিদবাবু। তবু বিকালে অবসন্নতা বৃদ্ধি পাইল। ঠাকুর বলিলেনঃ মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরে আর প্রাণবায়ু নেই।···বামদিকের বুকের কাছে দেখাইয়া বলিলেনঃ এখান থেকে শ্বাস উঠছে ও পড়ছে।···

মাঝে মাঝে নামানন্দে ঠাকুরের শরীরে দেখা গেল অদ্‌ভূত রোমাঞ্চ। অধিকাংশ সময় সমাধিমগ্ন অবস্থায় রহিলেন। ইহা তাঁহার মহাপ্রস্থানের

পূর্বাভাস কিনা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না আমরা। তবু যেন এক অলক্ষ্য শক্তিবলে এই গুরুতর অবস্থার সংবাদ পাঠাইতে লাগিলাম চারিদিকে। কোথাও তারযোগে সংবাদ দিতে নিষেধ করিলেন ঠাকুর। মৃহুদিদি জিদ প্রকাশ করায় শুধু পুরীধামে টেলিগ্রাম করা হইল ছোট জ্যেঠামহাশয় সারদাকান্তজীকে।

৯ই আষাঢ়। ঠাকুরের অবস্থা লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে রাত্রি জাগরণ করিলাম তিন-চারজন গুরুভ্রাতা। মধ্যরাত্রে গায়ের তাপ পঁচানব্বই ডিগ্রীতে নামিয়া গেলে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম সকলে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন : অত ভয় পাবার কী আছে? কোন চিন্তা নেই।…

সহসা লক্ষ্য করিলাম সমস্ত ঘরটি স্নিগ্ধ অলোকে সমুজ্জ্বল, পবিত্র সুগন্ধে চতুর্দিক ভরপুর।…পরে বিহ্বল ভাবাবেশে দর্শন করিলাম অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির ন্যায় বিচিত্র বেশে নানা সন্ন্যাসীর গতায়াত, নানা দেবদেবীর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান।…মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া দেখিলাম—শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখমণ্ডল আশ্চর্য প্রশান্ত, ললাটদেশে ত্রিনেত্র হইতে বিচ্ছুরিত অপূর্ব আলোকচ্ছটা।…তাঁহার অর্ধ সমাধিমগ্ন অবস্থা, দেবদেহ হইতে ঝংকৃত অনাহত বিচিত্র ধ্বনি।…

ভাববিহ্বল সন্তোষনাথজী নিভৃতে ডাকিলেন আমাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী, বারদীর ব্রহ্মচারিজী, গম্ভীরনাথজী, কাঠিয়াবাবা, গিরিমহারাজ প্রমুখ মহাপুরুষের সূক্ষ্ম উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরক্ষণে দেখা গেল বিদ্যুৎবর্ণে গোসাঁইজীর আত্মপ্রকাশ।…সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ধ্বনিত হইল : বাবারে! আর পারি না।…

জীবন সংশয় রোগে কয়েকবার মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ঠাকুর; কিন্তু ক্লেশসূচক কোন কথা উচ্চারণ করেন নাই কখনো। এখন ঠাকুরের এই যন্ত্রণা ধ্বনিতে সকলে বিচলিত হইয়া পড়িলাম। বিশেষত মহাপুরুষদের ও স্বয়ং গোসাঁইজীর চকিত আবির্ভাবে বিহ্বলতার মধ্যেও কাঁপিয়া উঠিল গোপন অন্তর।…তবু বারিদবাবু ও সত্যরঞ্জন

দাদাকে অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া হইল। শেষ চেষ্টা করিবার জন্য ঔষধ দিলেন বারিদবাবু; বিশেষ কোন উপকার দেখা গেল না। তখন ইনজেকসান দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন সত্যরঞ্জনদাদা। ঠাকুর শ্রীহস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন: ভাল বোঝ দেও।···

সবই জানিতেন ঠাকুর, তবু সন্তানদের তৃপ্তির জন্যই তাহাদের সব ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন। নইলে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধির ভীষণ বিষ যিনি বিনা চিকিৎসায় হজম করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে আজো কি পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিতেন না তিনি ?

বিকালে ইনজেকসান দেওয়া হইল। বহুমূত্র রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সত্যব্রতবাবু পরীক্ষা করিয়া ইনজেকসান দিতে বলিলেন, আরো দুইবার। আবার আসিলেন মাধব তর্কতীর্থ মহাশয়, এবার পরীক্ষা করিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। গোপনে আমাদের বলিলেন: মহাপুরুষ সব অবস্থা চেপে রেখেছিলেন—সকাল থেকেই নাভিশ্বাস উঠেছে !···

ঠাকুরের ইচ্ছার নিকট কোন বিদ্যাবুদ্ধিই আর খাটিবে না বেশ বুঝিতে পারিলাম। মোহগ্রস্থ মন তবু মানে কই! তৎক্ষণাৎ আবার লোক পাঠান হইল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নিকট। রাত্র ১০টায় আসিয়া তিনি পরীক্ষা করিয়া কোন ভরসা দিতে পারিলেন না।

ডাক্তার কবিরাজ সকলের সঙ্গেই মধুর সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বলিলেন—কোন কষ্ট নেই, আছে শুধু দুর্বলতা।

ঠাকুরের শ্রীমুখে দিব্য হাসি। কিন্তু সকলের প্রাণেই গোপন কান্না।···অস্তগামী রবির ছবিতে দিনান্তের কত না বৈচিত্র্য।···কিন্তু বিষাদের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে দিগ্‌দিগন্তে।···

তাহারই আভাসে শঙ্কিত হৃদয়ে সমবেত হইতে লাগিলেন ঠাকুরের গুরুভ্রাতা এবং বহু শিষ্যশিষ্যাবৃন্দ। নিদ্রার লেশ নাই কাহারও চক্ষে—নিদারুণ উৎকণ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ, গভীর বেদনায় সকলের চিত্ত বিক্ষুব্ধ।··· মৃদুদিদি আশৈশব শ্রীগুরুর স্নেহপালিতা, অপূর্ব সেবাপরায়ণা। ঠাকুরের

শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন তিনি, অপর পার্শ্বে যোগেশদাদা, রাজেনদাদা এবং অধম লেখক। অদূরে আশেপাশে আছেন আর সকলে। কাহারও মুখে কথাটী নাই, শুধু ভীত চকিত নয়ন নিবদ্ধ সেই প্রশান্ত, অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীমুখের উপর।

গভীর নিশুতি রাত্রি। সারা ভুবন সুপ্তিমগ্ন, আমরাই শুধু বিনিদ্র। বাহিরে পাষাণপুরীর নিস্তব্ধতা, অন্তরে অগ্নিগিরির আলোড়ন।···

ঠাকুর তেমনিই শান্ত সমাহিত। দেবদেহ অসাড়—কিন্তু চোখে মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার আভাস মাত্র নাই। ধীর-স্থির নিমীলিত নেত্রে যেন গ্রহণ করিতেছেন মহাপুরুষ ও দেবতাদের সাদর সম্ভাষণ। তাঁহাদের সহিত মৌন আলাপ আলোচনায় পান করিতেছেন প্রেমামৃত। আজীবন কঠোর সাধনা, মহাসিদ্ধি ও সদ্‌গুরু লীলার সার্থক পরিণতি। এ তো মরণ নয়, অমর দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ।···সে দৃশ্য সত্যই অপ্রাকৃত, স্বর্গীয় বিভায় সমুজ্জ্বল।···

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তো শুধু মহাসিদ্ধ যোগিরাজ নন—তিনি যে আমাদের মন প্রাণ, আশা-আকাজ্ক্ষা, ধর্ম-মোক্ষ সর্বস্ব। সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে তিনি যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়।···ঐ বুকে কী অনন্ত স্নেহ-ভালবাসা, ঐ আঁখিপদ্মে সে কী সকরুণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি! করুণাঘন সেই মধুর চাহনি আর কি সত্যই বর্ষিত হইবে না? এত স্নেহ-প্রেম, শান্তি ও সান্ত্বনা সবই কি চিরদিনের মত মিলাইয়া যাইবে মহাশূন্যে?···

ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। ডাঃ সত্যরঞ্জনদাদা উঠিয়া ঠাকুরের নাড়ী দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে।···সেই ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হইল সারা বাড়ীতে। অসহায় কণ্ঠে কান্নার সুরে সকলে আরম্ভ করিলেন নাম-কীর্তন।

ধীরে ধীরে আঁখি মেলিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রীহস্ত সঞ্চালন করিয়া অস্ফুটে বলিলেন: এখনও দেরী আছে।···

পলকে নিবৃত্ত, নিস্তব্ধ হইলেন সকলে। নিথর হইয়া রহিল শোকাচ্ছন্ন, মন্ত্রমুগ্ধ জনতা। তবে কি আশা আছে এখনও?···আশা—নিরাশার দ্বন্দ্বে নিরুপায়ে সকলে চাহিয়া রহিলেন।

১১ই আষাঢ়, ১৩৩৭। অমাবস্যা তিথি।

প্রভাত হইল কাল রাত্রি। ঠাকুর কুলদানন্দজীর নশ্বর জীবনের শেষ প্রভাত। আর অবিনশ্বর দিব্য জীবনের প্রথম সুপ্রভাত।···

নাড়ীর অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হইল। অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সামান্য চা-পান করিলেন স্বাভাবিকভাবে। বসন্তদাদা করুণ সুরে একটি গান ধরিলেন। এসরাজ লইয়া ঠাকুরকে কতদিন প্রাণ ভরিয়া গান শুনাইয়াছেন।

আজ কী গান গাহিবেন তিনি? এসরাজ আনিয়া বিহ্বলভাবে ঠাকুরের পাশে বসিলেন বসন্তদাদা। যেন আপনা হইতেই তাঁহার আবেগপূর্ণ মধুর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল :

"তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার
তুমি শান্তি, তুমি সুখ, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমি হে আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক
তাপ হরণ তোমারই চরণ, অসীম শরণ দীনজনার।"

প্রেমভক্তির অমৃতস্রাবী মহাসঙ্গীত—আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে হইয়া উঠিল প্রাণবন্ত। শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

প্রাণে প্রাণে ঝংকৃত হইল সেই মধুর গান, সঞ্চারিত হইল নব আশা। আর বুঝি চিন্তা নাই—প্রভাতী সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই আজ বুঝি নব রাগে রঞ্জিত হইবে দিগ্‌দিগন্ত।···

তখনও কেহ বুঝি নাই, ইহা নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ শিখার শেষ দীপ্তি।···

অল্পক্ষণ পরেই দেখা দিল অভাবনীয় পরিবর্তন। নাড়ী স্পন্দনহীন, শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধিমগ্ন। শ্রীমুখমণ্ডল স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত। প্রশান্ত দেবদেহে সে কী পবিত্র পুষ্পচন্দন ও ধূপধূনার সুগন্ধ।··· মকরধ্বজ ও মৃগনাভি সেবন করাইলেন গুরুভ্রাতা কবিরাজ অন্নদা কিশোর। দেবদেহে স্পন্দন লক্ষিত হইল ; মধ্যে মধ্যে বরফখণ্ড শ্রীমুখে দিলে তাহা চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন। তাঁহার মানসকন্যা মৃন্থদিদি তিলকচর্চা করিলেন শ্রীললাটে ও দেবদেহে। পার্শ্বে সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন ব্যবহৃত মাল্যগুলি।

ইতিপূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রোহিণীকান্তজী। তিনি কাছে বসিয়া ক্রন্দনের সুরে ঠাকুরকে শ্রীনাম স্মরণ করিতে বলিলেন। সস্মিতমুখে প্রশান্তকণ্ঠে অনন্তপথযাত্রী মহাপুরুষ উত্তর দিলেন: তবে সারা জীবন কী করলাম!...

পুরীধাম হইতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গঙ্গাতীরে স্নান, তর্পণাদি অন্তে নয়টার সময় উপস্থিত হইলেন সারদাকান্তজী। স্নেহপ্রতিম কনিষ্ঠ ভ্রাতার আসন্ন অবস্থায় তাঁহার সারাদেহে হস্তলেপন করিলেন প্রেমবিহ্বলভাবে। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে 'জয় গুরু, জয় গুরু' উচ্চারণ করিয়া শ্রীমুখে দিলেন মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল।

প্রিয়তম অগ্রজের দিকে নিবদ্ধ হইল ঠাকুরের প্রসন্ন দৃষ্টি। মাথা নীচু করিয়া অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিলেন সারদাকান্তজী: নাম হচ্ছে তো? ...স্থির প্রশান্ত চিত্তে সম্মতি জানাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

আরম্ভ হইল তারকব্রহ্ম হরিনাম। নামকীর্তনের মধ্য দিয়া জগদ্‌গুরুর উদ্দেশে অসহায় হৃদয়ের আর্ত ক্রন্দন।...

আচ্ছন্নভাবে বসিয়াছিলাম শ্রীচরণতলে। চরণপদ্মে বুলাইয়া দিতেছিলাম বিমুগ্ধ হৃদয়ের শেষ ভক্তিস্পর্শ।...দিনে দিনে প্রকাশিত হইয়াছে শতসহস্র ভক্তিনম্র চিত্তের কত ব্যাকুলতা। আজ কি তবে সমস্ত উৎকণ্ঠা ও আকুল আবেগের পরিসমাপ্তি?...

চকিতে লক্ষ্য করিলাম, স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুৎদীপ্তিতে যেন উদ্‌ভাসিত সারা ঘরখানি। শ্রীললাট হইতে তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইয়া মস্তকশীর্ষে বিকশিত হইল অপূর্ব আলোকচ্ছটা।...

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সমবেত সকলের দিকে চিরকালের মত শেষবার নিক্ষেপ করিলেন অপার স্নেহময় সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি।...তাঁহার সম্মুখে ধরা হইল ভগবান গোসাঁইজীর প্রতিকৃতি। অমনি করজোড়ে প্রণাম করিলেন—অপলকে চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধনেত্রে দর্শন করিলেন জন্ম-জন্মান্তরের ইষ্টদেবতা।...তাঁহার উদাস প্রশান্ত দৃষ্টি পরক্ষণে ইহলোকে সীমার গণ্ডি পার হইয়া সুনিবদ্ধ হইল কোন্ অসীম-অনন্তে!...অকূলের কূলদাতা শ্রীশ্রীকুলদানন্দ সংবরণ করিলেন

মর্ত-লীলা,···স্বস্থান দিব্যধামে মহাপ্রস্থান করিলেন সাক্ষাৎ প্রেমাবতার, মূর্তিমান সদাশিব শ্রীশ্রীনীলকণ্ঠ !!···

পলকে বজ্রপাত হইল যেন ! শত শত হৃদয় বিদীর্ণ হইল সুকঠোর আঘাতে। তাহারই অভাবনীয় তীব্রতায় কেমন হতচেতন হইয়া পড়িলেন সকলে। ক্ষণকাল পূর্বেও যে সেই স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল দৃষ্টি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিবদ্ধ হইল সকলের চোখে-মুখে—তবে কি তাহা স্থির, নিশ্চল হইয়া গেল চিরদিনের মত ?··· ঐ মধুময় কণ্ঠে আর কি কোনদিনই ধ্বনিত হইবে না পরম প্রেমময় অমৃতবাণী ?···

সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন সারদাকান্তজী। অমনি সারা বাড়ীতে পরিব্যাপ্ত হইল মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি। সেই অসহায় আকুল আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইল দিগদিগন্তে, সারা বিশ্বজগতে।···

ভূলুণ্ঠিতা হইলেন মৃহুদিদি, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। মহানন্দদাদাকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিলেন : ওগো ! তুমি গেলে না কেন ? তাহলে তো শুধু স্বামীকে হারাতাম।··· কিন্তু এ যে আমার স্বামী-পুত্র, মা-বাবা, ভাই-বোন, একসঙ্গে সবই হারালাম !···বলিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলেন। আরও কেহ কেহ অচেতন হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারা পরস্পরকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন অনাথ শিশুর মত। সত্যই মাতা-পিতা, বন্ধু-ভ্রাতা—একাধারে সবই যে তিনি ! ঠাকুর ভিন্ন যে এ জীবন বৃথা—ত্রিভুবন অন্ধকার !···

অপলকে চাহিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের নিস্পন্দ মুখমণ্ডলের দিকে। মনে পড়িল বসন্তদাদার গান : তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার···"। সে তো মিথ্যা নয়—চির সত্য, অনন্ত পাথেয় !···

চারিদিকে মর্মান্তিক শোকাবেগ। তবু সচকিত হইয়া উঠিলাম সহসা। অশ্রুসজল অস্পষ্ট দৃষ্টির মধ্য দিয়াও প্রতিভাত হইল এক অপূর্ব অপ্রাকৃত দৃশ্য : শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যোতির্ময় দেবদেহ অপরূপ পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত, সুসজ্জিত স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন !···নীলকণ্ঠের জটাশোভিত মস্তকের উপরে মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণছত্র, চামর ব্যজনে নিরত অপ্সরা কিন্নরী।···সিংহাসনটী স্কন্ধে বহন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে

অগ্রসর হইলেন অসংখ্য মুনি-ঋষি, দেব-দেবী—কীর্তনানন্দে নৃত্যসহকারে অগ্রসর হইলেন শ্রীমন্দির অভিমুখে।···একটি বিরাট স্ফটিক নির্মিত তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইতেই ছায়াছবির ন্যায় মিলাইয়া গেল সেই অপূর্ব দৃশ্য।···

এ কি স্বপ্ন, না সত্য? সিদ্ধ সাধক গুরুভ্রাতা সন্তোষনাথজীও প্রকাশ করিলেন অনুরূপ দিব্যদর্শনের কথা। ভাগ্যবান গুরুনিষ্ঠ আরো কেহ কেহ উপলব্ধি করিলেন সেই অপার্থিব রহস্য।··

সুগভীর শোকাবেগের মধ্যদিয়াও অভাবনীয়ভাবে দেখা দিল বর্ণাতীত আনন্দের আবেশ।···বার বার মনে হইতে লাগিল শ্রীগুরুর মহাযাত্রার বিচিত্র তাৎপর্য—আর, সমস্ত সত্তা যেন সমাচ্ছন্ন হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বর্গীয় মহিমার বিপুল গৌরবে।···অন্তরের অন্তস্থল হইতে স্বতই উৎসারিত হইল ঃ জয় গুরুদেব—তোমারই জয়!!

॥ চব্বিশ ॥

সকাল ৯টা ২২ মিনিট। ঠাকুরের জীবনদীপ নির্বাণের সময়। বক্ষের ধন সন্তানদের ফকির করিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার এই মহাপ্রয়াণ। অস্তে গেল সাধনা ও সিদ্ধির গৌরব রবি—প্রস্থান করিলেন আধুনিক যুগের মহাঋষি। নিঃসংশয়ে ঠাকুরের মহাযাত্রা মহাগৌরবের—সেই অনুভূতিতে মনপ্রাণ আন্দোলিত। তবু অস্তাচলে বিচিত্র বর্ণাঢ্যের সঙ্গে সঙ্গেই ঘনাইয়া আসে গাঢ় তমিস্রা।···সেই আঁধার, সেই শোকাবেগ যে বড় মর্মান্তিক!···প্রাণের ঠাকুর ভিন্ন ত্রিভুবন যে সত্যই ঘন অন্ধকার! আর একটিবারও ফিরিয়া চাহিবেন না তিনি? ভুবনে ভুবনে পাগল হইয়া বেড়াইলেও আর কি কোন দিনই শুনিব না সেই মধুমাখা কথা? তবে আর কী প্রয়োজন এ ব্যর্থ জীবনের?···

নিদারুণ শোকে সকলেই মুহ্যমান। কিছুকাল কাটিয়া গেল আচ্ছন্নের মত। একদিন দেশবাসীর নয়ন মন সার্থক হইয়াছে শ্রীশ্রীঠাকুরের নীলকণ্ঠ রূপদর্শনে। আজ সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত তাঁহারই অনুপম রূপজ্যোতি। দেহে থাকিতে চিরদিন অম্লান

বদনে সহ্য করিয়াছেন দুঃসহ জ্বালা ও গ্লানি। আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও ক্ষণেকের জন্য ম্লান হইল না সেই ভাস্বর দীপ্তি। দুরারোগ্য ব্যাধির চরম পরিণতি শোচনীয় মৃত্যু—তবু সেই তপ্ত মরুবুকে বিশুষ্ক হইল না তাঁহার উচ্ছল প্রাণগঙ্গা। সর্ব তাপজ্বালা আপন বক্ষে গ্রহণ করিয়া হাসিমুখেই গোলক-বৃন্দাবনে আজ তাঁহার অগ্রগতি।···তাইতো মুনিঋষি ও দেবতাদের আজ এই বিচিত্র শোভাযাত্রা, তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় রূপের দিব্য বিভায় উদ্‌ভাসিত ভূলোক দ্যুলোক !···

আমরা অনেকেই মৃৎবৎ পড়িয়া রহিলাম প্রায় অর্ধঘণ্টা কাল। সকলের জীবনদীপ প্রবল ঝঞ্ঝায় সহসা নির্বাপিত হইয়াছে যেন।···

শ্রীগুরুর অসীম স্নেহে আজন্ম-পালিতা মৃদু দিদি তখনও মূর্চ্ছিতা। হঠাৎ তাঁহার দেহে যেন কোন আত্মার আবির্ভাব হইল। সুসংস্কৃত ভাষায় তিনি প্রায় দশ-বারো মিনিট ভাষণ দান ছলে বলিলেন ঃ এই স্থানটি আমাদের পরম তীর্থ। শ্রীগুরু ভগবান নিজ দেবহস্তে এই গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ এই স্থানে দেহরক্ষা করলেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু তিনি—কতভাবে কৃপা করে জিতুদাদাকে সামান্য অবস্থা থেকে বর্তমানে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। কত লোকের এখানে দীক্ষা হয়েছে, কত ঘটনায় অলৌকিকভাবে তিনি এখানে কত জনকে বহু শিক্ষা দিয়াছেন। বহু উৎসব উপলক্ষে অনেকের প্রাণে নব ভাবের সঞ্চার করে বৃন্দাবন-লীলা প্রকটিত করেছেন। আমরা যেন চিরকাল এই স্থানে সমবেত হয়ে তাঁর পুণ্যস্মৃতি চিরভাস্বর করে স্থানটীকে চিরজাগ্রত করে রাখতে পারি—উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে স্থানটীকে শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে গড়ে তুলতে পারি। আপনাদের উৎসাহ যেন স্তিমিত না হয়, স্মৃতি যেন কখনও ম্লান না হয়। আপনারা সকলে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করে উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমি আমার এই সামান্য অলঙ্কার এই উদ্দেশ্যে দিয়ে দিলাম।···বলিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন মৃদুদিদি।*

---

*পরবর্তীকালে জিতুদাদা নিজ বাড়ীর ত্রিতলে ও দ্বিতলে শ্রীগুরুর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে একটা খসড়া দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জিতুদাদার উত্তরাধিকারিগণ সেই সদিচ্ছা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন আশা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশান্ত দেবদেহের দিকে চাহিয়া মনে জাগিল কত কথা, কত না আবেগ। অতীত স্মৃতির পাতায় পাতায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল কত সুধাপূর্ণ বাণী।···তিনি যে দেহে আর নাই, তাহা বিশ্বাস করিতে মন কিছুতেই চায় না যেন।···মনে হইল পূর্বের ন্যায় মৃত্যুর তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়াও অপ্রাকৃত বিভূতিযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও ঐ দেবদেহে সমাধিস্থ।···তিনি কতবার বলিয়াছেন: জীবনে মরণে সর্বদা আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—সঙ্গে সঙ্গেই থাকব।··· ঠাকুর-বাণী যে বেদবাক্য।···

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল ভগবান গোসাঁইজীর কথা: মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগে কাহারও মনে শোকের কাতরতা আসে না।···কথা প্রসঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন: ওকথা শুনে মনে মনে ভাবলাম, ঠাকুর এ কী বললেন? আমাদের কি তিনি এত অসার মনে কচ্ছেন যে, গোসাঁই দেহ ছাড়বেন আর তাঁর বিরহে আমরা প্রাণে বেঁচে থাকব?···মনে একবার এ কল্পনাও এল: আমার আর চিন্তা কী? সত্যই যদি ঠাকুর আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যান, তবে সেই মুহূর্তে বিষ খেয়ে আমিও ঠাকুরের সঙ্গে যাব। কিন্তু কী আশ্চর্য! মাসখানেক পরে সত্যিই ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন, তখন মনে হল হয়ত বা ঠাকুর সমাধিতেই আছেন, আবার সমাধি ভেঙ্গে উঠবেন।··· ঠাকুরের এমনি খেলা যে, নিজের বিষ খাবার কথা তখন একবারও মনে হ'ল না।···

এখন চিরসুপ্তিমগ্ন শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া একে একে মনে পড়িতে লাগিল ঠাকুরেরই সেই কথামৃত।···সত্যই কী আশ্চর্য!···কয়েক মাস হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রস্থানের আভাসে ও ইঙ্গিতে আমাদের বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সব আদেশ ও উপদেশ, প্রেরণা ও আদর্শের মধ্য দিয়াও গুমরিয়া কাঁদিয়াছে সারা মনপ্রাণ।···বার বার মনে হইয়াছে, ঠাকুর দেহ রাখিলে সত্যই এ জীবন রাখিব কী করিয়া?···

কিন্তু গোসাঁইজীর তথা ঠাকুরের বাণী অভ্রান্তই বটে।···নাই বা তিনি দেহে রহিলেন—তবু তিনি যে নাই ভাবিব কীরূপে?···তিনি যে

আছেন সম্মুখে পশ্চাতে, জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে, সর্বভূতে।··· দেহে থাকিতেই বিচিত্র লীলার মধ্য দিয়াই তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহার সার্থক পরিচয়।··

ধীরে ধীরে আশ্চর্যভাবে প্রশমিত হইল সকলের শোকাবেগ। মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, ভ্রাতা-বন্ধু, জীবনের প্রিয়তম কাহারও মৃত্যুতে দেখি নাই এমনি মর্মভেদী সকরুণ আর্তনাদ। অথচ কালবৈশাখীর মতই যেন কোন অলৌকিক শক্তি বলে অল্পক্ষণে বিদূরিত হইল সেই দুঃসহতম শোকোচ্ছ্বাস। ইহারই মধ্য দিয়া অনুভব করিলাম ঠাকুরের কৃপা ও আশীর্বাদ।···

তখন সকলেরই মনে হইল পবিত্র দেবদেহখানি সমাধিস্থ করিবার কথা।···দেহে থাকিতে তাহার সব বিধিব্যবস্থা নিজেই করিয়া গিয়াছেন কৃপাময় শ্রীশ্রীঠাকুর। মহানন্দ দাদার নিকট একখানি বন্ধ খামও রাখিয়া গিয়াছেন; লীলা সংবরণের পর তাহা খুলিয়া পড়িয়া সেইমত কার্য করাই ঠাকুরের আদেশ। সর্বপ্রথমে মনে পড়িল সেই কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তিম নির্দেশ জানিবার জন্য সকলের মনেই ব্যাকুল আগ্রহ। খামখানি খুলিয়া হতবাক্ হইয়া গেলাম সকলে। কবে, কোথায়, কীভাবে দেহত্যাগ হইবে, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন স্বয়ং অন্তর্যামী।···এছাড়া দেবদেহ পুরীতে লইয়া গিয়া নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে কীভাবে সমাহিত করা হইবে, সমাধিবেদীর উপর কীভাবে নির্মিত হইবে শ্রীমন্দির, কীভাবে চলিবে সেবাপূজা ও ভোগরাগ—চিঠিতে পূর্ববর্ণিত সর্ব নির্দেশই পুনরায় সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।···

সমাধির বিধান আবিলম্বে সকলের অন্তরে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত করিল অদম্য উৎসাহ। একদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবদেহ ঘিরিয়া নব প্রেরণায় চলিল উচ্চ নাম-সংকীর্তন।···অন্যদিকে চলিল নির্দেশ পালনের উদ্যোগ আয়োজন।

ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রোহিণী কাকার চেষ্টায় পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনের দুইখানি কামরা রিজার্ভ করা হইল। পুরীতে তারযোগে জানান

হইল ঃ শ্রীগুরু পঞ্চাশ জন ভক্ত সঙ্গে যাইতেছেন, যেন ষ্টেশনে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা থাকে। সন্ধ্যার পর শত শত শিষ্যশিষ্যা শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া চলিল বিচিত্র পুষ্পশয্যায় শায়িত পবিত্র দেহখানি। আর যেন শোকের ছায়ামাত্র নাই কাহারও মনে—সমবেত কণ্ঠে শ্রীগুরুদেবের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইল দিগদিগন্ত।...

কাষ্ঠনির্মিত শবাধারে রক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবদেহ লইয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিল পুরীধাম অভিমুখে।...

মধুর নামকীর্তনে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার মহিমা ও লীলামাধুর্য আলোচনায় ট্রেনের মধ্যে কাটিয়া গেল সারা রাত্রি।

পরদিন সকালে যথাসময়ে ট্রেন পৌঁছিল শ্রীক্ষেত্রে!

দেবদেহ স্কন্ধে লইয়া সকলে সংকীর্তন সহকারে অগ্রসর হইলাম। জগন্নাথদেবের মন্দিরের সম্মুখে কীর্তন করা হইল একঘণ্টাকাল। দেশ-বিদেশের কত যাত্রী, কত ভক্ত নিবেদন করিল নীরব শ্রদ্ধার্ঘ্য। আর শিষ্যবৃন্দ কীর্তনানন্দে মত্ত রহিল অপূর্ব প্রেরণায়। চক্ষে তাহাদের অশ্রুধারা, বক্ষে তাহাদের বিহ্বল স্পন্দন।...জগন্নাথদেবের নিকট ঠাকুরের শান্তি ও পরম গতির জন্য নিবেদিত হইল না কোন প্রার্থনা।... শ্রীশ্রীঠাকুর যে নিজেই পরম শান্তিময়, আর দেহাবসানে তাঁহার পরম গতির অপ্রাকৃত দৃশ্য তো প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমরা। মহাপ্রভুর ন্যায় গোস্বামী প্রভু বিলীন হইয়াছিলেন জগন্নাথদেবের মধ্যে। শ্রীশ্রীঠাকুরও যে ভগবান গোসাঁইজীর অমর সত্তায় বিলীন হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না আমাদের।

অতঃপর শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল আশ্রমের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল বহু নরনারী, ভক্তিনত বিরাট জনতা। সকলে উপনীত হইলাম গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দির চত্বরে। মন্দির দ্বারে গোসাঁইজীর শ্রীচরণপ্রান্তে লইয়া উন্মুক্ত করা হইল পূত শবাধার। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানির দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল অগণিত মুগ্ধ দৃষ্টি। শ্রীমুখখানি সদ্য প্রস্ফুটিত শতদলটী যেন।...কয়েক দিন পূর্বেও

কলিকাতা রওনা হইবার প্রাক্কালে এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর জানাইয়াছিলেন সর্বশেষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।···গুরুগতপ্রাণ, প্রিয়তম মানসপুত্র সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শাশ্বতকালের জন্য সমাসীন ভগবান গোসাঁইজীর পরম স্নেহময় বক্ষে।···

শোকাচ্ছন্ন ভাববিহ্বল নিথর জনতা। সহসা আলুথালু বেশে ছুটিয়া আসিলেন শ্রীগুরু-বিরহিণী উন্মাদিনী গুরুভগ্নি মৃত্যুহাসিনী। শ্রীমন্দিরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: দেখ গোসাঁই, তুমি চিরকাল আমার ঠাকুরকে পেটভরে খেতে না দিয়ে কত কষ্ট দিয়েছ, কত কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রেখেছ।···এখন আমাদের মধ্যে তাঁকে একটু আরামে থাকতে দেখে তোমার আর সহ্য হল না—অমনি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলে।··· সেখানেও যদি আবার কষ্ট দাও, তবে তোমাকে আমি অভিসম্পাত দেব! যদি আমি সতীসাধ্বী হই, তবে সেই অভিশাপে তুমি জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে!···

বলিয়াই মূর্ছিতা হইল একাধারে সর্ব্বহারা পাগলিনী। বাতুলের প্রলাপই বটে! তবু সেই নিরুদ্ধ মর্মভেদী ক্রন্দন, গুরুগতপ্রাণার নিখাদ আন্তরিকতা স্পন্দিত হইতে লাগিল শত-সহস্র হৃদয়ে। মূর্ছিতা অবোধ সন্তানের মস্তকে হয়ত সান্ত্বনার অমিয় স্পর্শ বুলাইয়া দিলেন প্রেমের ঠাকুর গোসাঁইজী। কিন্তু অজ্ঞাতে আমাদেরও চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল।···

ঠাকুরবাড়ী আশ্রম। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমর কীর্তি। তাঁহারই পরম পবিত্র লীলাক্ষেত্র।···

মনে পড়ে কয়েক দিন পুর্বে কলিকাতা যাত্রার সময় ঠাকুরের শেষ বিদায় দৃশ্য!···বিয়োগবিধুরা শিষ্যাদের বলিয়াছিলেন: আমি আর এখান থেকে কোথায় যাব? সাতদিন পরে এখানেই ফিরে আসছি।··· শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা প্রতি অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল। কিন্তু কে জানিত সে সত্য এমনই নির্মম!···

কান্নার রোল উঠিল সারা ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে। সর্বহারা অসহায় নরনারীর সে কী মর্মভেদী আর্তনাদ।···সেই শোকাবেগে নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, আকাশ-বাতাস মর্মান্তিক হাহাকারে মুহ্যমান।···

নিজ সমাধির স্থান নির্দেশ ও ভিত্তি পত্তন ইতিপূর্বেই করিয়া গিয়াছিলেন ঠাকুর; দেবদেহ সমাধিস্থ করিবার বিধি-বিধান সম্পর্কেও চমৎকার নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। সেই বিধান অনুযায়ী শবাধারটী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের বাগান পরিক্রমা করাইয়া লইয়া যাওয়া হয় দ্বিতলে ঠাকুরের আসন ঘরে। পরে শবাধার আনীত হইল পূর্ব নির্দিষ্ট বিল্ববৃক্ষ মূলে। সমাধিকুণ্ড খনন করিয়া পরিস্কার করা হইল এবং সংগৃহীত হইল পঞ্চতীর্থের জল ও সমাধি দিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি।

বেলা প্রায় এগারোটা। ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে তাঁহার দেহখানি স্নান করান হইল গঙ্গাজলে ও পঞ্চতীর্থের জলে। নির্দিষ্ট স্থানে দক্ষিণ দিকে মস্তক স্থাপন করিয়া পূর্বাভিমুখে শয়ন করান হইল সমাধিকুণ্ডে। মহাপ্রসাদ, ফলমূল ও পানীয় জলাদি নিবেদন করিয়া সকলে পূজা করিলাম সমবেতভাবে। মাটীর কমণ্ডলুতে প্রদত্ত হইল গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ ও তুলসী মঞ্জরী। সমাধিকুণ্ডে উৎসর্গ করা হইল ঠাকুরের ব্যবহৃত রূপার কমণ্ডলু, রূপার গ্লাস এবং তাঁহার এক প্রিয় ভক্ত প্রদত্ত এক হাজার টাকার একটী তোড়া। তাঁহার অঙ্গুলীতেও ছিল নবরত্নের অঙ্গুরীয়টি। এই সব অনুষ্ঠান অন্তে গোসাঁইজী ও ঠাকুরের জয়ধ্বনির সঙ্গে শুরু হইল নাম কীর্তন—প্রচুর বালি ও লবণ চাপাইয়া মহা সমারোহে সমাধিস্থ করা হইল দেবদেহখানি।

দেহে থাকিতে বহুদিন সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আবার লীলাপুষ্টির প্রয়োজনে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত এই নশ্বর দেহপিঞ্জরে। আজ চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল সেই বন্ধন, টুটিয়া গেল সেই সীমারেখা—অনন্তকালের জন্য নির্বিকল্প সমাধিতে আত্ম-নিমগ্ন হইলেন মহাযোগী নীলকণ্ঠ। কোটি প্রলয়, তুহীন শীতল মহামৃত্যু গ্রাস করিতে পারে নিখিল জগৎ; কিন্তু তাহার বহু উর্ধে চিদানন্দময় অনন্তধামে এখন হইতে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান।···সর্ব গ্লানি ও মালিন্যের

পরপারে দিব্য জোতির্লোকে প্রেমামৃত বর্ষণে আজ তাঁহার শাশ্বত অভিষেক।...

তৎক্ষণাৎ গাঁথিয়া প্রস্তুত করা হইল সমাধিবেদী। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ঐ বেদীর উপর চতুর্দিকে নির্মিত হইল একটী তৃণ-কুটীর। শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার সেবাপূজা আরম্ভ হইল সঙ্গে সঙ্গেই। গোসাঁইজীর সমাধির সহকারী সেবক ছিলেন বসন্তদাদা—তাঁহাকেই ঠাকুরের সমাধির সেবাপূজা ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হইল।

সন্ধ্যায় বাজিয়া উঠিল আরতির শঙ্খঘণ্টা। বিগ্রহত্রয়ের আরতির পর নূতন করিয়া সমাধি-বেদীতে শুরু হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি। পরে দুই-তিন ঘণ্টা ব্যাপী চলিল তুমুল নাম-সংকীর্তন।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তাঁহার ফিটন গাড়ীতে সুসজ্জিত করিয়া নামকীর্তন ও শোভাযাত্রা সহকারে পুলিনপুরী ভবনে গিয়া শোকের মধ্যেও উৎসবানন্দে কাটিল। বৈকালে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম সকলে। স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিমত অনুযায়ী দেহত্যাগের নবম দিনে মহোৎসবের দিন ধার্য করা হইল। সেদিন শত-সহস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পাণ্ডা, অনাহূত ব্রাহ্মণ, কাঙ্গালী প্রভৃতি প্রাণ ভরিয়া সেবা করিলেন। কীর্তনভজনে আশ্রম মুখরিত রহিল। মনে পড়িল মহাপ্রভু ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধদেহ সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করেন মহোৎসবের মধ্য দিয়াই। মহোৎসবের ইহাই তো উপযুক্ত সময়। দুঃখপূর্ণ ইহলোক হইতে আনন্দময় অমৃতলোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণের এই তো পরম মাহেন্দ্রলগ্ন।...

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নির্দেশপত্রে লিখিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে স্থানীয় পৌরসভা বা পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন হইবে না, সে সব আপনা হইতেই ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। সমাধিস্থ করিবার পরদিন প্রথমে আসিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার; তাঁহারই অধ্যাপক ডাঃ সত্যরঞ্জন সেনের সার্টিফিকেট দেখিয়া তিনি নিজেই পৌরসভার ব্যাপার মিটাইয়া দিলেন। পরে আসিলেন পুলিশ অফিসার,

বিনা অনুমতিতে লোকালয়ের মধ্যে দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য কৈফিয়ৎ চাহিলেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন গুরুভ্রাতা রমণী মিত্র, কটকের ডি, আই, জি, পুলিশ আফিসের তদানীন্তন বড়বাবু। তাঁহাকে দেখিয়াই এবং তাঁহারই গুরুদেবের ব্যাপার জানিয়া সসম্মানে সরিয়া পড়িলেন পুলিশ অফিসার, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও করিয়া দিলেন।

বৎসরের পর বৎসর অসংখ্য ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমার প্রকাশ। তাঁহার সমাধির শেষ মুহূর্তেও সেই মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য মনে করিলাম সকলে। অধমদের উপর কত অসীম স্নেহ ঠাকুরের—তাই নিজের ব্যাপারে কোন দিক দিয়াই এতটুকু বেগ পাইতে দিলেন না। তাঁহার কৃপায় সহজে সব ব্যবস্থা হইয়া গেল সুষ্ঠুভাবেই।

অতঃপর ঠাকুরের নির্দেশমত বিগ্রহত্রয়ের সেবাপূজার সঙ্গে তাঁহার সমাধিতেও প্রতিদিন শুরু হইল নিয়মিত সেবাপূজা। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা তিথিতে, জগন্নাথদেবের নবযৌবনের দিন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উৎসব।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম সমাধি উৎসবের পরেই সমাধি-মন্দিরের উপরিভাগ নির্মাণের পরিকল্পনার জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের লইয়া গঠিত হইল একটি কমিটি। ১৩৩৬ সালের পৌষ মাসে ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী জমির প্রায় সাত ফুট নীচে স্থাপিত হয় ৪০′×৪০′×১॥′ রিইনফোর্স্ড্ কনক্রিটের ভিত্তি—জমির নীচ পর্যন্ত গাঁথুনির কাজ সারিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখা হইয়াছিল। এখন কমিটির সভ্যবৃন্দ অনেক পুরাতন মন্দিরের চিত্র পরীক্ষা করিয়া অবশেষে অনুমোদন করিলেন গুরুভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রস্তুত একটি শ্রীমন্দিরের চিত্র। ১৩৩৫ সালের মাঘ মাসে কোণারক মন্দির দর্শনে গিয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সেখানে নীল মুগনি পাথরের মূর্তি ও কারুকার্য দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মন্দির গাত্রস্থিত নীল পাথরের মূর্তিগুলি স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন: কী সুন্দর—কী সুন্দর!...

সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া গুরুভ্রাতাদের অন্তরে জাগিল নীল পাথরের সমাধি-মন্দির নির্মাণের প্রবল স্পৃহা। কিন্তু কোথায় মিলিবে এত নীল পাথর? আপাততঃ খুরদা ষ্টেশনের নিকট তাপং নামক স্থানের সানো পাথর দ্বারা শ্রীমন্দিরের ভিত্তি পর্যন্ত নির্মিত হইবে স্থির হইল। ১৩৩৭ সালের মহাহোমের সময় চন্দননগরে সমবেত গুরুভ্রাতা-ভগ্নিগণ মহাদশমী তিথিতে মিলিত হইয়া শ্রীমন্দির নির্মাণের জন্য প্রায় বারো হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অতঃপর কলিকাতায় গঠিত হইল গুরুভ্রাতাদের একটি কমিটি—তাহাতে মহানন্দদাদা ম্যানেজার, অচ্যুতদাদা ইঞ্জিনিয়ার ও জিতুদাদা ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে অর্থসংগ্রহ আরম্ভ হইল। সানো পাথর ও মাকড়া পাথর সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হইলেন তাপং-এর গিরিধারী সামন্ত। ১৩৩৭ সালের ৯ই ফাল্গুন শুরু হইল শ্রীমন্দির নির্মাণকার্য। ১৩৩৮ সালের ১৩ই ভাদ্র ভিত্তি নির্মাণকার্য শেষ হইল। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে প্রস্তুত করা হয় একটি খড়ের জগমোহন—সেখানে বসিয়া ছোটদাদা হেমবাবু শ্রীমন্দিরের দিকে চাহিয়া বলিতেন: কবে শ্রীমন্দিরের কাজ শেষ হবে দেখব?···হায়! তাহা দেখা তাঁহার ভাগ্যে আর হইল না!···এই সময় সমাধির চারিপার্শ্বে একটি ইষ্টক-নির্মিত গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেবাপূজা চলিতেছিল ঐ গৃহেই। নীল পাথরের কোন সন্ধান না পাওয়ায় সানো পাথর দ্বারা আরম্ভ করা হয় মূল মন্দিরের নির্মাণকার্য।

নীল পাথরের অনুসন্ধান চলিল বালেশ্বরে, নীলগিরির রাজবাটীতে ও মঙ্গলপুরে। ১৩৩৯ সালে সন্ধান পাওয়া গেল, মানভূম জেলায় চাণ্ডিল ষ্টেশনের নিকটে মধুজানার নীল পাথরের খাদ হইতে প্রয়োজনীয় পাথর সংগৃহীত হইতে পারে। তদনুসারে সুবর্ণরেখা নদী পার হইবার সময় নদীগর্ভে অবস্থিত নীল পাথরের দৃশ্য দেখিয়া সকলের নয়ন মুগ্ধ হইল। মধুজানার এবং অন্যান্য খাদে গিয়াও নিরাশ হইলেন তাঁহারা। অবশেষে নীল পাথরের সন্ধান মিলিল সুবর্ণরেখা নদীর ধারে একটি খাদে। মূল মন্দিরের নীচের অংশের গঠনকার্য শেষ হইল ১৩৩৯ সালের ৫ই আশ্বিন
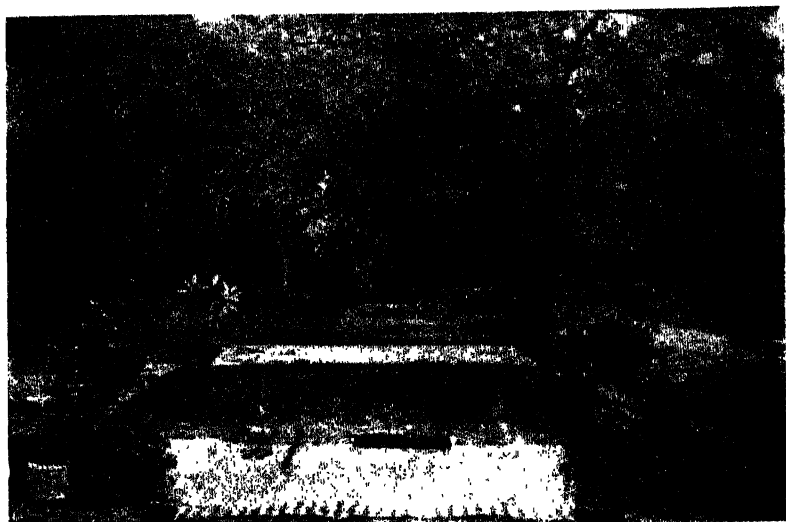
নীলকণ্ঠজীর সমাধির প্রথম অবস্থা

পুরী ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের উত্তরে নীলকণ্ঠজীর সমাধির দ্বিতীয় অবস্থা

তারিখে। মন্দিরের স্তম্ভগুলি ও শীর্ষদেশ নীল পাথর দ্বারা নির্মিত হইবে স্থির হইল। বীরডিহির খাদে আট-দশ ফুট নীচে পাওয়া গেল ভাল নীল পাথর। চৈত্র মাসে পুরীতে পৌছিল নীল পাথরের প্রথম ওয়াগন। সুবর্ণরেখার পারে ডিমুডি খাদ হইতে এক বৎসরের মধ্যে আনা হইল চব্বিশ ওয়াগন নীল পাথর। এই পাথর অতি মূল্যবান—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের মেঝে এবং ভোগ-মন্দিরের চৌকাঠ ও মূর্তিগুলি এই মুগনি (ক্লোরাইট্) পাথর দ্বারা নির্মিত।

১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মন্দিরের ছাদ ঢালাই করা হইলে মন্দিরেই সমাধির সেবাপূজা আরম্ভ হয়। স্তম্ভগুলির নির্মাণকার্য শেষ হয় এই বৎসরের মধ্যে। ১৩৪৪ সালের উৎসবের পূর্বে মন্দিরের ভিতরে মেঝে ও দেওয়ালে মার্বেল পাথর বসানো হয়। কার্তিক মাস হইতে নীল পাথর দ্বারা চূড়ার কার্য আরম্ভ হয়। অষ্ট-কোণাকার মন্দিরগাত্রে নির্মিত হইল একটি বড় চূড়া ও চব্বিশটি ছোট চূড়া। চূড়ার উপর প্রণব ও ত্রিশূলাদি সোনা দিয়া মুড়িবার জন্য অলঙ্কারাদি দান করিলেন অনেক গুরুভগ্নি। শ্রীমন্দির সংলগ্ন একটি জগমোহনের ভিত্তিও সানো পাথর দ্বারা বাঁধানো হইল। শ্রীমন্দির-গাত্রে নীল পাথরের দশাবতার, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেবের সুদৃশ্য মূর্তি স্থাপন করিয়া সুশোভিত করা হইল। মন্দিরের প্রধান দরজার উভয় পার্শ্বে নির্মাণ করা হইল নীল প্রস্তরের সুলক্ষণযুক্ত হস্তী ও পদ্মফুলের তোরণ। মূর্তিগুলি ও এই তোরণ উড়িষ্যার প্রাচীন ভাস্কর্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন—গুরুনিষ্ঠ সেবক পশুপতি বাবাজীর অঙ্কিত নক্সা অনুসারে এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী দাসু মহারাণা কর্তৃক নির্মিত।

নাসিক হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর আনয়ন করেন সুলক্ষণযুক্ত নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ। নিজ সমাধির সম্মুখে যত শীঘ্র সম্ভব তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার নির্দেশ দান করেন। ১৩৪৫ সালে আষাঢ় মাসে শ্রীগুরুর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্দির ও নর্মদেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাকার্য যাহাতে

সুসম্পন্ন হয়, সেজন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উৎসাহের অন্ত ছিল না শিষ্যবৃন্দের।

এই পুণ্য প্রতিষ্ঠা কার্য শাস্ত্রীয় বিধিমতে সুসম্পন্ন করিবার জন্য দরবেশজীর প্রস্তাবমত পুরীধামস্থ পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণদাস জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের বিধান লওয়া হইল। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি কলিকাতার এক অধিবেশনে গঠিত হইল একটি কমিটি। স্থির হইল এই প্রতিষ্ঠা কার্যে সমস্ত গুরুভ্রাতাভগ্নি ও প্রশিষ্যগণের প্রতিনিধিত্ব করিবেন গুরুভ্রাতা সন্তোষনাথজী। সাত শত গুরুভ্রাতাভগ্নির দশদিন পুরীবাসের উপযোগী ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, পাণ্ডা, পণ্ডিত ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার ব্যবস্থাও করা হইল। পুরীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পিত হইল আমাদের পাণ্ডা পূজনীয় হরেকৃষ্ণ খুঁটিয়া মহাশয়ের উপর। আর কলিকাতায় সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন কমিটির কর্মাধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী এবং প্রাথমিক আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অগ্রিম দিলেন জিতুদাদা।

গোসাঁইজীর সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পণ্ডিত ভুবনেশ্বর মহাপাত্র মহাশয়। তাঁহার শিষ্য ও ছাত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রথ, মীমাংসা-বেদান্ত-স্মৃতি-কাব্যতীর্থ মহাশয়কে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপর অর্পণ করা হইল প্রতিষ্ঠা কার্যের সমস্ত দায়িত্ব। পূজনীয় রামচন্দ্র রথ মহাশয় কৃষ্ণদাস জ্যোতিরত্ন এবং আঠারো জন পণ্ডিতের সাহায্যে ব্রতী হইলেন এই পুণ্য অনুষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠা উৎসবের কর্মসূচী নিম্নলিখিত রূপে নির্ধারিত হইল :

৪ঠা আষাঢ় ··· যজ্ঞমণ্ডপের স্তম্ভারোপণ।
১২ই ,, ··· শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাব উৎসব।
১৩ই ,, ··· প্রতিষ্ঠা কার্যারম্ভ।
১৪ই ,, ··· প্রতিষ্ঠা কার্যের হোম।
১৫ই ,, ··· প্রতিষ্ঠা হোমের সমাপ্তি ও ৺নর্মদেশ্বর শিবস্থাপন।
১৬ই ,, ··· ১৬ শাসনের ব্রাহ্মণ-ভোজন ও সুরেন্দ্রনাথ আচার্য মহাশয়ের কীর্তন।

১৭ই আষাঢ় ··· ৩৬ নিয়োগের পাণ্ডা-ভোজন ও আচার্য মহাশয়ের কীর্তন।

১৮ই ,, ··· পণ্ডিত বিদায় ও আচার্য মহাশয়ের কীর্তন।

১৯শে ,, ··· দরিদ্র-নারায়ণের সেবা।

যথাসময়ে আশ্রমে সমবেত হইলেন প্রায় আটশত গুরুভ্রাতাভগ্নি। ইতিপূর্বে ছোট দাদা হেমচন্দ্র বটব্যাল এবং অক্লান্ত কর্মী মহানন্দ-দাদার অকাল মৃত্যুতে পূর্ণাঙ্গ হইল না উৎসব আনন্দ। *

৪ঠা আষাঢ় সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীমন্দিরের পূর্বদিকে যজ্ঞমণ্ডপের শুভ স্তম্ভারোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। বারো বর্গ হাত যজ্ঞমণ্ডপের উপর যজ্ঞবেদী হইল চারি বর্গ হাত।

১২ই আষাঢ় সম্পন্ন হইল ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব। সকাল নয়টায় মাথুর কীর্তন করিলেন পূজনীয় রেবতী কাকা। সন্ধ্যা ছয়টায় প্রতিষ্ঠা কার্যের মঙ্গলার্থে সম্পন্ন হইল শুভাঙ্কুরা রোপণ ও অধিবাস। এইদিন ভোজন করিলেন পঞ্চাশ জন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও দুইশত রবাহুত।

১৩ই আষাঢ় প্রতিষ্ঠা কার্যারম্ভ। সকালে সমাধির পূজা ও ভোগ অন্তে আমরা আঠারো জন ব্রাহ্মণ গুরুভ্রাতা শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করিয়া জগমোহনে হোম করিলাম। বেলা দশটায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা দিয়া কার্যারম্ভের অনুমতি লইয়া আসিলেন পাণ্ডাজী। নর্মদেশ্বরকে ষোল কলসে এবং পরে একাশী কলসে মহাস্নান করাইয়া পূজা করা হইল। শ্রীমন্দিরের চতুর্দিকস্থ দ্বারের জন্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইল নন্দী, হরগৌরী, গণেশ ও কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবতা মণ্ডলীর। শ্রীমন্দিরের অষ্টদিকে ও ঊর্ধে পঞ্চরত্ন পূর্ণ দশকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথম কুণ্ডে সমাধা হইল পার্বতীর হোম। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের দেবদাসীরা নৃত্যগীতাদি দ্বারা শুভ সূচনা করিলেন মঙ্গল অনুষ্ঠানের। এইদিন প্রসাদ গ্রহণ করিলেন প্রায় তিনশত রবাহুত সাধু সন্ন্যাসী।

---

* আশ্রম কর্তৃপক্ষের অমর্যাদাসূচক ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া আঠারোনালার জলে আত্মবিসর্জন করেন হেমবাবু।

অনেকের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া, নানা অভিশাপে জর্জরিত হইয়া, মহানন্দ দাদাও অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৪ই আষাঢ় ৺রথযাত্রা। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগ অন্তে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও হোম করিলাম আমরা আঠারো জন ব্রাহ্মণ গুরুভ্রাতা।

১৫ই আষাঢ় প্রতিষ্ঠার শেষদিনেও যথাবিধি সমাধা হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভোগ, চণ্ডীপাঠ ও হোম। নর্মদেশ্বর ও শ্রীমন্দিরের পার্শ্ব দেবতাদের পূজা করিয়া হোম করিলেন আচার্য মহাশয়। বেলা এগারোটায় যজ্ঞবেদীর চতুর্দিকে সমবেত হইলেন গোসাঁইজীর শিষ্যবৃন্দ এবং সমস্ত গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিগণ। সর্বসমক্ষে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমাপ্ত হইল পূর্ণাহুতি। বাদ্যাদি সহ শ্রীমন্দিরের অষ্টকোণে ও হৃদয়ে নয়টী রত্নপূর্ণ ঘটস্থাপন, শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ, পিণ্ডিকা ও প্রতিমা সংযোগ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান অন্তে শ্রীমন্দির উৎসর্গ করা হইল ৺নর্মদেশ্বরকে। হোমের আহুতি অন্তে সকল দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রসাদ, দক্ষিণাদি দান করা হইল। অপরাহ্নে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিলেন প্রভুপাদ নদীয়া-বিনোদ গোসাঁইজী।

১৬ই আষাঢ় ব্রাহ্মণ-ভোজন। সমাধি পূজা ও ভোগ অন্তে মধ্যাহ্নে গোষ্ঠ কীর্তন করিলেন সুরেন্দ্রনাথ আচার্য মহাশয়। সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় উপস্থিত হইলেন পুরী রাজার প্রতিষ্ঠিত ষোল শাসনের পাঁচ শত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ। মহাপ্রসাদ, কণিকা, মিষ্ট দধি ও মতিচুর দ্বারা সেবা করাইয়া যথাযোগ্য দক্ষিণা দেওয়া হইল।

১৭ই আষাঢ় পাণ্ডা ভোজন। সমাধি পূজা ও ভোগ অন্তে পূর্বরাগ কীর্তন করিলেন আচার্য মহাশয়। সন্ধ্যায় পাণ্ডাজীদের আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য তিনটী বড় ডে-লাইট সহ পাঠান হইল জিতু দাদাকে। গম্ভীর পরিবেশে শোভাযাত্রা সহকারে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ছত্রিশ নিয়োগের পাঁচ শত পাণ্ডা। মহাপ্রসাদ, কণিকা ও চকটার দ্বারা সেবা করাইয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হইল সকলকে।

১৮ই আষাঢ় পণ্ডিত বিদায়। সমাধি-সেবা ও ভোগ অন্তে আচার্য মহাশয় পরিবেশন করিলেন কলহান্তরিতা কীর্তন। অপরাহ্নে এক শত নিমন্ত্রিত পণ্ডিতবর্গকে চন্দন ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া

নীলকণ্ঠ   শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সমাধি মন্দির
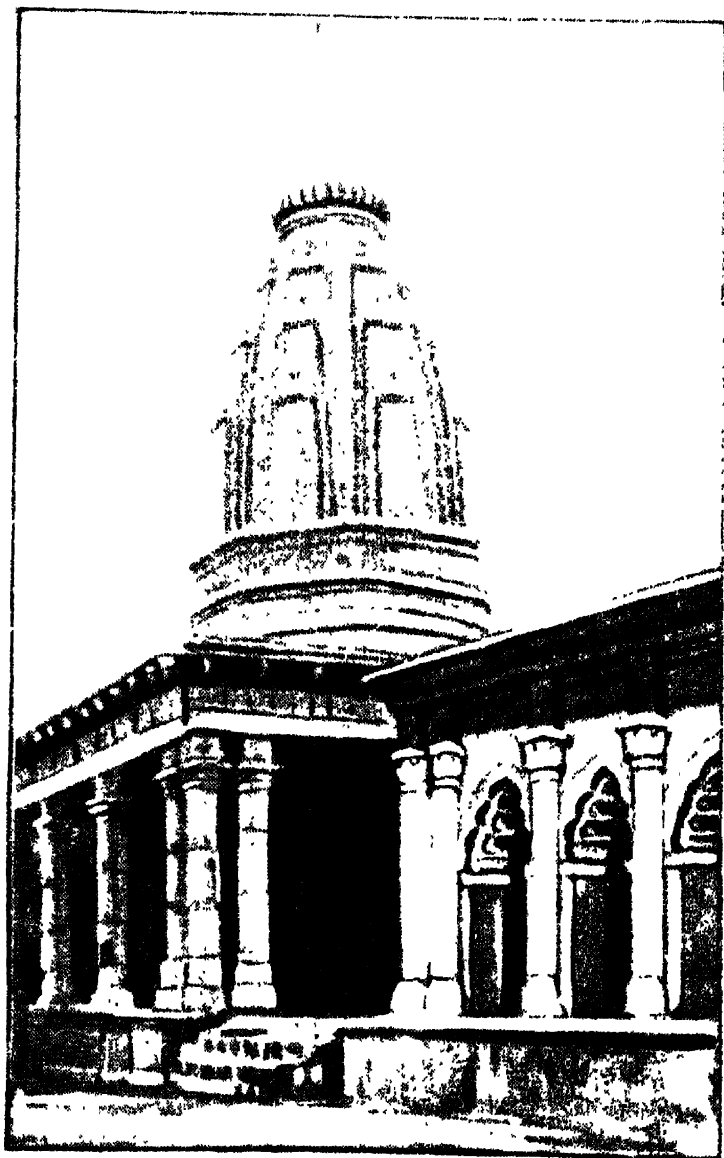
মহাপ্রসাদ দ্বারা সেবা করান হইল। পরে মর্যাদা স্বরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দান করা হইল একখানা ধুতি, একটী রৌপ্য অঙ্গুরীয়, একখানি গীতা ও একটী তাম্র কলসী।

১৯শে আষাঢ় প্রায় দেড় হাজার কাঙালী ভোজনের পর তাহাদেরও দক্ষিণা দেওয়া হইল। ১২ই আষাঢ় হইতে প্রত্যহ গোসাঁইজীর সমাধিতে চা-ভোগ এবং অপরাহ্নে মহাপ্রসাদ পাঠান হইল।

এইভাবে শাস্ত্রীয় বিধিমতে যথোচিত নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন হইল শ্রীমন্দির এবং নর্মদেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা উৎসব। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর হইতে ১৩৪৬ সাল অবধি শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে ব্যয় করা হইল পঞ্চান্ন হাজার টাকা, আর প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ব্যয়িত হইল প্রায় নয় হাজার টাকা। এই পুণ্য অনুষ্ঠানের স্মৃতি আজও অক্ষয় হইয়া আছে অনেকের অন্তরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেহে থাকিতে ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে গোসাঁইজী ও মাতাঠাকুরাণীর বিগ্রহের সহিত প্রতিষ্ঠা করেন সুলক্ষণযুক্ত স্বয়ং পূজিত শালগ্রাম—ক্ষীরোদার্ণবশায়ী অষ্টভুজ-মহাবিষ্ণু-চক্র। আর দেহান্তর প্রাপ্তির পর নিজ সমাধির সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিয়া যান নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ। নিজস্ব একই আশ্রমে তাঁহার এই দুইটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা তাৎপর্যপূর্ণ।

গোস্বামী প্রভুর প্রধান বাণী: শাস্ত্র ও সদাচারের সহিত যাহা না মিলিবে তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে।···মহাপ্রভুর পর তিনি একদিকে নামযজ্ঞের প্রবর্তক, অন্যদিকে বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষক। অথচ কিছুমাত্র সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না মহাপ্রভুর ন্যায় গোস্বামী প্রভুর চির উদার হৃদয়ে। বরং তাঁহারা উভয়েই বক্ষে ধারণ করেন পতিত বঞ্চিত আচণ্ডাল সর্বজাতীয় নরনারীকে।···

বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্পর্কে একবার প্রশ্ন উত্থাপন করেন ঠাকুর কুলদানন্দ। উত্তরে গোসাঁইজী বলেন: প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুষ্য সমাজে নয়—পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতর আছে।

এই জাতিভেদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা।···আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। এই বর্ণাশ্রম না দাঁড়াইলে জনসাধারণের কখনই মঙ্গল হইবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করে চলা উচিৎ, সর্বদাই ত বলি, না মানলে কি আর করা যায়?

বস্তুতঃ তৎকালিক বৈদেশিক প্রভুত্বের যুগে সর্বসাধারণের সর্বজনীন কল্যাণের তাগিদেই এই মতের পরিপোষক ছিলেন গোস্বামী প্রভু। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন: উত্তরকালে লুপ্তপ্রায় হইবে ধর্ম, শাস্ত্র ও আস্তিক্যবাদ; পরিবর্তে জড়বাদ ও হীন স্বার্থবাদে আচ্ছন্ন হইবে সারা জগৎ। এজন্য ব্যক্তিগত আধ্যাত্ম ধর্মের দিক দিয়া বাড়ীর মেথরকেও তিনি জানাইয়াছিলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম; কিন্তু দেশের সমষ্টিগত কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি ছিলেন শাস্ত্রমূর্তি।···

ভগবান গুরুদেবের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ ও শিক্ষা লাভের ফলে শাস্ত্র, সদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করেন বিশ্লেষণপটু ঠাকুর কুলদানন্দ। আর্য্য ঋষিদিগের পথ অনুসরণ করা এবং সকলকে সেই পথে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ ঠাকুরবাড়ী আশ্রমে গোসাঁইজী ও মাতাঠাকুরাণীর বিগ্রহের সহিত তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শালগ্রাম শিলা। আশ্রমে বিগ্রহত্রয়ের সেবাপূজা যাহাতে ব্রাহ্মণসেবক কর্তৃক শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পূজিত ও পরিচালিত হয়, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু আধুনিক যুগধর্মকেও অস্বীকার করেন নাই উদার-হৃদয় শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি সাম্য, মৈত্রী ও উদারভাবেরও পরিপোষক। জাতিগত বিচারে শিষ্যশিষ্যাদের মধ্যে যাহাতে কোন বিভেদ, অসাম্য বা মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়, সেদিকে ছিল তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি। তিনি চাহিয়াছিলেন, পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে তাঁহার বিরাট শিষ্যগোষ্ঠি নিজ নিজ কর্তব্য পালন ও নাম-সাধনের সমন্বয়ে সুসংবদ্ধ হইবে একটি আদর্শ সমাজরূপে। কিন্তু বিগ্রহত্রয়ের সেবাপূজায় সকলের অধিকার থাকিবে না; অথচ আশ্রমে চাই সকলের, সর্বজাতির সমান স্বীকৃতি।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাও বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার অর্জনের জন্য করিবে তুমুল আন্দোলন। বাণলিঙ্গ শিবের মন্দিরে সকলেরই প্রবেশ করিবার এবং সেবাপূজা করিবার কোন শাস্ত্রীয় বাধা নাই। এইজন্যই নিজের সমাধি-মন্দিরে নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার নির্দেশ দান করেন কল্যাণব্রতী শ্রীশ্রীঠাকুর। অবশ্য সমাধিতেও মূল পূজা ও ভোগরাগ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের দ্বারাই করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

নিজস্ব আশ্রমে একদিকে শালগ্রাম এবং অন্যদিকে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার মূলে ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র ও সদাচার পালনের এবং বর্ণাশ্রম ধর্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠির জন্যই। কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও গোস্বামীপ্রভু ছিলেন সর্বজাতি ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের পক্ষপাতী। গোস্বামীপ্রভু দেশ ও সমাজগত রীতিনীতি, আচারপদ্ধতি সব বজায় রাখিয়া সকলকে নিজ নিজ ধর্মপথে অগ্রসর হইবার উপদেশ দান করেন। আবার ধর্মজগৎ সম্পর্কে তিনি বলিতেন, 'আমাদের কোন সম্প্রদায় নাই'।…কার্যতও যে কোন বিগ্রহের মন্দির, গির্জা, মসজিদ সর্বত্রই প্রণত হইতেন তিনি। বলিতেন—যেখানেই ভগবানের পূজার্চনা ও নাম স্মরণ করা হয়, সেখানেই অবনত মস্তকে প্রণাম করবে।…এইজন্য প্রার্থী হইলে তিনি হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান সর্বজাতিকে দীক্ষাদান করেন। এবং সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার আসনের চারিপার্শ্বে প্রায়ই আবির্ভূত হইতেন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, যীশু খ্রীষ্ট, মহম্মদ, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মা ও অবতার পুরুষগণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন এই পরম সাম্য ও সমন্বয়ের পরিপোষক। এজন্য তিনি নিজেও আচণ্ডালকে দীক্ষা ও আলিঙ্গন দান করেন। খ্রীষ্টান গ্রাফ দম্পতীও তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সাহচর্যে আসিয়া এই অন্তর-সৌন্দর্যের সন্ধানলাভে মুগ্ধ হইয়া-

ছিলেন নিউ ইয়র্কের ডক্টর ইভ্যানস্ ওয়েনজ্। তাঁহার বিশ্ববিদিত 'ভারতীয় ও তিব্বতীয় সাধুগণের ইতিহাস' নামীয় পুস্তকে ঠাকুর কুলদানন্দের প্রতিকৃতি সহ সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেনঃ আর্যগুরুরা শিষ্যদের ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা আদায় করেন শুধু তাহাদের প্রতি নিজেদের অকৃত্রিম ভালবাসা দান করিয়া।...বস্তুতঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই ভালবাসা ও অসীম স্নেহই ছিল ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সামাজিক গণ্ডির বাহিরে অন্তর্লোকে তাঁহার সুগভীর স্নেহ ও ভালবাসা, সাম্য ও সমন্বয়ের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই সব ক্ষোভ ও অভিমান ভুলিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন। সকলের প্রতি তাঁহার সমভাব ও সমদৃষ্টি ছিল আদর্শ স্থানীয়। শাস্ত্রীয় সনাতন ধর্মকে যথাসম্ভব যুগোপযোগী করিয়া প্রচার করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। নিয়মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রপালনে দৃঢ় হইলেও শিষ্যদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দান সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদার। এছাড়া, কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে সুমধুর আলাপ ব্যবহারে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র সকলকেই আপন করিয়া লইতেন অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে জ্বালা-যন্ত্রণা, শোক-তাপ, হিংসা-দ্বেষ সবকিছু ভুলিয়া সকলেই ভাসিতেন অনাবিল আনন্দস্রোতে। তাঁহার অমৃতময় সঙ্গগুণে যখন যেখানে যাইতেন সেখানেই দেখা দিত মধুর বৃন্দাবন। তাই কঠোর শাসক হইয়াও তিনি ছিলেন স্বর্গীয় ভালবাসার অমৃতকুম্ভ।...

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আর স্থূলদেহে নাই। কিন্তু সূক্ষ্মদেহে তিনি আছেন মহত্তর জীবনে, ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। আছেন আশ্রমের ধূলিকণায়, বৃক্ষলতায়, ভক্ত হৃদয়ে। আছেন সাধনা ও সিদ্ধির পীঠস্থানে, তীর্থধামে, মন্দিরে মন্দিরে, পথপ্রান্তরে। আছেন আকাশে বাতাসে, মহাব্যোমে, অমরাবতী ও অনন্তধামে। তিনি আছেন সর্ব জীবে, সর্বভূতে সর্ব লোকে।...

সেই সঙ্গে আছে তাঁহার আবাল্য আস্তিক্য বুদ্ধি, অবিচল সংগ্রাম-সাধনা, ঐকান্তিক সেবা-অনুরাগ, মহাসিদ্ধি ও সমাধির বিচিত্র কাহিনী। আছে কঠোর সংযম-তীতিক্ষা, অটল ধৈর্য-অধ্যবসায়, প্রবুদ্ধ বিবেক ও বৈরাগ্যের উজ্জ্বল আদর্শ। আছে শুদ্ধ কর্ম-জ্ঞান, পরা ভক্তি-প্রেম, গভীর স্নেহ ও ভালবাসার অমৃত নির্ঝর। আছে উদার শিক্ষা-দীক্ষা, একনিষ্ঠ সেবাপূজা ও নামসাধন, সদ্‌গুরু মহিমা ও লীলামাধুর্যের স্বর্গীয় প্রেরণা।···

এছাড়া, বাহিরে তিনি কঠোর, অন্তরে সুকোমল—স্বভাবে গম্ভীর, আলাপে সুস্মিত—রূপে কমনীয়, দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়। তেমনি কর্মে নিরলস, ফললাভে নিরাসক্ত—দানে মুক্তহস্ত, পরিগ্রহে বিমুখ। তিনি গ্রহণ করেন গরল, পরিবেশন করেন অমৃত—সংসারে থাকিয়াও সর্বত্যাগী, সমাধিস্থ হইয়াও জনকল্যাণব্রতী। এজন্য স্থুল দৃষ্টিতে অতি সাধারণ, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মহিমাময় সদ্‌গুরু অবতার। তিনি ভগবানের চিরানুগত ভক্ত, আবার ভক্তের চিরবাঞ্ছিত ভগবান। রূপে গুণে, আলাপে ব্যবহারে, মাধুর্যে দীপ্তিতে, ক্ষমায় ও ঔদার্যে তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছে বহু ভাব, আদর্শ ও বিভূতির বিস্ময়কর সমাবেশ। ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যাইবে, শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যই অপূর্ব, অপরূপ, অতুলনীয়!···

তাঁহার জীবনচরিত কথামৃতের সমাপ্তি রেখা টানিতে বসিয়া তাই অধম আজ বিস্ময়বিমূঢ়, ভক্তিনতচিত্ত। ইহা যেন সমুদ্র শোষণ করিয়া অফুরন্ত রত্নসম্ভার প্রকাশিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।···স্বভাবতই তিনি ছিলেন আত্মগোপন-প্রিয়, আত্মপরিচয় দানে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও অনিচ্ছুক। ডায়েরীতে তাঁহার সাধন জীবনের এবং শিষ্য ভক্তদের দুঃখতাপে আপদে বিপদে তাঁহার সদ্‌গুরু জীবনের অতি সামান্য অংশই প্রকাশিত। তাঁহার সেই জটিল সাধন পথ, ধর্মের কঠিন সমস্যা, নানা পরীক্ষা ও সমাধান, মহাসিদ্ধি ও দিব্য বিভূতির রহস্য—তাঁহার স্বর্গীয় জীবনবেদের সামান্যতম তথ্যই সংগৃহীত ও পরিবেশিত হইল। আপন ইচ্ছায় যতটুকু ধরা দিলেন, বর্ষিত হইল তাঁহার ততটুকুই কৃপামাহাত্ম্য। তিনি যে স্বয়ম্ভু, স্বরাট—আমাদের ধরাছোঁয়া ও উপলব্ধির

বহু ঊর্ধে।··· এ শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা,···অশ্রুজলে ভাবমুগ্ধ গুরু-অর্চনা।···

বিচার-বিশ্লেষণ, স্তুতি-প্রশস্তি, ধ্যান-ধারণার পরপারে শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সমাধির মত নীরব, সমুদ্রের মতই প্রশান্ত।···নরেন্দ্র সরোবরের নির্জনতটে গোস্বামী প্রভুর পবিত্র সমাধি-মন্দির। পার্শ্বে আঠারনালা নদীর তটপ্রান্তে তাঁহারই বক্ষের ধন নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী মহারাজের সমাধি-মন্দির।···দুইটী অম্লান জীবনজ্যোতিঃ—অধ্যাত্ম ভারতের আলোক-স্তম্ভ,···মহাপুণ্য দুইটী সিদ্ধপীঠ। মন্দির দুইটীর শীর্ষদেশ প্রতিদিন উদয়-সূর্য ও অস্ত-রবির সোনালী আভায় উদ্ভাসিত। পাশাপাশি মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্তিনত অসংখ্য নরনারীর পূজারতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে মুখরিত দিগদিগন্ত।···সেই দুইটী মহিমান্বিত দিব্যজীবন যেন নীরবে ঘোষণা করিতেছে এই অমৃতবাণী :

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

জয়গুরু-শ্রীগুরু—হরি ওঁ।
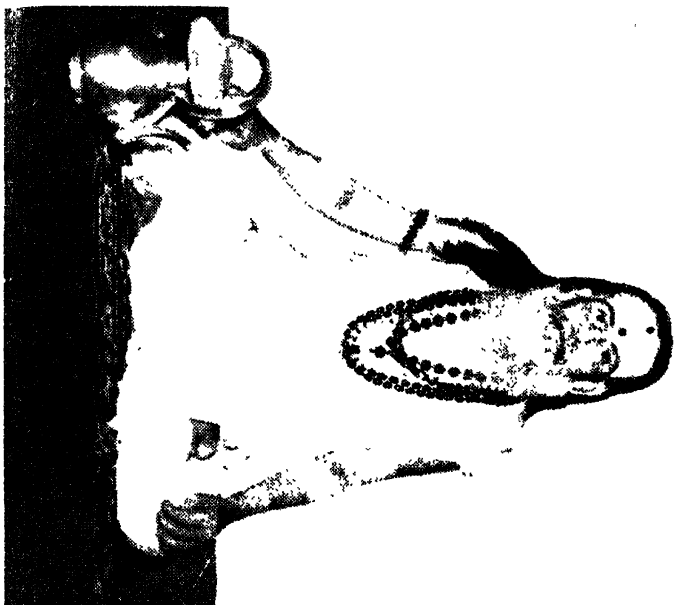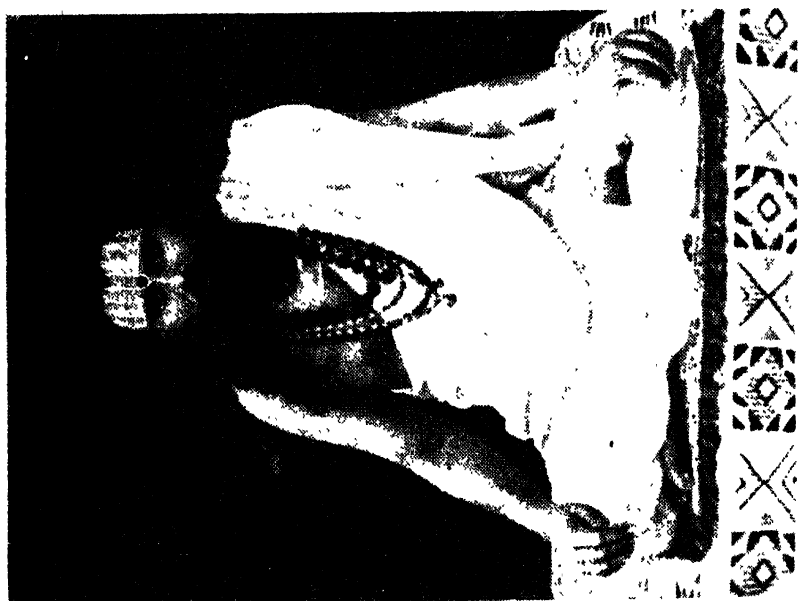
শ্রীশ্রীনীলকণ্ঠ কুলদানন্দ প্রশস্তি

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য, শিষ্যাধিক, আধ্যাত্ম সন্তান
নীলকণ্ঠ হলে তুমি, নিজে করি হলাহল-পান
নিঃশেষে নিঙাড়ি বিষ, বিশ্বজনে বিতরিলে সুধা
তোমার তপস্যাপূত পরিপ্লুত হ'ল এ-বসুধা।
আকুমাব মারজয়ী উর্দ্ধস্বল তুমি ব্রহ্মচারী
আপাত মধুরে মুগ্ধ সংসারীর মুক্তির দিশারি,—
সন্দেহ-সংশয়-ভয় সমুত্তীর্ণ নিত্য নিকেতনে
আপনি লইলে ব্রত বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মোচনে
সাধন-কুঞ্চিকা ধরি।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেরে
যেমন দিলেন স্থান, নীলকণ্ঠ কুলদানন্দেরে
তেমনি বিজয়কৃষ্ণ করিলেন নিজ বার্তাবহ
কলিহত জীবগণে আমন্ত্রণ করি অহরহ।
কপট-কুটিল-পন্থী সংসারের কলুষ-কল্মষ
তা'রি পঙ্ক হ'তে তুমি প্রস্ফুটিত ফুল্ল তামরস
অদ্বৈত-বংশের সূর্য গোস্বামীর ভূষণে ভাস্বান
বর্ণালী মালিকা বদ্ধ বালারুণ জটাজুট বান
গঙ্গাধর নীলকণ্ঠ,—তব গঙ্গাধারা পড়ে ঝরে
সদ্‌গুরু-সঙ্ঘের গঙ্গা, ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ 'পরে,
অসীমানন্দের বন্যা, হ'ল ধন্যা, তৃষ্ণা করি দূর
কিরণচন্দ্রের করে,—দিবাদগ্ধ সংসার-মরুর
মায়ামুগ্ধ পথিকের।

নামে প্রেমে পরিপূর্ণ প্রাণ
সর্ব-দ্বন্দ্ব-সমাধানে দেখাইলে পথের সন্ধান ;
যোগ-জ্ঞান-ভক্তি পথে ত্রিবেণীর সমুদ্র সঙ্গম
সত্য শিব সুন্দরের পুরোধা প্রণাম লহ মম।

আশীর্ব্বাণী ও অভিমত

পরমভাগবত মনীষী শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'নীলকণ্ঠ' পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। বইখানি অনন্যসাধারণ হয়েছে। প্রায় কোন মহাপুরুষেরই সাধন জীবনের অন্তর্যুদ্ধের ও অন্তর্বেদনার এমন নিখুঁত আলেখ্য লোকসমাজে উপস্থাপিত করবার সুযোগ থাকে না, কারণ সাধক স্বয়ং ব্যতীত আর কেউ তার সন্ধান রাখতে পারে না। নীলকণ্ঠ তাঁর জীবন প্রভাত থেকে দিনলিপিতে নিজের অন্তর্জ্জীবনটী চিত্রিত করে রেখে গেছেন। দিনলিপি তাঁর নিজের জন্যই লেখা, প্রচারের জন্যে নয়। কাজেই তাতে কোন ভেজাল নাই, যা পরবর্ত্তী জীবনে লোকপ্রসিদ্ধ মহান পুরুষদের autobio-graphyর মধ্যেও না থেকে পারে না। আপনি ঠিকই গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করেছেন। অকপট নবীন সাধকদের বিশেষ উপকার হবে। ভাষাটী ও লেখার পদ্ধতিটীও বেশ আধুনিক হয়েছে। সাহিত্য-রসিক পাঠকদেরও উপভোগ্য হয়েছে। সদ্‌গুরু ও শিষ্যের জীবন একসঙ্গে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এত দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা ক'রে আপনার এই গুরুসেবা সার্থক হয়েছে। রাধারমণ বাবুর 'প্রাক্‌কথনটী'ও বেশ সুন্দর হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশে যাঁরা আপনাকে সহায়তা করেছেন, তাঁদের আমার শুভাশীষ জানাবেন। পরবর্ত্তী ভাগের জন্যে অনেকেই সম্ভবতঃ প্রতীক্ষমান থাকবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ স্মৃতিতীর্থ

সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন তাঁরা, যাঁরা ঐ পথের পথিক; পথের ইঙ্গিত তাঁরা পেয়ে থাকেন মহাপুরুষের জীবন গাথার অনুরণনে। যাঁদের সদ্‌ভাবগুলি এখনও সুপ্ত, মহাপুরুষের জীবন-প্রবাহ তীর্থে বার বার অবগাহনে তাঁদেরও সম্ভাবনা আসে উক্ত সদ্‌ভাবগুলির জাগরণের। যাঁদের আবার গতিপথ একেবারেই বিপরীত, সাধারণ উপন্যাস হিসাবেও যদি তাঁরা পাঠ করেন, সদ্বস্তুর পুনঃ পুনঃ আলোচনায় ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হ'য়ে স্বচ্ছ হ'তে পারে তাঁদেরও হৃদয়-দর্পনখানি। কাজেই দেখা যায়—মহাপুরুষের জীবনী সর্ব্বশ্রেণীর লোকের জন্য।

সর্ব্বশ্রেণীর লোকের তৃপ্তি সাধন কিন্তু নির্ভর করে একমাত্র পরিবেশকের নৈপুণ্যের উপর। মহাপুরুষের চরিত্র অঙ্কন সোজা নয়! দেবতা না হ'য়ে দেবতার উপাসনা করা যায় না। মহাপুরুষ না হ'লে মহাপুরুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। সাধনপথে সমুন্নত না হ'লে সাধক-জীবনের প্রতিটি খুটিনাটীর স্বরূপ বোধের দৃষ্টি লাভ করা যায় না। গভীর সমুদ্রে অবগাহন সহজ নয়—চাই পাকা ডুবুরী। ভাবের ভাষার জ্ঞানের বুদ্ধির মনের সৌকর্য্যের ও সৌষ্ঠবতার দুর্বলতা নিয়ে এই মহাসমুদ্রের তটভূমিতেও যাওয়া যায না। পরিবেশক শ্রীমদ্ গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সারবত্তা সম্বন্ধে বিচার সামর্থ্য আমার নাই। মাত্র এই বলা যায়—তাঁকে ভালভাবে চেনা যাবে, তাঁর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁরই গ্রথিত "নীলকণ্ঠে"। ইতি—

প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

(সভাপতি, নিখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মিলনী)

"নীলকণ্ঠ" কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের 'সদ্গুরুসঙ্গ' নিজের লেখা 'ডায়েরী' পড়েছিলাম বহুদিন পূর্বে। ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ লিখিত সেই 'ডায়েরীর' অভিনব আস্বাদন নূতন ভাবের প্রেরণা জাগালো পরিণত বয়সে মনে প্রাণে। সাধন সমীক্ষার পথে প্রতিক্ষণে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ চল্‌ছে চিরদিন। সাধকজীবনে সেটি অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের কৃপামৃত ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের জীবনকে কিভাবে অভিরঞ্জিত করেছে, তার বিচার-বিশ্লেষণ এবং বিবরণ দিয়ে অনুবর্ত্তীগণকে তিনি করেছেন কৃতকৃতার্থ। সেই সুধাকণা মহিমামাধুরী শুধু প্রাঞ্জল ভাষার মাধ্যমে নয় জীবনসাধনায় রসায়িত করে প্রকাশ করেছেন ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ। তাই তাঁর বইখানা হয়েছে আগাগোড়া বীণার ঝংকারের মতন মধুশ্রুতি মনোহর। এর প্রচার ও প্রসারে সাধকসমাজ নির্বিশেষে সকলকার আনন্দবর্ধন করবে এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। সাহিত্যরসিকও রচনাশৈলীর গৌরব দর্শনে মুগ্ধ হবেন।

সাহিত্য-সম্রাট শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

সমুদ্রমন্থন শুধু দেবলোকে নয়, মর্ত্যলোকে, সাধকের হৃদয়ে। সেখানেও অমৃতের সঙ্গে হলাহল ওঠে। আর সেই হলাহল আত্মসাৎ না করে নিলে অমৃতের আস্বাদ লাভ হয় না। শ্রীমৎ কুলদানন্দেরও সেই নীলকণ্ঠ লীলা। আর সেই লীলারই অমূল্য ভাষ্য ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দের "নীলকণ্ঠ"। পতিতের ত্রিতাপজ্বালার গরল কণ্ঠে ধরে যিনি তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্রতর সাধনার শক্তিতে পিপাসিত জনগণকে অমৃত বিতরণ করছেন, সেই মহারুদ্র যোগিরাজের পবিত্র আনন্দ কীর্তন। বাঙলা সাহিত্যে এই গ্রন্থ এক নবতন পরিচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. সি. এস.

শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন একজন আদর্শ গুরু। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য। গুরুর ভাবধারাতেই তিনি অনুপ্রাণিত। তিনি ছিলেন গুরু-অন্ত-প্রাণ। গুরুর আদেশ তাঁর শিরোধার্য্য। তাঁর গুরু তাঁকে নীলকণ্ঠ বেশ দান করেছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি সিদ্ধিলাভের পর মনুষ্য সমাজের মধ্যেই তাঁর অগণিত শিষ্যের দুঃখভার নিজে বহন করে তাদের মধ্যে কল্যাণ বিতরণ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনী পাঠ করে মনে হয়, তাঁর চরিত্রে সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ঐকান্তিক গুরুভক্তি। তার একাধিক প্রমাণ আছে। পুরীতে নরেন্দ্র সরোবরের নিকট রাস্তার দু'পাশে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দির ও শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ দুটিই তাঁর কীর্ত্তি। তাঁর নিজের আশ্রমেও তিনি গুরুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুর নিকটে যখন বাস করতেন তখন তিনি গুরুর সহিত কথোপকথন এবং অন্য দৈনন্দিন ঘটনা তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করেন। তা হতেই তাঁর বিরাট গ্রন্থ শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়। ব্রহ্মচারীর অন্তরে অহরহ গুরুর জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির ফল্গুধারা অবিরাম প্রবাহিত ছিল।

শিষ্য সমাজে তাঁর এই কল্যাণব্রতী জীবনের তথা তাঁর এই মধুর গুরুভক্তির ইতিহাস পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর ঐকান্তিক চেষ্টায়। নীলকণ্ঠ প্রথম খণ্ডে ১৩০০ বঙ্গাব্দ অবধি তাঁর জীবনীর আলোচনা আছে। তার পরেও শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ ৩৭ বছর জীবিত ছিলেন। প্রথম খণ্ডটির আলোচ্য বস্তু প্রধানত সাধনার জীবন, দ্বিতীয় খণ্ডটির বিষয়বস্তু মূলত তাঁর কল্যাণব্রতী জীবন। উভয় খণ্ডই রচনা করেছেন ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী। প্রথম খণ্ডের প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁর সংগ্রহ করতে হয়েছিল অন্যের কাছ থেকে; কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড রচিত হয় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে,

কারণ তখন তিনি গুরুর অন্তরঙ্গ অন্তেবাসী। তাই বোধ হয় দ্বিতীয় খণ্ড আরও সরস এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। নিরাসক্ত ব্রহ্মচারীর সংবেদনশীল মনের, শিষ্য সম্প্রদায়ের জন্য অপরিমিত স্নেহের এবং সর্বোপরি গুরুর জন্য ঐকান্তিক ভক্তির স্নিগ্ধ মধুর বর্ণনা এই দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়।

নীলকণ্ঠ

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বিগ্রহ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার মানসপুত্র শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে "নীলকণ্ঠ বেশ" ধারণ করাইলেন। 'অমৃতেষু' গুরুর "নীলকণ্ঠ" শিষ্য মণিকাঞ্চন সংযোগ। এত নাম থাকিতে নীলকণ্ঠ নামই সর্ব্বশাস্ত্র নিষ্ণাত গুরুর স্মৃতিপথে উদিত হইল কেন ইহাই চিন্তার বিষয়। আত্মদর্শী, তত্ত্বদর্শী, দূরদর্শী গুরু বোধ হয় শিষ্যের ভবিষ্যৎ পরিণাম দেখিয়াই এইরূপেই শিষ্যকে রূপায়িত করিলেন এবং এই নামেই তাঁহাকে পরিচিত করাইলেন। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেকটি কথা যাঁহার মনে মুখে কাজে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু কর্তৃক নীলকণ্ঠ নাম সংগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবতের সমুদ্র মন্থনের উপাখ্যান পুনর্মথিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

নীল আকাশ যাঁহার কণ্ঠদেশরূপে প্রতিভাত হয়, সেই বিরাট রূপের বর্ণনীয় দেবতাকেই নীলকণ্ঠ বলা হয়। আকাশের গুণ শব্দ। কণ্ঠের কাজও শব্দোচ্চারণ করা। এজন্য বিরাট রূপের বর্ণনায় বিশ্বের অন্যান্য অংশকে বিরাটের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ বলিয়া আকাশকে বিরাটের কণ্ঠ বলা হইয়াছে। নীলবর্ণ অসীমতারও দ্যোতক, জল বর্ণহীন, বায়ু বর্ণহীন। কিন্তু অসীম জলরাশি নীলবর্ণ দেখায়, সেরূপ অসীম বায়ুমণ্ডল নীলবর্ণ দেখায়। নীলকণ্ঠ এইরূপ অসীম কণ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হন। অসীম সমুদ্রমন্থন করিয়া প্রাপ্ত বিষেরও নীল নাম দেওয়া হইয়াছে। এই বিষার্থক নীল শব্দ হইতেও নীলকণ্ঠ নাম করা হইয়াছে।

ভবসমুদ্র ও ভাবসমুদ্র উভয় বারিধি মন্থন করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের নীলকণ্ঠ উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। ৮।৭।৪৩ শ্লোকে শুকদেব বলিয়াছেন—'যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্। তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।' অর্থাৎ এই যে শঙ্কর গলায়

বিষ ধারণ করিলেন, এই কার্য সাধুর পক্ষে অলঙ্কারস্বরূপ হইল। সাধুরা লোকের ত্রিতাপজ্বালা টানিয়া নিজের উপর আনিয়া সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। নীলকণ্ঠ শিবের এই আদর্শে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বজনাদৃত অংশ রসলীলা প্রসঙ্গ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ১০।৩৩।৩১ শ্লোকে শুকদেব বলিতেছেন—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রো অব্ধিজং বিষম্।" অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর নহেন তাঁহারা কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না—রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ বিষপান করিলে মরিয়া যাইবে। ইহার পূর্বশ্লোকে ঈশ্বরগণের সাহসের কথা শুকদেব উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই সাহসের দৃষ্টান্তরূপে এই শ্লোকে নীলকণ্ঠ রুদ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিবৃতি দিতে গিয়াই শুকদেব এই সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টান্ত সকল দৃষ্টিগোচরে আনিয়াছেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে নীলকণ্ঠের আদর্শে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অনুপ্রাণিত।

নীলকণ্ঠ ত্রিলোকদাহক বিষ হইতে সৃষ্টিকে রক্ষা করিয়াছিলেন—লোকপালগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া এই তারকব্রহ্মরুদ্রকে ডাকিতে লাগিলেন। কি প্রাণস্পর্শী ভাব—কি প্রাঞ্জলভাষা! ৮।৭।২৪ শ্লোকে লোকপালগণ এই নীলকণ্ঠকেই পরাৎপর ব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা, গুণাতীত গুণময় এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন নামে পরিচিত তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সদ্গুরু শিরোমণি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ তাঁহার দূরদর্শিতার প্রভাবে শিষ্যকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য, এই সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত করার জন্য, এই বিষ ও অমৃত একাধারে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য শিষ্যকে নীলকণ্ঠরূপে রূপায়িত করিলেন—নীলকণ্ঠ উপাধিতে বিভূষিত করিলেন।

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ যতদিন গুরুর সঙ্গে ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে সতীর্থ-সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীরবে দিন কাটাইতে হইয়াছে। ব্রহ্মচারী মহারাজের গুরু ভ্রাতৃগণের ঈর্ষা, হিংসা কটাক্ষাদির সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়াই তাহার তপের তাপের

মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীমান গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারিজী তাঁহার লিখিত 'নীলকণ্ঠ' প্রবন্ধের প্রথমে তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার যোগ্য গুরুর চরণছায়ায় অল্পাধিক নিরাপদে থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহার নীলকণ্ঠ নামের সুপরিচয় দেওয়া অত্যাবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শিষ্য থাকাকালীন তাঁহার সাধকজীবনের ধৈর্য্যের কথা প্রথম খণ্ডেই বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধ হওয়ার পর গুরুর আসন অলঙ্কৃত করিতে গিয়া ফুলশয্যার পরিবর্তে যে কণ্টক শয্যায় তিনি আমাদের মত অত্যাচারী শিষ্যের সেবার নামে সর্বনাশের আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, তাহা নীলকণ্ঠ গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত হইতে গিয়া লেখকের লেখনী হইতে অবিরল অশ্রুধারায় ঠিক ঐভাবে পরিশ্রুত হইয়াছে কিনা নীলকণ্ঠই জানেন।

গুরু-সাগর মন্থনের ভার তাঁহার উপরে ছিল না। তাঁহার সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী গুরু সেই দিক হইতে শিষ্যকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। শিশু যেমন মায়ের স্তন পান করিয়া পুষ্ট হয়, ব্রহ্মচারী মহারাজও গোস্বামী প্রভুর সান্নিধ্যে বসিয়া গুরুর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবেই পুষ্ট হইয়াছিলেন। উপনিষদে উদ্দালক, আরুনি—একালের দৃষ্টান্ত ব্রহ্মচারী মহারাজ। সতীর্থ-সাগর মন্থনেও তিনি গুরুর কৃপায়, গুরুর সহায়তায় সফলকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু শিষ্য-সাগর মন্থনে যে বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কণ্ঠে করিয়াই তাঁহার গুরুদত্ত নীলকণ্ঠ নামের সার্থকতা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার গ্রন্থের ২য় খণ্ডে তাহার বিবৃতি দেওয়ার আভাস দিয়াছেন। জানিনা নীলকণ্ঠ তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছেন।

গীতার সর্বোচ্চ আদর্শ 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' সুখে দুঃখে অটল, লাভক্ষতি, জয় পরাজয়ে সমভাব বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিতে গিয়া ব্রহ্মচারী মহারাজের মধ্যেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শিষ্যকে নরকে গেলেও গুরু তাহাকে ত্যাগ করা দূরে থাকুক বুকে করিয়াই রাখেন—এই কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁহার

শেষ জীবনের ঘটনা বিশেষের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা আমার স্নেহের সতীর্থ শ্রীমান গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন আশা করি। আর নমস্কার করিতে গিয়া বলি: জয় শ্রীকুলদানন্দ বালক ব্রহ্মচারী, একনিষ্ঠ গুরুভক্ত শিষ্যতাপহারী।

গ্রাম্য যোগাশ্রম,
বালিগঞ্জ

আচার্য্য যোগেশ ব্রহ্মচারী

গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছে :

আচার্য্য প্রসঙ্গ	...	সারদাকান্তজীর প্রকাশিত ডায়েরী
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ	...	৺অমৃতলাল সেন
ছাত্রদের কুলদানন্দ	...	হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
অমৃত প্রসঙ্গ	...	জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত